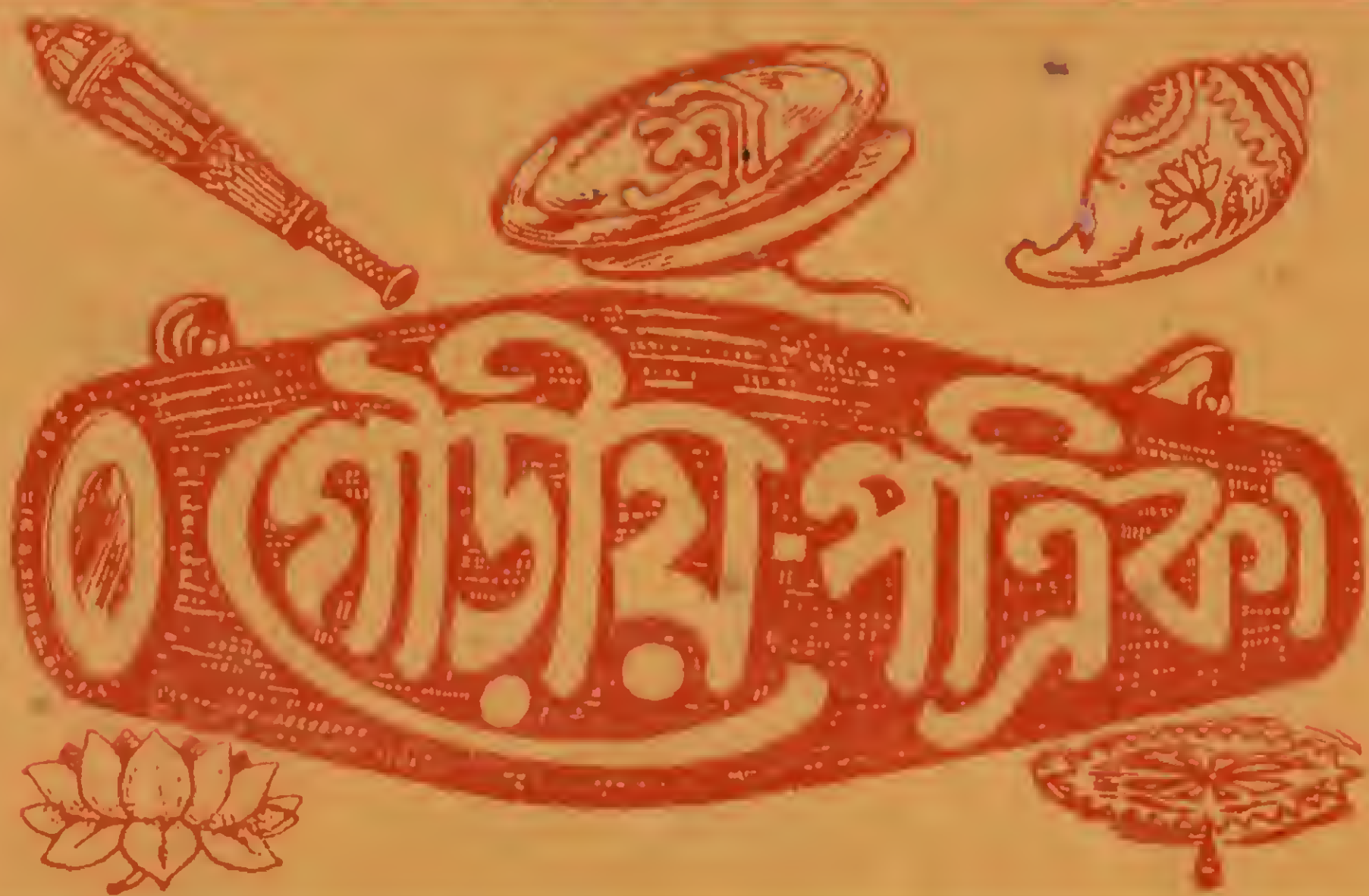


শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ



৩য় বর্ষ

}

চৈত্র ১৩৫৭

{

২য় সংখ্যা



শ্রীল ঠাকুর গোরাকিশোর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (ভগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

- পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)
- পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগরত্ন
- পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম্, এ, বি, এল্
- পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
- পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী
- পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
- পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী
- পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
- পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাক
১। অগ্ন্যাহার (১) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৭
২। অনর্থ-নিবৃত্তি	৯।৩৪৬
৩। অপ্রকট-তিথি [শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে ১১ই কার্তিক, ১৩২৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত]	৯।৩২৪
৪। অমায়া [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮৩
৫। অর্চন	৩।৮৯
৬। আত্মনিবেদন	১১।৪২৬
৭। আদর্শ সেবা	২।৭৬
৮। “আমিও যা’ব”	১২।৪৬৬
৯। আমি বৈষ্ণব !	১।১৬
১০। আত্মরিক প্রবৃত্তি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।২০৪
১১। উপকুর্বাণ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৪
১২। উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম (৩) [জন্মাষ্টমীর বিস্তৃত বিচার-সম্বলিত সমালোচনা—২২৫-২৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]	৬।২৩০
১৩। কালের গতি [পদ্ম]	৮।৩০৭
১৪। কৃপা চাই	৩।৯৪
১৫। কৃষ্ণ-তত্ত্ব [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪৫
১৬। কৃষ্ণ-বিস্মৃত বহিষ্কৃত জীবের ক্লেশ-বর্ণন [শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	৯।৩৪৩
১৭। কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?—শ্রী	৭।২৬৭, ১২।৪৬৩
১৮। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ—শ্রীশ্রী [শ্রী ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৬
১৯। গানের অধিকারী কে ? [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৫
২০। গুরুতত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রী	১০।৬৮৫
২১। গুরুসেবা—শ্রী	১।২৯
২২। গুরুষ্টকের পঞ্চানুবাদ—শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত	১২।৪৪৯
২৩। গৃহ-ধর্ম	১২।৪৫৫

২৪।	গৃহে সুখ কোথায় ?	৫।১২৫
২৫।	গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর চরণ-কমলে দীনের ভক্ত্যর্থ্য—শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্ম]	৭।২৫৫
২৬।	গোবর্দ্ধনাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১০।৩৬১
২৭।	গোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	১০।৩৬৩
২৮।	গোস্বামি-মতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী [সমালোচনা]	৫।১২৮
২৯।	গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
৩০।	গৌর কি দত্ত ?—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৪
৩১।	চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর ২।৭১, ৩।১০৭, ৪।১৪২, ৫।১২৩, ৮।৩১৬	
৩২।	চৈতন্যষ্টকম্—(১) শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	২।৪১
৩৩।	চৈতন্যষ্টকের অনুবাদ—(১) শ্রীশ্রী	২।৪৩
৩৪।	জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৪।১২১
৩৫।	জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৪।১২৩
৩৬।	জগন্নাথষ্টক—শ্রীশ্রী—চুঁচুড়াহু শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পূজিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসবোপলক্ষে [পদ্ম]	৬।২১২
৩৭।	জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব—শ্রী	৭।২৭২
৩৮।	জনসঙ্গ (৫) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭১
৩৯।	জন্মাষ্টমীর বিগুহ-বিচার—শ্রী [সমালোচনা] ৬।২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩০, ২৩৩, ২৩৬	
৪০।	জয় ও বিজয়—শ্রী	২।৩৩৬
৪১।	জ্ঞান [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৬
৪২।	ঠাকুর নরহরি—শ্রীল [পদ্ম]	১১।৪১৩
৪৩।	ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বন্দনা [পদ্ম]	৫।১৭২
৪৪।	দাস্ত	৫।১২১
৪৫।	দীনদয়াল প্রভুর অপ্রকটে অনুতাপ-গীতি [পদ্ম]	৮।২২৫
৪৬।	দীনদয়াল ব্রজবাসী—পরলোকে শ্রীপাদ	৭।২৬৩
৪৭।	দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্থলিখিত প্রবন্ধ—পরলোকগত শ্রীপাদ [হরিভক্তের অধিকারী ও বর্ণ বিচার, এবং কৃষ্ণবিশ্বত বহিস্মৃৎ জীবের ক্লেশ-বর্ণন-সম্বলিত] ২।৩৪২-৩৪৩, ১২।৪৫২	

୪୮ ।	ଦୀନେର ଭକ୍ତି-ଅନୁନାମ—ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିପ୍ରଜ୍ଞାନ କେଶବ ମହାରାଜେର ଅକଟ-ବାସରେ [ପୃଷ୍ଠା] ୩୧୦୮	
୪୯ ।	ଦୁର୍ଗାପୂଜା [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୮୧୨୮୪
୫୦ ।	ଦୈତ୍ୟ [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୩୮୫
୫୧ ।	ନବଦ୍ଵୀପଧାମ ପରିକ୍ରମାୟ ଆହ୍ଵାନ—ଶ୍ରୀ [ପରିକ୍ରମା ଓ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ- ପଞ୍ଜୀକା (୧୩୫୭-୧୩୫୮)—ବିଜ୍ଞାପନ] ୧୩୫୭-୫୮, ୧୩୫୯-୬୦	
୫୨ ।	ନବଦ୍ଵୀପଧାମ ପରିକ୍ରମାନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା [ପୃଷ୍ଠା]	୩୨୨
୫୩ ।	ନବନିର୍ମିତ ଗୃହ-ପ୍ରବେଶ-ମହୋତ୍ସବ—ଶ୍ରୀସିଦ୍ଧବାଟୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର	୮୧୨୫୪
୫୪ ।	ନବବର୍ଷେ ବିଗତବର୍ଷର ଆଲୋଚନା [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୧୩୧୦
୫୫ ।	ନାରକୀ [ପୃଷ୍ଠା]	୩୮୮
୫୬ ।	ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ [ଶ୍ରୀମଦ୍-ବିନୋଦନାଥ-ଠାକୁର-ବିରଚିତମ୍]	୧୩୧
୫୭ ।	ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାଷ୍ଟକର ଅନୁବାଦ—ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ	୧୩୩
୫୮ ।	ନିୟମାଗ୍ରହ (୫) [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୨୩୨୨
୫୯ ।	ନିୟାମକ-ମହାରାଜେର ହରିକଥା [ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା-ପଥେ ଗୟାୟ]	୧୦୩୨୬
୬୦ ।	ନାମସେବନ	୧୩୪
୬୧ ।	ନାରାୟଣ ସାମୟିକପତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୧୩୫
୬୨ ।	ନିକ୍ରମାର ଶତ୍ରୁରବ [ପୃଷ୍ଠା]	୨୩୫୨
୬୩ ।	ନିକ୍ରମ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମା [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୧୩୫୫୫
୬୪ ।	ନିକ୍ରମ—କାକଦ୍ଵୀପେ	୮୧୨୫୫
୬୫ ।	ନିକ୍ରମ—ଚୁଁ ଚୁଡ଼ାୟ	୨୩୨
୬୬ ।	ନିକ୍ରମ-ପ୍ରସଙ୍ଗ	୫୩୨୨
୬୭ ।	ନିକ୍ରମ—ସାତାଳ ପରଗଣାୟ ହରିକଥା [ନାମନୀୟା ଗ୍ରାମେ]	୮୧୨୫୫
୬୮ ।	ନିକ୍ରମ (୩) [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୮୧୨୮୮
୬୯ ।	ନିକ୍ରମ-ନିଧି [ଶ୍ରୀବେଦାନ୍ତ ସମିତି-ସଂସ୍କରଣ “ନିକ୍ରମ-ନିଧି”—ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିପ୍ରଜ୍ଞାନ କେଶବ ମହାରାଜ-ଲିଖିତ ଭୂମିକା]	୧୩୫୭
୭୦ ।	ନିକ୍ରମାନନ୍ଦ—ଶ୍ରୀ [ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ]	୧୦୩୨୫
୭୧ ।	ନିକ୍ରମାନନ୍ଦର ଆବିର୍ଭାବ-ବାସରେ ବିରହ-ସ୍ମୃତି—ଶ୍ରୀଳ	୧୩୨
୭୨ ।	ନିକ୍ରମାନନ୍ଦର ବିରହ-ମହୋତ୍ସବ—ଶ୍ରୀଳ [ନିକ୍ରମ-ବାର୍ଷିକ ତିରୋଭାବ]	୧୩୫୫୮
୭୩ ।	ନିକ୍ରମ (୨) [ଶ୍ରୀଳ ଠାକୁର ଭକ୍ତିବିନୋଦ]	୧୩୫୫

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৭৪।	প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র (চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর)	২।৭১
৭৫।	প্রার্থনা [পত্র]	৬।২২৪
৭৬।	বন্দন	৪।১৪২
৭৭।	বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্তব্য [পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	১২।৪৫২
৭৮।	বর্তমান সভ্যতার মানদণ্ড	১১।৪৩১
৭৯।	বর্ধাস্ত্র নিবেদন	১২।৪৬২
৮০।	বলদেব-স্তোত্রম্ শ্রীশ্রী	৩।৮১
৮১।	বলদেব-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮২
৮২।	বসিরহাটের বক্তৃতার প্রতিবাদ (চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)	২।৬৫
৮৩।	বাস্তহারার মর্শ্ব-কথা	৪।১৪৫, ৫।১৮২
৮৪।	বিরহ-বাসরে বক্তৃতা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব- তিথিতে শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু দাসাধিকারী, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক-প্রদত্ত]	৭।২৭৩
৮৫।	“বিরহীর অশ্রু-বন্দনা”—(জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে)	১১।৪৩০
৮৬।	বিগ্রহগণের নবমন্দিরে প্রবেশ—শ্রী—পরিক্রমা ও শ্রীগৌর- জন্মোৎসব-মধ্যে	২।৭৩
৮৭।	বিষ্ণু ভজন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৫০
৮৮।	বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা ২।৭২, ৩।১২০, ৪।১৫৭, ৫।২০০, ৬।২৪০, ৭।২৮০, ৮।৩১২, ৯।৩৬০, ১০।৩৯২, ১১।৪৪০	
৮৯।	বিষ্ণুরাতের কলি-শাসন [পত্র]	৪।১৩০
৯০।	বৃন্দাবনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৮।২৮১
৯১।	বৃন্দাবনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
৯২।	বৈষ্ণব-ঠাকুর—“রূপাসিকু”	৮।৩০৩
৯৩।	ব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৬
৯৪।	ব্যাসপূজার আহ্বান—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৩২
৯৫।	ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ [পত্র]	১।১৪
৯৬।	ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জবত—৮৪ ক্রোশ শ্রী	১০।৩৯৩, ১১।৪৩৪
৯৭।	ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র—৮৪ ক্রোশ শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৮।৩০৬

৯৮।	ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—৮৪ ক্রোশ শ্রী [বিজ্ঞাপন] ৭।২৬২
৯৯।	ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটি বিচার (৪) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা] ৬।২৩৩
১০০।	ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ (২) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা] ৬।২২৮
১০১।	ভক্ত অশ্বিনীকুমার ও তাহার নির্য্যাণ ৩।১১৪
১০২।	ভক্ত ও ভোগী ৬।২১৪
১০৩।	ভক্তিকথা ১।২৫, ২।৬১, ৪।১৩৭, ৫।১৭৭, ৮।২২৬, ১০।৩৮০, ১১।৪১৪, ১২।৪৫১
১০৪।	ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের বক্তৃতার চূষক—শ্রীগৌড়ীয়- পত্রিকা-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ৩।১০৯
১০৫।	ভক্তি-কুসুমাজলি—শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে [পদ্ম] ১০।৩৭৯
১০৬।	ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ [পদ্ম] ৪।১৫১
১০৭।	ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল ৭।২৭১
১০৮।	ভগবান্ কি নাই? ৬।২১৮
১০৯।	ভজন-ক্রিয়া ৮।৩০০
১১০।	“ভূতানুদ্বৈগদায়িতা” ৮।৩১০
১১১।	ভ্রম-সংশোধন ৭।২৫৪, ৮।২৯৪, ১২।৪৬৮
১১২।	মায়াপুর-বন্দনা—শ্রীধাম ১১।৪১৯
১১৩।	মুখার্জি মহাশয়ের বৈষ্ণবশ্রয়—শ্রীযুত ৪।১৫৩
১১৪।	মুদ্রাকর-প্রমাদ ৫।১৯৪
১১৫।	যমুনাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ১২।৪৪১
১১৬।	যমুনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী ১২।৪৪৩
১১৭।	যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ৮।৩০৮
১১৮।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকা সহ] ৪।১৫৯-১৬০
১১৯।	রাধাকুণ্ডাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী-বিরচিতম্] ১১।৪০১
১২০।	রাধাকুণ্ডাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী ১১।৪০৩
১২১।	রাধাষ্টমী-ব্রতম্—শ্রীশ্রী ৭।২৪১
১২২।	রাধাষ্টমী-ব্রতের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী ৭।২৪৩

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাক

১২৩।	রাধিকাষ্টকম্ শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	২।৩২১
১২৪।	রাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	২।৩২৩
১২৫।	রাম-নবমী-ব্রত—শ্রী [সমালোচনা]	৩।২৫
১২৬।	লৌল্য (৬) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪০৬
১২৭।	শান্তিলাভের অধিকারী কে ?	৬।২২১
১২৮।	শুভ-প্রবেশোপলক্ষে—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহগণের	২।৫৭
১২৯।	শ্রদ্ধাই ভক্তিব্রতা-বীজ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭৮
১৩০।	শ্রীমূর্তি ও মায়াবাদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।৬৪
১৩১।	সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব	২।৩৫৩
১৩২।	সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব	২।৩৫৪
১৩৩।	সখা	১০।৩২১
১৩৪।	সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ—(৫) শ্রীল [জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২৩৬
১৩৫।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা [নবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে ১৩৫৭]	৪।১৩২
১৩৬।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে]	৭।২৭৫
১৩৭।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম কাকদ্বীপে	৫।১৮৭
১৩৮।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম [শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চদশ-বার্ষিক বিরহ-বাসরে]	১১।৪৩২
১৩৯।	সহ-সম্পাদকের বিলাত যাত্রা [পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল্ মহোদয়ের]	২।৩৫৯
১৪০।	সারস্বত লীলা—শ্রীহর-পার্বতী-সংবাদে [পদ্ম]	২।৩৩৪
১৪১।	সুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
১৪২।	সুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
১৪৩।	স্মার্ত্ত শ্রমণের মতি পরিবর্তন [সমালোচনা]	১১।৪৩৮
১৪৪।	হনুমান্ খুঁটিয়াজী—পরলোকে	৩।১১৩
১৪৫।	হরিকুণ্ডম-স্তবকম্—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৬।২০১
১৪৬।	হরিকুণ্ডম-স্তবকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৬।২০৩
১৪৭।	হরিবাসর (১) [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৬।২২৬
১৪৮।	হরিভজনের অধিকারী ও বর্ণ-বিচার [শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ]	২।৩৪২

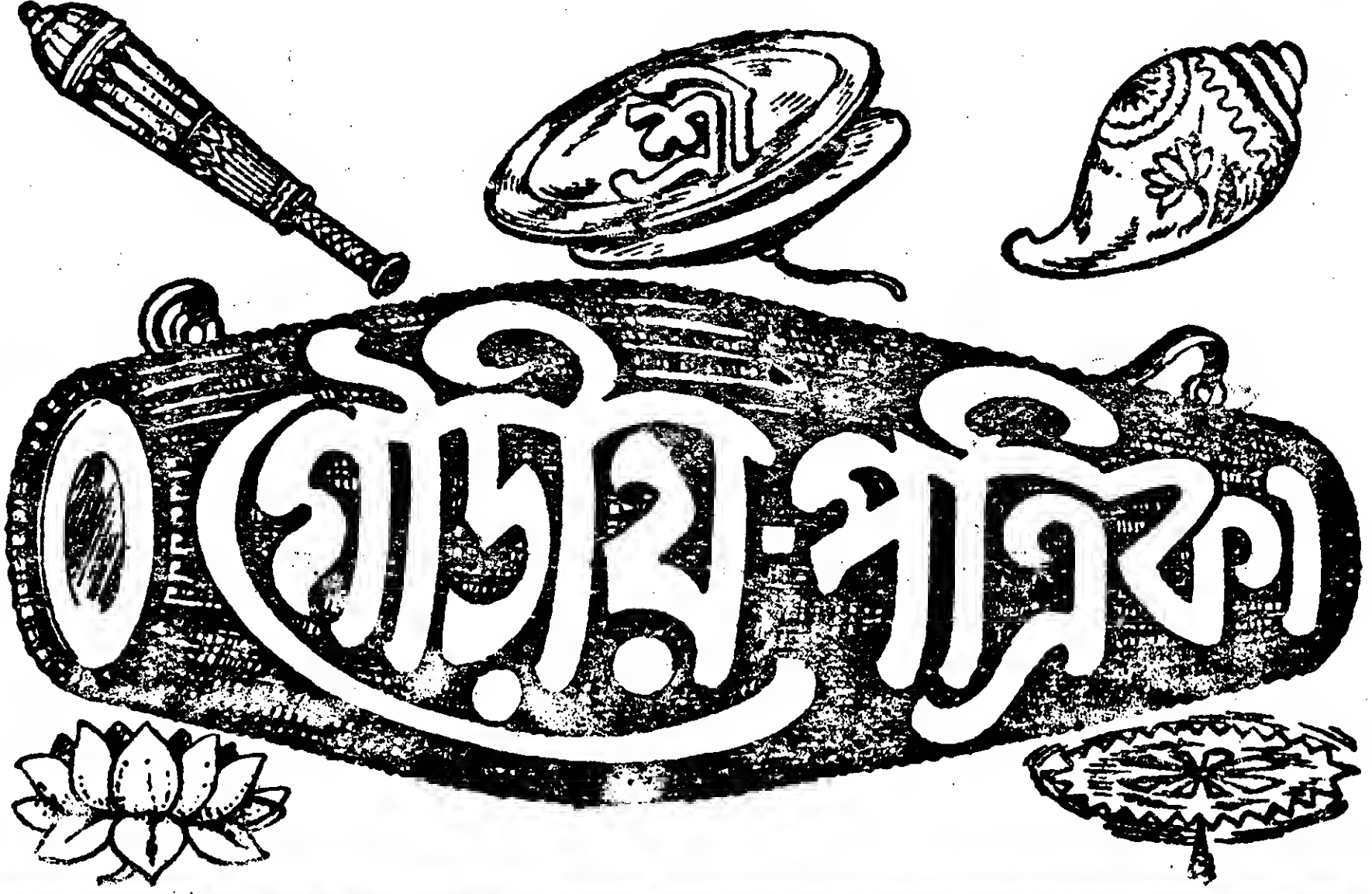
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা :-



• জগদ্-গুরু পরমহংসকুল-চুড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	{	অনিরুদ্ধ, ২১ গোবিন্দ, ৪৬৪ গোরাঙ্গ	{	১ম সংখ্যা
		বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৫৭ ; ইং ১৮৭৩		

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্বন্দ্যাবনদাস ঠাকুর-বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সঙ্গং স্মিতমুখং
সদা ঘূর্ণনৈত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবী-পতিং
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

শচীসূনু-প্রের্তং নিখিল-জগদিচ্ছং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদাম-করণং ।
হরেব্যাখ্যানাদ্ভা ভব-জলধি-গর্বেবান্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

অয়ে ভ্রাতৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি কামিণ্যং সহ ভগবতা মদ্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

যথেষ্টং যে ভ্রাতঃ ! কুরু হরি-হরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ ।
ইদং বাক্ত-স্ফোটৈরাতি-রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারান্তোনিধি-হরণ-কুন্তোদুবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুনতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং ।
খলশ্রেণী-স্ফুর্জ্জতিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং ।
প্রকুবন্তং সন্তং সকরণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
 মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ং ।
 ভ্রমন্তুং মাধুর্যৈরহহ ! মদয়ন্তুং পুরজনান্
 ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

রসানামাধানং রসিক-বর-সদৈষ্যব-ধনং
 রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ ।
 পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি য
 স্তদজিহ্ব-দ্বন্দ্বাজং স্মরন্তু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ

যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহররূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত মাতঙ্গের গ্রায় মৃদু-মহুর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার কলেবর বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, যিনি নিরন্তর সহাস্ত-বদন, যাঁহার নয়ন-যুগল সদাই চঞ্চল, যাঁহার হস্তে বেত্র শোভা পাইতেছে, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবাস্থা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি সমুদ্রকর্ত্তা-রূপে পাষাণগণের দলন-কর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রচার দ্বারা দুস্তর ভব-সমুদ্রের গর্ভ খর্ব করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৩ ॥

“হে ভ্রাতঃ ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে ? তুমি কৃপা করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে”—এইরূপে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও যুক্তি পরামর্শ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পিতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

“হে ভাই-সকল ! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্ত আমি দায়ী रहিলাম”—এইরূপ বলিতে বলিতে যিনি বাহু আশ্ফালন-পূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পিতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৫ ॥

আহা মরি ! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কুণ্ড বা কলস-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি আনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্ত চন্দ্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জয়গণের পাপাঙ্ককার বিনাশ করিতে সূর্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পিতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীর্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে ও শ্রীহরিনাম-কীর্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ-নেত্রে ঈক্ষণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পিতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীগৌরাজের অকোমল কর-কমল ধারণপূর্বক পরস্পরের বদন-চন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আহা মরি ! যিনি নগরবাসি-গণকে স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পিতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যিনি ভক্তিরসসমূহ-প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাহার শ্রবণ করিলে পাপিগণের পরিভ্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এই অত্যাশ্রয় ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করিবেন, তাহার হৃদয়ে তদীয় সুদুল্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারু-রূপে স্মৃতি প্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥

পারমাথিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি

সাধুর সন্তোষ-বিধানই পারমাথিক পত্রের বৃত্তি ও জীবন

সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমাথিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমাথিক পত্রের সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু-বৃত্তি ত্যাগ করিবার প্রার্থনা-সমূহে পারমাথিক পত্রিকা অলঙ্ঘ্য থাকেন। অত্যাভিলাষ-দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমাথিক পত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ হরি-বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন, এবং মিথ্যাযুক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন, তিনি সজ্জনতোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী ও অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনন্দপ্রকাশই সাধুর লক্ষণ

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমাথিক সাময়িক-পত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এইরূপ নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহারা-রাগদ্বেষের বশবর্তী, তাহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের গায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। পারমাথিকপত্র মহাজনবর্গের পথের অমুগমনই “পরমধর্ম” বালিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

গোশ্বামী বলিয়াছেন,—‘কালঃ কলিঃ’ অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিপদসঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণের বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্ত বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের পরবর্তীকালে অপসম্প্রদায়ের প্রভাব

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভাক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোশ্বামিগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোশ্বামীর প্রতি-উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগোরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঙ্কল্পপূর্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ী শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

বিষয়-মিশ্রিতা চেষ্টা ভক্তি মহে, পরন্তু ভব-বন্ধের কারণ

অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অগ্ৰাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এসকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অগ্ৰ গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম। কৃষ্ণের বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাহারা কৃষ্ণের অসদ্বস্ত-সেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম-বিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন। শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।

সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥

প্রাকৃত অর্থ-লাভাদি চতুর্বর্গের চেষ্টা আদরণীয়া নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-ফলোদ্দেশ্যে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারি না। প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধ কারক প্রাকৃত দ্রবিল, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধ-শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অগ্ৰাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের তালিকা

অগ্ৰাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অগ্র উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ মিছাভক্ত বলেন। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী। নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুকুর উদাহরণ-স্বরূপ রাম-দাস বিশ্বাস, বুড়ুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অগ্ৰাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট, শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথাপ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগ্য সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ-দঙ্কল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধ-ভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্নহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্তপদাসীন অতন্ত্রগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত কথা-প্রচারই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

শ্রীসঙ্জন:তোষণী বিষয়-রস-বাহিনী সাময়িক-পত্রিকা নন। শ্রীগৌরহৃন্দরের দয়িতবর শ্রীমহাভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাশ্রয় বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের স্বকৃতিলাভের জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্তনোদ্দেশ্যে ‘তোষণী’ প্রকট করিয়াছিলেন। বচনসর্কস্ব তত্ত্বাভিমानी প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরহৃন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। “যাহাতে অপ্রাকৃত-চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রয়স লাভ ঘটে, নেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছা-ভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্তুষ্ট হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত-শব্দ-তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

দুঃসঙ্গ-বর্জনে ও সংসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই শ্রীপত্রিকার ধর্ম

সঙ্জনের ধর্ম সঙ্জনকেই তুষ্ট করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণের জন্য সঙ্জন:তোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) নহেন। “যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্কান্নাশ্রিতপদো যদি নির্ক্যালীকং” শ্লোক ; “কর্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কপট-বৈষ্ণব-বেশে” প্রভৃতি পদ্য ; “বাহ্যাত্মন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যাগহে বৈষ্ণবান্” —এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রদৃশ, কিন্তু অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তিপ্রতিকূল-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাহারা বলেন,—শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না ; কেননা তাহাতে পরচর্চা হয়, তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসজ্য সংস্ং সজ্জিত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাশ্র ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

প্রতিকূল বা দুঃসঙ্গ-বর্জনের পরামর্শ পরচর্চা নহে

শ্রীগৌরহৃন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে “পরচর্চা” বলিয়া স্থির হইলেও অসংনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ

জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসংনিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মারিক কথা-মাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটি-দল বলেন,—অনর্থবিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমৃদ্ধিকল্পে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরিভজন করিলেও বস্তুধর্ম-প্রভাবে তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু যাহার অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন-সংজ্ঞামাত্র দিয়াছে, সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতা-আশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু জাতভাব প্রভৃতি জানিলে কি-প্রকারে বস্তুধর্ম প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধানযুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাই ত' শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তি সহজিয়ার পোষিকা নহেন

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাঁহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত-দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন। বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধ-ভক্তিপথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

বৈষ্ণবগুরুর অবমাননায় শ্রীপত্রিকার ক্রোধ ও তীব্র প্রতিবাদ

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্তুতি উড়ায় হেসে”—একথা পরম সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া গোড়ীয়-সম্পাদক যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রুত-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—
“ক্রোধ ভক্ত-দেষিজনৈ।” ক্রোধের নিয়োগ ভক্ত-দেষিজনেই কর্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন

করিয়াছে। বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ করা কেবলমাত্র পাপ নহে, —
আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া
যাউক, তাহাও আমরা সহ করিতে প্রস্তুত থাকিব।

—শ্রীল প্রভুপাদ

নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা

শ্রীশ্রীমদগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় আমরা বর্তমান বর্ষ প্রবেশ করিলাম। বিগত-
বর্ষের সমস্ত পারমার্থিক বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সকল
প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-নামের জয় হইয়াছে।

মিথ্যা ব্যতিরেকভাব সত্যের উজ্জ্বলতা-কারক

দুই একজন নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা
বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন সন্দেহ নাই।
সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা
মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয় নিতান্ত
মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়। এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্ত্বের জয় হয়,
ততদূরই মায়া-জনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে,
যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া অগ্রসর হয় এবং
সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্টাচরণ করিয়া থাকে। ইহাও ভগবানের ইচ্ছা,
কেননা, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়া না উদয় হইলে যথার্থ্য-তত্ত্ব বল লাভ করিতে পারে
না। অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না। তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত
ব্যক্তিগণের উদয় না হইলে সত্যশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।

শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণিগীর্ষী শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধী

কলিচেলাগণের আত্মগোপন

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যথার্থ্য গোপন করিয়া
কতকগুলি লোক কনক-কামিনী সঙ্ঘে যত্নবান্ ছিল। যে মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের
মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল কলির চেলাগণ নানা
আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে
লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির
চেলাদিগের মুখে কালি চূর্ণ পড়িয়াছে; ভক্তজগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস

করেন না। সুতরাং নিজে-নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা, অমাবস্যা কে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল; কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি-পীঠ।

শ্রীগৌরপূজা ও গৌরমন্ত্র-বিরোধিগণের দমন

কএক বৎসর হইতে কলি কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্র-পূজাদি নিষেধপূর্বক জগৎকে প্রতারিত করিতেছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা সহিতে না পারিয়া সেইসকল লোকের শক্তি হরণ করতঃ এবং শুদ্ধ গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বলপ্রদান করতঃ তাহাদিগকে দমন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে পলায়িত হইয়া তাঁহারা পূর্বদেশ আশ্রয় করেন; সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরুদ্ধে কোন প্রকার চেষ্টা করায় তদ্রূপ ভক্তবর্গ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আহা, সত্যের প্রতিরোধ করিতে গেলে এইরূপ দুর্দশা ঘটয়া থাকে। গৌরাঙ্গ-মন্ত্রপূজা নিষেধ করিয়া তাহারা কি করিতে পারিল? ফলতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে গৌরাঙ্গোপাসনা আরও প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগোড়ক্ষেত্রে এবং শ্রীপুরুষোত্তমে সাধুগণ চমকিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সনাতন পূজাপ্রথা বিশেষ যত্ন-সহকারে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও লোককে শিক্ষা দিতেছেন। বোধ হয় এই বৎসরের মধ্যেই গৌরাঙ্গ বিরোধিগণ একবারেই লুপ্ত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জয় হউক।

নূতন গৌরাঙ্গের দল মায়াবাদী ও প্রবঞ্চক

শুদ্ধভক্তবর্গ অবগত আছেন যে, কতকগুলি লোক স্থানে স্থানে নূতন গৌরাঙ্গ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কার্যে যাহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই মায়াবাদী। ছদ্ম-বেশে হরিকীর্তনাদি দ্বারা অনেকের মোহ উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করতঃ হরি-কীর্তন করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে অনেকেই তাঁহাদের গতিকে দেখিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় উদয় হইতেছেন এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত এবং খিওসফি প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদের বলিয়াছেন যে, যখন গৌরচন্দ্র

স্বয়ং উদয় হইতেছেন তখন তৎপার্ষদ হইয়া, আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন ? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহাপ্রভুর অবার অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন যে, শচীনন্দন গৌরাজ বৈষ্ণবদিগের দ্বৈতবাদরূপ একটি মতবাদ মাত্র প্রচার করিয়াছেন । তাঁহার কার্যে জগতে তৎকালে কিছু উপকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর সেই উপকার হইতেছে না ।

নবগৌরাজের উদয়ের কারণ

আজকাল বিদ্যা বিশেষরূপে প্রভাব লাভ করিয়াছে, এ-সময়ে আর একটি-মতের গৌরাজের দ্বারা কাণ্ডা হইবে না । মায়াবাদী, থিওসফিষ্ট, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলকে যে-গৌরাজ এক করিতে পারিবেন, তিনিই আসিয়াছেন । আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবগৌরাজ কি পুরাতন গৌরাজ হইতে পৃথক ? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন,—না, তিনি পৃথক নন । যিনি চারি শত বর্ষ পূর্বে কেবল বৈষ্ণব-মতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্তে সর্বমত সামঞ্জস্যকারী এক প্রকার মত প্রচার করিবেন । এই ধর্মই জগতের সাধারণ ধর্ম হইবে । তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে, বিশ্ব-প্রেম স্থান পায় না । সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্ব-প্রেম উদয় হয় ।

নবগৌরাজের আবির্ভাবের প্রমাণ

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাল, এবস্তৃত নবগৌরাজ যে উদয় হইবেন ইহার কোন প্রমাণ আছে ? তাহাতে তাঁহারা শ্রীরূদ্রাবন দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই দুইটি পদ্য পাঠ করিয়া শুনাইলেন । গৌরাজ বলিয়াছেন—

“এইমত আরো আছে দুই অবতার ।

‘কীর্তন’-‘আনন্দ’রূপ হইবে আমার ॥”

“আরো দুই জন্ম এই সংকীর্তনারন্তে ।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥” (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।১৩,৪৭)

চৈতন্য সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতই প্রমাণ, তখন এই প্রমাণানুসারে আমরা নব-গৌরাজকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য আছি । এরূপ নানাপ্রকার ছল বাক্য বলিয়া তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, আমরা সনাতন মত পরিত্যাগ করিব না, তখন তাঁহারা নিরস্ত হইয়া গেলেন ।

কলিহত নবগৌরাজ-দলের ধ্বংস

এই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই নবগৌরাজের দল স্থানে স্থানে অনেক গোলমাল করিয়াছিল। বিগত বৎসরে শ্রীমন্নহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন। কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন, বাকি ষাঁহারা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈত্রিক-ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাজ-প্রকাশের যত্ন পাইতেছেন; ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করেন, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদগর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।

এখন দেখুন, পারমাণ্বিক জগতে বিগতবর্ষে কতই কারখানা হইয়া গেল, কিন্তু করুণাবতার শচীনন্দন সমস্ত দুশ্চেষ্টা নিবারণপূর্বক সাধুদিগের সচ্চেষ্টায় অনুকূল হইয়াছেন।

গয়া, কাশী, প্রয়াগে মঠ-স্থাপনে ইচ্ছা-জ্ঞাপন

আমরা শুনলাম, শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে (যেখানে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইখানে) ভক্তগণ একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন; এই কার্য্যটী যদি হইতে পারে তাহা হইলে শ্রীমন্নহাপ্রভুকে ভালরূপে প্রচার করা হয়। আবার শুনলাম যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে যেস্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটি সেবাপ্রকাশ করিবার জন্য অত্রস্থ কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমরা অবগত হইয়াছি যে, অভ্যাগত বৈষ্ণব শ্রী * * দাস বাবাজী ছাপরা জেলার অন্তর্গত মহারাজ-গঞ্জে শ্রীমহাপ্রভুর এক সেবা সংস্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে শ্রীযুত রায় তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও তদীয় বন্ধুগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখরের ভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন। আমরা আশা করি, এই বৎসরের মধ্যেই সমস্ত মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সঙ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ

ব্যাসের পূজন দিনে ব্যথা পাই এবে মনে,

তোমার বিরহ সদা জাগে ।

তোমার স্মারক যত ক্লেশ দেয় অবিরত,

অপার সান্দ্রনা এবে মাগে ॥ ১ ॥

কোথা মোর প্রভুপাদ ! অভিন্ন নিতাইচাঁদ !

কোথা গেলা মোদের ছাড়িয়া ।

কোন্ অপরাধে বিধি চলিলে অমূল্য নিধি !

কেন হৈলে নিষ্ঠুর নিদয়া ॥ ২ ॥

সেই দিন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত,

পোহাইল কি কাল রজনী ।

হায় ! হায় !! কোথা যাই, কোথা গেলে তোমা পাই,

তোমা বিনা রত্ন-শূন্য অবনী ॥ ৩ ॥

হায়রে জীবন-গতি প্রভু মোর সরস্বতী,

তোমা বিনা সব অন্ধকার ।

কোন্ মহা অপরাধে পড়িনু ঘোর বিপদে,

তোমা বিনা কে আছে আমার ॥ ৪ ॥

যে দুঃখে দহিছে দেহ জানে না তা আর কেহ,

এবে মোরে কে দিবে সান্দ্রনা ।

হে করুণা-পারাবার ! দেও দেখা একবার,

যুচে যাক্ সকল যাতনা ॥ ৫ ॥

কোন্ পুণ্যে পেয়েছি, কি পাপে বা হারাই,

বল প্রভু ওহে সরস্বতী ।

কৃপা যদি ছিল মনে তবে ছাড়ি গেলে কেনে,

তুমি যে মোর একমাত্র গতি ॥ ৬ ॥

সাধের 'মঠ-মিশন' নষ্ট কৈল খরদূষণ,

রক্ষক সব হৈল ভক্ষক ।

শুনিলে সব কুক্রিয়া বিদরিয়া যায় হিয়া,

ধর্ম্মধ্বজী যত অঘ-বক ॥ ৭ ॥

আচার্য্য-আসনে বসি' ভোগে মত্ত দিবানিশি,
 কলঙ্কিত কৈল তবাসন ।
 পবিত্র মন্দির মঠ, কলির কপট ভট
 গ্রাসি' কৈল নবীন বিধান ॥ ৮ ॥
 তুমি আচার্য্য-শিরোমণি, গৌরশক্তি গুণমণি,
 অকলঙ্ক গোড়-গগনেন্দু ।
 হও প্রভু অবতীর্ণ, শুন কাতর কার্পণ্য,
 দুঃখ দূর কর দীনবন্ধু ॥ ৯ ॥
 মঠ-মন্দির-প্রাঙ্গন পত্রপুষ্পে সুশোভন,
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজিছে স্রুতানে ।
 গাহিছে বিরহ-গাথা ব্যক্ত তাহে মনোব্যথা,
 অশুভাচরণ শুভদিনে ॥ ১০ ॥
 মায়াবাদ-ধ্বান্ত -রাশি সিদ্ধান্ত-ভাস্করে নাশি',
 জানাইলে ভক্তিরস সার ।
 পুরুষার্থ প্রেমভক্তি যেথা শুক্তিসম মুক্তি,
 যজ্ঞ তথা সকলি অসার ॥ ১১ ॥
 তোমার মহিমা কণা কে করিবে বর্ণনা ?
 বেদ আদি করেন কীর্তন ।
 অযোগ্য অধম আমি, জান তুমি অন্তর্যামি !
 নিজগুণে করহ মার্জন ॥ ১২ ॥
 তপ্ত হেম সম দ্যুতি, কোথায় সে দিব্যকাস্তি ?
 কোথা গেল সে রূপ-রতন ।
 গান্ধর্বিকা-নয়নমণি, অপ্রাকৃত ছবিখানি,
 পুনঃ কি পাইব দরশন ? ১৩ ॥
 তব করুণার কথা স্মরিলে পাই যে ব্যথা,
 সেই ব্যথা রহে সদা বুকে ।
 গৌরশক্তি তুমি প্রভু, মোরে না ভুলিও কভু,
 না ফেলিও বিশ্বতির দুঃখে ॥ ১৪ ॥
 প্রকট-বাসরে আজি, উপচার-শূন্য সাজি,
 দীন হীন অকিঞ্চন ছার ।
 অশ্রু-অর্ঘ্য মাত্র সার, মোর কিছু নাহি আর,
 কৃপা করি' কর অঙ্গীকার ॥ ১৫ ॥

—ত্রিদিগেশ্বরী শ্রীমন্তুক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

আমি বৈষ্ণব !

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। ইহাই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা। বৈষ্ণবতার মধ্যে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। যথা শ্রীমন্নহাপ্রভুর বচন—

প্রভু কহে—“বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীৰ্ত্তন ।

তুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥”

তঁহো কহে—“কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ ?”

তবে হাসি কহে প্রভু জানি তঁার মন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০-৭১)

কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব—

প্রভু কহে—“ঘাঁর মুখে শুনি একবার ।

কৃষ্ণনাম, সেই পূজা,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৬)

মধ্যম-বৈষ্ণব—

“কৃষ্ণনাম নিরন্তর ঘাঁহার বদনে ।

সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তঁাহার চরণে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২)

উত্তম-বৈষ্ণব—

“ঘাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ।

তঁাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

মহাবদান্তাবতার শ্রীগৌরসুন্দর ক্রম-পন্থায় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা জানাইলেন। এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরই সেবা করা বদ্ধজীব-মাত্রেয়ই কর্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাতেই নিত্যমঙ্গল নিহিত।

“বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।

গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥”

এবম্বিধ বৈষ্ণবের প্রাণধন যে কৃষ্ণচন্দ্র তঁাহাকে বৈষ্ণবসেবা দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ বলিয়া বৈষ্ণবের সেবাকেই একমাত্র

জীবনের ধ্রুবতারা করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবের সেবা করা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণবের আসনে উপবেশন করতঃ নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্ত হৃদয়ে কামনার উদয় হইল। তখন বৈষ্ণবের বাহিরের বেশভূষায় নিজেকে ভূষিত করিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম—এখন আমি একজন পরম বৈষ্ণব ! তাই বিশ্ববাসিগণকে সেবকজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত আমার পিপাসা হইতে লাগিল ; আমি তাহা নিবারণার্থ প্রভু সাজিয়া বসিলাম ! আমার বৈষ্ণব সাজিবার জন্ত এত উৎসাহ কেন, তাহা একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখিতে পাই—প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্তভাবে লুকাইত। তাহার জন্তই আমার এই বৈষ্ণবের বেশ এবং লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্ত মহা-ভাগবতের অল্পকরণে আমার কপট ভাবকেলি। এতৎপ্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকা আলোচনা করিলে অতি স্পষ্টভাবে আমার কপট বৈষ্ণবতা ধরা পড়িয়া যায়। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কোন এক ডঙ্কের মুখে কালীয়-দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষের এই প্রকার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া ডঙ্ক তাঁহার চরণের ধূলি পুনঃ পুনঃ মন্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং সমাগত দর্শকবৃন্দও ডঙ্কের অল্পসরণে তাঁহার পদধূলি শিরে ধারণ করতঃ নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সম্মান দর্শন করিয়া, দর্শক-গণের মধ্যস্থিত একটি কপট বিপ্র ঈর্ষান্বিত হইলেন ; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—লোকগুলি কি-প্রকার অবোধ, একটি বাজে লোকের এই প্রকার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ? আমিও যদি ঐ প্রকার ভাব প্রদর্শন করতঃ মূচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমিও উহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইব। ঐ বিপ্রক্রম এই মনে করিয়া তদল্পযায়ী ভাব প্রকাশপূর্বক ভূমিতে মূচ্ছিতের ন্যায় পতিত হইল। পতিত হইবামাত্রই ঐ ডঙ্ক চঙ্গবিপ্রকে অতিরিক্ত পরিমাণে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া ঐ চঙ্গবিপ্র 'বাপ, বাপ' বলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

কপট বৈষ্ণবক্রম আমাকে সাবধান করিবার জন্ত মহাজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন—

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা স্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নম্ন মনঃ ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং

যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ (মনশিক্ষা—৭)

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে ।

অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন ।

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্তন ॥

কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
স্বপচিনী যাছে হয় দূর ।

তদর্থ্যে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্টপদ ধরি'
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥

তৈহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
স্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া ।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদদাস কাঁদিয়া ॥

জড়-প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়ে অবস্থান করতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্ত কাঙ্গাল করিয়া তোলে । তখন আমি প্রতিষ্ঠা-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকি । আমাকে অণ্ডে মস্তবড় বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করুক, এবম্বিধ বহু প্রকারের সম্মান-লাভেচ্ছায় উপদেশকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে শিক্ষাদান করিবার বৃত্তি জাগিয়া উঠে ; তখন পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়া বসি, কিন্তু যে বিষয়গুলি অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত আমি উপদেষ্টা সাজিয়াছি, সেগুলি আমি নিজে পালন করি কৈ ? তাই বলি, অন্ধকে পথ দেখাইবার জন্ত আমার অত্যন্ত উৎসাহ !

—শ্রীমন্তকুরুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি

—:~(*):~—

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

“তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫), এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—“শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা” (গোঁঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ) । স্মতরাং পরমপূজ্য জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গোড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায় । এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমাথিক পত্রিকার সেবার জন্ত আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি । মাননীয় গুরুদাসগণই একপস্থলে বিপদুদ্ভারণ বান্ধব । গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা । গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিক্ষিপ্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি । তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে ‘সখ্য’ আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিকার দিতেছি ।। ব্যাস-পূজার পূজারী গুরুদাসগণ ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাজ-গুণগানরূপ ‘দাস্ত্র’ নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা ।

গুরুদেবের স্বরূপ

ব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের “গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাজ বলিয়া”, “আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে “সাক্ষাৎকরিষ্মেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ” জানাইলোও “কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তস্ম” ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন । কবিরাজ গোস্বামিও “গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে” বলিয়া জানাইয়া “গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥”—উপদেশ করিয়াছেন । মহাজনগণেরও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন । এবম্প্রকার

শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিধ্বজ্ঞানে শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—“শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।”—কীর্তন করিয়াছেন। গুরুর নিত্য সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্ত। আপনাদের অতিমর্ত্যবাণী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্য-বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত বা অমুয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্তনই প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট

‘বাণী’ কেবলমাত্র ‘কর্ণ’-নামক একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অত্র ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীৰ্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্তই শ্রবণ-কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্য-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অত্র অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্তমানযুগে যে-কোন ভক্ত্যঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন। এবং শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অত্র ভক্ত্যঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্তন ব্যতীত সফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রবণ-কীর্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট ‘ভাগবত-মত’ এবং মঠ-মন্দির নির্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চনাখ্যা ভক্তিই ‘পাঞ্চরাত্রিক মত’। ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়াছেন। কীর্তনই কীর্তনের ফল। কীর্তনই সেবা—কীর্তনই প্রেম। শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“যতপাশ্চা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্।” শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—“পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন; কিন্তু better class—higher class যাহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। * * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ

হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।” তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—“আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।” যে-কোনও একান্ত সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—“আগে কাণ তৈয়ারী হউক, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে।” কথাটা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার “শ্রেষঃ ও প্রেষঃ”; “অনুসরণ ও অনুকরণ” “আসল ও নকল”, “Ontology ও Morphology”, “পারমাণ্বিক ও ব্যবহারিক” প্রভৃতি এবং গোড়ীয়ে “বপু ও বাণী” আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দিন। কাণ প্রস্তুত না হইলে “উপদেশো হি মূখ্যনাং প্রকোপায় ন শাস্তয়ে।”—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ-প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্ত্রে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটী অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আশ্রিতিক প্রবৃত্তিকে মুগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসর্বস্ব কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়াসীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাকলঙ্কী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শঙ্করের জীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন যুগুন-মিশ্রের স্ত্রী ‘উভয়ভারতী’র নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি

তাঁহার শরীর পদুপাদেব নিকট এক পর্কতগুহায় রক্ষা করিয়া জনৈক রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদেব অতিমর্ত্য সঙ্কে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-রূপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য।

আচার্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবকাভিমানী এহেন দুর্জ্জন দণ্ডে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সহিত সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখনই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তুততুল্য কঠিন, অস্ত্রের স্থায় অদাহ, অগ্নিতুল্য শুষ্ক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্কতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—“আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং এ-জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।” তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হটাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহং-গ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া “বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস” শিক্ষা দিবার জন্য ‘সন্ন্যাস-বেশ’ গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটয়া উঠে নাই। তাই তিনি আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের প্রথমপাদেব শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে “সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশপরিক্ষয়াং” বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—“সাম্পরায়বিধিদেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষাং (শিষ্ণাণাং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।” অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস-ধর্ম্মানুকরণ করেন।

তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্তই জানিতে হইবে।

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্ত শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসমুখ শ্রীশুকদেবের উক্তিসমূহ জানাইয়াছেন—

“রাজন্ পরশু তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,

মায়াবিড়ম্বনঃ বেহি যথা নটশ্চ।” (ভাঃ ১১।৩১।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের দ্বায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্র-গ্রাহ জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিষয় উৎপাদনের জন্ত তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্ত অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার শ্রায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সাস্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময় হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয় বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের দ্বায় শোকই হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-মোষ্ঠব বন্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে আসিলেই উত্তরোত্তর সেবার প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেবার আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বদ্ধজীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের দ্বায়—শূদ্রের মত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। “হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং” আমাব পক্ষে দুর্লভ হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্ব্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিশে বিবাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুর্ব্বস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্তই প্রতিবৎসর

বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সাহুনা দিবার জন্যই অপ্রকট কালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় দয়া ও ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয়, তাহা ভাষা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তুষ্টীম্-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্তরুদ্ধেস্থ বুদ্ধিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সম্বিত একটি বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অন্যান্য সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষ আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভুলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতিক্রান্তবেগে অনিমেঘে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে কেবলমাত্র ‘বিদ্যা-বেদনের’ রণক্ষেত্রে ‡ সারথি রথের গতি সঙ্গোপন করিলে লব্ধ-বেদনজ্ঞান আচাৰ্য্যপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানোন্মেষলীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বাধ-ঋষির গায় নিঃশব্দ আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অজ্ঞানতাশবতঃ তখন আমি তাঁহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও ‘অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা বৃথা’—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়া-ছিলাম। শ্রীবাণী-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-দুগ্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচাৰ্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে আচাৰ্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুণ্ডে এ অধমের

সংগৃহীত বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাভণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন গুরু-পাদপদ্ম-মনোহীষ্ট-সেবার কিঙ্কিনাত্রণ্ড যোগ্যতা আমার প্রদান করেন।

নমঃ ঔ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রাণায় ভূতলে।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরস্বতীতিনামিনে ॥

নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।

রূপানুগবিরূপসিদ্ধান্তধ্বাশ্বহারিণে ॥

ভক্তিকথা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগতীর্থে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে যখন ভক্তিকথা বা ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইসময়ে তিনি স্থাবর-জঙ্গম নির্বিশেষে জীব-চৈতন্যের বিচার করিয়াছিলেন। নয়লক্ষ প্রকার জলজন্তু, কুড়িলক্ষ রকমের বৃক্ষাদি জীব, এগার লক্ষ রকমের ক্রিমি-কীট, দশলক্ষ রকমের পক্ষীজাতি, ত্রিশলক্ষ রকমের পশুজাতি এবং চারিলক্ষ রকমের মনুষ্যজাতি—মোট সর্বসমেত চৌরাশ লক্ষ রকমের জীব-নিচয়ের মধ্যে মনুষ্য-জাতিই অল্প সংখ্যক। সেই অল্প সংখ্যক মনুষ্য জাতির আবার বিশ্লেষণ করিলে অসত্য, অর্দ্ধ সত্য এবং সত্য—এই তিন প্রকার মনুষ্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার মধ্যে সত্য-জাতি বলিয়া পরিচিত বহু মনুষ্যই সকল প্রকার নিয়মাহুষ্ঠান বাদ দিয়া জীবনে তথাকথিত স্মৃতি করিবার উদ্দেশে প্রায় অসত্য জাতিয়ই, অর্থাৎ কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিবেশনকারী। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গুলির সেবা এবং তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া বেশ কাষাক্ষম রাখাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এমনকি, অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও নিজ ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ রাখিবার জন্য আধুনিক চিকিৎসাসাহুসারে বাদরের শিরাবিশেষকে নিজ শরীরে নিয়োগ করিয়া পুনর্জীবন ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী মনুষ্য-সমাজ জানে না যে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মন, মন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির পশ্চাতে যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ

অহঙ্কার আছে, তাহাই আত্মার আবরণ। সেই প্রকার আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী ব্যক্তিগণ চিরদিনই পশ্চাতে থাকিবেন। কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী ব্যক্তিগণ পশুজাতির মধ্যেই গণ্য— কারণ মনুষ্য-জাতির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ব্যতীত আরও অনেক বেশী গুরুতর কার্য আছে। যাহার জন্ম সে সকল জাতিরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তজ্জন্ম কিছু কিছু লোক জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিয়া মহাজনগণের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনে ব্রতী হন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি যাহারা যতদূর ভগবদ্-বিশ্বাসী, সকলেই দেশ, কাল, পাত্র-বিশেষে নিজ নিজ নিয়ম পালন করেন। সেই সকল নিয়ম পালনকারী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর অর্জুন মহাশয়ের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (গীঃ ৭।৩)

জীব-চৈতন্য অনাদি কাল হইতে বহু ইतर-যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ নিজ কর্মানুসারে ক্রমবিকাশ-পন্থায় বহু জন্মের পর এবং বহু ভাগ্যে এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেতর কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর শরীরে জীব-চৈতন্য অত্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-ধর্মই প্রবল। মনুষ্য-জীবনেও কতকগুলি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ধর্ম হইতে কিছু বিরত থাকিয়া জগতে মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ যে মন, সেই মনোধর্মে বা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি-ধর্মে নিযুক্ত থাকেন। বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে জীব-চৈতন্য, সেই চৈতন্য-ধর্মে নিযুক্ত থাকার নামই চেতনধর্ম বা সনাতন-ধর্ম বা জৈবধর্ম।

চেতনধর্ম ব্যতীত ছল-ধর্ম বা অগ্র তদনুরূপ যে-সকল ধর্ম আছে, তাহাতে পশু-ধর্মে প্রাথমিক প্রয়োজন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্যই তর-তম হিসাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর জীবের চেতন-ধর্মের বিকাশের আদৌ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে সেই চেতন-ধর্মের বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ সেই সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করেন। মনুষ্য-জীবনেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—“কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

মনুষ্য-জীবনেই একটা নিত্য স্থথের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং সেই শরীরেই

উপলব্ধি হয় যে—আমি দুঃখ চাহি না, অথচ আমার স্বন্ধের উপর দুঃখ আসিয়া চাপে, আমি মৃত্যু চাহি না, অথচ আমাকে মৃত্যু জোর করিয়া লইয়া যায়, আমি জরা চাহি না, অথচ যৌবনের পরেই জরা আসিয়া আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়; আমি রোগ-শোক হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। অধিকাংশ বোকা লোকই এই সকল দুঃখ-দৈন্ত্য থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য-জীবনকে সুখের করিবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহারা স্থিরভাবে চিন্তা করেন—কি-ভাবে এই সকল দুঃখ চইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না? এই প্রকার সত্যানুসন্ধান প্রবল হইলেই ‘ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা’ উপস্থিত হয় এবং সেইসকল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই সিদ্ধিলাভের পথিক। যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারাই পূর্ক পূর্ক স্মৃতিবলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া সর্বদাই জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দুঃখকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করেন।

সেই সকল দূরদর্শী সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নস্তরের লোক কর্ম্মী। এই কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভোগী, ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী। তাহাদের অপেক্ষা আরও কিছু উচ্চস্তরে অবস্থিত—যাহারা শরীর বা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাহারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন, তাহারাই যোগী-সম্প্রদায় বা তৃতীয় পর্যায়-ভুক্ত সিদ্ধিকামী। ইহাদিগকে অশান্ত ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা জড়াভিমান ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন এবং শরীর, মন, বুদ্ধি ও জড়াহকার ত্যাগ করিয়া আত্ম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াছেন, তাহারাই মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে বা জানিতে পারেন। এবং সেইসকল কৃষ্ণতত্ত্ববিদগণ যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তাহারাই জগদগুরু।

কিবা বিপ্র, কিবা গ্রামী, শূদ্র কেনে নয় ॥

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ চঃ ১২৭)

সুতরাং সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায় এবং জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বুঝেন না, ভক্তিতত্ত্ব বা ভক্তি-কথাও বুঝেন না। এইসকল মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞাবশতঃ গীতার কদর্থ্য করিয়া থাকেন।

কলিকালে হতজ্ঞান মনুষ্যগণ সকল বিষয়েই দীন-দরিদ্র হইয়া পশু-জীবনের

যে প্রাথমিক আবশ্যক—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন তাহাতেই সকল সময় নষ্ট করিয়া, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণতত্ত্ব জানা ত' দূরের কথা সম্যকভাবে কর্ম-জ্ঞান-চর্চার সময় পায় না। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম-জ্ঞান দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তদ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিবার কিছু কিছু শক্তি লাভ হয়। জ্ঞানের শেষকথা—ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তাহার পর কৃষ্ণভক্তি লাভের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। সেইপ্রকার ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভের সুযোগ কলিহত জীবের মোটেই নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজতত্ত্ব সরসারিা ভগবদ্গীতায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ তাহাতেও ভুল করিবে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তরূপে, প্রেমের অবতার, পরমদয়ালু গৌরহরি-রূপে জীবকে গীতার কথা আদর্শরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘আমিই সব’, আর সেই কথাই শৃগাল-কাস্তুরদেব-জাতীয় ব্যক্তিগণ কদর্থ করিবে বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মূর্তিতে বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণই সব”। দুই কথার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। লক্ষ্য বস্তু একই। সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকি ‘বান্দরের গলায় মুক্তার মালা’। আমরা কলিহত জীবগণ সেই প্রকার বান্দরের মত। আমাদিগকে কৃপা করিয়া ব্রহ্মার ছলভ বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব—ভক্তিতত্ত্ব অতি সহজে বিলান হইয়াছে বলিয়া আমরা ভক্তি-তত্ত্বেরও যথেষ্ট কদর্থ করিয়াছি। ইহাও আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যে নিকট ইন্দ্রিয়-ধর্ম্য হইতে পরিজ্ঞান করিয়া আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আত্মধর্মের কথা আবার ইন্দ্রিয়-ধর্মে পরিণত করিয়াছি।

অন্নবুদ্ধি শিশুর নিকট যেমন একটি রঙ্গিন কাচের পুতুল, আর একটি স্বচ্ছ হীরকখণ্ড উপস্থাপিত করিলে শিশু যেমন হীরকখণ্ড বাদ দিয়া কাচের পুতুলটিই গ্রহণ করে, সেইরূপ কলিহত অন্নবুদ্ধি মনুষ্য-জাতি স্বচ্ছ-হীরকখণ্ড যে ভক্তি-কথা বা শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে হতাদর করিয়া রঙ্গিন কাচখণ্ড যে ‘কর্ম’ আর ‘শুদ্ধ-জ্ঞান’ তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। অন্নবুদ্ধি শিশুগণ যেমন বুঝিতে পারে না যে, ঐ স্বচ্ছ হীরকখণ্ডের মধ্যে শত-সহস্র রঙ্গিন পুতুল অন্তর্হিত আছে, সেইপ্রকার অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুঝে না যে, “কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়।”

যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব বুঝেন তাহাদের কর্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, তপ, জপ, সকল তত্ত্বই স্বতঃই জানা হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে, যথা—

যৎ কৰ্মভিৰ্যং তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যাতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধৰ্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সৰ্ব্বং মদুক্তিযোগেন মদুক্তো লভতেহংগমা । (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

কৰ্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধৰ্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন-সমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

নিরীশ্বর কপিল যে সাখ্য দর্শন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে মহত্ত্ব হইতে প্রাকৃতিক ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পানি, পায়ু, পাদ, ঊরু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিচার করিয়াছিলেন । এবং এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই । কপিল সেইজন্য সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিকট 'নিরীশ্বর কপিল' বলিয়া প্রসিদ্ধ । (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সহঃ সম্পাদক ও সজ্ঞপতি

শ্রীগুরুসেবা

প্রকৃত সদ্গুরু-সেবাই একমাত্র ভক্তি । গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি উৎপাত-স্বরূপ । শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত সেবার ফল, আমি গত বৎসর কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; কৃষ্ণপ্ৰীতিই গুরুসেবার মুখ্যফল এবং ইহাতে আনুশঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় অবশ্যই হইবে ।

বহু বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুদেবের বহু সেবা করার ফলেও যদি শ্রীভগবানে প্রীতি ও আনুশঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় না দেখা যায়, তাহা হইলে সেবার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভেজাল অর্থাৎ অন্যাভিলাষ আছে বুঝিতে হইবে । শুদ্ধ-সেবার ফল অবশ্যই দেখা যাইবে । ইহা কেবল গ্রন্থেই থাকিবে এরূপ নয় । শ্রীগুরুসেবা-প্রভাবে যদি আমার উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাতে রুচি না হইল, তাহা হইলে তাহা কিরূপে গুরুসেবা হইতে পারে । “গুরুদায়দৈবত” হইয়া অর্থাৎ গুরুকে দেবতা—দেখর, আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র

জানিয়া অমায়ার গুরুসেবা করিলে ‘আত্মাহুদ’ অর্থাৎ নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেন এমন যে শ্রীহরি, তিনি তাহাতে তুষ্ট লাভ করেন। ভগবৎ-সুখামুসন্ধানের সহিত গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবও সুখলাভ করেন না। কারণ শ্রীভগবানের সুখ বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের সুখ হয় না। স্নেহ সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করা যায় এবং তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করা যায়। গুরুর হৃদয়ে স্থান লাভ, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান লাভ—একই কথা।) কারণ গুরুর হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণ।) স্নিগ্ধ শিষ্য তাহার স্নেহসেবা-প্রভাবেই গুরুদেবের হৃদয়-সম্পত্তি লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবের চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করাই শ্রীগুরুসেবা। স্নেহসেবা দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়। তখনই অনুসরণ সম্ভব হয়।

সেইজন্তু শ্রীগৌরানন্দদেব বলিয়াছেন,—

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপার।

স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৩৯)

মহাভাগ্যবান্ জীবই স্নেহসেবা দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রচুর সেবা লাভ করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহশীল শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব পরম গোপ্য কথা ব্যক্ত করেন। গুরুদেবের হৃদয় জয় না করিতে পারিলে শ্রীভগবানকে বশীভূত করা অসম্ভব। স্নেহসেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার নিকট পরম রহস্যপূর্ণ ভগবৎ-বশীকরণ উপায় না জানিলে কেহই কপট-চুড়ামণি বাঁকা ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। গুরুর নিকট বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়, কারণ গুরুদেব যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে পরম সমর্থ শ্রীহরিও তাহা ক্ষমা করেন না। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে কিন্তু গুরুদেব রক্ষা করেন।

“হরৌ রুষ্টে গুরুজ্ঞাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥”

সর্বপ্রযত্ন অর্থাৎ বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিতে হয়। সাবধান না থাকিলে কৃষ্ণনামাবিষ্টমনা শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করা যায় না। হরিভজনে তৎপরতাই সাবধান। অনুক্ষণ সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তনই হরিভজনে তৎপরতা। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর “সাবধান” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম,

কেবল ভকতি-সদ্ব,

বন্দে। মুক্তি সাবধান মতে।

নিকট গুরুসেবকের কোথায়ও অসুবিধা হয় না। কারণ তিনি সর্বদা সাবধান।

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে, অতথা দোষ হয়। যিনি প্রথমে “শঙ্করক্স ও পরব্রহ্মে নিষ্যাত” ইত্যাদি পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ উক্ত উপলক্ষণরহিত গুরুর আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন এবং মাৎস্যাদি-বশতঃ তাদৃশ গুরুর নিকট হইতে মহাভাগবতগণের সংকারাদি অমুমতি লাভ করেন নাই, তিনি প্রথমেই শাস্ত্র-মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া তাহার কথা বিচার করার কিছুই নাই। যেহেতু তাহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাতই হইয়া থাকে। এতাদৃশ অভিপ্রায়ে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে, “যিনি গুরুরহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি তাহা অগ্রায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাহার উভয়েই চিরকালের জন্ত ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।” অতএব তাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আর যদি তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হন, তাহা হইলে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ১৭৯।২৫)

“কর্তব্যাকর্তব্য-অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গম্বীর্ণ গুরুরও পরিত্যাগ বিহিত হইয়া থাকে”—এই স্মৃতি-বাক্যানুসারে এবং তাহার বৈষ্ণব-ভাব-রাহিত্যবশতঃ “অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্থেণ নিরয়ং ব্রজেৎ” অর্থাৎ অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা পুরুষ নরকগামী হয়।—ইত্যাদি বচনের বিষয়স্ব-নিবন্ধন তাদৃশ গুরু পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব যদি স্বল্প-বলবিশিষ্ট হন, তবে ততোহধিক বলবিশিষ্ট মহাভাগবতের নিকট বিশেষ ভজন-রহস্ত জানিয়া গ্রহণ করিলেও শ্রীগুরুদেবকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তিনি পূর্ববৎই পূজ্য—ইহা জানা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীগুরুদেব যদি অপ্রকট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কর্তব্য? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—“শ্রীগুরুদেবের অবিদ্যমান শ্রীগুরুবৎ সমবাসনায়ুক্ত এবং নিজপ্রতি রূপানুচিত কোন মহাভাগবতের নিত্যসেবনই পূর্ণ শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে।” মহাভাগবতের

উক্ত দুইটি বিশেষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নতুবা সম্যক ফল লাভ হয় না।

যশ্চ যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্ত্রীং স তদগুণঃ।

স্বকুলোদ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযুথ্যানেব সংশ্রেণ ॥ (হরিতত্ত্ব-সুধোদয়)

যে ব্যক্তি যেরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করেন, তিনি স্পর্শমণি-সংস্পর্শে কাচ প্রভৃতি যেরূপ তদগুণ-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হন। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের উত্তম পুরুষগণেরই সঙ্গ করিবেন। এজন্ত সঙ্গ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন।

শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। কি এ-জগতে, কি পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্যকালের পরম বন্ধু। গুরু ব্যতীত এজগতে বন্ধু বলিয়া আর কেহই নাই। শ্রীগুরুসেবকের কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই—গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। তাঁহার কুদর্শন, প্রাকৃত দর্শন বা জড় দর্শন নাই। কারণ গুরু-কৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে। আমরা অন্ধ, কারণ সকলের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন এবং নিজের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন—এ অনুভূতি আমাদের নাই। যেদিন শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা দ্বারা আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিবেন, সেইদিনই সর্বহৃদয়ে যে ইষ্টদেব আছেন তাহা দেখিতে পাইব, এবং নিজের হৃদয়েও ইষ্টদেব কি-ভাবে বিলাস করিতেছেন তাহা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ করিব। তখন “সর্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল ॥”—ইহা অনুভবের বিষয় হইবে। গুরুসেবকের দৃষ্টিতে ইষ্ট-দর্শন ব্যতীত অনিষ্ট দর্শন হয় নাই। তাঁহার দর্শন—ইষ্টদেবের বিলাস দর্শন—সুদর্শন; তাই গুরুসেবক পরম নির্ভীক, পরম শান্ত। গুরুসেবকের দন্ত নাই, তিনি পরম দীন, তাই তিনি বলেন—

গুরুদেব !

যোগ্যতা বিচারে,

কিছু নাহি পাই,

তোমার করণা সার।

করণা না হলে,

কাঁদিয়া কাঁদিয়া

প্রাণ না রাখিব আর ॥

সদগুরু লাভ করিয়াও যদি কেহ অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। অহঙ্কারের মত অতবড় বাধা আর কিছু নাই।

শিষ্যের প্রথমে গুরুর প্রতি দেবতা অর্থাৎ 'প্রভু'-ভাবটী প্রবল থাকে। তাহার পর শ্রীগুরুদেবের সেবা ও সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার প্রতি আত্ম অর্থাৎ প্রিয়ত্ববোধ ক্রমশঃ বদ্ধিত হয়। শ্রীগুরুদেব কত প্রিয় নিকৃপাধিক বান্ধব, তাহা এ-জগতের চিন্তার অতীত।

শ্রীগুরুদেব আলো বস্তু। তাঁহার রূপালোকেই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপা, স্বয়ং-রূপাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও সগণ শ্রীরূপ ও নিজের রূপ দেখিতে পারা যায়। তাঁহাদের যে আমার প্রতি কত স্নেহ, তখনই তাহা জানিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীগুরুসেবকের নিরাশা-হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি পরম আশা-যুক্ত। তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় “ভগবানকে নিশ্চয় লাভ করিব”—এই পরম আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। যিনি এরূপ আশা লাভ করেন নাই, ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে যাহার সন্দেহ আছে, তিনি প্রকৃত শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে। প্রথমে হৃদয়ে আশা পাওয়া যায়, তাহার পর বস্তু লাভ হয়। শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের রূপায়ই শ্রীরাধা-মাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িনী আশা লাভ করা যায়। আশা লাভ হইলেই নিরন্তর ভজন সম্ভব হয়। আশা লাভ না হইলে ভজনে নৈরন্তর্য্য আসে না।

অহো! যে শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় এ জগতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম, ইষ্ট মন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন-গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রেষ্ঠ পুরী মথুরা, শ্রীগোষ্ঠভবন শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িনী আশা লাভ করা যায়, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপম্

রূপং তস্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং

প্রাপ্তো যন্ত প্রথিতকুপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

পাদসেবন

আমরা পূর্বে ‘স্মরণ’-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অধুনা ‘পাদসেবন’-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়া নিজের আত্মশুদ্ধি লাভের চেষ্টা পাইব। পাদ-সেবন শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে সেবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ‘সেবা’ ভাবে-‘অনট্’ প্রত্যয়ে ‘সেবন’ শব্দ নিষ্পন্ন। সাধারণতঃ উপাসনা, আরাধনা, উপভোগ প্রভৃতি অর্থে সেবন বা সেবা শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। উপাশ্র-বস্তুর প্রীতি উৎপাদন-কল্পে কায়-মনোবাক্যে সদাচার সমূহের সহিত যে ক্রিয়া অবলম্বিত হয়, তাহাকে সেবা বলা যায়। এখানে কিন্তু ‘পাদ’ শব্দ পূর্বে যোগ থাকায় বুঝা যায় যে, নন্দনন্দন হরির পাদ-যুগলের নিরন্তর আরাধনাকেই পাদ-সেবন বলিয়া বিচার করা হইয়াছে। সেবা-বৃত্তি যদি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত না হয়, তাহা হইলে ভগবদনুভূতি লাভ করা অসম্ভব।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীতা ৪।৩৪)

অর্থাৎ ভগবদন্তর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটি বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ ভগবদন্তর অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহের উত্তরোত্তর যাজনের দ্বারা পূর্ণ ভগবদনুভূতি লাভের সূচুতা সম্পাদিত হয়; সেইজন্ত নবধাতন্ত্রির মধ্যে ‘পাদসেবন’-রূপ ভক্ত্যঙ্গটি প্রেমভক্তিলাভের একটা বিশেষ সোপানরূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২।৩১) বলেন—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজনোপচিতং মলং ধিয়ঃ।

সত্ত্বঃ ক্ষিণোত্যবহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত্য সরিৎ ॥

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত গঙ্গা যেমন জীবকুলের বহু-জন্মার্জিত দুষ্কৃত-সমূহকে সত্ত্ব নাশ করিতে সমর্থ হন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চরণ-সেবারূপ অতিরুচি প্রতিদিন সংসার-তাপদগ্ধ জীবগণের অশেষ জন্ম-সঞ্চিত কামাদি বাসনাময় চিত্তের মলিনতা সত্ত্বই বিনষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং ধোতাত্ম-পুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্মমূল কখনও পরিত্যাগ করেন না। যথা—

ধোতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।

মুক্ত-সর্বপরিরূপঃ পাদুঃ স্বশরণং যথা ॥ (ভাঃ ২।৮।৬)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবাদ্বারা জীবগণের পুনঃ সংসার লাভের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই ভগবৎসেবার সাক্ষাৎ ফল।

বিনির্দ্ধিতাশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞান-বিশেষ বীৰ্য্যবান্।

যদ্যদ্যি মূলে কৃতকেন্নঃ পুনর্ন সংসৃতি-ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে। (ভাঃ ৪।২।৩২)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক সেবা করিলে জীবগণের অশেষ জন্মার্জিত মনোমল বিদূরিত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয় ও তদ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং জীবগণকে জন্ম-মরণ-রূপ সংসার-জালা ভোগ করিবার জন্ম আর প্রাপঞ্চিক জগতে আসিতে হয় না।

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।

মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥

পরাত্ম-নিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।

মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥ (চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৮)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা দ্বারা জীবের যেরূপ আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হয়, অন্য কোন সাধনা দ্বারা সেরূপ হয় না।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কমলোভহতো মুহুঃ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথা দ্বাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

ভগবানের পাদপদ্ম-যুগলের রূপা ব্যতীত প্রেমভক্তি-রূপা ভগবৎ-মহিমা জীবের নিকট দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মার উক্তি (ভাঃ ১০।১৪।২২)—

অথাপি তে দেব পদান্বজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি॥

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চাত্ম একোহপি চিরং বিচিহ্ননু॥

হে দেব! যাহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের সাক্ষাৎ সেবাদ্বারা রূপালেশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল আপনার মহিমা জানিতে পারেন ; কিন্তু যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র-বিচারপূর্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। অতএব শাস্ত্রের সর্বত্রই ভগবৎ-সেবাদ্বারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়—একথা কীর্তিত হইলেও ইহার দ্বারা প্রথমতঃ ভগবৎ-পদারবিন্দ-সেবনই একমাত্র জীবগণের সেবা—ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। আরও বিশেষ বক্তব্য এই যে, পাদসেবন-রূপা সেবা-লাভের পূর্বে গৌর-প্রিয়দপাদগণের সেবার যোগ্যতা অর্জিত না হইলে পাদসেবন-রূপ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অধিকার লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং, বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং, বেদাদি-দুস্ত্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥

এই জগুই উদ্ধব প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং শ্রাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্ ।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা

ভেজুমু'কুন্দ-পদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

অহো ! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্ম-সেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা অথবা ওষধির মধ্যে কোন একটী রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মদনমোহনাভিন্নবিগ্রহ শচীনন্দন গৌরহরির পাদসেবা-রূপ ভক্তিলাভ করিতে হইলে গৌর-প্রিয়পাদ-গণের ও উদ্ধব-প্রার্থিত ব্রজ-সুন্দরীগণের পাদপদ্ম-সেবা-লাভের যোগ্যতা সর্ব্বাঙ্গে অর্জন করা প্রয়োজন।

—শ্রীরাসবিহারী-ভক্তিশাস্ত্রী, সহঃ সম্পাদক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের শ্রায় এবং সরও চুঁচুড়া-সহরস্থিত, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১২ই, ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীব্যাসপূজা ও জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের সহিত মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত জনগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ স্বয়ং এই উপলক্ষে শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া পূজা-পঞ্চকাদি অনুষ্ঠানে সেবকগণকে রূপাপূর্ব্বক বিবিধ বিষয়ে আদেশ নির্দেশ প্রদান করেন। ১২ই ফাল্গুন, শনিবার সমিতির সভাপতি স্বামীজী-মহারাজের জন্ম-দিবসে তাঁহার

নির্দেশানুযায়ী, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অগ্রতম সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ মোহিনী-মোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয় বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-নিদ্দিষ্ট “শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি” অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক প্রভৃতি পূজাপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ, হোম প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয় দিবস ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার—পণ্ডিতজী সকালে ও বৈকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিবস ১৪ই ফাল্গুন সোমবার, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিকাণ্ডে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর গুরুপরম্পরা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, “এইবার করুণা কর” “কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর” প্রভৃতি স্তবস্তোত্র ও গীতিগুলি কীর্তন করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়।

শ্রীমন্দিরের ভিতর ও বহিঃপ্রাঙ্গণ আশ্রয়পল্লবাদি ও বিচিত্রবর্ণের পতাকা দ্বারা সজ্জাভিত করা হয়। অভ্যন্তরে সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণ বিবিধ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া ভক্তগণকে কৃপাপূর্বক দর্শন দান করিতেছিলেন। শ্রীমন্দিরের বহির্দিশে জগমোহনে সজ্জিত মণ্ডপোপরি শ্রীল প্রভুপাদ অর্চালেখ্য-মূর্তিতে চন্দন-চর্চিত ও পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত হইয়া বিরাজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের অর্চন ও ভোগ-রাগান্তে পূজ্যপাদ স্বামিজী-রচিত “শ্রীল প্রভুপাদের আরতি” কীর্তন সহযোগে আরাটিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর অঞ্জলি-প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত সেবক-সেবিকাগণ অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত মঠের ভক্তগণ, পরে স্ত্রী-পুরুষ নির্কিশেষে সমাগত সকলেই যথাক্রমে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

অঞ্জলি প্রদানের পর পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ কৃপাপূর্বক শ্রীব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীব্যাসপূজায় আমাদের কৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ভারতে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন না হইবে, ততদিন পর্যন্ত কোনরূপ সমস্য়ারই সমাধান হইবে না। জগৎ এখন নাস্তিকতার দিকে—ঋংসের মুখে অতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইতেছে। ধর্মভাবের অভাবেই এখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিভাগে দুর্নৈতিকতা অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুতরাং দেশের বর্তমান সঙ্কটে প্রত্যেকের মধ্যে

ধর্মভাব জাগ্রত করা ও ধর্ম-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী আরও বলেন যে, বর্তমানে রাষ্ট্রনেতাগণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ভারতে যেদিন প্রতি ঘরে ঘরে ব্যাসপূজার প্রচলন হইবে এবং শ্রীব্যাসদেবের শান্তি-বাণী একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইবে, সেইদিন ভারত তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবে—সেই দিন সকল সমস্যার সমাধান হইবে—সেই দিন চিরমিলন, চিরশান্তি লাভ হইবে।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত দর্শক ভক্তমণ্ডলীকে চর্ক্য, চোষ, লেহ, পেয়,—চতুর্বিধ রসসম্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের বিবিধ আয়োজন ও প্রসাদ বিতরণ ব্যাপারে মঠরক্ষক শ্রীপরমধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারিজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু-গৌরান্দের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে “শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম”, “সুজনাক্ষুদ”—স্তোত্র, “দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব!” প্রভৃতি পদাবলী, স্তোত্র ও গীতি কীর্তন করা হয়। বলা বাহুল্য, রাগভূষণ মহোদয়ই প্রত্যেক স্থলে মূল-গায়কত্ব করেন।

অতঃপর সভাপতি-মহারাজ শ্রীতৈত্ত্বভাগবত হইতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বিভিন্ন উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামিজী-মহারাজের আদেশে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রেরিত বঙ্গভাষায় “ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি”, “দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি”, “ভক্তি-গীতি”, “ব্যাসপূজায় বিরহ-বিলাপ” ও হিন্দীভাষায় “শ্রীব্যাসপূজা” প্রভৃতি পঠিত হয়। অতঃপর স্বামিজী-মহারাজ-লিখিত “শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি” পাঠ করা হয়। পরে সভা ভঙ্গ হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চালেখ্য-মূর্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। আরতিকালে পূর্ববর্ণিত “শ্রীল প্রভুপাদের আরতি” কীর্তনটী মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্তিত হয়।

—প্রকাশক

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,

(নদীয়া)

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই চৈত্র ১৩৫৭, ইং ২৩শে মার্চ, ১৯৫১ শুক্রবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ, শনিবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টি দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য কীর্তনমুখে ষোলকোশ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাস্কর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ব্যভিক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)— ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৪ঠা চৈত্র, রবিবার— (১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীশ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন ।

২। ৫ই চৈত্র, সোমবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, টাঁপাহাটি (শ্রীগৌর-গদাধর মন্দির) এবং

(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাহুতপুর বা রাতুপুর ।

৩। ৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার—(৫) শ্রীজহুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহু মনি-স্থান), বিজ্ঞানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ।

(৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটালী বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ৭ই চৈত্র, বুধবার—(৭) শ্রীকুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামাতলা ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে কুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা ।

৫। ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—(৮) শ্রীসৌমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে) শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ।

৬। ৯ই চৈত্র, শুক্রবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

৭। ১০ই চৈত্র, শনিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্ব-সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।	*
ধর্মঃ সমুৎপত্তিঃ পুংসাং বিষক্লেসন-কথাসু যঃ ।		নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূর্যরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	{ ক্ষীরোদশায়ী, ২২ বিষ্ণু, ৪৬৫ গৌরাদ শনিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৫৭ ; ইং ১৪৮৮৫১	{ ২য় সংখ্যা
----------	--	--------------

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সদোপাস্ত্যঃ শ্রীমান্-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং

বহিদ্ভির্গৌর্ববগৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ।

স্বভক্তৈঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
 মুনীনাং সর্বস্বং প্রগত-পটলীনাং মধুরিমা ।
 বিনির্ঘাসঃ প্রেমো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
 প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
 হরিদীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ৩ ॥

রসোদ্যামা-কামার্ববুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
 যতীনামুত্তং সস্তুরণি-কর-বিছোতি-বসনঃ ।
 হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবনাস্থিক-রুচা
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ৪ ॥

হরেক্ষেতুচৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
 কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
 বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঙ্কিত-ভুজঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ৫ ॥

পয়োরাশেষ্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
 মুহূর্বন্দারণ্য-স্বরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
 কচিৎ কৃষ্ণাবৃতি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ৬ ॥

রথাকটস্থারাদধিপদবি নীলাচল-পতে—
 রদভ্র-প্রেমোন্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
 সহস্রং গায়ন্ত্রীঃ পরিবৃত-তনুবৈষ্ণব-জনৈঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁয়াশ্চতি পদং ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চনশ্র-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ

পরীতান্ধো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্চল-জয়িভিঃ ।

ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ণন-সুখী

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশ্যোয়াম্ভুতি পদং ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরান্ধ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং

কৃতী যো বিশ্রুত-স্মরদমলধীরকটকমিদং ।

পরানন্দে সচস্তুদমল-পদান্তোজ-যুগলে

পরিষ্কারা তন্তু স্মরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

(১) শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্শ্বদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতি-পূর্বক সতত যাহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পঙ্খের পখিক হইবেন ? ॥ ১ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্য স্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাহাকে উপাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ২ ॥

যিনি ইহ-জগতে অল্পমম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্শ্বদকে রূপামৃত-ধারায়, প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মারার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপ-দগ্ধ দীন-হীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন ? ॥ ৩ ॥

যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের গ্রায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসীগণের শিরোঃশি, যাহার

বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ত্রায় অরুণ-বর্ণ এবং যাহার অঙ্গ-কান্তি
সুবর্ণ-রাশির অতুল্য মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই
শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন ? ॥ ৪ ॥

যাহার রসনায় “হরেকৃষ্ণ” নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তিত হইতেছে ও
সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রহীকৃত কটীস্থত্রে যাহার বামহস্ত
জ্বলোভিত, যাহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাহার বাহু-যুগল
আজামূলস্থিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৫ ॥

সমুদ্র-তীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুমূহঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায়
যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা
কৃষ্ণনাম-কীর্তনে যাহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব
কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদ্ভিত হইবেন ? ॥ ৬ ॥

রথাস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পশ্চিমমুখে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-
সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া
পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৭ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাহার অশ্রুধারায় ধারাতল প্লাবিত হইয়া যাইত,
যাহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত
এবং যাহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব
কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক
এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল
শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

শ্রীগৌর কি বস্তু ?

ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী
বলিয়াছেন—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের
অঙ্গকান্তি ব্রহ্মবস্তু এবং অন্তর্যামী যিনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও
ক্ষীরোদকশায়ী—এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাহার
খণ্ডবৈভব-প্রকাশ তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীগৌর রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত-তনু

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আরোও বলিয়াছেন—শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণের প্রণয়বিকার স্নানাদিনী শক্তি । কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলেও দুইটী দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন । অধুনা গৌর-লীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্ত-গত আভ্যন্তরীণ ভাব এবং রাধিকার বাহ্যঙ্গ-কান্তি স্মৃতিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয়-চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌর-লীলা প্রকাশ করিতেছেন ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌর-রূপ, মহাবদান্ত-গুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন করিতে, কৃষ্ণচৈতন্য-নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন । শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন—শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবন-ধন ।

শ্রীগৌরানন্দদেবের সম্বন্ধে অপসম্প্রদায়গণের বিচার

নাভদাসাদি কস্ম-জ্ঞান-মিশ্র ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরানন্দকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম-প্রচারক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই । ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ক্রটি করেন না ।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণের মতবাদ

যাঁহার যেরূপ অধিকার, কুচি ও পারদর্শিতা, তিনি তদ্বস্তু শ্রীগৌরানন্দকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপ ভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া থাকেন । বর্তমান কালে মায়াবাদিগণ বলেন, যখন শ্রীগৌরানন্দ পর-তদ্ব তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করা যাইবে বা শুনা যাইবে, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার আবশ্যক নাই, কোন প্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই । মণ্ড বা গঞ্জিকাসেবী শ্রীগৌরানন্দকে তাহার মাদক দ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লম্পটোর আদর্শ বলুন, গৃহতগণ গৌরকে গৃহ-সুখপ্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সা-ভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিকগণ গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিস জানিয়া ‘শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাজিয়া’

যে-কোন প্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক, তাহাতে মায়াবাদী ও মিছা-ভক্তের আপত্ত্য নাই।

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভ্রমাত্মক বিভিন্ন বিচার

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু একরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্ত দয়ানিধি নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদী ও গৌরভক্ত দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তু ;—মায়াবাদী-অহঙ্কারী, আত্মগুরি ও আত্মগত্য-ধর্ম-রহিত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু। ভক্ত তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তেরও উহা থাকিতে পারে—মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী—নির্কিংশেবাদী আর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎ-সত্তার নিত্য-‘বিশেষ’ স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়া-নির্মিত ; সূতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক ‘বিশেষ’-রহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। ‘ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান্, জীব’ প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ-ভাব জড়ই লাভ করেন ; চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর মায়াবাদী নিজের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের বশবর্তী হইয়া ভগবানের ও ভক্তের নিত্য নাম-রূপ-গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ও ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন।

শ্রীগৌরলীলা গৃহত-লীলা নহে

নিত্যভক্ত ও ভগবান্কে মায়িক নম্বর বস্তুর তুল্য যাহারা মনে করে, তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদ-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, দরবেশ, চুড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী, থিয়সফি-বিশ্বাসী গৌরভক্ত, গৃহি-গৌরাঙ্গ-সেবী নিজবুদ্ধিদ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধ-যজ্ঞ-সুখই গৌরভজন কেন হইবে না, বলিয়া ভক্তের সহ কলহ করেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সৌভাগ্যক্রমে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার ঐ সকল মায়াবাদীর প্রাকৃত-মত আনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌর-বস্তু নিত্য এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজ-জনেরই গোচর হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত গৃহত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম।

গৌর-ভজন-কামীর মায়াবাদ আশ্রয়ের ফল

যে জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে গৌরভক্ত বলে সে বাউল, সাঁইগণের গ্রাম হরিনাম-ভজন ছাড়িয়া অণু-মৎস্য-মাংস প্রভৃতি ভোজন

করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে ‘চৈতন্য-তত্ত্ব’ বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে স্থগিত হইয়া ‘বৈধগৃহী’ বাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ প্রজন্ম ও ‘স্বল্পতত্ত্ব’ ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ-শূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, নতুবা গৌরাঙ্গ গড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মস্তুরিতা করাই বিপথ-গমন।

ভক্তের ‘গৌরাঙ্গ’ ও অভক্তের ‘গৌরাঙ্গ’ এক নহে

কৃষ্ণ যে-কালে কংস-সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য ও সেব্যবস্তু। ‘নিজের উন্নতিবাদী’ অভক্ত মায়াবাদিগণ অনিত্য-চেষ্টায় বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের নিত্য-চেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অশুষ্টিত হয়। যেখানে ষষ্ণভক্তি নাই, সেখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান, সেখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি খুব বিচার-নিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি-সম্প্রদায়, নিজের চক্ষের জল, ‘ফোপানি’, সখীভেকীর নবীন ‘ছড়াছারা’ ও গলাবাজির দ্বারা কু-ভজন করেন। তাহাদের গঠিত গৌর-বিগ্রহের উপাসনা কাল্পনিক, ভক্তগণের উপাশ্রু গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে বস্তু নহেন।

মায়াবাদি-দুঃসঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য এবং সংসঙ্গেই

শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিয়া ভজন করা শ্রেয়ঃ

মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন এবং “আমার গৌরাঙ্গ” প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজ কল্পিত মতবাদ প্রচার করে। এই সকল মায়াবাদীর দলকে ভক্তগণ কোন প্রকারে ইষ্টগোষ্ঠীতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদী ভক্তসঙ্গচ্যুত হইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রজন্মী মনে করেন, কিন্তু ইহাতে ঠিকিলেন কে ? ভক্ত, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবা-পূর্বক পরমোচ্চতম হইলেন ; মায়াবাদী গোটাকতক বেশী অর্কাটীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল, মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইম্পাত ফাঁকি দিয়া একটি অন্তঃসারহীন বিষয়-লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা

শ্রীকৃষ্ণানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতর্কিক অভক্ত মায়াবাদী-দিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরি-ভজনের সুবিধা হয়।

গৌরতত্ত্ব মনঃকল্পনাভীত—গৃহি-গৌর বা ন্যাসি-গৌর নহে

কৃষ্ণ যে বস্তু, শ্রীগৌরানুগ যে বস্তু তাহাকে নিজ কল্পনা-বলে অগ্র বস্তুত্বে স্থাপন করা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছা-ভক্ত হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগ ভক্তগণের জন্ত লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া যে-সকল মায়াবাদী কালক্ষেপ করিয়া নিজে নিজে মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনা-প্রভাবে গোস্বামী-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলেন এবং গৃহি-গৌরানুগ ন্যাসি-গৌরানুগ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্যা ভাবসমূহের আরোপ করেন, ফলতঃ তাহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদীর কল্পিত গৌর, রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায়

মায়াবাদিগণের ইহাই জানা উচিত যে গৌরবস্তু নিত্য, কেবল মায়া-গঠিত দৃশ্য-জগতের বস্তু-বিশেষ নহেন। অনন্ত কোটি মায়াবাদী নিজ নিজ অনিত্য কল্পনারূপ অস্ত্রদ্বারা শ্রীগৌরানুগে আঘাত করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় গৌরের নিত্য গঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। যে বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগ-সেবা হয় না এবং তাহা কখনই গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ-কলুষ-নিমগ্ন-চিত্ত গৌরকে বিকৃতরূপ, বিকৃতগুণ ও বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না; তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরানুগ-নাগরীর দল বাঁধে, উহা মায়া-সীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃতবস্তু গৌর কোনদিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ঋবসত্য, মায়াবাদী কোন দিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। আজ চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার কত চেষ্টা করিতেছেন; শ্রীগৌর-ভগবান্ ও শুদ্ধ-ভক্ত নিজ-জনগণকে প্রপঞ্চ পাঠাইয়া মায়াবাদীর চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। অনিত্য মায়াবাদীর সহ গৌরের নিত্য লড়াই। এই যুদ্ধের ফল—জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্পল কৃষ্ণ-প্রেমোদয় অথবা অশুদ্ধ ভূমিতে হলাহল মায়াবাদ। আমরা বলি ‘ঘুণ’ অভিমান ছাড়িয়া সরল প্রাণে ‘ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধি’, ‘শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত’ পড় এবং সেইরূপভাবে নিত্য জীবন উপলব্ধি কর; তাহা হইলে নিজজন-সহ শ্রীগৌর কি বস্তু বুঝিতে পারিবে; আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহতত ধর্মকে পারমার্থিক গৌর-ভক্তি

বলিয়া চালাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ তোমার ঞ্চায় মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

সংসার-নির্বাহকে গৌরভক্তি বলে না

মায়াবাদিগণ সর্বদাই বলিয়া থাকেন, তাহারা শুদ্ধ ভক্তের কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়ি-মিশ্রি, অসৎ-সৎ, আলস্য-উৎসাহ, প্রহার-মিষ্টান্ন, একজ্ঞানে পাপময়-‘সংসার নির্বাহকে’ গৌর-ভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌর-ভক্তি হইল, একথা মায়াবাদীর মুখে শোভা পায়।

গৌরতত্ত্ব জড়বুদ্ধির অতীত ও সেবাহীনের অগম্য

মায়াবাদিগণ সকল জিনিস নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্তি ভোগময়ী জড়বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম-প্রচারক হইবেন মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ প্রকাশে ও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রচারিত হইল! আদৌ ভজন করিব না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটা স্থানে কলিকে প্রবল হইতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না, আর জগতে আমাকে সকলে ‘বৈধ-গৃহি-বাউল’ ভক্ত বলুক, তাত্ত্বিক বলুক, আর আমি প্রতিষ্ঠাশা-মায়াবাদ-অহঙ্কারে ক্ষীণ হই, গৃহমেধ-যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌরভক্ত হই—এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়।

বস্তু-নিরূপণের উপায়

বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্থিতায় মায়াবাদ থাকিবে না—সেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয় থাকা উচিত। হিন্দুর পরবের কোন দিন-নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে বিধর্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্য যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থ, চক্ষু দ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না, প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অজ্ঞাতসারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌর-বস্তুর পরতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করিতে যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীকৃপাভূগ শুদ্ধ গৌর-ভক্তের পাল্যরূপে নিজের অস্থিতাকে উপলব্ধি কর, দেখিবে সকল মোহান্ধকার কুজাটিকার ঞ্চায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেম-চক্ষু ফুটিয়াছে। এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে কোন ছ্যালোকেই যাও বা নরকেই যাও, তথায় বৈষ্ণব-বিশেষ শিখিবে—শ্রীগৌরাজ হইতে দূরে পড়িবে। গৌর-বস্তু স্থির হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ

গৌরকে কি বলেন, কোথায় তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন, সে-সকল কথা হৃদয়ে স্মৃতি পাইবে। জড়-জগতে বৈধগৃহী, বাউল, সহজিয়া-গিরি করিয়া ‘হাঁটকা পাটকা’ করিয়া বেড়াইলে প্রাকৃত দেহ, দ্রবণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা আসিয়া মায়াবাদীর নির্মীলিত চক্ষুই দ্বিতীয় বার আবরণ করিবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিশুদ্ধ ভজন

অশুদ্ধভাব ও ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে বিশুদ্ধ ভজন হয় না।

“পড়িলে শুনিলে কত কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।

ভজিলে বিশুদ্ধ-ভাবে তবে কৃষ্ণ পায় ॥”

কোন ভক্ত-গহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটি পাওয়া যায়। উপদেশটি নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন-সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন বাপারে যে-সমুদয় অশুদ্ধ-ভাব এবং ক্রিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করতঃ ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ-ভাব ও ক্রিয়াগুলি বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াদীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে, তাহার ফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভাক্য এইরূপ :—

ভক্ত্যাহমেকম্ গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াহ্মা প্রিয়ঃ সতাম্ । (ভাঃ ১১।১৪।২১)

ন সাধয়তি মাং যোপো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্বব ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ

শ্রীমদ্ভগবৎ গোপায়া শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন :—

অন্যাত্তিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাত্মনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকৃতম্ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২)

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সুকৌশলদ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি।

জ্ঞান ও কৰ্ম যখন ভক্তির অন্তর্গত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যা ন মেধয়া ন বহন্য শ্রুতেন।

যমেবৈষ ব্রহ্মতে তেন লভ্যন্তৈশ্চর আত্মা বিব্রুতে তমুং স্বাম্ ॥ (মুণ্ডক ৩।২।৩)

বহু শাস্ত্রযচন অভ্যাস, বহু ধী-শক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না; যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন— তাঁহাকেই স্মিয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-বিক্রম করেন।

তাৎপর্য এই যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।) তাদৃশ জ্ঞান, কৰ্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল।) তাহাতেই কৃষ্ণ-প্রমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজনকালের অবস্থাদ্বয়—(ক) অনর্থযুক্ত, (খ) অনর্থমুক্ত

ভজনকালে দুইটি অবস্থা আছে, অনর্থ-যুক্তাবস্থা, এবং অনর্থ-মুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজনের নানাবিধ পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধু-কৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (১) স্বরূপভ্রম :—

জীবের অনর্থ চারি প্রকার :—(১) স্বরূপভ্রম, (২) অসত্বতা, (৩) হৃদয়দৌর্বল্য এবং (৪) অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপভ্রম-রূপ প্রাপ্ত অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কড়ক নিশ্চিত, কৃষ্ণ-বহিস্মুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ—এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসং-সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নিকর্শেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কণী, এইরূপ নানা মতবাক্তি হইয়া ভজন অশুদ্ধ-করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্নৃসিংহ প্রভু কহিয়াছেন :—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।

‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’, ‘চৈতন্য’, কহে নিরবদ।

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে ।

মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহিস্মুখে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯, ১৪৩)

নির্বিশেষবাদিগণ পাষণ্ডী ও যম-দণ্ড্য

নির্বিশেষবাদিগণ বলেন, ঈশ্বর নিরাকার । ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দঘন মূর্তি তাহারা বিশ্বাস করেন না । কল্লিত মনে করেন । জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের আশা । তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না । তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য এই :—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ॥

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড ।

অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যম-দণ্ড্য ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)

যেই মুঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম' ।

সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫)

মায়াবাদীর জ্ঞান ও যোগীর আসনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না

জ্ঞানবাদিগণ শুদ্ধ বৈরাগ্য, শাস্ত্র-চর্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্ম-শুদ্ধির আশা করেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

জ্ঞানী জীবমুক্ত-দশা পাইলু করি' মানে ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)

~~অজ্ঞানে~~ জীবমুক্ত অপরাধে অধো যজে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১২৫)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্ম-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন ; অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না । শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

কর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ, সর্বশাস্ত্রে কহে ।

কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ করতঃ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে । জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু ; প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান । এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধভজনের ফল-স্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় ।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (২) অসত্ত্বতা :—

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্ত্বতা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যতকিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, তাহা সকলই অসত্ত্বতা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষস্থলে লোভ, এই সমস্তই অসত্ত্বতা। অসত্ত্বতা থাকিলে কোন-ক্রমেই ভজন-বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৭৫)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট নরক-সদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান্ দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা,—

নারায়ণপরাঃ সর্বৈ ন কুতশ্চন বিভ্যতি।

স্বর্গাপবর্গনরকেষুপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

সালোক্যসাষ্টি সামীপ্যসারূপৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

মোক্ষবাঞ্ছা অসত্ত্বতা, সূতরাং ভজনবিরোধী

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাতমনোহর, পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ—ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোনও ক্রমে ভক্তি হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবদ্ধভক্তিস্থখস্তাত্ৰ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৫)

শ্রীচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম कहিয়ে কৈতব।

ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দান ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।৯০,৯২)

প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগলালসা ভজন-বিরোধী

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগ-লালসার বশবর্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধূষ্টা খপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ ।

কথং সাধুঃ প্রেমাঃ স্পৃশতি শুচিরেতম্ভু মনঃ ॥ (মনঃশিক্ষা—৭)

প্রতিষ্ঠাশা-রূপিনী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাব।
প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন ?

অতএব বহুযত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা
যত্ন-সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই সনাতন-গোস্বামীর উপদেশ—

“কুৰ্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্ ॥”

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৩) হৃদয়-দৌর্বল্য :—

হৃদয়দৌর্বল্য জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে
জীবকে একরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্মগুলির আদর
করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্মগুলি স্বভাব-স্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই
জীবের হৃদয়দৌর্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসংসঙ্গ, কুটিনাটি, বহিস্মুখাপেক্ষা
প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসং
সঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ
ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়। অতএব শ্রীমন্ন্যাসপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসংসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

শ্রীসঙ্গী—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ত’ আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৪)

বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও কুটিনাটি, হৃদয়-দৌর্বল্যের অন্তর্গত

হৃদয়-দৌর্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রূপ মহান
দোষ উপস্থিত হয়। আপনার জাতি, বিজ্ঞা বা সম্বন্ধগত অভিমান উদয় হয়,
তাহাতে বৈষ্ণব-অধরাযত, চরণায়ত ও পদরঞ্জে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির
পরিবর্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা
একেবারেই বিনষ্ট হয়। অতএব প্রভু-আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিরা।

কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোথংকপটকুটিনাটিভরথর-

করন্ম ত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাশ্রয়ানমপি মাম্ । (মনঃশিক্ষা—৬)

ওরে মন ! কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ যুগ্মে স্নান করিয়া কি জন্ম আমাকে এবং
আপনাকে দহ করিতেছ ?

কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়-দৌৰ্জল্যবশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসং কার্যো বা অসংসঙ্গে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়-দৌৰ্জল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্নহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

“যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫)

“নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩)

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৪) অপরাধ :—

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসতৃষ্ণা, এবং অসতৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌৰ্জল্য জন্মে। হৃদয়দৌৰ্জল্য বৃদ্ধি হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অকুর ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।২২-৩০)

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। (১) বৈষ্ণবাপরাধ, (২) সেবাপরাধ ও (৩) নামাপরাধ।

বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ

বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্বান্দে,—

ইত্তি নিন্দতি বৈ ঘেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।

ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ঘট ॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, ঘেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমুণ্ডি সম্বন্ধে বিচার্য্য।

নামাপরাধ দশবিধ, যথা :—

১। সাধুনিন্দা—যাহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা ঘেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, একপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়।

২। **দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্বেশ্বর, অগ্ৰাণ্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অগ্ৰ দেবদেবীর ভজন হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অগ্ৰ এক ঈশ্বর, এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়।

৩। **গুরুবজ্রা**—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অগ্ৰ সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্মের চরম ফল নাম-তত্ত্ব-লাভ, তাহা যাহার হইয়াছে তাঁহার অগ্ৰ কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

৪। **শ্রুতি-নিন্দা**—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়।

৫। **হরিনামে অর্থবাদ**—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম,রূপ, গুণ, কর্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়।

৬। **নামবলে পাপ**—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্ত একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ।

৭। **শুভকর্ম-সাম্য**—অর্থাৎ ধর্মব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভ কর্মবিশেষ। অতএব যে কোন একটি শুভকর্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ।

৮। **প্রমাদ**—নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষিপ্ত থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি, এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার স্মরণ প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাস্ত্র-বশবর্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষিপ্ত।

৯। **অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান**—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিশুকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপাতি হন।

১০। অহং-মম ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য
বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। যথা,
প্রভুবাক্য—

“শ্রবণ” কীর্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। (চৈঃ চঃ ৯২৬১)

“নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৪৭১)

কৃষ্ণনামানুশীলনই বিশুদ্ধ ভজন

কৃষ্ণ-নামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের-অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই
সহচররূপে গৃহীত হয় ; অন্ত্যভিলাষ, অন্য দেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞানকর্ম-প্রয়াস
পরিত্যাগ করিয়া অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয়
এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই
কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের নব-নির্মিত শ্রীমন্দিরে
শ্রী শ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর
শুভ প্রবেশোপলক্ষে—

(১)

বিগ্রহের নিত্য-সেবা, মন্দির-মার্জ্জন

আচরস-উদ্দীপক বেশাদি রচনা—

• প্রভৃতি সেবার কার্যে আপনি যে-জন

নিযুক্ত রহিয়া ভক্তে দেন প্রয়োচনা—

অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥

(২)

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-সাগর।

জয়দ্বৈত-চন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবর ॥

জয় জয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুবর।

গোড়ীয়-সুনীলাবাণে প্রদীপ্ত ভাস্কর ॥

জয় শ্রীত্রিদণ্ডস্বামী কেশব দীন-পালক ।
 ভক্তি-প্রদায়ক দুষ্ক-দুর্জজন-জন-শাসক ॥
 জয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মহারাজ ।
 জীবের কল্যাণে আত্ম ত্যাগিয়াছ আজ ॥
 চরণ-সরোজে কোটী নমস্কার করি ।
 পদ-তরী দেহ তরিবারে ভব-বারি ॥

জয় জয় মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ ।
 সর্ববক্ষণ বন্দি' আমি সবার চরণ ॥
 জয় জয় সমাগত যত ভক্তগণ ।
 করযোড়ে বন্দি' আমি সবার চরণ ॥

(৩)

কষিত সোণার অমল বরণ, জিনিয়া যাঁহার মধুর কান্তি ।
 যাঁহারে হেরিলে মোহ দূরে যায়, উপজে হৃদয়ে মেদুর শান্তি ॥
 যাঁহার আদেশ-পালনে নিরত, বিধি-হর আদি দেব অগণন ।
 চন্দ্র-মিহির যাঁহার আদেশে, নাশিছে আঁধার বিতরি' কিরণ ॥
 যাঁহার চরণ হরে পাপ-তাপ, নামে দূরে যায় শমন-ভয় ।
 তিনি গোলোকেশ শচীর দুলাল, গাহ সবে মিলি তাঁহার জয় ॥

(৪)

হে প্রভু দয়াল শচীসুত বিশ্বস্তর !
 পতিত-পাবন প্রভু গোলোক-ঈশ্বর !
 তোমারই সৃজিত মধুর দৃশ্য, এই যে অনন্ত নিখিল বিশ্ব,
 এ-সৃষ্টি তোমার শুধু লীলার কারণ ।
 প্রেম-ভক্তি-ডোরে করিয়া বন্ধ, মানবে নিয়োজি' সাধিতে সাধ্য,
 সৃষ্টির উদ্দেশ্য তব করিছ সাধন ॥
 শুধু তব সেবা বিশ্ব মাঝারে, করিয়া প্রচার শুদ্ধ আচারে,
 মানবে কর্তব্য শিক্ষা দিতেছ দয়াল ।
 সে-কথা ভুলিয়া স্নেহ আচারে, প্রমত্ত হইয়া করমের ফেরে,
 (জীব) দুঃখের জলধি-জলে ভাসে চিরকাল ॥

এই বিশ্ব-চিত্রপটে হেরিনু অঙ্কিত যত লোভনীয় কাম্যবস্তু-চিত্র ।
 অতি মনোরম বটে অম্পাত মধুর, তাহা মানবের ছদ্মবেশী মিত্র ॥

এরাই কুপথে টানি' সদাই আমারে করে ঘণ্য, হেয় পিশাচ-সমান ।
হিমশুভ্র হৃদি-মাঝে কলুষ-অনল-জ্বালি' দগ্ধ করে দেহ-মন-প্রাণ ॥
তাই আজ সকাতরে, প্রভু ! তব স্নিগ্ধ চির-বাঞ্ছনীয় চরণ-উপান্তে ।
শুদ্ধভক্তি লাভেচ্ছায় করিতেছে এই দীন করযোড়ে প্রার্থনা একান্তে ॥

(৫)

বহুরত্ন সু-খচিত নীলান্বর-চন্দ্রাতপ-তলে

বিরাজিত ঋষিভুল্য ব্রহ্মচারী-অধ্যুষিত রম্য তপোবন ।

তার মধ্যে ভগবৎ-লীলা-নিকেতন সুবর্ণের—

অপরূপ সুকোমল সুবাসিত বহুবিধ কুসুম-কানন ॥

তার মধ্যে সুধাসিক্ত মনোহর রতন-মন্দির,—

মধ্যস্থলে রত্নবেদী সিক্ত সদা অগুরুর নীরে ॥

সুমধুর কসুরবে আজি মুখরিত চারিদিক—

কুসুম-সুবাস হরিয়া পদন বহে ধীরে ধীরে ॥



শ্রীশ্রীগুরু-গৌরঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউ

অনন্ত করুণা-নিধি,

তুমি ত বিধির বিধি,

(নদীয়ার) পূর্ণচন্দ্র শচীর ঢুলাল ।

(আজি) রাজ-রাজেশ্বর সাজে, নব ন্যামন্দির-মাঝে,

রত্নাসনে বসেছ দয়াল ॥

(সঙ্গে) কিবা নিরূপম রূপ, নিরখি যে অপরূপ,
 (বিরাজেন) সঙ্গে ল'য়ে শ্রীরাধারে যশোদা-তুলাল।
 শিরে শিখি-পাখা বাজে, চরণে নূপুর বাজে,
 গলে দোলে সুরভিত বনফুল-মাল ॥

(৬)

আজিকার কোলদীপ অতি মনোরম।
 শক্তি আছে কার করে সভার বর্ণন ॥

(আজি সভা-মাঝে)—

বিষুভক্ত সুবাসিত কুসুম-কাননে,
 তারা-হার মধ্যমণি শীতেদু সমান,
 বৈষ্ণব-মুকুটমণি কলি-জীব-প্রাণ,
 বিরাজিত প্রভুপাদ প্রসন্ন আননে ॥

আমি অতি দীন, মায়ার অধীন,
 ভাসি ভব-জলধির অন্তহীন নোরে।
 সকল বৈষ্ণবগণ, শ্রীপদের ধূলিকণ,
 'কৃপা করি' প্রদানহ এ-দাসের শিরে ॥

আলোয়ার আলো-সম মায়ার ছলায়,
 ভ্রান্ত-পথে ছুটে মরি দিশেহারা হ'য়া।
 ভুঞ্জিয়া নরক-ব্যথা করি হায় হায়,
 (মোরে) রক্ষা কর সবে মিলি' করুণা করিয়া ॥

দীন সেবক—

—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার পর)

দেবহুতি-পুত্র ভগবান্ কপিলদেব এই নিরীশ্বর কপিল হইতে পৃথক্ । তিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া স্বীকৃত ।

নিরীশ্বর কপিলের পদাকান্তসরণকারী সাংখ্য-দার্শনিকগণের অব্যক্তানুমান নিরসন করিয়া অষ্টপ্রকার প্রকৃতির নিয়ন্তা যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা গীতায় ব্যক্ত হইয়াছে । যথা—

ভূমিরাপোহনঃলা বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ (গীঃ ৭।৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি ?—তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বল-বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য কিরূপ, তাহা না জানিলে ভক্তিতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না ।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।

ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে স্পৃহ মানস ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

এই প্রকার তত্ত্ব জানিয়া যে কার্য্যের সূচনা হয়, তাহাই ভক্তি-কথা । মনুষ্যজাতি নিজ মন ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া বায়ুর বেগে দ্রুত গমন করিয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া কপিলের মতে যাহা জানিতে পারে নাই, তাহাই এক-কথায় এই স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিলেন । যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ভক্তিকথা হইতে দূরে চলিয়া গেল ; কিন্তু যাহারা বুঝিল, তাহাদের ভক্তিতত্ত্ব আরও দৃঢ় হইল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—এবং যেখানে পুরুষ সেইখানেই তাঁহার দেবার জন্ম প্রকৃতি আছে । পুরুষাভিমानी সাধারণ জীবের অধীনে যদি সর্ব্বত্রই প্রকৃতির আবশ্যক থাকে, পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃতি বা সেবিকা নাই—এমন অবাস্তব কথা বাতুলেই বলিয়া থাকে । পুরুষকে প্রকৃতির অধীন করিয়া যে দর্শন-শাস্ত্রের অবতারণা, তাহা সর্ব্বদাই অসম্যক্ জানিতে হইবে । ‘প্রকৃতি’ বলিয়া খামিয়া গেলে চলিবে না ; কাঁহার প্রকৃতি তাহা সন্ধান করা আবশ্যক । প্রকৃতি পুরুষ কে, তাহা সিদ্ধান্তিত হওয়া দরকার । প্রকৃতি আর শক্তি একই তত্ত্ব । সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই শক্তির পরিচয়ে শক্তিমানের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । উপনিষদাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে পরতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তাঁহার বহুধা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বিশেষ আলোচনা আছে । এই ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গজ্যোতি—ইহাই আমরা ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানিতে পারি ।

যস্য প্রভা-প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্বাক্ত নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫।৪০)

সৃষ্টে জগতের বাতিরেক চিন্তাতে অতন্নিরসন কল্লৈই ব্রহ্মের নির্কিশেষ অবস্থিতি । সূতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব যে নিরাকার, নির্কিশেষ, নিরঞ্জন, নিঃশক্তিক—তাহা বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হইলেও সেই ব্রহ্মতত্ত্বের যে প্রতিষ্ঠা, তিনি জড় আকার-বজ্জিত চিং সবিশেষ, চিহ্নহ্রিত-সম্পন্ন, চিদ্রস্তু, চিদ্রুণের গুণমণি ! তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং সেই চিল্লীলাবিশিষ্ট পরম পুরুষই চরম প্রতিপাদ্য বিষয় । কস্ম্যজড়-সম্প্রদায় সেই চিদ্রবিশেষকে জড়-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতেছেন, আর শুদ্ধ-জ্ঞানী-সম্প্রদায় জড়-সবিশেষের তিক্ততা আশ্বাদন করিয়া চিদ্র-সবিশেষেও সেই অপ্রীতিকর তিক্ততা আছে—এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাদের আরোহ-পন্থার অবরতা, হেয়তা প্রকৃষ্টভাবেই প্রমাণ করিতেছেন । এই দুই বিকৃত সম্প্রদায়ই কুপার পাত্র এবং তাহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নিজতত্ত্ব ও নিজ-শক্তিতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন ।

উপরোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির প্রসূতি জড়মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি । সেই বহিরঙ্গা শক্তির বহু অবরতা আছে বলিয়া তাহা অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া পরিচিতা । জড়-শক্তিরূপা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদির নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া ইহারা অপরা প্রকৃতি বা অনুৎকৃষ্টা শক্তি । এবং সেই অনুৎকৃষ্টা শক্তি যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহা উৎকৃষ্টা শক্তি বা পরাশক্তি । শক্তিতত্ত্ব কখনও নিজে ভোগী হইতে পারে না বা একটি শক্তি অপর একটি শক্তিকে কখনও ভোগ করিতে পারিবে না । শক্তি-তত্ত্ব ভোগ্যা, আর শক্তিমান্-তত্ত্ব ভোগী বা ভোক্তা ।

পরাশক্তি-সমুত জীব স্বতন্ত্র্য বলিয়া, অস্বতন্ত্র্য ক্ষিতি-অপ্-তেজাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা । কিন্তু তাই বলিয়া জীব কখনও সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ভগবানের সহিত সমান নহে । অস্বতন্ত্র্য জড়া প্রকৃতি হইতে চেতনের উৎকৃষ্টতা সহজেই অনুমেয় । জীবশক্তিই এই জড়জগৎকে আলোড়ন করিয়া ধারণ করিতেছে । যদি সেই জীবশক্তি জড়াশক্তির উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে জড়জগতে জড়-বিলাসসমূহ প্রত্যক্ষ করা যাইত না । ভূমি, অপ্, অনল যেখানে যাহা আছে, সেখানেই তাহা থাকিত—যদি চেতনা-শক্তি

তাহাতে বিলাস করিবার চেষ্টায় সংযুক্ত না হইত। চেতনের সংযোগেই মাটি, কাঠ, পাথর, লোহাদিপদার্থের বিনিময়ে এই দৃশ্য জগতের মেঠো ঐশ্বর্য, অট্টালিকাদি কল-কারখানা সমস্তই সম্ভবপর হইয়াছে। জড়শক্তির এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে নিজে নিজেই একটা কিছু হয়। এতদ্বারা আরও আমরা বুঝিতে পারি যে, এই জড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও নক্ষত্র-গ্রহাদি এইভাবে কোন বৃহৎ চেতনের সংযোগে সম্ভব হইয়াছে। জড়ের নিজের কোন ক্ষমতা নাই— ইহাই নিছক সত্য।

জড়-সম্ভূত চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে চেতনই অলোড়ন করিয়া যে একটা জড়-বিলাসের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে জড়ের হেয়তা, অবরতা ও পরিচ্ছিন্নতা সর্বদা বর্তমান আছে। বৈচিত্র্য-আনন্দময় হইলেও জড়ের বৈচিত্র্যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের যথেষ্ট অভাব আছে। সূত্রাং উৎকৃষ্টা প্রকৃতিতেই নিরবচ্ছিন্ন চিদানন্দ বর্তমান আছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। চিদ-বৈচিত্র্য ব্যতীত চিদানন্দের কোন সম্ভাবনা নাই। জীব যে পরাশক্তি, তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

অপরেয়মিতস্তৃতাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৫)

জীব পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড়শক্তিতে তাহার স্বজাতীয় মিল নাই। যেমন জল-জন্তুর সহিত স্থলের মিল নাই অথবা স্থল-জন্তুর সহিত জলের মিল নাই। সেইরূপ পরাশক্তির সহিত জড়শক্তির যে আপাত অতিনিবেশ, তাহাই মায়িক বা মিথ্যা। কিন্তু জীবতত্ত্ব পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড়শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারে মাত্র—যদিও তাহা মায়িক ও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ এক শক্তি অন্য শক্তির উপর চিরন্তন কর্তৃত্ব করিতে পারে না। নিজকার্য সম্পাদন করিয়া পরাপ্রকৃতির শক্তিমানের সেবা করিবার ক্ষমতা মাত্র আছে। শক্তিমানের সেবা-চেষ্টায় জীবশক্তির যে জড়-প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা—তাহাই একমাত্র চিন্ময় বা যান্ত্রিক, অতথায় মায়িক কর্মবন্ধন মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে ত্রিবিধ শক্তির কথা আমরা শুনিতে পাই, যথা—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজা তথা পরা।

অবিদ্যা-কর্মসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিযতে ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি পরা, ক্ষেত্রজা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরশক্তিই

চিহ্নিত, ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি (যাহা মায়া রূপা অবিদ্যা হইতে অপরা বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে) এবং কর্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নামই ‘মায়া’।

অতএব এই দৃশ্য জগতে যে-সমস্ত কার্য্য হইতেছে তাহার মূলীভূত কারণ— ভগবানের উপরোক্ত পরা ও অপরা শক্তিদ্বয়। অপরা শক্তি ‘ক্ষেত্র’ কর্মসংজ্ঞা, আর পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা। ইহজগতে যতপ্রকার বিভিন্ন জীব-নিচয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা সমস্তই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা-শক্তির সংঘর্ষে উৎপাদিত। এবং সেই দুই শক্তির অধ্যক্ষ ও শক্তিমান-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলীভূত কারণ জানিতে হইবে।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতাপধারয়।

অহং কুৎসস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নাশ্রুং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

— ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (গীঃ ৭।৬-৭)

বেদাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে আমরা ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম’, ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’, ‘সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম’, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইত্যাদি যে প্রাদেশিক বাক্য শুনিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য এইস্থানে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ একই পরাংপর তত্ত্ব; সূতরাং তাঁহার সম বা অধিক আর কেহই দ্বিতীয় পুরুষ নাই। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, “মত্তঃ পরতরং নাশ্রুং” এবং তিনিই যে তাঁহার বিবিধ শক্তির দ্বারা এই জগতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সর্বত্র বিরাজমান, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইল। শক্তির পরিণামই দৃশ্য জগৎ এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব বলিয়া “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” শব্দে ভগবানের পরা ও অপরাশক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শক্তির পরিণামে পূর্ণব্রহ্মের কোন প্রকার-হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম ‘নিরঞ্জন’ আখ্যায় শব্দিত এবং অপরা-প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়ামাত্র বলিয়া ব্রহ্ম ‘নিরাকার’ শব্দে বিঘোষিত।

শ্রীচৈতন্যদেব এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সকল সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং জীব ও জগৎ তাঁহার অধীন শক্তিতত্ত্ব। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারাই অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত অধীন জীব (materialist) এবং এই তত্ত্ব বুঝিয়া যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারাই মায়াযুক্ত ভগবদ্ভক্ত (Spiritualist)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই গীতাতে বলিয়াছেন, যথা—

ত্রিভিগুণময়ৈভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম্ ॥

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৩-১৪)

ইচ্ছা-দ্বেষ, ভাল-মন্দ বিচার প্রভৃতির মূল কারণ—সত্ত্ব-রজ-তমঃ এই গুণত্রয় সমস্ত জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য গুণাতীত চিদ্বিলাস যে ভগবান্, তাঁহাকে ‘পরমব্যয়ম্’ বলিয়া বুঝিতে অস্ববিধা হইতেছে। এখানে পরম অব্যয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের অনন্ত শক্তি অনন্ত প্রকারে দৃষ্ট হইলেও তিনি নিত্যকালই পূর্ণ এবং নির্বিকার আছেন। এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যেহেতু ব্রহ্ম সমস্ত জগতেই সত্তা বিস্তার করিয়া আছেন, সেইহেতু তাঁহার নিজের কোন স্বরূপ নাই। অগ্নির উত্তাপ সর্বত্র প্রবাহিত হইলেও অগ্নির কোন বিকার নাই। সূর্য্য চিরদিনই উত্তাপ দিতেছেন বলিয়া সূর্য্যের হ্রাস যদি না হয়, তাহা হইলে সূর্য্য যাহার কণামাত্র শক্তির পরিচয়, তাঁহার হ্রাসের কি কথা আছে? ভগবানের শক্তি অগ্নির উত্তাপের ন্যায় সর্বত্র বিকীর্ণ হইলেও তাঁহার শক্তি কোন দিনই ন্যূন হইবে না। সেই জন্যই তিনি পরম অব্যয় শক্তিমান্-তত্ত্ব। যথা, শ্রুতিতে —“পূর্ণশ্চ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সহঃ সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি

বসিরহাটের বক্তৃতার প্রতিবাদ

(চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

টাটানগর

পূজ্যপাদ

তাং ১৭ই পৌষ, ১৩৫৭

পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ-

শ্রীচরণ-কমলরোঃ নিবেদনম্—

মহারাজ ! আপনার বিখ্যাত গোড়ীয়-পত্রিকার (২য় বর্ষ) ১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ১৫৭ পৃষ্ঠাতে (৪র্থ সংখ্যা) আপনার প্রদত্ত “বসিরহাটের

বক্তৃতার সারাংশ” বলিয়া যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে “বিশ্ববাসী সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি” বলিয়া Challenge থাকায় টাঠানগরস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অত্রস্থ শিক্ষিত সমাজকে ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছেন।

তথাকথিত আপনার উক্তি বলিয়া প্রকাশিত “শঙ্করের বিচার অত্যন্ত মোটাবুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকের পক্ষেই আদরণীয়” এবং “শঙ্কর-দর্শন অসার ও অযৌক্তিক, তাহা শিক্ষা দিতে আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি” প্রভৃতি উক্তি বিশ্ববাসী কোন এক বিশিষ্ট সমাজকে আক্রমণ করিয়া কটুক্তি সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐরূপ প্রচার-কার্য্য আপনি করিতেছেন বলিয়া আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না বা এই প্রবন্ধ আপনার জ্ঞাতসারে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইতেছে না। অপরন্তু বেদান্ত সমিতির বালকগণকে আপনি ঐরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কারণ এইরূপ ভাব বৈষ্ণবতার বিরোধী। “বিষ্ণুতত্ত্ব নিকাম—অতএব শাস্ত্র ॥”

এইরূপ প্রচার কার্য্যের ফলে বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ আসনের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আমাকে আপনার নিকট প্রতিবাদ পাঠাইতে হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

(১) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের মুকুটমণি ও সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তত্ত্ব-সন্দর্ভে ৪৩ সূত্রে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মতের লক্ষণ করিয়াছেন। যথা—

তত এবাভেদশাস্ত্রাণ্যভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন জীবসমূহস্ত দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্তা স্বাভাবিকতদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাত্তদ্যতিরেকে, ব্যতিরেকণ চ বিরোধং পরিহৃত্যাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাস-সমাধিলক্ক-সিদ্ধান্ত-যোজনায় যোজনীয়ানি ॥

(২) শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই সিদ্ধান্তের সহিত আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের (ব্রহ্মসূত্র—২.৩।৪৪) সিদ্ধান্ত, ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বটে কিনা দেখিয়া লইলে আর তাঁহার দর্শনের দোষ দেওয়া চলিতে পারে কি? যথা :—

৪৩ সূঃ— অংশো নানাব্যপদেশাদনুত্থা চাপি দাশকিতবাদিস্বমধীয়ত একে ।
 শরীরক ।..... চৈতন্যক্কাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্থথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্যাম্ ।
 অতো ভেদাভেদাবগমাত্যামংশস্বাবগমঃ । কুতশ্চাংশস্বাবগমঃ ? “মন্ত্রবর্ণাচ্চ”
 মন্ত্রবর্ণশ্চৈতমর্থমবগময়তি :—“তাবানশ্চ মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।
 পাদোহশ্চ সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদশ্চামৃতং দিবি ॥” ইতি । অত্র ভূতশব্দেন জীব-
 প্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দিশতি—“অহিংসন্ সৰ্ব্ভূতানুত্থ তীৰ্থেভ্যঃ” ইতি
 প্রয়োগাৎ । অংশঃ পাদো ভাগ ইত্যনর্থাস্তরম্ । তস্মাদপ্যাংশস্বাবগমঃ ।

(৩) অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর
 উক্তি মিল করিয়া দেখুন :—

তাঁরে ‘নির্বিশেষ’ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি’ ।

অর্কস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জ্বলন ।

জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

অবিচিন্ত্য-শক্তিবুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী ।

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিষয় ॥ (আঃ ৭ পরিচ্ছেদ)

বিবর্তবাদ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলেন, তাহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা
 আসিয়া পড়ে ; পরন্তু তাহা ঠিক নহে, পরতত্ত্ব অদ্বয় । দ্বৈত বলিয়া বস্তু অলীক
 এবং মিথ্যা । যথা :—

‘দ্বৈতে’ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব ‘মনোধর্ম’ ।

‘এই ভাল, এই মন্দ’—এই সব ‘ভ্রম’ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ—৪)

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতশ্রাবস্তনঃ কিয়ৎ ।

বাচোদিতং তদনুতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ (ভাঃ ১১।২৮।৪)

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি । (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩)

(৪) অতঃপর শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্য এ সম্বন্ধে যাহা
 বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে :—

দর্শয়তি চাত্থো অপি স্মর্যতে । (ব্রহ্মসূত্র ৩অঃ ২পাঃ ১৭ সূত্র)

গোবিন্দভাষ্য।—বিজ্ঞানানন্দস্বাত্মনো মূর্ত্ত্বমলৌকিক-বস্তুত্বাৎ শ্রুতিমাত্রাৎ প্রতি-
পত্তব্যম্। তন্মূর্ত্ত্বং খলু ভক্তিভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং গাক্ষরবাসিতেন শ্রোতেন
রাগমূর্ত্ত্বমিব। অত্থথা বিজ্ঞানধনানন্দ-ঘনেতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। তদেবং
প্রত্যক্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহশ্চৈব। তস্মিন্নত্থথা বিভানং তু মায়্যৈব ভবতি।

এতদ্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।

ইচ্ছনুহুর্লানশ্চেষ্মীশোহহং জগতো গুরুঃ ॥

মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

(মহাভারত—শান্তিপর্ক, মোক্ষধাম, নারায়ণী-নারদ-প্রতি ভগবান্)

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইতি ভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা
জীবসৌপাদিকত্বং নিরস্তং। তস্যাং তং সম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি।

(৫) শ্রীমন্নহাপ্রভুর উক্তি-মত ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা
হইয়াছে, তাহা আচার্য্য শঙ্করের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত।

(৬) কিন্তু পূজ্যপাদ জীব গোস্বামী ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিত
মহাপ্রভুর বাক্যের সাদৃশ্য নাই বালিয়া স্পষ্টই দেখা যাইতেছে :—

(ক) মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

“তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন।

জীবের স্বরূপ যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥”

শ্রীমন্নহাপ্রভু ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ, “গুণগত পার্থক্য” বালিয়া প্রকাশ
করিতেছেন, উহা অচিন্ত্য নহে। কিন্তু—

“অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥”

পয়ারে জগতের সহিত “ঈশ্বরের” অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলিতেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্
জীব গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ, “জীবকে” অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মধ্যে
গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত যোজনা করিয়াছেন।

(খ) তঁাহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে আমাদের কোনরূপ কথা বলা সম্ভব
নহে বা প্রস্তাবিত প্রতিপাদ-করণের উহা উদ্দেশ্যও নহে। তবে শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ
মহাশয় গীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শ্লোকার্দ্ধ মাত্র; ঐ শ্লোকের
অপরার্দ্ধ “মনঃ স্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥” (১৫।৭) এবং ৮, ৯, ১০, ১১ শ্লোক
“জীবের বিভূত্ব” বিষয়ে ভগবদ্‌মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে উল্লেখ করেন নাই।

খ (১) “হা সুপর্ণা সমুজা সখায়া”—শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই।

খ (২) “রঞ্জিত-গুণরাগেণ”—নারদ-পঞ্চরাত্রের বচন উল্লেখ করেন নাই।

খ (৩) “স জীবো পরিসংখ্যাতো জীবঃ সঙ্কষণঃ প্রভুঃ”—শান্তিপর্ব-বচন অনুসরণ করেন নাই।

খ (৪)— . অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যুত-গুণবৃংহিতম্।

অদৃষ্টাশ্রিতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ ॥ (ভাঃ ১।৩।৩২)

উক্ত শ্লোকের স্বামী-টীকা—“তত্রাহ জীবঃ জীবোপাধিঃ। জীবো জীবেন নিম্নুক্তো জীবো জীবং বিহায়েত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্দ-প্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া ক্লমিত ইত্যর্থঃ।”

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকও স্বামী-ভাষ্যের বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এমতে তাহা আলোচনায় যোগ্যতা না থাকায় নিরস্ত হইতে হইল।

(৭) শ্রীভগবানের বিগ্রহ সম্বন্ধে আচার্য্যের সিদ্ধান্ত, তাঁহার গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় ও “কবিং পুরাণম্” শ্লোকের ভাষ্য স্পাষ্টতঃই ভক্তির অনুকূল। যথা, গীতা উপক্রমণিকা :—

স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমশ্চ ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বশ্চ ব্রহ্মণাথঃ
দেবক্যাং বাহুদেবাং অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্ভব। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যাশক্তি-
বলবীৰ্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং (বৈষ্ণবীং) স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং
বশীকৃত্যাজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি সন্ “স্বমায়ুয়া
দেহবানিব'জাত'ইব লোকানুগ্রহং কুর্ক্বন লক্ষ্যতে।

যথা— কবিং পুরাণমুশাসিতারমণোরণীয়াং সমমুশ্বরেদ্ যঃ।

সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ (গীঃ ৮।৯)

শঙ্কর-ভাষ্য—...অচিন্ত্যরূপং নাশ্চ রূপং নিয়তং বিদ্যমানপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং
শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ তম্। আদিত্যবর্ণম্ আদিত্যশ্চ এব নিত্যচৈতন্য-প্রকাশো
বর্ণো যশ্চ তমাদিত্যবর্ণম্। তমসঃ পরস্তাং—অজ্ঞান-লক্ষণামোহাক্ষকারাং পরং
তমুচ্চিন্তয়ন্ যাতিতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ।

(৮) শ্রীশঙ্করের এই সকল ভক্তিরসাত্মক সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর
ব্রহ্ম-সংহিতাব “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ” শ্লোকের ভাষ্য সম্পূর্ণ
সাদৃশ্যাত্মক। যথা :—নমু স্বমতে যোগবৃত্তৌ চ সর্বা কর্ষকঃ পরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ
ইত্যভিধানাং অবিগ্রহ এব স ইত্যবগম্যতে, আনন্দশ্চ বিগ্রহানবগমাৎ ? সত্যং,
কিন্তু অগ্নঃ পরমাপূর্বঃ পূর্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি।

তদেবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-রূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাইত্বং বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্ । ততো জীববৎ দেহিত্বং তস্মৈ নেতাপি সিদ্ধান্তিতম্ । যথোক্তং শ্রীদশমে—
“কৃষ্ণমেনমরেহি ত্বমাশ্রানমখিলাশ্রনাম্ । জুগন্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি
মায়য়া ॥” ইতি ; তথাপি তস্মৈ দেহিবল্লীলা কৃপাপরবশতরৈবোত্যর্থঃ ।

দর্শনের উচ্চশিখরে সিদ্ধান্ত একরূপ । শঙ্করের ভক্তিসিদ্ধান্ত, শত শত উদাহরণ
দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ; সুতরাং এদৃষ্টান্তে অধিক আলোচনা নিম্প্রয়োজন ।

(২) অনেকেই বলেন যে, শঙ্কর “অহং ব্রহ্মস্মি” প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা জীবকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া দিয়াছেন । এজন্য তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি ।

(ক) জীবের মায়ামুক্ত অবস্থার নাম “সিদ্ধ দেহ” বা স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা” বা “আত্মারাম” অবস্থা । যথা, গীতা—

“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিশোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ (গীতা ১৪।২৬)

(খ) এইরূপ সিদ্ধদেহীর বাক্য-কর্ম-আহারাди বদ্ধজীবের সহিত তুলনা হয় না ।
এমতে সিদ্ধদেহী আত্মারামগণ ভাব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া হরির ভজন করেন । সর্ব-
কামনা পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও হরির ইচ্ছায় তাঁহারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইবেন এবং
তত্ত্বদেহের অভিমান করেন । যথা—

খ(১) “অনুখণ মাধব মাধব স উরিতে সুন্দরী তোপী মাধাই”—(বিদ্যাপতি)

খ(২) যঃ একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দান্তিকতয়া ।

তদভার্গে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং ॥—(রঘুনাথ দাস ‘গোবিন্দামী’)

খ(৩) “চণ্ডীদাস কহে, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা ।”—(চণ্ডীদাস)

খ(৪) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাশ্রানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মস্মিতি । তস্মাত্তৎ

সর্বমভবভবত্ততো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং
তদ্বৈতং পশুন্নৃষিক্ষামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবং সূর্যাস্চেতি ।

(বৃহদারণ্যক ১।৪, ব্রাঃ ১০)

যদি সকলেই ভাব-দেহের অভিমান করেন, তবে তাহা শঙ্করের পক্ষেই কি
দোষাবহ ? আর ঐ দেহ যখন ভগবানের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তাহাতে
জীবমুক্তির কর্তৃত্বই বা কোথায় ?

এমতে আমার প্রতিবাদ সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম । “শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ”—

তথা “বৈষ্ণবানাং যথা শত্রুঃ”—জ্ঞানে শঙ্কর-নিন্দা অপরাধ মদ্যে গণ্য । তিনি কপট-

শ্রীমদ্ভট্ট শ্রীমদ্ভট্ট

ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, বলাও “ভুল”, কারণ “ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং” প্রমাণে তাহা বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় নহে। তবে বামনাবতারে বলিকে ছলনার জন্ত যেক্রপ দুই অর্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্যে তাহাই করিয়া দিয়াছেন। ঐ ভাষ্য পাঠ করিলে “অমুর প্রকৃতির লোক” একরূপ অর্থ বুঝিবে, আর বৈষ্ণবগণ নিগূঢ় অর্থ বুঝিবেন—ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত-তত্ত্ব, ভাব-অবস্থায় গ্রাহ্য মাত্র; যাহাদের আশঙ্কা আছে, তাহাদিগকে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া চলে না। তটস্থ অবস্থায় অদ্বৈত-বিষয়ে যাবতীয় যুক্তি নিষ্ফল। বহু ভাবের মধ্যে অদ্বৈত-ভাব একটা ভাব মাত্র। আর যদিও শঙ্করের মত, আপনাদের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়াও মনে হয়, তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্যের অনুগত বৈষ্ণব “অমানীকে মান দান করিবেন”—ইহাই আশা করা যায়।

এমতে নিবেদন, আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় আচার্য্যের প্রতি যে কটুক্তি করা চইয়াছে, তাহা সংশোধন করতঃ শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে বৈষ্ণবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া “প্রবন্ধ প্রকাশ করতঃ” আমাদের তথা বৈষ্ণব-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া চিরকৃতজ্ঞ করুন।

আমাদের এই প্রতিবাদ আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে কিনা, জানিবার আগ্রহে রহিলাম। প্রার্থনা, প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিঃ ইতি—

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীসত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

C/O Babu Kedarnath Mallick, merchant
New Jugsalai, P.O. Tatanagore
(Singhbhum)

প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র

(চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর)

All Glory To Sree Sree Guru And Gauranga.

(Tridandi-Swami)

BHAKTI PRAJNAN KESHAV

Founder-President.

Sree Uddharan Gaudiya Math
Chinsura, West Bengal.

Sree Gaudiya Vedanta Society.

Dated.....24.....1.....1951.

সাদর-সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

মাননীয় শ্রীযুত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়! আপনার টাটানগর হইতে ১৭ই পৌষ তাংএর পত্রাকারে প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত

হইয়াছি। আমি এখানে উপস্থিত না থাকায় উত্তর দিতে দেয়ী হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে গত পরশ্ব এখানে আসিয়াছি। পুনরায় কল্যাণ তথায় যাইতে হইতেছে। আপনার এই পত্র আমাদের পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত জবাব দিব।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের বিচারের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রাখেন না। আপনি বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিলে স্পষ্টভাবে ইহা বুঝিতে পারিবেন। মিশ্র-বৈষ্ণব-অভিমানী কাহারও কাহারও মধ্যে মায়াবাদের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। ইহা আমরা অবৈধ ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের পত্রিকায় “শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা” শীর্ষক প্রবন্ধটী দয়া করিয়া পাঠ করিবেন। উহা কা্তিক-মাস ৯ম সংখ্যা হইতে মাঘ-মাস ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ (সংখ্যা) ১৫৭ পৃষ্ঠায় আমার বক্তৃতার সারাংশ বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমার অনুমোদিত। উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন। আমরা সন্ন্যাসী,—সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কারের আনুযজিক মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজকে তাঁহাদের অনধিগত ব্যাপারগুলি নিবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে।

আমার বিশেষ প্রার্থনা, আমার বক্তব্য বিষয়গুলি আপনারা ধীর-স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। অবশ্য সত্যের প্রচার করিতে গেলে কাহারও কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে; কিন্তু ইহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তবে ইহা ধ্বংসসত্য যে, আমরা কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছুক নহি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচার-বিচার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা আচার্য্য শঙ্করের নিন্দুক নহি; কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত বিচার-যুক্তির সর্বতোভাবে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা এসম্বন্ধে বিস্মৃত ও ধারাবাহিক প্রবন্ধ আগামী ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা* হইতেই প্রকাশ করিব। অধিক কি, আপনাদের সর্বাদীন কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

*স্থান ও সময়ভাববশতঃ ১ম সংখ্যার প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের প্রকৃত প্রতিবাদ আমরা আগামী ৩য় সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। —প্রকাশক

পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে প্রবেশ

এবংসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ শনিবার পর্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কেবল বঙ্গদেশ নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভগবদ্ভক্ত ও সজ্জনমহোদয়গণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রী-সংখ্যা পূর্ব পূর্ব সকল বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং প্রচলিত অপ্রচলিত সকল পরিক্রমার যাত্রী-সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহা হইতেই আমরা শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচারের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কেবল গলাবাজি করিয়া “গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল” মাজিলে প্রচার হয় না। আজকালকার শিক্ষিত সমাজ প্রকৃত আদর্শ দেখিতে চাহে। অর্থশোষণ বা অর্থের জন্য পেষণ—ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থভাবে যাত্রীগণের যাবতীয় অসুবিধা বিমোচনের চেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা সরলান্তঃকরণে বিশেষ আনন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে পরিক্রমার সুসংবাদ জানাইতেছি। আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ভজনোন্মুখী স্কৃতি অর্জন করতঃ আগাদিগকে উৎসাহিত করেন।

পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের সুব্যবস্থায় যাত্রীগণ আহার, বাসস্থানাদির চিন্তা-বিরহিত হইয়া অনায়াসে ও সুষ্ঠুভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাশ্রী দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। মঠের সংলগ্ন কয়েকখানি বৃহৎ অট্টালিকা ব্যতীত, যাত্রীগণের থাকিবার জন্য সমিতির নিজস্ব বহুসংখ্যক শিবিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির কলে উৎসবের বিরাট ব্যাপারে প্রয়োজনানুরূপ জল না পাইলেও, সমিতি আশ্রমের মধ্যেই নলকূপ প্রতিষ্ঠা করায় কাহারও বিত্তজল সংগ্রহের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

পরিক্রমার নিয়মাবলী ও বৈশিষ্ট্য আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ নির্বিঘ্নে নবধা ভক্তির পীঠসমূহ পরিক্রমা, ভগবলীলাশ্রী দর্শন ও স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্তনের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

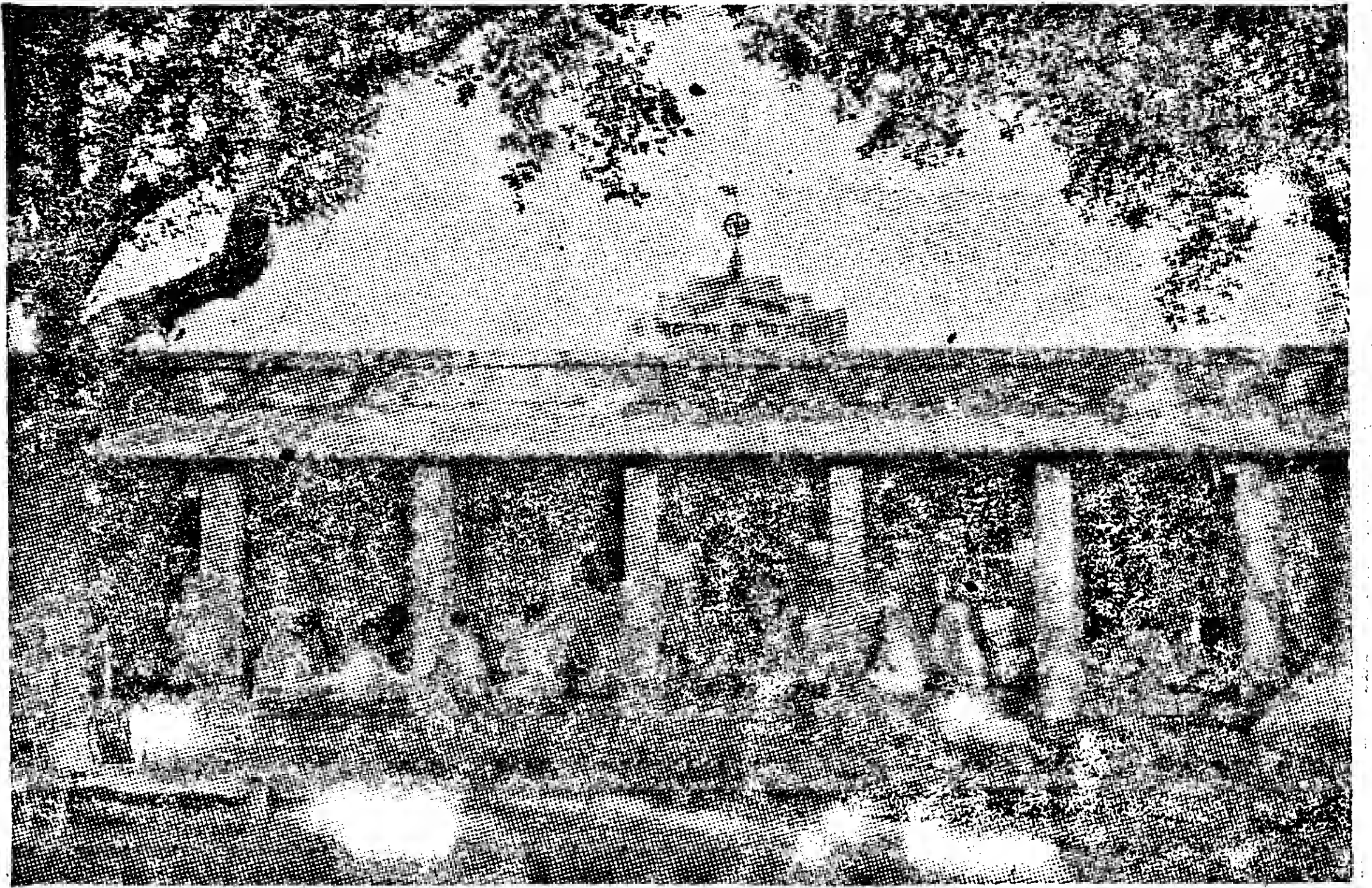
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরিক্রমার নিয়ামক পরিব্রাজাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পরিক্রমার সময় যথারীতি বক্তৃতা এবং নবদ্বীপের তথ্য ও বিবরণসমূহ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্তন করেন। পরিক্রমার সময় বাতীত মঠে সন্ধ্যাকালেও যাত্রীগণ যথারীতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস ৪ঠা চৈত্র—প্রাতঃকালে নগরসঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যাত্রীগণ গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীশ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পরপারে কীর্তনাখ্য শ্রীগোক্রমদ্বীপস্থ (১) সুরভিকুঞ্জ, (২) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, (৩) হুবর্ণ-বিহার, (৪) হরিহরক্ষেত্র, (৫) নৃসিংহদেব-পল্লী এবং সুরনাথ্য শ্রীমদ্বীপস্থ (৬) হংসবাহন প্রভৃতি স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করেন। উল্লিখিত (১), (২), (৩), (৫) ও (৬) নং স্থানে সভাপতি-মহারাজ “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য” ও সমিতির সচ্য প্রকাশিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত “শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ” হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া যাত্রীগণকে অবহিত করেন। পরিক্রমাকালে অধিকাংশ স্থলেই উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে সকলে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ, কীর্তন বা ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা করেন। (৪) ও (৫) নং স্থানে শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য খোল-করতাল সহযোগে কীর্তনমুখে পাঠ করেন। সুরভিকুঞ্জে ও নৃসিংহ-দেবপল্লীতে সভাপতি-মহারাজ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে যে বক্তৃতা করেন, তাহা স্থানাভাবহেতু বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। উহা “সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা” শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অতঃপর পরিক্রমাকালে পথিমধ্যে হরিহরক্ষেত্রে যাত্রীগণকে সরবৎ ও দধিচিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিপ্রহরে তাঁহারা দেবপল্লীতে প্রসাদাদি পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন।

নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ-মহোৎসব

বর্তমান বর্ষের পরিক্রমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার সমিতির সংগৃহীত বিশাল প্রাচীর-বেষ্টিত নিম্নত ভূখণ্ডে শ্রীমন্দির, সেবকথণ্ড ও ভোগশালা নির্মিত হইয়াছে এবং তথায়ই পরিক্রমার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর পরিক্রমা সমাপন করিয়া যাত্রীগণ সন্ধ্যাকালে শ্রীমঠে পৌছিলে, ভক্তগণের গগণভেদী সঙ্কীর্্তন-রোল, স্ত্রীগণের উদ্-ধ্বনি, শঙ্খনিবাদ ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক স্বামিজী-

মহারাজদ্বয়ের স্বাক্ষ, সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও চন্দন-লিপ্ত পুষ্পমালা-বিভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউ পূর্ব-গৃহ হইতে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। প্রাতঃকাল হইতেই

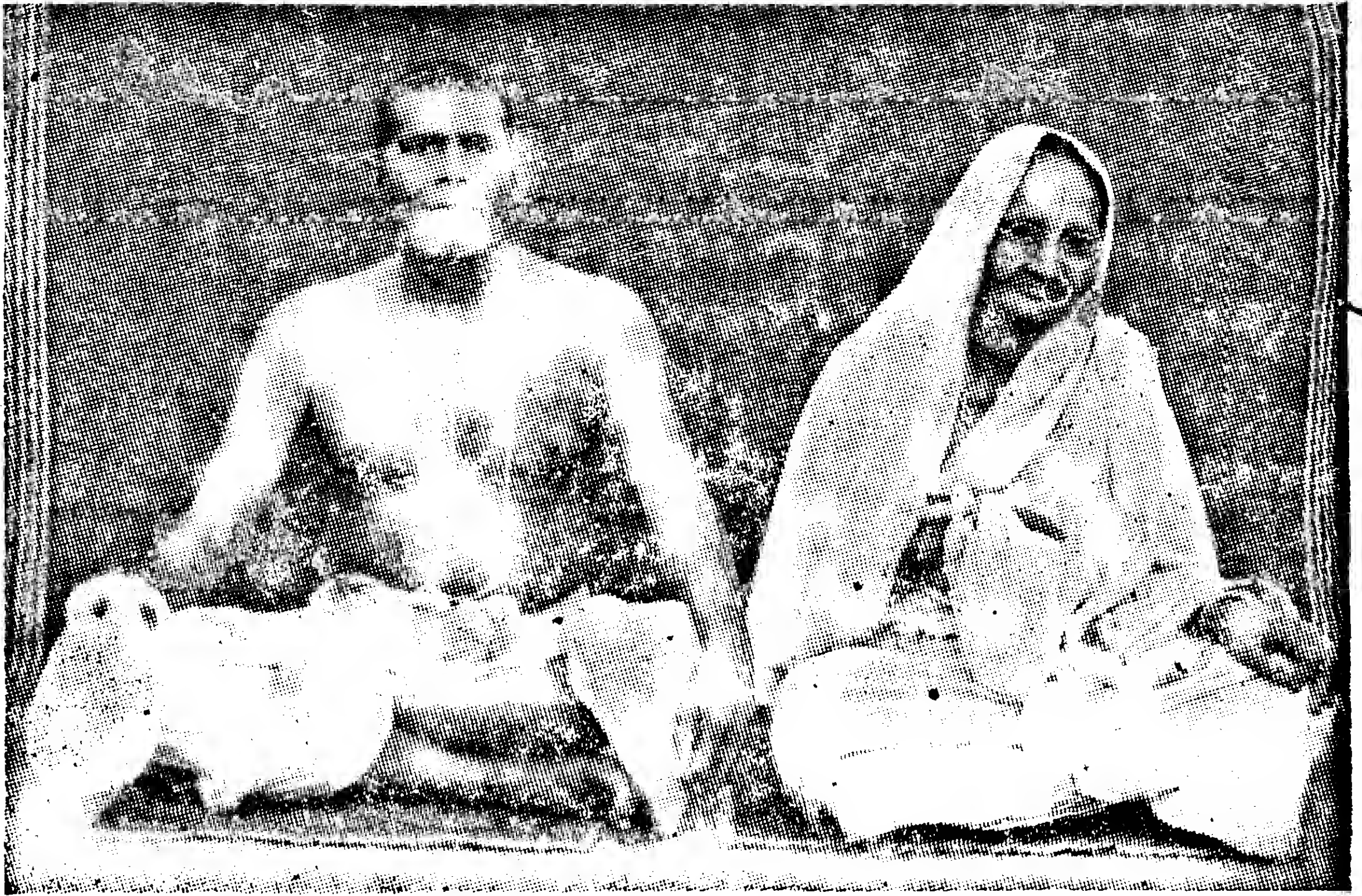


নবদ্বাপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দির

উৎসবের নানাপ্রকার মাস্তুলিক দ্রব্যসম্ভার, পুষ্পরাজি, যজ্ঞানুষ্ঠানের উপকরণ ও অর্চনের উপচারসমূহ সংগৃহীত হয়। শ্রীমন্দির বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হয়। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ ও সম্মুখস্থ বহিঃপ্রাঙ্গণে আলিপনা দ্বারা স্বস্তিক চিহ্ন এবং শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদাদি মাস্তুলিক বিষ্ণুচিহ্নসমূহ রচিত হয়। শ্রীমন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণের সম্মুখে নব-আম্রপল্লবাদি ও নারিকেল ফল-সমন্বিত স্বস্তিকচিহ্নবিশিষ্ট পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষদ্বয় নবনির্মিত শ্রীমন্দিরের শোভা বর্ধন করিতেছিল। শ্রীবিগ্রহগণ নবমন্দিরে আগমন করিয়া তদীয় একনিষ্ঠ সেবকগণ কর্তৃক অচ্চিত হইয়া যেন অধিকতর কমনীয় রূপ ধারণ করতঃ তাঁহার দর্শনপিপাসু ভক্ত-জনগণকে কৃপাপূর্বক দর্শন-দান করিতেছিলেন। তখন অসংখ্য যাত্রী ও ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে দর্শন-জন্ম খুব ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়। ভক্তগণ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিগ্রহ-দর্শন-স্থলে নিমগ্ন হন। নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাগত সহস্র সহস্র লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আদর্শ সেবা

হুগলী-জিলার শ্রীরামপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্মিণী শ্রীমতী শ্রীজ্ঞানদা সুন্দরী দেবী, নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শিখাল ভূখণ্ডের সুদীর্ঘ প্রাচীর ও শ্রীমন্দির নির্মাণে বহু সহস্র টাকা আত্মকূল্য করিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-মহারাজের প্রচুর



শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী

আশীর্ভাজন হইয়াছেন। ইহাদের শুভ সেবা-প্রচেষ্টা সকলেরই সেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-চরণে আমাদের প্রার্থনা।

এই চৈত্র—যাত্রিগণ অত্র পাদসেবনাথ্য শ্রীকোলদ্বীপের কিয়দংশ ও অর্চনাথ্য শ্রীধতুর্দ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্রগড়, টাঁপাহাটী (শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) প্রভৃতি দর্শন করেন। এই দিবস পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের শরীর অসুস্থ থাকায়, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল মারসিংহ মহারাজ-এর আত্মগত্যে যাত্রিগণ দর্শন ও পরিক্রমা করেন। সমুদ্রগড়ে সমুদ্রসেন রাজার স্থানে স্বামীজী যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের বক্তৃতার চূষক”-শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধাকারে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সমুদ্রগড় ও টাঁপাহাটীতে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শাস্ত্র হইতে হান-মাহাত্ম্য পাঠ করেন।

৬ই চৈত্র—অষ্ট যাত্রিগণ বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপস্থ বিদ্যানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট), জহ্নুমুনির স্থান ও দাণ্ডাখ্য শ্রীমোদকুমদ্বীপস্থ মামগাছি (শ্রীল বন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা ও দর্শন করেন । বিদ্যানগর ও মামগাছি মঠে সভাপতি-মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা করেন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) । বিদ্যানগরে যাত্রিগণকে সরবৎ ও দধিচিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।

৭ই চৈত্র—সঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রার অনুগমনে যাত্রিগণ অষ্ট প্রথমেই কোলদ্বীপস্থ পোড়ামাতলায় উপস্থিত হন । এখানে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ “ধাম-মাহাত্ম্য” ও “ভাবতরঙ্গ” হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রোঢ়া মায়ায় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন । তথা হইতে বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করা হয় । এখানেও সভাপতি-মহারাজ, শ্রীল বাবাজী-মহারাজের অতিমর্ত্য চরিতাবলী আলাচনামুখে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) । তথা হইতে যাত্রিগণ সখ্যাখ্য শ্রীকৃষ্ণদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ গোড়ীয় মঠ প্রভৃতি দর্শন করেন । এখানে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । মঠে অষ্ট রাত্রেও তিনি ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ।

৮ই চৈত্র—নগর-সঙ্কীর্্তন শোভাযাত্রাযোগে সুসজ্জিত শিবিকারূঢ় শ্রীমন্নহা-প্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে যাত্রিগণ গঙ্গা পার হইয়া শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ দূর হইতে দর্শন করিয়া আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি-ও পুর শ্রীপাট প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করেন । অষ্ট সভাপতি-মহারাজ অধিকাংশ স্থলেই “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য” ও “শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ” পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । যোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে তিনি যে গভীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন (বক্তৃতা—আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) । শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজীও যোগপীঠে অন্তর্দ্বীপের মাহাত্ম্য যুদ্ধ-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনমুখে পাঠ করেন । অষ্টাষ্ট বৎসরের গ্রাম এবারও যাত্রিগণ ও এতদঞ্চলের আহুত, অনাহুত ধামবাসী ভক্তবৃন্দ সকলে স্থানীয় শ্রীযুত ভূদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুত অনন্তদেব ব্রহ্ম মহাশয়দিগের বাটীতে ৫

ও তৎসংলগ্নস্থানে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। বিশ্রামান্তে যাত্রীগণ সন্ধ্যায় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌছেন। অতঃপরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অগ্রতম সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৯ই চৈত্র—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবস। অতঃপরে মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ সকলেই উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন শ্রীহরিসঙ্কীর্তনে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই কীর্তনমুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং সারাদিবসব্যাপী সঙ্কীর্তন চলিতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন হয়। পরে সকলে অমুকল্প গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

অতঃপরে দ্বিপ্রহরে কতিপয় মাংসর্যাপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী, বৈষ্ণববিদ্বেষীর শ্রীগৌর-আবির্ভাবোৎসব পণ্ড করিবার হীন-চেষ্টা ও বৈষ্ণবগণের প্রতি অযথা বর্ষারোচিত আচরণ—উপস্থিত যাত্রীগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল এবং শ্রীমন্নুহাপ্রভুর সময়ের ‘পাষণ্ডী হিন্দু’ ও শ্রীবাস-অঙ্গনে ‘খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা’র কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। দৈত্যের মূর্ত্যবিগ্রহ, “তৃণাদপি” শ্লোকের জলন্ত দৃষ্টান্ত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত আশ্রিত, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরাভিন্ন ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ লাক্ষিত ও মাধাইএর নিষ্কিপ্ত দক্ষ যুগ্মগুণের আঘাতে শোণিত-সিক্ত হইয়াও তাঁহার আশ্রিত-জনকে প্রেম-বিতরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। দৈব ও অসুর-সৃষ্টি জগতে সর্বত্র সর্বকালেই লক্ষ্য করা যায়। ভগবানের প্রিয়তম বস্তু ও তাঁহার প্রিয়তম জনের প্রতি ঘৃণাচরণ করাই অসুরগণের চিরন্তন স্বভাব। সুতরাং ভগবৎপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবী স্ব-স্বভাব অসুরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

১০ই চৈত্র—সাধারণ মহামহোৎসব। পূর্বাঙ্ক ১০টা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। স্মৃতিশালী জনসাধারণ অতঃপরে মনের আনন্দে প্রসাদ সেবা করিয়া নিজদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন। প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমে অস্তমিত হইলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পাঠ ও কীর্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে পরিক্রমার বিরাট অমুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইল।

উৎসবান্তে পরদিবস যাত্রীগণ পরিক্রমাকালের অফুরন্ত আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে ও দুঃখিতাত্ত্বকরণে পূজ্যপাদ স্বামীজী-মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

—প্রকাশক

চুঁচুড়ায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনায় স্থানীয় দেপাড়াস্থিত 'ত্রিতাপ শান্তি-নিকেতন'-হরিসভায় গত ১২ই চৈত্র, সোমবার হইতে ১৬ই চৈত্র শুক্রবার পর্যন্ত যথাক্রমে দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তিন দিবস ছায়াচিত্রাযোগে শ্রীগৌরঙ্গ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা হয়। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দ অসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন ও সমিতির প্রচারণার্যের সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করেন। আমরা সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহাদের মহতী চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরঙ্গ—৪৬৫

চৈত্র—১৩৫৭

১ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ, শনিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ্ব দি ৩।১৩। পূর্বাহ্ন ৯।৪২ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

৩ বিষ্ণু, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ, সোমবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ১।১৫। কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্নহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৫ বিষ্ণু, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২৭। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পঞ্চম দোল। চম্পকহট্টে উৎসব।

১০ বিষ্ণু, ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ৬।২২। পাপ-বিমোচনী একাদশীর উপবাস।

১১ বিষ্ণু, ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৫।১। পূর্বাহ্ন ৯।৩৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীমন্নহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

১২ বিষ্ণু, ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, বুধবার—গৌর-পঞ্চমী রা ১০।২৮। শ্রীল রামানুজাচার্যের আবির্ভাব।

বৈশাখ—১৩৫৮

২৪ বিষ্ণু, ২ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল, সোমবার গৌরনবমী প্রাতঃ ৫।২৬। শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মোৎসব। শ্রীরামনবমী ত্রতোপবাস। মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ।

২৫ বিষ্ণু, ৩ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার, গৌর-দশমী দি ৬।১৫। প্রাতঃ ৬।১৫ মধ্যে শ্রীরামনবমীর পার্ৱণ।

২৬ বিষ্ণু, ৪ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল, বুধবার—গৌরৈকাদশী দি ৬।৩২। কামদা একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু, ৫ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী—দি ৬।১৯ মধ্যে একাদশীর পার্ৱণ। শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপণ উৎসব।

২৯ বিষ্ণু, ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, শনিবার—পূর্ণিমা রা ২।৫৪। শ্রীশ্রীবল-দেবের রাসযাত্রা।

যৌ মাসৌ তত্র চাবাসীং মধুং মাধবমেব চ।

রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিগাবহন্ ॥

পূর্ণচন্দ্র-কলাবৃষ্টে কোমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।

যমুনোপবনে য়েমে সেবিতৈ স্ত্রীগণৈবৃতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর ও শ্রীল শ্রীমানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

৭ মধুসূদন, ১৪ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-সপ্তমী দি ১।১৭। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ১৭ বৈশাখ, ১ মে, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দশমী প্রাতঃ ৫।৫৬ পরে কৃষ্ণৈকাদশী রা ৪।৫৭। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মধুসূদন, ১৮ বৈশাখ, ২ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৪।২৬। বক্রথিনি একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন, ১৯ বৈশাখ, ৩ মে, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ৪।২৫। দি ৯।২৪ মধ্যে একাদশীর পার্ৱণ।

১৮ মধুসূদন, ২৫ বৈশাখ, ৯ মে, বুধবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১।১৮। অক্ষয় তৃতীয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রা আরম্ভ।

২২ মধুসূদন, ২৯ বৈশাখ, ১৩ মে, রবিবার—গৌর-সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।১। অক্ষয় সপ্তমী।

২৪ মধুসূদন, ৩১ বৈশাখ, ১৫ মে, মঙ্গলবার—গৌর-নবমী রা ৭।৬। শ্রীদিত্যানন্দশক্তি শ্রীজগদ্ধাদেবীর ও শ্রীরামশক্তি শ্রীমীতাদেবীর আবির্ভাব।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

<p>* ধর্ম: সমুদ্ভিত: পুংসাং বিশ্বকর্সেন-কথাতু য:। *</p>	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রজীদতি ॥</p>	<p>* নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ *</p>
---	---	--

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	প্রচ্যুত, ২৪ মধুসূদন, ৪৬৫ গোবিন্দ মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৫৭ ; ইং ১৫।৫।৫১	৩য় সংখ্যা
----------	--	------------

শ্রী শ্রী বলদেব-স্তোত্রম্

- ১। দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোহস্ত তে ।
নমোহনন্তায় শেখায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ৩ ॥
- ২। ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে ।
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সর্কষণায় তে ॥ ৪ ॥
- ৩। রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতগ্রজ ।
হলায়ুধ প্রলম্বন্ন পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৫ ॥

- ৪। বলায় বলভদ্রায় তালান্ধায় নমো নমঃ ।
নীলান্ধরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥
- ৫। ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কূটারিবর্বলান্তুকঃ ।
রুদ্র্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুস্তাগু্যরিস্তম্বেব হি ॥ ৭ ॥
- ৬। কালিন্দীভেদনোহসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ ।
দ্বিবিদারিষাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৮ ॥
- ৭। কংসভ্রাতৃপ্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ ।
দুর্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ ॥ ৯ ॥
- ৮। জয় জয়াচ্যুত দেব পরাংপর
স্বয়মনন্তু দিগন্তগতশ্রুত ।
সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ১০ ॥
- ৯। যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ
স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ ।
জগতি সর্ববলং ত্বরিমর্দনং
ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥ ১১ ॥

—শ্রীমদগর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে

একাদশোহধ্যায়ে

শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রের অনুবাদ

- ১। হে দেবাদিদেব ! হে ভগবন্ কামপাল ! আপনাকে নমস্কার ।
হে বলরাম ! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥
- ২। হে ধরাধর ! আপনি স্বীয় তেজে পূর্ণ ; হে সহস্র-শীর্ষ সর্কর্ষণ !
আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥ ৪ ॥
- ৩। হে বলদেব ! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ
ও প্রলম্ব ; হে পুরুষোত্তম ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

৪। হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে নীলাশ্বর গৌরবর্ণ রোহিণী-তনয় ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

৫। আপনি ধেনুক্যারি, মুষ্টিক্যারি, কুট্যারি, বহ্নলান্তক, রুম্বী, কূপকর্ণ ও কুস্তাণ্ডেরও অরি আপনিই ॥ ৭ ॥

৬। আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন ; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের মণ্ডন ॥ ৮ ॥

৭। আপনি কংস-ভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তর্কযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্ঘোধান-গুরু ; অতএব হে প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

৮। হে অচ্যুত ! আপনার জয় হউক, জয় হউক ; হে পরাংপর দেব ! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী ; আপনাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

৯। যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয় ; জগতে তাহার সর্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সার্থক ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

—শ্রীমদ্ভগবৎসংহিতায় বলভদ্রখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে

অমায়ী

‘অমায়ী’-শব্দের অর্থ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে ‘অমায়ী’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই শব্দটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়।

সদুপদেশ আপাত-সুখ-হানিকর

কোন চিকিৎসক কোন আময় নিবারণ-কল্পে বিশ্বাদবুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। একরূপ আপাত-সুখ-হানিকর অপ্রিয় সত্য সংফলপ্রসূ-চেষ্টা পরিশেষে অফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব নিজের শুভকর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত-সুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এইপ্রকারে মায়ার দ্বারা আপাত-সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়।

মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়

পরমার্থ বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া জীব স্ব-স্বার্থ-হানিকর পরচর্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা, নানাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম-প্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়।

ভক্ত-পদরেণুই কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের উপায়

কেহ যেন আপাত-সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়া-মণ্ডিত না করেন। মায়ামুক্ত জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজামুভূতিকে মায়ার আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্ত হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত-সহজিয়ার কপট-দৈন্ত্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ‘তৃণাদপি স্তূনীচ’-শ্লোকের পরিচায়ক নহে

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—“জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহজয় দৈন্ত্য-সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখ-কাতর, সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্ত্য ত্যাগপূর্বক প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও ; কপট দৈন্ত্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কপটাকে যেন তুমি স্তূনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর। তোমার মমত্ব বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুক্ত জীবকে মায়িক-বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্তিত হইতে পারিবে।” মায়ামুক্ত হইয়া সর্বদা হরিনাম করিবে—ইহাই গৌরসুন্দরের আশ্রয়।

মায়াবদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্ত-বিদেষী

যাহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম-স্পর্শ করিতে বাস্তব হন, তাঁহারা মায়া-কর্তৃক মুগ্ধমান হন। মায়া-কর্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহনিকার উদয় হয় ; সে-কালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং

নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীন-জ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শ-চরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার (গৃহাসক্ত সহজিয়ার) মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

গোস্বামীবর্গের আদর্শ আচার ও ‘অমায়া’-শব্দের তাৎপর্য

শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ-দাস অতুল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-বিমুখ-জ্ঞানকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবন-দাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিহাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্তী কোমল-শ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কুপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ-ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্ত সর্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অমুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরাধী ; বাস্তবিক তাহা নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া-কর্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্তই বৈষ্ণব-সাহিত্যে “অমায়া”-শব্দের প্রয়োগ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

দৈন্য

শুদ্ধা ভক্তির বুদ্ধিক্রমে আনন্দদায়ক দৈন্যের প্রকাশ

দৈন্য বৈষ্ণবের ভূষণ। দীনতাবিহীন বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবতার ভাগ মাত্র। ফলতঃ ভক্তিবুদ্ধির সহিত—আনন্দ-বুদ্ধির সহিত ভক্তের দীনতাও বাড়িয়া উঠে। জগতের সকলেই ভগবদ্বিমুখ কদাচার-রত ; ভক্ত অতি শুদ্ধ, ভগবৎ-পরায়ণ, তথাপি তিনি আপনাকে ভক্তহীন, অতি দীন মনে করেন। তিনি সর্বগুণ-ধাম সর্বোত্তম হইলেও, আপনাকে সর্বোদম বলিয়া জানেন। একরূপ দৈন্য ভক্তের একটা অলৌকিক ভাব। তাহা আনন্দদায়ক।

ভক্তের দৈন্য কপটতা নহে—হৃদয়ের আবেগ

ভক্তের অতি দৈন্য দর্শনে কেহ কেহ সংশয় করিয়া বলিতে পারেন—“ইহা তাঁহাদের কপটতা”। এটা কিন্তু বিষম ভ্রম। শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র যখন কৃষ্ণদাস

অভিমাণে আপনাকে তৃণাধিক নীচ জানিয়া ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, “আমি বড় দীন-হীন, তোমরা আমাকে কৃপা কর”—এই কথা বলিয়া যখন কাকুতি করিতেন, তখন অতিমাত্র পাষণ-হৃদয়ও গলিয়া যাইত, লোহ সদৃশ চক্ষুতও বারি দেখা দিত। সে-দৃশ একবার মানষ-চক্ষে দর্শন করিলে বৈষ্ণবের দীনতা, কপটতা বলিয়া বোধ হইবে না—বোধ হইবে তাহা ভক্তের অন্তরের অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তির আবেগে সবেগে হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে।

“দৈন্য”-শিক্ষায় শ্রীমন্নহাপ্রভু

শ্রীমন্নহাপ্রভু আমার প্রেম-বন্তায় জগৎ ডুবাইয়াছিলেন, শত শত পাষণ্ডের হৃদয়-মরু ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়া যিনি নিরন্তর সাত্ত্বিক ভাব-প্রাপ্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন করিতেন, তিনি প্রেমাবেগে বিহ্বল হইয়া কেন বলিবেন—

ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।

বংশীবিলাস্তাননলোকনং বিনা

বিভ্রমি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই। তবে যে আমি তাঁহার জগৎ ক্রন্দন করিতেছি, তাহা কেবল আমার সৌভাগ্য জানাইতেছি মাত্র। যদি সত্যই তাহাতে আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সেই বংশী-বিলাসাননের শ্রীমুখ দর্শন না করিয়া আমি কিছুতেই বৃথা জীবন-ধারণ করিতাম না। অহো, কি আশ্চর্য্য দীনতা, কি মহান্ ভাব! জগৎপূজ্য গৌর-ভক্তগণও দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের দৈন্য-কল্পিত বসন, দৈন্য-নমিত বদন, এবং দৈন্য-নমিত বচন—সকলই দৈন্যের চূড়ান্ত আদর্শ এবং চরম শিক্ষা।

শ্রীনাম-সাধনের উপকরণ—দৈন্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি

পতিত-পাবন শ্রীগৌরান্ধ জগতে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে আনিয়াছিলেন, নাম দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে নাম-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ—দীনতা। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোঁরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক—৩)

অর্থাৎ তৃণ যেমন সর্বজীব-কর্তৃক পদদলিত হইলেও অকাতরে অবনত-মস্তক

হইয়া থাকে, বৈষ্ণবও তদ্রূপ সর্বোত্তম হইলেও আপনাকে সর্বাধম জানিয়া, আপনাকে সকলের পদানত হইবার যোগ্য বিবেচনায় সর্বদাই দৈন্যপূর্ণ থাকেন।

রক্ষা-যেমন নিজে রোদ্র-বৃষ্টি সহ করিয়া অপরকে ছায়াদানে সেবা করে, কাঠুরিয়া তাহাকে ছেদন করিতে থাকিলেও তাহাকে ছায়াদানে কাতর হয় না, নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবও সেইরূপ নিজে অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া অন্তকে রক্ষা করেন এবং অন্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপকার করিতে পরাজুথ হন না। নিজে অমানী হইয়া জগতের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনিই হরিনাম-কীর্তনের অধিকারী।

আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে দীনতার অভাব

ভাগ্যহীন আমরা, তাই আজকাল আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে আর সে দীনতা দেখিতে পাই না। সকলেই যেন স্বীয় গুণপনা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি লক্ষ নাম করি, আমি বড় শুদ্ধাচারী, আমি বড় ভক্তিমান—ইত্যাকার অভিমান-সূচক বাক্যাবলীই যেন আজকাল বৈষ্ণবতার নিদর্শন হইয়াছে। এখন আর সহজে দণ্ডবৎ আসে না। দুইজনে দেখা হইলে আগে ‘দণ্ডবৎ করি কি না’—এই বিচারেই প্রায় দণ্ডবতের সময় অতীত হয়। ‘দণ্ডবৎ’ শেষে ‘ঐ পর্যান্ত’। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া মনে ভয় হয়, পাছে কাল-ধর্ম বৈষ্ণব-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিল।

কপটতা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণের উপদেশ

আমাদের অভিমান^{১ম} কিসের? মুহুমূহঃ বিষম ভ্রম, প্রতিনিয়ত পদস্থলন, পদে-পদে ঘোর বিপদ, তথাপি কিসের এ অভিমান? যিনি নাম প্রচারিতে জগতে আসিয়া নিরন্তর নাম করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিতেছেন—“আমার দুর্দৈব নামে নাই অনুরাগ”। আর আমরা একবার একটু ‘নাম’ লইয়াই ঘোর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। অতএব আর কেন এ দুর্লক্ষি! যাহা বৈষ্ণবতার নিদর্শন, শ্রীগোরাঙ্গের আচরণ, ভক্ত-জীবনের ভূষণ—সকলে মিলিয়া আইস, সমস্ত কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দৈন্য-অনুভবে জীবন কৃতার্থ করি।

(শ্রীসঙ্কনতোষণী ১০ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নারকী

[অর্চে্য বিষ্ণৌ শিলাধীশ্চ রুশু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-

বিষ্ণোর্ব। বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ ।

শ্রীবিষ্ণোনান্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দনামাত্মবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধীর্ষস্তু বা নারকী সঃ ॥] (পদ্মপুরাণ)

কাঠ-শিলা বোধ যার পূজার ঠাকুরে,

মানুষের মত যেবা দেখে গুরুবরে,

বৈষ্ণবের কুল-দোষ করে আলোচন,

বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন ।

অকাল-মরণ-জয়ী কলিমলহারী,

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পদ জগৎ-কাণ্ডারী,

হেন পাদোদকে যার জল দরশন,

বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন ।

যে মন্ত্র হইতে হয় পাপ-বিমোচন,

যে নাম হইতে মিলে মুরারী-চরণ,

হেন নাম মন্ত্রে যিনি শব্দ মাত্র ক'ন,

বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন ।

সকল দেবের প্রভু জীবন আलय,

বিষ্ণু পরতত্ত্ব কৃষ্ণ জীবে দয়াময়,

অন্যদেব সম তারে যে করে স্মরণ,

বেদব্যাস বলে ভাই নারকী সে-জন ।

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

অর্চন

“অর্চায়াং পূজায়াঞ্চ”—অর্থাৎ ‘অর্চ’-ধাতু পূজা বা অর্চা-অর্থে ব্যবহৃত হয় । ‘অর্চ’-ভাবে ‘অনর্চ’ প্রত্যয় করিয়া অর্চন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সম্ভ্রম-জ্ঞানের সহিত শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চা-বিগ্রহের ষোড়শ, দশ, কিংবা পঞ্চোপচারে পূজাকে ‘অর্চন’ আখ্যা দেওয়া হয় । কনিষ্ঠাধিকারে ‘অর্চন’ ও উন্নতাধিকারে ‘ভজন’ সম্ভব । শুদ্ধভক্তি-পথে অর্চনের বিধান রহিয়াছে । নবধা সাধন-ভক্তির মধ্যে ‘অর্চন’ একটি ভক্ত্যঙ্গ । অতএব রূপানুগ আচার্য্যবর্গের অনুগত শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে সাধনমার্গে অর্চন ন্যূনাধিক সকলেরই স্বীকার্য্য । দেহাত্মবাদী বা জড়বাদী জীবগণ পূর্ব পূর্ব স্মৃতি-বলে ভক্ত, ভগবান্ ও তন্নামে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং সৎগুরুর চরণাশ্রয়পূর্বক তদুপদেশক্রমে নিষ্ঠা-সহকারে কলি-পাবন মহামন্ত্রের সেবা করিতে থাকেন । এ অবস্থায় তাঁহাদের নাম ও নামীতে অভিন্ন বুদ্ধির সঞ্চার হয় না, তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপূর্বক নামসেবা করিতে আরম্ভ করেন । তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের ‘গুরু কৃষ্ণরূপ হন’—এ বুদ্ধির উদয় হয় না । শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ, তিনি কৃষ্ণকে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের হয় না । এবম্প্রকারে নাম-সেবা করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি অর্চনাধিকার লাভ করিয়া থাকেন ।

অদীক্ষিত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি না থাকায় তাহাদের আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি ব্যাপার, অণু পশুর সহিত সমানভাবে বর্তমান । মানুষ ও পশুতে আহাৰাদি চারিটী বিষয় সমভাবে থাকিলেও মানুষের একটি অধিক গুণ আছে—সেটীর নাম ধর্ম্ম । এই ধর্ম্মই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক । জীবসকলকে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে আনিবার জন্ত সৎগুরু পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অর্চনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন । স্মরণীয় ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে-অবস্থায় মানবগণকে উন্নতাধিকারে আনয়নের নিমিত্ত অর্চনাধিকার প্রদত্ত হয়, তাহা কনিষ্ঠাধিকার ব্যতীত আর কিছুই নয় । পূজা ও অর্চনাদি কনিষ্ঠাধিকারীর অবশ্য কৃত্য । কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীভগবানের অর্চা-বিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে থাকিলেও, অর্চন করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপা-প্রভাবে তাঁহার অর্চা-বিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়

হয়। প্রাপঞ্চিক জীবগণের শুদ্ধ-সেবোন্মুখ চিন্ময়-ভাব প্রকটিত করিবার জন্ত, অর্চা-বিগ্রহ অষ্টপ্রকারে প্রপঞ্চ প্রকাশিত হন।—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ (ভাঃ ১১।২৭।২২)

সদৃশু ও বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অষ্টপ্রকার প্রতিমার মধ্যে যে-কোনও প্রকার প্রতিমার সেবা করিতে করিতে কনিষ্ঠাধিকারিগণের বিষয়-বাসনা বিধৌত হইয়া চিত্ত-দর্পণ মার্জিত হইতে থাকে। তাঁহাদের হৃদয়ে রাগ-দ্বेष-মাৎস্যর্যাদি স্থানলাভে সুযোগ পায় না এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর সেবাপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হইতে থাকেন। এমন কি, পঞ্চমপুরুষার্থ-স্বরূপ, পরম প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর নিত্য সাক্ষাৎসেবা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হন। তখনই কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ উন্নতাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ‘প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন’—এই বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহাদের ‘অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে’—শ্লোকের উদ্দিষ্ট প্রাকৃত-বুদ্ধি আর থাকে না।

এস্থলে একটা বিষয় বিশেষ বিচার্য্য এই যে, কলিকালে যিনি যে-কোনও ভক্ত্যঙ্গ যাজন করুন না কেন, তিনি যদি “পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনম্”—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া কেবলই ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যাবতীয় ভজন-সাধন পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে। সেইজন্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, “যতপাত্ৰা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য, তদা কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব”। অতএব আমাদের অর্চন যদি কীৰ্ত্তনমুখে সাধিত না হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা পরম-প্রয়োজন-লাভ সুদূর-পরাহত।

অর্চন দুই প্রকার—জপাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত যে অর্চন, তাহা জপাঙ্গ। রূপানুগ ভক্তগণের অর্চন—ভক্ত্যঙ্গ। ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকারিগণ জপাঙ্গ-অর্চনকারীদিগের গায় আবাহন, প্রাণায়াম, গ্রাস প্রভৃতি ও মুদ্রাদি ব্যবহার চেষ্টার অনুষ্ঠান করেন না। এই অর্চন আবার ‘কেবল’ ও ‘কর্ম্মামশ্রা’ ভেদে দুই প্রকার। ভক্ত্যঙ্গ সেবা আবার ‘ভাবসেবা’ ও ‘রাজসেবা’ ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণতঃ গৃহস্থগণ কেবল ভাবসেবা করিয়া থাকেন; কারণ রাজসেবাতে নিয়মের কঠোরতা যথেষ্ট বিদ্যমান। গৃহস্থগণের নানাবিধে বিক্ষিপ্ত মতি নিবন্ধন তাঁহারা রাজ-

সেবার নিয়মের কঠোরতা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়েন । রাজসেবাকারিগণের নিয়মের ব্যতিক্রমে প্রত্যাবার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয় ।

অর্চনকারিগণকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উখিত হইয়া, রাত্রে শয়নারাত্রিক পর্য্যন্ত অর্চনের পাঁচটি অঙ্গ পালন করিতে হয় । যথা—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা । শ্রীভগবন্মন্দির মার্জ্জন, অনুলেপন, নিষ্মাল্যোত্তরণাদি—**অভিগমন**, সেবার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহকে **উপাদান**, ভূতশুদ্ধিরূপ **যোগ**, নাম ও মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষিপূর্বক জপ, কীর্তন, শ্লোত্রাদি পাঠ প্রভৃতি—**স্বাধ্যায়** এবং নিজ উপাস্ত দেবতার বিধিবৎ সেবাকে **ইজ্যা** বলা হয় । অর্চনে পৃথু-মহারাজ কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়াছিলেন ।

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ ।

ফলং দদাতি স্থলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ ॥

(মধ্বমুনি-রচিত কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব)

অর্চনের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কোনও প্রকৃর আয়োজনের সামর্থ্য না থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিপূর্বক কেবলমাত্র জলদ্বারা অর্চিত হইলেই অনন্ত ফল দান করিয়া থাকেন ।

নৈকং সবংশন্ত নরস্তারয়ত্যাখিলং জগৎ ।

অর্চায়ামীপ্সিতং নৃণাম্ ফলং দদাতি ছলভম্ ।

প্রতিমামাশ্রিতোহ্ ভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ॥

(হরিভক্তি-স্থধে দয়)

অতএব মানবমাত্রই একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর ও তদীয় জনগণের বিধিবৎ অর্চন করিলে সর্বার্থ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।

পদ্মপুরাণোপাখ্যাতীর প্রতি শিববাক্য, যথা—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

হে দেবি, অগ্ৰাণু দেব-দেবীর আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চন শ্রেষ্ঠ ।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন,—

‘আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়’ ।

সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৮)

নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন,—

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।

‘মদন্তপূজাভ্যধিকা’ সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৯।২১)

শ্রীভগবানের পরিচর্যা আদর, সর্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, তাঁহার ভক্তের বিশেষ পূজা—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ ।

বৃক্ষমূলে জল দিলে যেরূপ পৃথগ্ভাবে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পে জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই সন্তোষ-বিধান হইয়া থাকে, পৃথক্ করিয়া অবান্তর ফল লাভোদ্দেশ্যে অগ্ন্যাগ্ন দেবদেবীর আরাধনার প্রয়োজন হয় না । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যথা তরোমূল-নিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তং স্কন্ধভূজোপশাখা ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমান্তে প্রার্থনা

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারুন্দ ।

ভক্ত অভিযাত্রী কত,

সঙ্গে হয়ে পরিবৃত,

চলগো আমরা নেহারিব সবে সে সুদৃশ্য অফুরন্ত ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারুন্দ ॥ ১ ॥

দুর্গম পথে দুঃসহ ক্লেশ তবুও হওনি ক্লান্ত,

(মোরা) না জানি স্তব না জানি স্তুতি,

কিসে দেবতার সাধিব প্রীতি,

অশ্রুর অর্ঘ্য এনেছি শুধু যে পূজিব চরণ ক্লান্ত ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারুন্দ ॥ ২ ॥

গৌর-তীর্থে প্রচারিয়া নাম করিলে সকলে মুগ্ধ,

মানবের হিত কল্যাণ তরে,

(প্রতি) বরষে বরষে ডাকিছ সবারে,

নারিনু চিনিতে নারিনু ভজিতে আমরা এমন অন্ধ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারূন্দ ॥ ৩ ॥

ভক্তের কীৰ্ত্তি-কলাপ হেরিয়া নাস্তিক হয়েছে স্তব্ধ,

কলির দন্ত করিলে চূর্ণ,

পরিক্রমা-ব্রত করিয়া পূর্ণ,

এমন সুযোগ নারিনু গ্রাহিতে মোদের ভাগ্য মন্দ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারূন্দ ॥ ৪ ॥

জীবনের মাঝে এশুভ বৎসর এক স্মরণীয় অব্দ,

ধন্য তোমরা যাত্রীর দল,

জনম সবার হইল সফল,

প্রত্যক্ষ হেরিয়া তীর্থ-মহিমা ঘুচালে মনের সন্দ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারূন্দ ॥ ৫ ॥

লও মহারাজ এই সেবকের প্রণতি ভক্তিয়ুক্ত,

পদারবিন্দের মধু হরে চোর,

মানস মধুপ তাহে বিভোর,

এ নেশার ঘোর না হউক ভোর প্রাণে থাক দৃঢ় বন্ধ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারূন্দ ॥ ৬ ॥

উদ্দেশে দেব ! জানাই চরণে প্রাণের আকুল ছন্দ,

উদ্দেশে কর আশীস্ দান,

ঘুচুক জড়তা, ভ্রান্তি ও ভাণ,

যেন মন-মুখে এক-ভাব রেখে ভাবি সে পরমানন্দ।

আশ্রম আজ হইল উজল ফিরিছে দেবতারূন্দ ॥ ৭ ॥

প্রণত

—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র জানা

গ্রাম—ঝিঝুখাল (মেদিনীপুর)

কৃপা চাই

আমি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা চাই। আমি সত্যই কি কৃপা চাই? সাধু-গুরুর নিকট ভাণ করিয়া বলিয়া থাকি—আমাকে কৃপা করুন। আমার মন সত্যই কি কৃপা চায়? আমি আমার অন্তরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা করিলে আমি কি সত্যই তাহা গ্রহণ করিতে পারিব? আমি অনেক সময় সাধুগুরুর নিকট কৃতাজ্ঞ লিপুটে কৃপাভিক্ষার অভিনয় করি এবং বলিয়া থাকি যে, আপনাদের কৃপা হইলে সব হয়। আবার কোন সময় তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া বলি—কই, আমার উপর ত' আপনার কৃপা হইল না? তাই বলিতেছি, সত্য কি আমি কৃপা চাই?—আমার বঞ্চক মন একথার উত্তর দিতে পারে না। অসং ব্যক্তিগণের সহিত যতদিন আমার সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিব না।

আমি লোকের নিকট জাহির করিতে চাই যে, আমি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার ভিখারী। আমি কপটতা করিয়াই তাঁহাদের কৃপা চাই ও তাঁহাদের ভক্ত হইতে ইচ্ছা করি। প্রকৃতপক্ষে আমি কৃপা ছাড়া আরও কিছু চাই। ভগবান্ আমার সেই কপটতাটুকু ধরাইয়া দেন—আমার ক্ষমতার উপর কষ্টসাথ্যের গায় বিপদ-আপদের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, সত্যসত্যই আমি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে চাই কিনা তাহা পরীক্ষা করেন। আমি যখন সত্যসত্যই কৃপা চাহিব, তখন আমার সকল বিপদাপদ ভগবানেরই কৃপা ও পরীক্ষা—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইবে। আমি যখন গুরুবৈষ্ণবগণের সেবার কিঙ্কিমা ত্রুণ্ড যোগ্যতা লাভ করিব, তখনই আমি উপলব্ধি করিতে পারিব—আমার প্রতি তাঁহাদের প্রচুর করুণা, এবং উক্ত করুণা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার জীবন সাংক হইবে।

আমি গুরু-কৃপাসুখা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ সংসাররূপ অগ্নি-জ্বালাময় অন্ধকূপে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলেও যেখানে গুরুকৃপা দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু আমি তখন সংসাররূপ অগ্নি-জ্বালাময় পিঞ্জরের দরজা খুলিয়া দিতে চাহি না। আমি তালার উপর তালা লাগাইয়া নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ঐ আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই। উষ্ট্রের কণ্টক-গুলা ভক্ষণের গায় মোহাক্ষ জীব আমি মায়ার মোহ-মদিরায় মত্ত হইয়া ভব-কারাগারকে চিরস্থায়ী আবাস বলিয়া মনে করিতেছি। সাধু-গুরু বলপূর্বক ঐ আবাস ভাঙ্গিয়া দিয়া কৃপা করিতে চাহিলে, প্রায়ই আমি তাহা গ্রহণে

অনিচ্ছুক হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। তিনি আমাকে এই মুহূর্তে কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য অধিকারী করিয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি সে অধিকার লাভ উপেক্ষা করিয়া সংসারে মায়াব দাসত্ব করিতেই অধিক উৎসাহী। কেবল কৃপা চাহি বলিয়া আমি মুখে বলিয়া থাকি—কিন্তু ঐ কৃপা চাওয়া ভাণমাত্র। সংসারদাবদ্ধ ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া অসহ জালা-যন্ত্রণায় মধ্যো মধ্যো আমি কৃপা চাহিবার ভাণ করি। কিন্তু কৃপা স্বয়ং অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলেও উহা এড়াইবার জন্ম বলিয়া থাকি—একটু অপেক্ষা করুন, হাতে অনেক কাজ, সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি, পেয়াদার গলা-ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত মোখিকভাবেও কৃপা চাহিবার প্রয়োজন বোধ করি না। গলাধাক্কায় যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া কৃপা চাহিয়া থাকি। সংসারে আমার জীবনে যে-সকল বিপদাপদ আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। ঐগুলি ভগবান ও ভগদত্তের নিকট আমার কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্মই উপস্থিত হয়। সংসারের অসংখ্য প্রকার দুঃখ-দৈন্য, ঘাত-প্রতিঘাতরূপ পেয়াদার গলাধাক্কায় জর্জরিত না হইলে আমার গায় সংসার-মদাক্ক নরপশু কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুগত হইত না। আমার এমন দুর্দৈব যে, উক্ত শাসনগুলি আমার প্রকৃত হিতকারী বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না; পরন্তু ঐগুলি আমার উপর ভগবানের অগ্নায়-অবিচার বলিয়া মনে করি। যদি আমি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতাম। তাই বলি—সত্যই কি আমি কৃপা চাই?

—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী

সহঃ সম্পাদক

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত নির্ণয়ে বিভিন্ন পঞ্জিকাকারগণ

শ্রীরামনবমী-ব্রত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। কারণ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ সকলেই স্মার্ত। তাঁহারা স্মার্তবিধির অনুগামী হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তথাপি তাঁহারা দিনপঞ্জিকায় গোস্বামি-মতের বিচার করিয়া ব্রত-উপবাসাদি-বিধানেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এবৎসর সমুদ্রয় পঞ্জিকাকারগণই রামনবমীর বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করেন নাই

এবং ভুলক্রমে ২রা বৈশাখের স্থলে ১লা বৈশাখ, রবিবার শ্রীরাম-নবমী ব্রতোপবাসের উল্লেখ করিয়াছেন। “গোশ্বামি-মতে পরাহে”—এই কথাটি এবার কোনও পঞ্জিকাতেই দৃষ্ট হয় না।

বর্তমান প্রবন্ধ লিখিবার কারণ

যাঁহারা স্মার্ত-বিচার না মানিয়া গোশ্বামি-বিচারই গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে প্রচার করেন, তাঁহারাও এবংসর রামনবমী-ব্রত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শনে উদাসীন রহিয়াছেন। আমি তজ্জগুই এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল সনাতন-কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ব্রত-উপবাসাদি পালনের বিধি-নিষেধাদি মূলতঃ শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থরাজেই সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুকূলে অগ্ৰাণ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও গৃহীত হইতে পারে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোশ্বামী কর্তৃক রচিত। সাধারণতঃ লোক-সমাজে ইহা ছয় গোশ্বামীর অগ্রতম শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোশ্বামি-কৃত বলিয়া প্রচার। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মূলতঃ এই গ্রন্থ শ্রীসনাতন-কৃত। শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে নানাকথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাই স্থস্থির সিদ্ধান্ত যে, গোপাল-ভট্টগোশ্বামী সনাতন গোশ্বামীর বিপুলায়তন “হরিভক্তিবিলাস” গ্রন্থকে সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলন করিয়া উহা “ভগবদ্ভক্তিবিলাস” নামে প্রচার করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্তমানে মুদ্রিত ‘হরিভক্তিবিলাস’ বা ‘ভগবদ্ভক্তিবিলাস’ শ্রীল সনাতন গোশ্বামীরই রচিত—ইহাতে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পূজ্যপাদ সনাতন গোশ্বামীর স্বকৃত উক্ত মূল স্মৃতিগ্রন্থের একটি বিস্তৃত টীকা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ঐ টীকা পূজ্যপাদ গোপালভট্ট গোশ্বামীর শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন-স্বরূপে আজ “দিগ্‌দর্শনী”-টীকা নামে প্রচারিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বর্তমান-প্রচলিত হরিভক্তিবিলাসের মূল শ্রীল সনাতন গোশ্বামীর নিজকৃত—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই হরিভক্তিবিলাস অবলম্বন করিয়া শ্রীরামনবমী-ব্রতের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি

চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। এবং মধ্যাহ্নে তিনি আবিভূত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম লইয়াই এই ব্রতের উৎপত্তি। আমরা অগস্ত্য-সংহিতায় দেখিতে পাই—

চৈত্রে মাসি নবম্যাস্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।

শ্রীরামনবমী শ্রোক্তা কোটিস্থধ্যগ্রহাধিকা ।

চৈত্রশুক্লা তু নবমী পুনর্বহুযুতা যদি ॥

তেন 'মধ্যাহ্নযোগেন' মহাপুণ্যতমা স্মৃতা । (২৮।১,৩-৪)

অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ভগবান্ হরি রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । চৈত্রমাসের শুক্লা-নবমীতে পুনর্বহুনক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে শ্রীরাম-নবমী বলা হয় । উহা কোটিস্থধ্য-গ্রহণ অপেক্ষা অধিক ফলদায়িনী হয় ; তন্মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে যদি উক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে উহা মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে ।

শ্রীরামনবমী-ব্রত পালন-অপালনের ফলাফল

পালনে, যথা—

মুমুক্শ্বোহপি হি সদা শ্রীরাম-নবমীব্রতম্ ।

ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠা দেবেন্দ্রোহপি বিশেষতঃ ॥

তস্মাৎ সৰ্ব্বাশ্বনা সৰ্ব্ব কৰ্ত্ত্বৈবং নবমীব্রতম্ ।

মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (অঃ সং ২৭।৩৬-৩৭)

অর্থাৎ যাহারা মুক্তির কামনা করে তাহারাও, অধিক কি দেবতারা পর্য্যন্ত সকলে, এমন কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও এই শ্রীরামনবমী-ব্রত পরিত্যাগ করেন না । সুতরাং সকলে সৰ্ব্বাস্তঃকরণে এই রামনবমী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ও সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ।

অপালনে, যথা—

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমী-দিনে মৰ্ত্ত্যো বিমুঢ়ধীঃ ।

উপোষণং ন কুরুতে কুস্তীপাকেষু পচ্যতে ॥ (অঃ সং ২৭।৯)

যন্ত রামনবম্যাস্তু ভুঙ্ক্তে মোহাদ্বিমুঢ়ধীঃ ।

কুস্তীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ (অঃ সং ২৮।৮)

যে মুঢ়বুদ্ধি মনুষ্য শ্রীরামনবমী দিন প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে উপবাস করে না, সে কুস্তীপাক নরকে পচিয়া মরে । মুঢ়বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ যদি রামনবমীতে ভোজন করে, সে ঘোর কুস্তীপাক নরকে পড়িবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

উক্ত শ্লোক চতুষ্ঠয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবমাত্রেই রাম-নবমী ব্রত পালন করা কর্তব্য, অকরণে প্রত্যাঘাত ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রীরামনবমী-ব্রত-বিধি হরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে মধ্যাহ্নযোগে পুনর্কল্পনক্ষত্রযুক্ত হইলে এই দিন মহাপুণ্যতম হইয়া থাকে। হরিভক্তিবিলাস আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—

শঙ্খপাত্রাদিনার্চ্যাক্ষু কুর্ঘ্যাদযামেষতন্ত্রিতঃ ।

যামে দ্বিতীয়ে সম্পূজ্য মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪৯৭)

শঙ্খ, পাত্র ও আসন—প্রতি যামে এই সকলের অবশ্য পূজা করিবে। দ্বিতীয় যামে এই প্রকার পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে জন্ম চিন্তা করিবে।

হরিভক্তিবিলাসে প্রত্যেক যামেই কিরূপে ব্রত পালন করিতে হইবে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। এবং ব্রতের যাবতীয় কর্তব্যও বিস্তারিতভাবে চতুর্দশ বিলাসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ব্রত-পালনেচ্ছু বৈষ্ণববৃন্দ, পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসের ১৪শ বিলাসের শ্রীরামনবমী-প্রদঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

বিদ্ধা ও অবিদ্ধা নবমীর বিধি ও নিষেধ

নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ।

উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্ ॥

(হরিভক্তিবিলাস-ধৃত অঃ সংহিতা ২৮।১৪)

অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া নবমীতে উপবাস এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“ননু বৈষ্ণবৈবিদ্ধা সর্বত্র বর্জ্যেতি পূর্বে নিশ্চিতং । অত্রাপি তথৈবোক্তং নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যেতি । তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাং শুদ্ধত্বে কিং কর্তব্যং তত্রাহ উপোষণমিতি ।”

অর্থাৎ সর্বত্র বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বিদ্ধা বর্জ্যনীয়—ইহা পূর্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। এস্থলেও পূর্বের গায় অষ্টমীবিদ্ধা নবমী সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নবমী ক্ষয় হইলে তিথি হ্রাসক্রমে পরবর্তী একাদশী তিথি শুদ্ধ হইলে কি কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে মূলে বলিতেছেন, নবমীতে উপবাস করিয়া দশমীতেই পারণ করিবে। এস্থলে দশমীতে পারণের প্রতি জোর দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর উপবাস অষ্টমীবিদ্ধা হইলেও সেই বিদ্ধা দিবসেই বৈষ্ণব-

গণেরও উপবাস কর্তব্য। কিন্তু একাদশীর উপবাসে বাধা না ঘটিলে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কোনপ্রকারেই উপবাস হইবে না। তজ্জগু হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

দশম্যাং পারণায়ান্ত নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।

বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্য বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্ ॥

(ইঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯১)

অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর ক্ষয় উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণও নিঃসংশয়-চিত্তে উপবাস-বিষয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী গ্রহণ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকের ‘দিগ্‌দর্শনী’ টীকায় লিখিত হইয়াছে—

নিশ্চয়াদশম্যামেবেত্যেবকারতঃ। অণ্ডাখ্যাপবাসদ্বয়-প্রসঙ্গাদিতি দিক্।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, দশমীতিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নাচেৎ একাদশী শুদ্ধা হইলে সেইদিন একাদশীর উপবাসের ব্যাঘাত ঘটয়া যায়। অর্থাৎ নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইলে পরদিবস দশমীতে উপবাস করিলে ‘দশমীতেই পারণ করিতে হইবে’—এই বাক্য সংরক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত একাদশীতে পারণ আসিয়া পড়ে। তজ্জগু দশমীতে পারণ বজায় রাখিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস কর্তব্য। দশমীতে পারণ বজায় রাখিতে গিয়া এবং শুদ্ধা একাদশীর উপবাস অবশ্য পালনীয় বিধায় আবশ্যক বোধে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে রামনবমীর উপবাস করা চলিবে। কিন্তু একাদশীর উপবাসের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোন ক্রমেই অষ্টমীবিদ্ধা নবমীর উপবাস হইবে না।

বর্তমান ১৩৫৮ সালের শ্রীরামনবমীর বিচার

এই বৎসর ‘বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা’ ও “সুসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা” ব্যতীত সমস্ত পঞ্জিকাকারগণই বিদ্ধা বিচার না করিয়া ১লা বৈশাখই রামনবমী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উক্ত পঞ্জিকাদ্বয়ই ২রা বৈশাখ রামনবমীর ব্রত-ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও এই পঞ্জিকাদ্বয়ের বিচার গোষ্ঠ্যামি-বিচারের অন্তর্কূল নহে, তথাপি যে-কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের নিদ্ধারিত ব্রতের দিবস ২রা বৈশাখ হওয়ায় জনসাধারণের ব্রত-পালনের দিন ঠিকই নিদ্ধারিত হইয়াছে। মাননীয় শ্রীমৎ শ্রমণ মহারাজের সঙ্কলিত নবদ্বীপ-পঞ্জিকায়ও আমরা এসম্বন্ধে বিচার-বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের বিচারে ১লা বৈশাখ তারিখের নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইয়াছে। সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া পরদিবস ২রা বৈশাখে রামনবমীর উপবাস কর্তব্য।

ত্রিবিধ বেধ-বিচার

শাস্ত্রে তিন প্রকার বেধের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—কপাল-বেধ, অরুণোদয়-বেধ ও সূর্যোদয়-বেধ। কপাল-বেধ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ পালন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্তর্গত গোস্বামিগণ কপাল-বেধ যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসহ নহে বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং কর্মজড় স্মার্তগণও কপাল-বেধ আদৌ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং কপাল-বেধ সম্বন্ধে আমরা কোনও বিচার এস্থলে প্রদর্শন করিব না। অরুণোদয়-বেধ ও সূর্যোদয়-বেধ, কোন্ স্থলে কোন্টী গ্রহণীয় অথবা সর্বত্রই একই প্রকার বেধ স্বীকার্য, তাহা লইয়াই এক্ষণে বিচার কর্তব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রত ও পর্কাদি সম্বন্ধে হরিভক্তি-বিলাস যেরূপ বিচার করিয়াছেন, আমাদের তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র রামনবমীর বিচারই প্রদর্শন করিব। অগ্ৰান্ত ব্রত-পর্কের বিচার আমরা পরবর্তীকালে “জন্মাষ্টমী-ব্রতের বিশুদ্ধ বিচার”-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা জানাইতেছি যে, গত বৎসরের গ্রায় এবৎসরও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের বিচার এই যে, ৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী হইবে না। ৮ই ভাদ্র শনিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস হইবে এবং পরদিবস নন্দোৎসব এবং পূর্বাঙ্ক ৯।৩১ মিঃ মধ্যে পারণ।

একাদশী ও জয়ন্তীর সংজ্ঞা একই

হরিভক্তিবিলাস একাদশী-ব্রতের অরুণোদয়-বিদ্ধা প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া, বৈষ্ণববর্গের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহের বিধান জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে একাদশীকে ‘হরিবাসরং’, ‘হরিদিনং’ বা ‘মদ্দিনং’ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সুতরাং হরিবাসর, কৃষ্ণবাসর, হরিদিন, মদ্দিন প্রভৃতি সংজ্ঞাসমূহ একাদশী ও বিষ্ণু-জয়ন্তীকেও লক্ষ্য করিতেছে। যদিও সাধারণতঃ হরিবাসর বলিতে একাদশীকেই লক্ষ্য করা হয়, তথাপি জয়ন্তী-দিবসকে ‘হরিবাসর’ বা ‘হরিদিন’ প্রভৃতি বলিলে কোনক্রমে ভুল হইবে না। অধিকন্তু ‘বাসর’ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া হরিভক্তিবিলাসের টীকাকার ‘একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি’ এইরূপ লিখিয়াছেন। আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রদর্শন করিব।

জয়ন্তী-বাসরে অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে ।

পাপমূলং তদা জ্যৈষ্মেকাদস্ত্যপবাসিনামিতি ॥

বিদ্বোপবাস-দোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা ।

জ্যৈষ্মন্তেহত্রাপি বিদ্বায়া লক্ষণশ্রামুসারতঃ ॥

এবং জ্যৈষ্মানি বাক্যানি বিদ্ধ-ব্রতপরাণি তু ।

অবৈষ্ণবশ্রাণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা ॥

ইথঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতাত্মপি ন বৈষ্ণবৈঃ ।

বিদ্বেষহঃস্ব কার্য্যাণি তাদৃগ্ দোষগণাশ্রয়াৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৪০-১৪৩)

অর্থাৎ অরুণোদয়কালে যদি দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাসী ব্যক্তিদিগের উপবাস পাপের মূল হইয়া থাকে। সাধারণভাবে যে-সকল বিদ্ধ-উপবাসাদির দোষ লিখিত হইয়াছে, পূর্বলিখিত লক্ষণ অনুসারে এখানে সেই সমস্ত দোষ বুঝিতে হইবে। বিদ্ধা উপবাসের প্রতি যে-সকল বচন আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর অথবা শুক্রমায়ার রচিত বলিয়া জানিতে হইবে। এই প্রকার বৈষ্ণব-ব্রতমাত্রেই বিদ্ধা দিন পরিত্যাগ করিবেন। যথা—বৈষ্ণবগণ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির (রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দশী প্রভৃতি) ব্রতসকলও বিদ্ধ দিনে করিবেন না। করিলে পূর্বলিখিত দোষসমূহ উপস্থিত হইবে। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী-ব্রতসমূহে একাদশী-তিথির অরুণোদয়-বিদ্ধার প্রসঙ্গ অবশ্যই গ্রহণীয় দৃষ্ট হইতেছে। উল্লিখিত “ইথঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি” শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার এবিষয়ে বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

প্রসঙ্গাঐষ্মবব্রতেষু সর্বেষ্বপি সবেধ-দিনানীথং পরিত্যাজ্যানীত্যাदिशन्
लिखति इथञ्चेति । नैवोपोष्यः वैष्णवैस्त्वित्यादि लिखति प्रकारेण । आदि-
शब्देन रामनवमी-नृसिंहचतुर्दश्यादि तद्दशां विद्वेकাদशीव्रতোक्त-
सदृशानां दोषाणां गणश्रयात् ।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, জন্মাষ্টম্যাতির মধ্যে ‘আদি’-শব্দের দ্বারা রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দশী প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং জন্মাষ্টমীতে যে রূপ বিচার গৃহীত হইবে, অত্যাগ জয়ন্তীসহ রামনবমীতেও তাহাই গৃহীত হইবে। মূল শ্লোকের ‘তাদৃগ্ দোষগণাশ্রয়াৎ’-বাক্যে ‘তাদৃক্’-শব্দের অর্থে টীকাকার

‘একাদশীব্রতোক্ত সদৃশ’—এরূপ কথাই লিখিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস একাদশীর প্রসঙ্গের বিদ্বা-বিচার করিতে গিয়া অরুণোদয় বিদ্ব-ব্যতীত অণ্ড কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এস্থলে ‘জন্মাষ্টম্যাদি’ ১৪৩ শ্লোকের বিচার করিতে গিয়া সূর্যোদয়-বিদ্বার কথা কোনও প্রকারে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, যেহেতু দ্বাদশ বিলাস মধ্যে সূর্যোদয় বিদ্বার কোন প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব জন্মাষ্টমী, রামনবমী, বৃসিংহচতুর্দশী প্রভৃতি জয়ন্তী তিথিসমূহের বিদ্বা-বিচার-প্রসঙ্গে অরুণোদয়-বিদ্বা-বিচারই সঙ্গত। আমরা হরিভক্তিবিলাসের আশু বিচার করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, হরিবাসর ও জয়ন্তী সম্বন্ধে অরুণোদয়-বিদ্বা-বিচার গ্রহণ করাই অসঙ্গত।

শ্রীরাম-নবমী সম্বন্ধে ‘তিথিতত্ত্ব’ ও ‘স্মৃতি-চিন্তামণি’ গ্রন্থদ্বয়ের বিচার

এতদ্ব্যতীত “তিথি-তত্ত্বম্” ও “স্মৃতি-চিন্তামণি” গ্রন্থদ্বয়েও উক্ত ব্রত সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের কিরূপ বিচার গ্রহণীয়, তৎসম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের উক্ত সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের প্রমাণ উদ্ধার করিলাম। তন্মধ্যে তিথি-তত্ত্বকার উল্লিখিত অগস্ত্য-সংহিতার অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও ঊনবিংশ শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ ‘চৈত্রে শুদ্ধা তু নবমী’ (২৮।৪) ইত্যাদি ও “নবমী চাষ্টমীবিদ্বা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ” (২৮।১২) প্রভৃতি প্রমাণ-বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহার টীকায় রাম-নবমীতে বৈষ্ণব-বিচার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

“এতদ্বচনদ্বয়ং কালমাধবীয়েহপি কিন্তু মহাপুণ্যেত্যত্র মহাকলেতি পাঠঃ। অত্র শুদ্ধেতি শ্রবণাৎ সর্বত্র শুদ্ধায়ামৃক্ষাদেবো, ন বিক্রায়ামিতি। অতএব ষ্টমীবিদ্বা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্যেতি মাধবাচার্যঃ। নৈব তাদৃশাব ন তু বিদ্বা। যদা তু পরদিনে একাদশ্যাং দশমীপারণযোগ্যা তদা দশমীযুক্তা নবম্যুপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণু-পরায়ণৈরিতিশ্রবণাৎ।”

অর্থাৎ—এই বচনদ্বয়ে কালমাধবীয়ে ‘মহাপুণ্য’ স্থলে “মহাফল”—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। এস্থলে অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে ‘শুদ্ধা’ এই শব্দ শ্রবণহেতু সর্বত্র শুদ্ধা নবমীতেই পুনর্বিষ্ণু-নক্ষত্রের আদর বুঝিতে হইবে, কিন্তু বিক্রয় নহে। অতএব ষ্টমীবিদ্বা নবমী উক্ত নক্ষত্রযুক্তা হইলেও তাহাতে উপবাস হইবে না—ইহাই মাধবাচার্যের মত। সুতরাং রাম-নবমী তিথি শুদ্ধাই পালনীয়, বিদ্বা নহে। যদি

পরদিনে একাদশী-তিথিতে পারণযোগ্য দশমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে দশমীযুক্তা নবমীতে বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ উপবাস করিবেন—ইহাই শাস্ত্র হইতে শ্রুত হয়।

স্মৃতিচিন্তামণি-গ্রন্থেও উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদবলম্বনে নিম্নলিখিত বিচার বঙ্গানুবাদ-সহ প্রদত্ত হইয়াছে,—

“যদা নবমীয়মখণ্ডা সতী পুনর্কক্ষযুক্তা ভবতি, তদ্দিনে ব্রতম্। খণ্ডিতায়াস্তু একাদশীদিনে দশমী পারণযোগ্যা চেৎ, তদা অষ্টমীযুক্তাং বিহায় দশমীযুক্তায়াং নবম্যাং ব্রতং কর্তব্যম্।”

অর্থাৎ—যে-দিন এই নবমী অখণ্ডা (একদিনমাত্র ব্যাপিনী) হইয়া পুনর্কক্ষযুক্ত হইবে, সেইদিনে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে। নবমী খণ্ডিতা হইলে অর্থাৎ দুইদিন পাইলে, একাদশীর দিনে দশমী পারণযোগ্য কাল পাইলে অর্থাৎ পারণ করিতে পারা যায় এমন একটু দশমী পাইলে, অষ্টমীযুক্ত নবমীখণ্ড ত্যাগ করিয়া দশমীযুক্ত নবমীখণ্ডে অর্থাৎ পরদিন মুহূর্ত্তানু্যন কালব্যাপিনী নবমীখণ্ডে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে।

সুতরাং বর্তমান ১৩৫৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের নবমী অরুণোদয়বিধ্বা হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বদিবস ৩১শে চৈত্র শেষ রাত্র অরুণোদয়কালে অষ্টমী থাকায় এইদিন উপবাস হইবে না। অধিকন্তু পরদিবস নবমী অতি অল্পকালের জন্য থাকিলেও দশমী-তিথিযুক্ত হওয়ায় ২রা বৈশাখেই শ্রীশ্রীরামনবমীর উপবাস হইবে এবং তৎপরদিবস ৩রা বৈশাখ দশমী অনুমান ৫৬ মিনিটকাল ভোগ করায় উক্ত সময় মধ্যে পারণ কর্তব্য। এইরূপ বিচারে একাদশীর উপবাসে কোন বাধা জন্মিতেছে না। অধিকন্তু দশমীযুক্তা নবমীতে উপবাস করিয়া দশমী-দিনেই পারণ-বিধি সংরক্ষিত হইয়াছে।

অতএব এই বৎসর ১লা বৈশাখের পরিবর্তে (১৩৫৮ সালের) ২রা বৈশাখ সোমবার—শ্রীরামনবমীর ব্রতোপবাস হইবে। এবং তৎপরদিবস ৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতঃ ৬।১৫ মিনিট মধ্যে রামনবমীর পারণ। *

— — —

* এই প্রবন্ধ বিলম্বে প্রাপ্ত। তথাপি অতীত বৎসরের রামনবমীর ব্রত-নির্দেশে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রকট-বাসদেব
দানের ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি*

পশু চাহে লজ্জিবারে উচ্চ গিরিবর ।
বধির বাসনা করে হ'তে শ্রুতিধর ॥
অন্ধ চাহে অনুক্ষণ,
করিবারে দরশন,
বিধাতার সৃষ্ট-বস্তু সৌন্দর্যের সার ।
মো-হেন মুকের চেষ্টা জয় গাহিবার ॥
জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ১ ॥

এই সব অসম্ভব আশা ফলবতী
কবিরায়ে চাহে হায় পাগল যেমতি,
জ্ঞানহীন মূর্থ হ'য়ে,
অসম্ভব আশা ল'য়ে,
হে দয়াল মহারাজ ! আমিও তেমতি ।
বর্ণিতে মহিমা তব উচ্যত সম্প্রতি ॥
জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ২ ॥

কৃষ্ণের সংসারে রহি কায়-বাক্য-মনে ।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার কারণে ॥
হে চৈতন্য-নিজজন !
ব্যস্ত তুমি অনুক্ষণ ;

* গত ১৩৫৭ সালের ১২ই ফাল্গুন, শনিবার মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে
আচার্য্যবরের জন্ম-দিবসে এই পদ্য লিখিত হয় এবং ১৪ই ফাল্গুন সোমবার,
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-দিবসে অপরাহ্নে প্রকাশ্য সভায় ইহা পঠিত হয় । —প্রকাশক

গুৰ্বাদেশে দেশে-দেশে ভবনে-ভবনে
ফিরিছ ; জীবের নিত্য মঙ্গল-কারণে ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৩॥

তুমি মহারাজ ! গৌরভক্ত-শিরোমণি ।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম মহাধনে ধনী ॥

মহামন্ত্র হরিনাম,

জপিতেছ অবিরাম,

অনিত্য সংসার ইহা গুরু মুখে শুনি’ ।

সবারে দিতেছ শিক্ষা এই মহাবাণী ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৪॥

প্রভুপাদ পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিয়া ।

উদ্ধারিছ পাপী-তাপী সংসার ত্যজিয়া ॥

সংকীৰ্ত্তনে হরিনাম,

নিত্য তব শ্রেষ্ঠ কাম,

অহর্নিশ মত্ত কৃষ্ণ-নামামৃত পানে ।

রতচিত গৌরলীলা-রস-আস্বাদনে ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৫॥

অমি মূঢ় দীন-হীন অতি অভাজন ।

মায়ার দাসত্ব করি’ কাটাই জীবন ॥

ভাবি নাই মোর পাছে,

অনন্ত রৌরব আছে,

ভাবি নাই নিরদয় যমদূতগণ ।

রৌরবে ডুবায়ে মোরে করিবে শাসন ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ॥”
বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥৬॥

নাহি জ্ঞান ভাব ভাষা বিচার বৈভব ।

মহিমা তোমার আমি কেমনে বর্ণিব ॥

তব পদরজ জল,

শুদ্ধভক্তি দিতে বল ;

পরম বৈষ্ণব তুমি সদা সদাচারী ।
 তোমার কৃপায় পাপী তরে ভববারি ॥
 জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
 বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ৭ ॥

কলিহত জীবে তব কত যে করুণা ।
 কোটী-মুখে কভু তাহা না হয় বর্ণনা ॥
 দিয়ে সুসিদ্ধান্ত-অসি,
 কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নাশি,
 বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা তুমি করিলে স্থাপন ।
 তব সম মহাজন কে আছে এমন ॥
 জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
 বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ৮ ॥

হে শ্রীগুরু-অন্তরঙ্গ ! গৌর-নিজজন,
 করুণা-সলিল শিরে করিয়া বর্ষণ,
 ক্ষমি' মোর অপরাধ,
 ভজনের যত বাধ,
 দূর করি' দেহ শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজন ।
 তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ॥
 জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
 বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ৯ ॥

জয় মহারাজ পতিত-পাবন ।
 তব কৃপায় মিলে গৌর-প্রেমধন ॥
 কৃষ্ণনাম সুধা-পান
 করি' ওগো মতিমান,
 মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণকার্য্যে সদা ব্রতী হ'য়ে ।
 ফিরিতেছ প্রতি ঘরে নাম বিতরিয়া ॥
 জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”
 বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্য্য ॥ ১০ ॥

তব পদে যেই জন আশ্রয় গ্রহণ
 করিয়াছে নিষ্কপটে, তবে সেইজন
 কোনকালে নাহি পায় সংসার-বেদন ।
 তাহার নিকটে কভু না যায় শমন ॥

ভবান্নবে মহারাজ ! তুমি কর্ণধার ।

অগণিত নতি মম চরণে তোমার ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”

বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্ষ্য ॥১১॥

তোমার চাহনী সর্ব তম-তাপহারী ।

মুগ্ধ সব হেরি তব শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী ॥

তোমার মহিমা-গাথা শ্রদ্ধায় যে-জন ।

করয়ে শ্রবণ আর করে সংকীৰ্ত্তন ॥

নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশচীনন্দন ।

নিত্যকাল তার প্রতি মহা প্রীত র'ন ॥

জয় “ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব পরিব্রাজকাচার্য্য ।”

বন্দি তোমার চরণ-যুগল তুমি ত শ্রীগৌর-সেবকবর্ষ্য ॥১২॥

ভবদীয় শ্রীচরণ-রেণুপ্রার্থী

—শ্রীহরিদাস রায়

ভগলী-মহসীন-কলেজের জনৈক ছাত্র

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

মাননীয় শ্রীযুত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় গত ১৩৫৭ সালের ১৭ই পৌষ তারিখের একখানি পত্রে বসিরহাট মহকুমার তৃতীয় মুন্সেফ মাননীয় শ্রীযুত জগদীশ্ব নাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের সহিত আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বিচার অপেক্ষা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রখানি শ্রীগোড়ীয় পত্রিকার বর্তমান ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ঐ পত্রে আমাদের প্রকাশিত বক্তৃতার এক অংশ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—“বিশ্ববাসী অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি’ বলিয়া Challenge থাকায় টাটানগরস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক মহাশয় (শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক নং ২৩৩) কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অত্রস্থ শিক্ষিত সমাজকে ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছেন।” তিনি এই পত্রের শেষে লিখিয়াছেন—“আমাদের এই

প্রতিবাদ আপনার নিকট পঁছিয়াছে কিনা, জানিবার আগ্রহে রহিলাম।
প্রার্থনা, প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া অমুগ্ধীত করিবেন।”

উক্ত পত্রের আদি এবং অন্ত্য অংশদ্বয় যাহা আমি পাঠকবর্গের নিকট উল্লেখ
করিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে পত্র-লেখক মহোদয়ের মনোগত ভাব
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও তাঁহার বক্তব্য বিষয় Challenge করিয়া
লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে
না বলিলেও আমি উহা বিদ্বৎসমাজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিক
আমার ২৪।১।৫১ তাংএর পত্রেও (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)
আমি তাঁহার পত্র প্রকাশ করিব বলিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছি। তিনি সেই
পত্রের আজও কোন উত্তর দেন নাই। তাহাতে বুঝিলাম—“মৌনং সম্মতি-
লক্ষণম্” অর্থাৎ তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে
অমুমোদন করিয়াছেন।

বর্তমান-ধর্ম-জগতের চিন্তাশ্রোত লইয়া যেরূপ গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে,
তাহা হইতে নিরপেক্ষ চিন্তাশ্রোত খুঁজিয়া পাওয়া অতীব কঠিন। সুতরাং
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” বিভিন্ন মতবাদ-
সমূহের নিরপেক্ষ সূত্রে আলোচনা করিয়া সর্বোত্তম বিচার জগতের নিকট
উপস্থিত করিবেন। ইহাতে বিচার, যুক্তি লইয়াই আলোচনা করা সম্ভব;
কিন্তু কোন বিচার উত্থাপন করিতে হইলে উক্ত বিচার কাহার, কে ঐ যুক্তি
প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্বতঃই উল্লিখিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে
নামের উল্লেখ না করিয়া কখনও প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব।
বিশেষতঃ কাহারও কাহারও কোন বাক্তি বিশেষের বিচার, যুক্তির প্রতি যথা
ও অযথা শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তজ্জগৎ তাঁহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আঘাত
লাগিলেও, কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া সমালোচকের ও সমালোচনার
উদ্দেশ্য নহে। কোন সিদ্ধান্তের তারতম্যমূলক বিচার করিতে গেলেই, কোন
সিদ্ধান্ত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, কোন্টার শ্রেষ্ঠত্ব অমুভূত হইতেছে এবং
অপরটার হেয়ত্ব বা অসারত্ব প্রমাণিত হইতেছে প্রভৃতি বলিলে স্তুতি বা কটুক্তি
করা হইল—এরূপ বিচার সম্ভব নহে। আচার্য্য শ্রীল শঙ্কর বিচার-স্থলে নিজ-
মতের স্তুতি করিয়া পরমত সম্বন্ধে তথাকথিত কটুক্তি হইতে অদৌ নিষ্কৃতি
— তিনি পরমতকে মতিচ্ছন্ন পাগলের উক্তি বলিয়া তাঁহার ‘শরীরক-

অপমানিত হওয়ায়, বিজেতাগণের প্রতি অস্ত্র-চালনার দ্বারা তাহাদের ধ্বংস-সাধন করিয়া স্বমত স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই, কটুক্তি ত' দূরের কথা । আমরা এই সম্পর্কে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে ইহার প্রমাণসমূহ মাননীয় সত্যাবাবু ও পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব । অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন সকলেই তাঁহার আদেশে “কায়মনোবাক্যে প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দিবে”—এই বাক্য সর্বতোভাবে পালন করিয়া থাকেন ।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব

—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের
বক্তৃতার চূষক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ২য় দিবসে ঋতুদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক স্বামিজী-মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্তবশে বক্তৃতামুখে সমবেত পরিক্রমাকারী যাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—অন্ধ যেরূপ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শনে অসমর্থ, মুক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা যেরূপ শ্রুতিমধুর মনোজ্ঞ বাক্যাবলা বা সুললিত গীতি প্রভৃতি আশা করিতে পারি না, তদ্রূপ আমার গ্রাম সর্ববিষয়ে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও আপনাদের গ্রাম সজ্জনগণকে কিছু হরিকথা পরিবেশন করিয়া পরিতুষ্ট করিতে সম্পূর্ণ অপারক । “ভগবন্নিজজনের কৃপা হইলে মুকও বাচলতা প্রাপ্ত হয় এবং পশুও দুর্গম গিরি-লজ্জনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে”—শাস্ত্র ও মহাজনগণের এই বাণীই আমাদের একমাত্র সঞ্চল ।

গতকল্য হইতে আমাদের পরিক্রমার শুভ আরম্ভ হইয়াছে এবং আপনার পূজ্যপাদ কেশব মহারাজের আনুগত্যে গতকল্য স্মৃষ্টভাবে পরিক্রমা সনাপন করিয়াছেন । উপযুক্ত পরিচালক অভাবে একান্ত আশ্রিত তদধীন ব্যক্তিগণে যেরূপ দুর্দশা উপস্থিত হয়, রণক্ষেত্রে সুদক্ষ সেনাপতির অভাবে হতভাগ সৈন্যগণ যেরূপ নিকুপায় অবস্থা লাভ করে, অতঃ মহারাজ উপস্থিত না থাকা আমরাও নিজদিগকে তদ্রূপ নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ করিতেছি । পিতা যেরূপ পাত্রের ভারী অমঙ্গলের আশা করিয়া সর্বদা চিন্তিত হন ও তাহার মঙ্গল কামনা

করেন, মহারাজ এখানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও নবদ্বীপ মঠে থাকিয়াই তিনি আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন আছেন।

বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু; তাঁহারা নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও অযাচিত-ভাবে জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। “মহাস্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ-কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর ॥” ভগবন্নিজজন শ্রীল গুরুদেবের করুণা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্যপ না করিয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে পদার্পণপূর্ব্বক আচার ও প্রচারমুখে হরিকীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছেন। বিভিন্ন সময়ে পরিক্রমা ও উৎসবদির অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে পারমার্থিক কল্যাণ-লাভে আহ্বান জানাইতেছেন। জীবের মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন ও সেবা-সৌষ্ঠব শিক্ষা দিবার জন্ত তাঁহারা নব নব উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করেন, কতপ্রকার পরিকল্পনা, কতপ্রকারই না যুক্তি অবিকার করেন। পরিক্রমা ও জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট—মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে মহাজনগণের ধামমাহাত্ম্য-সূচক দুস্ত্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সংশোধিত শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া, উৎসবদির সময়ে অসংখ্য পত্রাদির আদান প্রদান ও কত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কতভাবেই না তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মঠ-মন্দির, সেবকথণ্ড নির্মাণ, নলকূপ খনন, তাঁবু ইত্যাদি অশ্রয়ের ব্যবস্থা, সভা-সমিতির জন্ত আসন ও চন্দ্রাতপাদি সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় জড় বিজ্ঞানের উন্নতিই তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্বক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সাধু-মহাজনগণ নিজের জন্ত কিছুই করেন না, জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদিগকে যে-কোন উপায়ে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া সেবা-সুযোগ দান করিবার নিমিত্তই তাঁহাদের এই শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা ও বিবিধ উৎসবাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন।

প্রতি বৎসরই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান করা হয় এবং আপনারাও তাহাতে যোগদান করিবার জন্ত দেশ-বিদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুব-নির্ধিশেষে অসংখ্য নরনারী কত পথকষ্ট সহ্য করিয়া, কত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন। শ্রীধামে আসিয়াও কোথায় থাকিব, কি খাইব, নিজের ইঞ্জিয়-তর্পণের কোনও ক্রটি না হয়, স্বাস্থ্য খারাপ না হয়, সঙ্গের আত্মীয়-স্বজনের থাকা-খাওয়ার কোন কষ্ট না হয়—এইরূপ অবাস্তুর চিন্তাতেই ব্যস্ত ও বিভোর হইলে শ্রীধামে আগমনের সূচ ফল লাভ

হইবে না। ভগবদ্ দর্শন ও সজ্জন-সেবা-লালসায় যাহার হৃদয় আদৌ ব্যাকুল হয় নাই, শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদানের ছলনায় “রথ দেখা ও কলা বেচা” গ্রায় অবলম্বন করিয়া তথাকার স্বাস্থ্য কিরূপ, বাজার দর কিরূপ চলিতেছে, ও গৃহে শিশুগণের নিমিত্ত মিঠাই-মণ্ডা ও খেলনা সংগ্রহ ইত্যাদি চিন্তায় যিনি সর্বদা ভরপুর, তাঁহার শ্রীধামে আগমন হয় নাই বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে বহু ব্যক্তিই ত’ বাসের ও যাতায়াতের অভিনয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি অর্জিত হইতে দেখা যায় না, তাঁহারা ধামে বসিয়াও কত অপরাধ আবাহন করিয়া থাকেন; ইহার কারণ কি? শুদ্ধভক্ত-সঙ্কেতের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। স্মৃষ্টভাবে শ্রীধাম দর্শনে ইচ্ছা থাকিলে—প্রকৃত পরিক্রমায় যোগদান করিতে হইলে হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা, প্রবল আবেগ ও ভক্তিভাব প্রয়োজন। এইরূপ না হইলে আমরা কখনই ধাম-দর্শনে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইব না।

“ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা না হইলে কখনই ধাম-দর্শন সম্ভব নয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া যখন তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবেন, তখনই উহা উপলব্ধির বিষয় হইবে।—

“কলিঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহ দূর।

অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাইল আনি’, গোরা বড় দয়াল ঠাকুর ॥”

চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের গ্রায় কলিহত জীবের একমাত্র গতি। স্মৃতির গৌর ও গৌরভক্তগণের করুণা ব্যতীত আমাদের ধাম-দর্শন হইবে না। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

“গৌর আমার, যেসব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।

যে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

গৌরনিজজন জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভুবন-মঙ্গলকর যে-সকল ভক্তি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্তন তাঁহার অগ্রতম। বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিশ্রোতের পুনঃ প্রবর্তনকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহরীষ্টসমূহের মধ্যে ইহা একটী। শ্রীল ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদকে এই সেবা কার্যের ভার প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—

“শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা যতশীঘ্র পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।” ঠাকুরের এই মনোহরীষ্ট প্রচারের জন্ত শ্রীল সরস্বতী প্রভু প্রবল বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন ও

প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিরোধের মধ্যেও, বর্তমান সময় হইতে অন্যান ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্তন করতঃ দেহ-গেহাসক্ত আমাদিগকে গৃহানুকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর ও তৎকামের সেবার নিযুক্ত করিবার অভূতপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অমুষ্ঠানের দ্বারা তিনি স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নিধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলকেই সাধুসঙ্গে যুগপৎ নবধাভক্তি যাজনান্তে জীবন ধন্য করিবার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত শ্রীধাম-পরিক্রমা ও উৎসবাদি প্রভৃতি জীব-মঙ্গলকর এইসকল অমুষ্ঠানকে, নির্জন-ভজনে অধিকতর উৎসাহী কেহ কেহ আজকাল ‘কন্মাজ’ বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অমুগত সেবকবৃন্দকে দেশ বিদেশে পাঠাইয়া গৌর ও গৌরধাম-মাহাত্ম্য কীর্তনমুখে আনুকূল্য সংগ্রহপূর্বক শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজনোৎসবে যোগদানের জন্ত প্রতিবৎসর যে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা কি কেবল আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইচ্ছন সরবরাহ করিবার জন্ত?—না, তাঁহার আর কিছু মহদুদ্দেশ্য ছিল? আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানই শ্রীগুরুপাদপদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সে উদ্দেশ্য যাহারা অবধারণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই উক্তরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তবে বর্তমানে তাঁহার ক্রমশঃ নিজ নিজ ভুল-ভ্রান্তি বৃদ্ধিতে পারিয়া উক্ত অমুষ্ঠানাদির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিক্রমা ও উৎসবাদির অমুষ্ঠান ইত্যাদি—সকলে মিলিত হইয়া ভগবৎকথা আলোচনা ও সেবাসুযোগ লাভ করিবার অপূর্ব ব্যবস্থা এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহীষ্ট প্রচার ও ইহা দ্বারাই শ্রীমন্নহা-প্রভুর নির্দিষ্ট আচার-প্রচার সম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—“বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।” গৌরজনের এই বাণীর মধ্যে আমাদের গ্রায় অত্যন্ত দেহ-গেহাসক্ত জীবের প্রতিও বিশেষ করুণা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করা একান্ত কর্তব্য। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন প্রতিবৎসর নীলাচলে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহারা

মহাপ্রভুর সেবার জন্ত কত কত উপায়ন-হস্তে উপস্থিত হইতেন। দরিদ্রই হউন আর ধনীই হউন, গৃহী হউন আর ত্যাগীই হউন, সকলেই তাঁহাদের যথাসর্বস্ব শ্রীগৌরচরণে সমর্পণ করিবার জন্ত লইয়া যাইতেন। স্মরণ্য “অন্ন সেবা বহু করি’ মানে” প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরজন্মর, তন্নিজজন ও তদাশ্রিত জনগণের ভরসাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—“প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা ভগবৎসেবা আচরণই ইহজগতে দেহধারী জীবগণের জন্মের সার্থকতা।” স্মরণ্য আপনারা নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য ভগবৎসেবার নিয়োগ করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। আপনারা সংসারে নানারূপ ক্ষতি-স্বীকার করিয়া ও পথে বিবিধ ক্লেশ সহ করিয়াও পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় আপনাদের সদিচ্ছা ও মহদুদ্দেশ্য সফল হউক—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-চরণে প্রার্থনা।

—প্রকাশক

পরলোকে হনুমান্ খুঁটিয়াজী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীক্ষেত্রবাসী পরমভাগবত শ্রীহনুমান্ খুঁটিয়া জমিদার পাণ্ডা মহোদয় গত ৬ই চৈত্র ১৩৫৭, মঙ্গলবার রাত্র ১০ ঘটিকার সময় শুকা ত্রয়োদশী তিথি:ক অবলম্বন করিয়া শ্রীপুরীধামস্থ তাঁহার নিজগৃহে কাছারী-বাড়ীতে সজ্জানে তাঁহার কর্মচারী ও সূত্রংগগুলীর সমক্ষে ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। আমরা তাঁহার অবর্তমানে শ্রীশ্রী প্রভুপাদের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে বন্ধুহীন হইলাম বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহার গ্রাম সজ্জন, নিরভিমান, অমায়িক তীর্থপ্রদর্শক অতি বিরল। সাধারণ পাণ্ডাদের গ্রাম তিনি কখনও অর্থগ্রাহী ছিলেন না। পরন্তু যাত্রিসকল তাঁহার আশ্রয়ে গেলে পুরীধামে পরম প্রীতির সহিত নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিত। পরমহংস-কুল-চূড়ামণি জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্তৃসিকান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুঁটিয়াজীর সাধু-হৃদয় ও উদারতার পরিচয় পাইয়া কৃশাপূর্বক তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রবাসীর সাহায্যকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খুঁটিয়াজীর বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমিতির আশ্রিত ও অনুমোদিত সেবকগণের তীর্থ-প্রদর্শকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। খুঁটিয়াজীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারা যাইতেছে না। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

১৩৫২ সালে কার্তিক-ব্রত উপলক্ষে শ্রীক্ষত্ৰমণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তখন তিনি সমিতির সেবাকার্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় ৫০০ শত যাত্রীকে প্রচুর পরিমাণে চতুর্বিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। গত ১৩৫৭ সালের উজ্জয়ন্তকালে শ্রীবেন্দ্র সন্নিহিত রায়েশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণদেশ পরিক্রমার সময় শ্রীপুরীধামে উপস্থিত হইলে, তিনি তখন অত্যন্ত অল্প অর্থের সহায়তায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ মধুর প্রসাদাদি প্রেরণ করিয়া সমিতির যাত্রীগণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ অর্থগ্রাহী হইয়া থাকে ; কিন্তু তিনি অর্থগ্রহণের পরিবর্তে সমিতির সভ্য ও যাত্রীগণকে নিজব্যয়ে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করিয়া সমিতির দত্তবাদার্স হইয়াছিলেন। সমিতির এই প্রকার পরিক্রমার বিপুল আয়োজনে শ্রীক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ ছিলেন। তিনি বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হইয়াও নিরতিমানে তীর্থ-যাত্রীগণের সেবা করাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীম প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল। শ্রীম প্রভুপাদের অনুগৃহীত যে-কোন শিষ্যই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে যত্ন করিয়া আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন। আমরা তাঁহার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জমিদার শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া পাণ্ডাজী তাঁহার স্থান সর্বতোভাবে অবিকার করিতে সক্ষম হইবেন। খুঁটিয়াজী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা আমরা সর্বাস্তঃকরণে বলিতে প্রস্তুত করিতেছি না।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার ও তাহার নির্যাতন

ভক্ত অশ্বিনীকুমার ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে ফরিদপুর জিলাস্থগত 'ভাদ্রা' থানার 'ছিন্দার' গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যাবধি তাহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে পাড়া-প্রতিবেশী স লেই মুগ্ধ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদ্ব্যবস্থা, সত্যপ্রিয়তা ও নির্দোষ জীবন-যাপনের প্রগাঢ় নিষ্ঠা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সামাজিক ও দেশগত আচার-ব্যবহারের মধ্যে থাকিয়া অধিক শিক্ষালাভের সুযোগ না হইলেও তাহার বিজ্ঞানভ্যাসে বিশেষ আগ্রহ ও রতি-মতি দেখা গিয়াছিল। বাল্যাবধি অশ্বিনীকুমার তাহার পিতা অপেক্ষা খুল্লতাত কৃষ্ণহৃদয়ের বিশেষ অনুগত ছিল। শ্রীযুত কৃষ্ণহৃদর দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদ সমিতির

আশ্রিত ও একনিষ্ঠ সেবক। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন দেখিয়া অশ্বিনীকুমার খুল্লতাতের আনুগত্য করাই তাহার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছিল। যদিও তাহার পিতা শ্রীরাধাবল্লভ দাস মহাশয়ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দরের চেষ্টায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাই জীবনের কর্তব্য জ্ঞান করিয়া, বর্তমান জগতের একমাত্র পারমার্থিক বস্তু প্রদর্শক শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার পিতা অপেক্ষা খুল্লতাতের জীবনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তাহাকে অত্যধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আচার-নিষ্ঠা

পিতা ও খুল্লতাতের দুঃসঙ্গ-পরিবর্জন-স্পৃহা ও সদাচার সংরক্ষণে কঠোরতাই তাঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা দেশের, সমাজের ও আত্মীয়-স্বজনের কাহারও অন্নগ্রহণ করিতেন না। তথাপি সামাজিক উৎপীড়নে দেশস্থ স্বগ্রামবাসী জনৈক কঠুরা বা কাঠুরিয়ার আহ্বান গ্রহণে বাধ্য হইয়া স্ব-স্ব ধর্মপালন বজায় রাখিয়া, তাঁহারা বালক অশ্বিনীকুমারকে আমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত তাঁহার ভবনে পাঠাইয়া দেন। অশ্বিনীকুমার আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়া তথায় সদাচার-বিরুদ্ধ কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ্য করত তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করে। অন্ন-বয়স্ক বালকের এই প্রকার বিচার দেখিয়া সাধারণ লোক স্তম্ভিত হইলেও তাহার বিচার কেহ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। বালক তদর্শনে তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। পরে সে তাহার খুল্লতাত শ্রীকৃষ্ণচন্দর দাস অধিকারী মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া বলিয়াছিল—“কাকা, আমাকে আর কোনদিন এরূপ আমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত পাঠাইবেন না।” বালকের এরূপ সংসাহস ও সদাচার-নিষ্ঠা দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন।

স্বধর্ম-নিষ্ঠা

পূর্ববঙ্গের ‘ছিলাদর’ গ্রাম মুসলমান-প্রধান স্থান। তথাকার বিদ্যালয়ে অধিকাংশই মুসলমান ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য মুসলমান বিদ্যমান। অশ্বিনীকুমার তথায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রখর মেধা দর্শন করিয়া শিক্ষকমণ্ডলী তাহাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। একদিন ঐ স্কুলের একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান শিক্ষক স্নেহবশে অশ্বিনীকুমার ও তাহার সহপাঠী আরও ২টি মুসলমান ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তরে কোন মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হন। সেই ভদ্রলোক,

ছাত্রত্রয় ও শিক্ষক সাহেবকে প্রচুর আদর যত্ন করিয়া তাঁহাদের পাচিত বহু খাদ্যদ্রব্য ভোজনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাহা গ্রহণ না করায় মুসলমান ভদ্রমহোদয় লজ্জিত হইয়া তাহাকে অগ্ৰাণু মিষ্টদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, “আমাদের এখানে আপনাদের হিন্দুদের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি সন্তুষ্ট-চিত্তে ইহা গ্রহণ করুন।” অশ্বিনীকুমার “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ”—এই শাস্ত্রবাক্য ও তাহার কাকার উপদেশ ও শিক্ষা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ বিনয়ের সহিত অগ্রাহ্য করে। উক্ত মুসলমানগণ তাহাতে অপমান বোধ করিয়া একটু উত্তেজিত হইয়া পড়েন। ইহা আজ অধিকদিনের কথা নহে—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন হইবার পর হিন্দু-সম্প্রদায় যখন মুসলমানদের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তিময় ভাব টলমল করিতেছে। অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে অসহায় অবস্থায় দ্রুতবেগে সেইস্থান হইতে এককোশ দূরবর্তী স্বগৃহে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাকা তাহার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বিনীকুমার সমস্ত ঘটনা বর্ণন করে। খুল্লতাত তখন তাহার স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাহাকে বহু সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

দেশ-ত্যাগ

দেশের সমষ্টিগত কর্ম্মফলের প্রভাবে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হইলে “স্নেহ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া”—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্য স্মরণ করিয়া অশ্বিনীকুমার তাহার পিতা ও খুল্লতাতের সহিত স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকার ফলে পশ্চিমধ্যে নানা প্রকার ‘খানা-তল্লাশী’র উৎপাত হইতে সর্বতোভাবে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহারা ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে নির্বিবাদে নির্বিঘ্নে গঙ্গাতীরে চুঁচুড়া সহরে উপস্থিত হয়। এখানে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের চেষ্ঠা ও যত্ন স্থানীয় আমড়াতলা গলিস্থ একটি ভবনে বসবাস করিয়া অশ্বিনীকুমার প্রতিনিয়ত মঠে যাতায়াত করিতে থাকে। তাহার আচার-ব্যবহার, বিনয়-নম্র প্রকৃতি, সর্বদা মৃদুমন হাস্ত ও মধুর বাক্যলাপে মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন যে, অশ্বিনীকুমার সত্যসত্যই বৈষ্ণবভাবাপন্ন। সুতরাং তাহার পক্ষে শ্রীনামাশ্রয় করিয়া এখন সর্বতোভাবে ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য।

শ্রীনামাশ্রয়

বৈষ্ণবগণের আন্তরিক ইচ্ছা অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিল। শ্রীনাম-গ্রহণের জন্য তাহার প্রবলা বাসনা দেখা দিল। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিয়া কাহাকেও তাহার হৃদয়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া অবশেষে কাকার নিকট গত আশ্বিন মাসে তাহার নাম-গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। তখন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কর্তৃপক্ষগণ কার্তিক-ব্রত উপলক্ষে রামেশ্বর, অনন্তপদ্মনাভ প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমার কার্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, তাহার কাকা কাহারও নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন নাই। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অশ্বিনীকুমার কাকার নিকট পুনরায় এই প্রস্তাব আনয়ন করিলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সর্বোত্তম দিবস শ্রীমন্নহাপ্রভুর জন্মোৎসব-দিনে সে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করেন। তদনুসারে বিগত ৯ই চৈত্র শ্রী শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশুদ্ধচিত্তে প্রচুর আগ্রহান্বিত হইয়া বহু আর্তি-সহকারে সে শ্রীনাম-গ্রহণ করে। তদবধি নিয়মিতভাবে দিবারাত্র তাহাকে শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ করিতে দেখা যাইত।

শাস্ত্রালোচনা

“জড়বিষ্ঠা যত, মায়াব বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা ॥”

মহাজনগণের এই বাক্য দৈবানুশাসনে প্রতিকলিত হইয়াছে। পার্থক্য শিক্ষা অধিক লাভ না করিয়াও অশ্বিনীকুমার গৃহ থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুমোদিত গ্রন্থসমূহ সর্বদা আলোচনা করিত। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহার নিত্য-পাঠ্য ছিল। তাহার আত্মীয়-স্বজন, প্রাতবেলী সকলকে ডাকিয়া লইয়া সে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ করিয়া শুনাইত; শ্রীপত্রিকার দুর্কোধ্য স্থল কাকার নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। কাকা তাহার যথাশক্তি সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দিতেন। বৈষ্ণব-শিক্ষাস্তর কঠিন বিষয়গুলি অশ্বিনীকুমারের বুঝিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। তীক্ষ্ণ মেধাবী যাহা গ্রহণ করিতে পারে না, অশ্বিনীকুমার শরণাগতি, সেবা-বৃত্তির দ্বারা তাহা সহজে আয়ত্ত করিয়া লইত। “নাশনায়া প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যদেবৈব বৃণতে তেন লভ্যন্তৈশ্চৈব আত্মা বিবৃণতে তন্মৎ স্বাম্ ॥”—এই শ্লোকটির অর্থ আমরা তাহার জীবনী হইতে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

নির্যাতনের ইতিহাস

ইতোমধ্যে অশ্বিনীকুমারের মাতৃবিয়োগ হয়, কিয়দিন পরে তাহার কাকীমা কৃষ্ণ-
হৃন্দরের স্ত্রীও পরলোক গমন করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, অল্প বয়সের যুবক
তাহার স্নেহময়ী মাতৃদেহের লোকান্তর গমন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিন্দুমাত্রও শোকে
অভিভূত না হইয়া অচল, অটলভাবে প্রাত্যহিক শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীনাম-ভজনে
কোনক্রমে অবহেলা করেন নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাহার কাকার নিকট সে জানায়
যে, “মঠের লোক কি আমার অন্তেষ্টিক্রিয়া করিবেন না?” উদ্বেগ—তাহারাই
যেন উহার অন্তিম-কার্য সম্পন্ন করেন। তাহার কাকা উত্তরে বলিয়াছিলেন—
“তোমার ভয় কি, মঠের লোকই তোমার সব করিবেন। তুমি কোন চিন্তা করিও
না। তবে এখন তোমার এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল কেন?”—পরে বৃষ্টিতে
পারা গেল, ইহাই তাহার নির্যাতনের ইতিহাস। মায়াকূপ-পতিত অসদাচারী
ব্যক্তিগণের সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন—ইহা যেমন অশ্বিনী-
কুমার জীবিতকালে প্রত্যক্ষ আচরণের দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল,
সেইরূপ জীবিতোত্তর-কালেও যেন তাহার স্বজনাথ্য-দম্ম্যসকল তাহাকে স্পর্শ না
করে, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তাহার কাকার নিকট সে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল।

মাতৃশ্রাদ্ধ

গত ২ই বৈশাখ, সোমবার শ্রীশ্রীমদগোপালভট্ট-গোস্বামি-রচিত ‘সংক্রিয়াসার-
দীপিকা’ সাত্তত স্মৃতি-অনুসারে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অশ্বিনীকুমার তাহার
মাতার পারলৌকিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই দিবস তাহার কাকা শ্রীযুত
কৃষ্ণহৃন্দর দাস অধিকারী মহাশয়ও তাঁহার স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন
করেন। ভক্ত অশ্বিনীকুমার সাত্তত-বিগানে তাহার মাতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন
রায় বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। তাহার বহু
মাজিক আত্মীয়-স্বজন চুঁচুড়া সহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁহাদের স্মার্ত্ত ক্রিয়া-
লাপে যোগদানের উপরোধ-অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও সে বৈষ্ণব-ব্যবহারের
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপে বিরাট বৈষ্ণবসেবার অয়োজন
হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার ‘সংক্রিয়াসার-দীপিকা’র বিধানানুসারে যাগযজ্ঞ-হোমাদি
সমাপন করিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সকল বৈষ্ণব ও আগন্তুক ভক্তমহোদয়গণকে
শেষ উৎসাহ ও প্রাণের সহিত নিজ অধিকার অনুসারে পরিবেশনাদি সেবাকার্য
করে। ইহাই যে তাহার শেষ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, তাহা কাহাকেও জানিতে না দিয়া
পরাক্র-বেলায় বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। তখন

কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, এইরূপ উৎসাহী যুবক তাহার ২ দিবস পরে যাবতীয় লোক-চক্ষুর অন্তরালে অকস্মাৎ আত্ম-গোপন করিবে।

নির্যাতন

ভগবান্ ভক্তুর ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার বিগত ১১ই বৈশাখ ১৩৫৮ বুধবার, নিশান্তে ৩।০ ঘটিকার সময় যাবতীয় ঐহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বরণ করিয়া পরলোকে গমন করে। ঐ দিবস রাত্র ১২টার সময় তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, “আমি ভাল আছি।” অন্তিম-সময়ে সে কাহাকেও উদ্বেগ না দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছে।

চিরকুমার অশ্বিনীকুমারের সংসারে বৃদ্ধ পিতা ও ২টী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত আর কেহ না থাকিলেও তাহার কাকা-কই সে সর্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া মনে করিত। আমরা অশ্বিনীকুমারের বিয়োগে তাহার আত্মীয়বর্গের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছি। সর্বগুণে গুণী আদর্শ আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে অভিভাবক-গণের শোকাভিভূত না হওয়ার দৃষ্টান্ত গৃহস্থগণের পক্ষে অতি বিরল ও আদর্শ।

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

[আমরা পূর্ব-সংখ্যায় ত্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতির বিবরণে “সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা” পরবর্তী সংখ্যায় পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে বলিয়া পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। তদনুসারে স্বামিজী-মহারাজ যে যে-স্থানে যে যে গভীর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত হইয়া সংক্ষেপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।]

স্মরণভিকুঞ্জে—স্বামিজী গুপ্ত-নবদ্বীপ ও গুপ্ত-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত তত্ত্বসমূহ বিচার-যুক্তিমূল ব্যাখ্যা করেন। বৃন্দাবনই গুপ্ত-নবদ্বীপ এবং নবদ্বীপই গুপ্ত-বৃন্দাবন। অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রাকৃত কোন কালের বিচার নাই। নবদ্বীপ পূর্বে, কি বৃন্দাবন পরে বা বৃন্দাবন পূর্বে কি নবদ্বীপ পরে—এইরূপ কালের বিচার অপ্রাকৃত তত্ত্বে লক্ষ্য করা যায় না। যদি প্রাকৃত কালেরই বিচার গ্রহণ করিতে হয়, তবে ভৌম-নবদ্বীপ প্রকাশিত হইবার পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দেশমত রূপ-সনাতনের দ্বারা ভৌম-বৃন্দাবন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃত কালগত প্রাচীনতার বিচারে আমরা নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। ভজনপ্রয়াসী বৈষ্ণববৃন্দ এবিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকিবেন।

শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লীতে—স্বামিজী-মহারাজ বলেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

ঠাকুর “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য” বর্ণন করিয়াছেন,—শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান—যাঁহার দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্তকোণী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই ভগবান্ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন—ইহা তাত্ত্বিকগণের পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে নিয়ামক-মহারাজ বহু যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তৃতামুখে তাঁহর শুভ্রাচার্য্য ও বৃহস্পতি-নীতির তারতম্যমূলক বিচার অবগণেও যাত্রিগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮

২৬ মধুসূদন, ২ জ্যৈষ্ঠ, ৭ মে, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা ৬।৮।
মোহিনী একাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী অপরাহ্ন ৪।৫৮।
দি ৯।২১ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকৃষ্ণী-দ্বাদশী।

২৯ মধুসূদন, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে, রবিবার—গৌর-চতুর্দশী হি ১।৩০।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীর ত্রত ও উপবাস।

৩০ মধুসূদন, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২১ সোমবার—পূর্ণিমা দি ১।১২২। দি ৯।২০
মধ্যে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশীর পারণ। শ্রীল শ্রী নবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব,
শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও কাহারও মতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের
তিরোভাব।

৪ ত্রিবিক্রম, ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে, শুক্রবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ১।১২৯। শ্রীল
রামানন্দ রায়ের তিরোভাব।

১০ ত্রিবিক্রম, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৪।৩৪।
অপরা একাদশীর উপবাস।

১১ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১ জুন, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।২। পূর্বাহ্ন
৯।২০ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৪ ত্রিবিক্রম, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, সোমবার—অমাবস্তা রা ৯।৭ শ্রীল গদাধর
পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন, বৃহস্পতিবার—গৌর-নবমী প্রাতঃ ৬।৮।
শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব, মতান্তরে—পরাহে।

২৫ ত্রিবিক্রম, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, শুক্রবার—গৌর-দশমী প্রাতঃ ৪।৫৮, পরে
একাদশী রা ৩।২৫। শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	*
* ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।		* নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	গভোদশায়ী, ২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৬৫-গৌরাক শুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮; ইং ১৫।৬।৫১	৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রী জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্

Publisher
2/2

[ইত্যুক্তা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ ।

প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃ পরীত্য পিতামহঃ ॥১৩॥

আনন্দসিদ্ধসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্ ।

স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রতাপং সগদগদম্ ॥১৪॥]

শ্রীশ্রী জগন্নাথ-স্তোত্রম্

১। বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ ।

(শ্রী ব্রহ্মী কনক ই
সংস্কৃত প্রতীকাল

অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥১৯॥

- ২। গুণাতীত গুণাধার ত্রিণাত্মমোহন্তে তে ।
 তন্মায়য়া মোহিতোহহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥২১॥
- ৩। নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ ।
 দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥২৬॥
- ৪। জরামৃত্যুবিহীনায়া মৃত্যুরূপায় তে নমঃ ।
 জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥২৭॥
- ৫। প্রপন্ন-মৃত্যু-নাশায় সহজানন্দরূপিণে ।
 ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥২৮॥
- ৬। নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যর্চিতপাদপদ্ম ।
 নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ সান্দ্রসুধোধসান্দ্র ॥৩৬॥
- ৭। নমো নমঃ কম্পনদূরভূত, দুপ্রাপ-কামপ্রদ-কল্পবৃক্ষ ।
 দীনাশরণ্য প্রণতৈকদুঃখ-সংঘোদ্ধতো নিত্যসুবন্ধপক্ষ ॥৩৭॥
- ৮। প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে ।
 কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥৩৮॥

— — —

[স্তব্ধেখং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ সঃ পিতামহঃ ।

জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥৩৯॥

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা ॥৪০॥]

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্রম্

- ৯। পাদান্তোজ-প্রপন্নানাং নমঃ পার্শ্বোদারিণে ।
 অনন্ত-বক্তৃ-নয়ন-শ্রোত্র-পাদাক্ষি-বাহবে ॥৪৩॥
- ১০। নমোহনাতি-মহামূল-তমস্তোমৈকভানবে ।
 ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে ॥৪৪॥
- ১১। ফণা-মণিকণাকার ক্ষিতি-মণ্ডলধারিণে ।
 নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥৪৫॥
- ১২। ভোগতল্লফণাচ্ছত্র-মধ্যস্থপ্তায় তে নমঃ ।
 মহার্ণব-জলে বৃক্ষে একীভূতে জগত্রয়ে ॥৪৬॥

১৩। ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত ।

ফণামণিগণব্যাজ-সমুত্থিতাখিলভৌতিক ॥৪৭॥

১৪। ত্বমেব নাথ সর্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো ।

অন্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাচ্ছান্নিমিত্তকাঃ ॥৪৮॥

১৫। এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষু পগীয়তে ।

ত্বন্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্বেদভাগসি ॥৪৯॥

১৬। শয্যা ত্বং শয়িতা হেষ ছাণ্ডশ্চ চ্ছাদকো ভবান্ ।

যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ ।

যুবয়োবন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥৫০॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোহধ্যায়ে

শ্রী শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রের অনুবাদ

[কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্ৰয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবান্কে গদগদ-স্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪॥]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্র

১। (হে ভগবন্!) সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল বিষয়ানন্দ-কণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ॥১৯॥

২। হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত ; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥২১॥

৩। প্রভো! আপনি অখিল দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্য-স্বরূপ ; অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥২৬॥

৪। আপনি জরা-মৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী ; আপনাকে নমস্কার । মনীষিগণ

আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময়, মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন ॥২৭॥

৫। হে দেব ! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥২৮॥

৬। দেব ! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধা, এজন্ম সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চনা করিয়া থাকে । নাথ ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সাক্ষ্যস্বাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় স্খাংস্বরূপ ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার ॥৩৬॥

৭। হে দীনবন্ধো ! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্রত ; অতএব আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥৩৭॥

৮। নাথ ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন । হে করুণাকর ! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণা-কটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিদ্রাণ করুন ॥৩৮॥



[পিতামহ ব্রহ্মা সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন । অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৯-৪০॥]

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্র

৯। দেব ! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন । আপনার চক্ষু, কণ, মুখ ও হস্ত-পদাদি অনন্ত ; আপনাকে নমস্কার ॥৪৩॥

১০। প্রভো ! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্যাসম ; আপনিই ঋক্, যজুঃ, সাম —এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্তিতে অবতীর্ণ ; অতএব আপনাকে পুনর্বার নমস্কার করি ॥৪৪॥

১১। প্রভো ! আপনি নিজ মস্তকে স্থায় ফণাস্থিত মণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন । আপনি কাল্যাণি রুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৪৫॥

১২। দেব ! প্রলয়কালে মহার্ণব-জল বর্ধিত হইলে, যে-সময় তদ্বারা জগন্ময় প্রাবৃত হইয়া একীভূত হয়, সে-সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন ; অতএব অনন্ত-মহিম আপনাকে নমস্কার ॥৪৬॥

১৩। হে ভগবন্ ! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণ্ডলে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়-পয়োধি-জলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥৪৭॥

১৪। নাথ ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্তা । একমাত্র আপনিই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন ; প্রভো ! আপনি অস্বদাদি সকলেরই মূল কারণ ॥৪৮॥

১৫। ভগবন্ ! সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্রে ষাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন ; কেবল অনির্বচনীয় কারণ-বশতই তিনি পৃথকরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৪৯॥

১৬। আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাত্র । বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ । আপনাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । অতএব, হে জগন্ময় ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৫০॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে

গানের অধিকারী কে ?

কৃষ্ণ-কীর্তনের প্রভাব

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভাঙাই সর্বশ্রেষ্ঠ । অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয় । কৃষ্ণকীর্তন মলিন-চিত্ত-জীবের হৃদয়-দর্পনকে মার্জন করেন, ভব-সমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপন করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণ-কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অমুভূতির প্রাণ-স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণ-সেবানন্দ বর্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণ সুখ আশ্বাদন করান, এবং সর্বাস্থার স্নিগ্ধতা সাধন করেন ।

কৃষ্ণ-কীর্তনের যোগ্যতা

এই কৃষ্ণ-কীর্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সেবোন্মুখ হইয়া গান করিতে সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অগ্ৰাভিলাষময়ী অথবা কৰ্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; তজ্জগৎ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা এই,—

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক-৩)

প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কার-রহিত হইয়া, প্রাকৃত স্তনিয়ন্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে স্তনীচ-জ্ঞানে, তরুর গায় সহ-গুণসম্পন্ন হইয়া, আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া, অপরের প্রাকৃত অভিমান-সমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান লাভে লুপ্ত হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্বদা কীর্তিত হয় না।

কীর্তনের অযোগ্যতা

যিনি প্রাকৃত জন্ম-মাহাত্ম্যে মহিমাম্বিত হইয়া আত্মগ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনীজ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্পসদৃশ সৌন্দর্যলাভ করিয়া নিজ রূপ-গরিমার আশ্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত-মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের গায় নিকপট-চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

‘সুর’-‘তালে’ আচ্ছন্ন ব্যক্তি নাম-গানের অনধিকারী

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া নাম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন তাঁহারও কৃষ্ণগানে অধিকার লাভ ঘটে না। যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহবিশিষ্ট হন না, তিনিও গানাদিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবাস্তুর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নাম-কীর্তনে দণ্ড প্রকাশ করেন, তিনি নাম-গানে অধিকারী হন না। কেবলমাত্র জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবাপরায়ণ এবং নিকপট-চিত্তে একমাত্র নাম-গানে যিনি রত—তিনিই প্রকৃত নামগানের অধিকারী।

—শ্রীল প্রভুপাদ

গোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

স্ব-রচিত গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় নাই

বলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোন স্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার রূত বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদ্-ভাষ্য পাঠ করিয়াছি। শ্রীকৃপগোস্বামি-রূত স্তবমালায় শ্রীবলদেব-রূত ভাষ্যও আমরা পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রমন্তক প্রভৃতি আর কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল মুরারিকে স্বপূর্ব চতুর্থদেশিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

খণ্ডাইত বংশে জন্ম ও বিদ্যাভ্যাস

আমরা যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেব-রূত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে খণ্ডাইত বংশে জন্মগ্রহণ করত অল্প বয়সেই তীর্থ-ভ্রমণে এবং বিগোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিক্কা-হুদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে গ্রামশাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদসকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর মহীশূর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাকর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্বভাষ্য ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদী দিগের শিষ্য হইয়া মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

আত্ম-পরিচয় গোপন ও সর্ববৈদান্তিকগণের পূজা-লাভ

বেদান্ত-বিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চা ছিল সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সম্মানসিগ্গণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও ধর্ম্ম-প্রচারে অধিকার নাই বলিয়াই তিনি সংসারে স্বীয় বর্ণ-পরিচয় গোপন করত বৈষ্ণব-সম্ম্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমকেন্দ্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন।

বলদেবের পুনরায় গুরুকরণ

ঐ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলদেবের গায় বন্ধকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্ৰহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুন্সারির প্রশিষ্ঠ শ্রীরাধাদামোদর দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব সর্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। ‘গৌড়ীয় মাধব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যতীত ঐ গ্রন্থে অণুর অধিকার নাই,’ ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কাণ্ডকুজ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের মধ্যে শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্ণুত্ব গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বায় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায় অভিমানী আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

নবদ্বীপ দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি

• আহা! বলদেবের গায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরুকরণ লক্ষকৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনাম-বলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার জড়ীয় অভিমান থাকিতে পারে? এখন তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-করে

বলদেবের জয়পুর যাত্রা

সেই সময়ে জয়পুরে একটা গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটি মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদ-বেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

বলদেবের জয়লাভ, ভাষ্য-রচনা ও ‘বিজ্ঞাভূষণ’ উপাধি-প্রাপ্তি

বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে চিরা-কাছা ও কটিতে কোপীন-বহির্বসন-মাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্যের জন্ত গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, “হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত?” বলদেব বলিলেন, “আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব।” তখন তাঁহারা বলিলেন—“মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?” বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েকদিবসেব অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য ও উপনিষদ-ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন, পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রী-বৈষ্ণবদিগকে নিরন্তরপূর্বক শ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে ‘বিজ্ঞাভূষণ’ উপাধি দেওয়া হয়।

শেষ জীবন—বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে

সেই বৃহৎ কাব্য সাধন করিয়া বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় শ্রীশ্যাম বৃন্দাবনে আসিয়া শেষ জীবন শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষ-কার্য্যে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐ সময়েই রচনা করেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাই যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। পাঠকগণ আরও যাহা পান, তাহা সংগ্রহ করিবেন।

বলদেবের কাল ও গুরুপরম্পরা

শ্রীগন্যহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকাব্য সাধন করেন। তাঁহার গুরুদেবের পরমগুরু শ্রীমুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাহাকে অল্প বয়সে ‘দুঃখী কৃষ্ণদাস’ বলিত। স্বতরাং বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যামসুন্দর ঐ পরিবারের কুলদেবতা। বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর পূর্বে স্বীয় কাব্যসমূহ

সম্পন্ন করিয়াছিলেন । কোন কোন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন ।

ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ-মিশ্রই বলদেবরূপে অবতীর্ণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটি নক্ষত্রবিশেষ । তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই । ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর নিত্যপার্ষদ-দিগের মধ্যে একজন । কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সূতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন । বৈষ্ণববাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং কথাটি সত্য বলিয়া অনুমান হয় ।

কোন কোন অস্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে । আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীব-গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয় । তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাভীর্ঘ্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দ ব্যবহার করিয়া ন । তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিষ্ণুরাতের কলি-শাসন

বিষ্ণুরাত,—

হায় কলি ! একি আজ তব মুখে শুনি,
বিনাশিবে ধরা ধর্ম সমূলে এখনি ।
শ্রদ্ধা-শ্রী-শোভা-ধারণা-তোষণী,
সৎনীতি-লজ্জা-মনীষা-পোষণী ।

শান্তি-সিদ্ধি, আর সুমতি-সুখ্যাতি—
এই তের জায়া সদা সেবে ধর্ম্যে অতি ।
তাহা হ'তে তেজস্কর কাম-সম্মতি,
নিয়ম-নিপুণ-শুভ-সুজয়-সংহতি ।

মঙ্গল-সুযতন-সুযশ-আদরে'—

ধর্ম-সুত-সুতা এই জান বিশ্বপরে ।

ইহাদের অরি ভবে যেবা হয় তারে,

‘বিষ্ণুরাত’ আমি ঝাট ভেজি যম ঘরে ।

কলি,—

কায়া কলহের মোর করিয়াছে বিধি,

প্রাণ-মান-ধনদাতা ওহে ধরানিধি ।

কোথায় যাইব বল ভকত-সুন্দর,

আর কেন দুঃখ পাই ঘুচাও সম্বর ।

লইনু শরণ আজ তোমার চরণে,

অশ্রুতের শোধ লও যাহা আছে মনে ।

বিষ্ণুরাত,—

অধর্ম ও মায়া-শরীর-সন্তুতা,

মিথ্যা-দম্ভ-লোভ-বাসনা-বনিতা,

ক্রোধ-হিংসা-কটু-বিবাদ-অহিতা,

দুঃখ-মরণ-ভীতি-নরক-পীড়িতা ।

ধর্ম নাশিবার লাগি’ জনম হেথাই,

ক্রোধ-হিংসা হ’তে তোমার বলাই ।

শরণ লইলে আজ না বধিনু তাই,

মোর রাজ্য ছাড়ি’ এবে দূরে যাও ভাই ।

বেশ্যা-সুরা-পাশা-স্বর্ণমতি চিক্,

যাও যাও যথা জীব-হত্যা অধিক ।

গুরু-রাজ্যপাল-লোকনায়ক-ধার্মিক,

যে সব সেবায় সদা হয় ধিক্ ধিক্ ।

তবে যদি শ্রীচৈতন্য-বাণী পশে কাণে,

ত্বরায় তরিবে সেই জে’নে রাখ মনে ।

এত শুনি’ কলিরাজ চড়ে সুখ-যানে,

পরীক্ষিত পদতলে নতশির মেনে’ ।

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

আনন্দপুর (মোদনীপুর)

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যানগরে—নিয়ামক-মহারাজ বক্তৃতামুখে জানান যে, শ্রুতির অনুগত সকল প্রকার বিদ্যা ও দর্শনই প্রকৃত শাস্ত্র। কৰ্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অনুগত হইলেই তাহাদের সাথকতা। ভক্তিকে বাদ দিয়া যে কৰ্ম্ম ও জ্ঞান, তাহাতে অনর্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভারতে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনসমূহ সৰ্ব্ববিদ্যার আশ্রয়স্থল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করিয়া নিজদিগকে ধন্যজ্ঞান করে। নাস্তিক দর্শনগুলি তাহাদের অপরাধের মোচন কামনা করিয়া সেবা প্রার্থনা করে। কোন্ কোন্ দর্শনগুলি কিভাবে ভক্তির আনুকূল্য করে, ২১টি উদাহরণ দিয়া স্বামিজী-মহারাজ সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও জানান যে, স্বয়ং বৃহস্পতি গৌরলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানে পরবিদ্যাপতি শ্রী:গৌরহৃন্দ:রর কৃপা-কটাক্ষ লাভ করেন।

মামগাছিতে—স্বামিজী বলেন যে, হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি যাহার যত আনন্দি ও প্রীতি, তাহারই ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের বিদ্বেষীর প্রতি তত ক্রোধ হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই আদর্শের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—“ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।” সহজিয়াগণের ‘কাচু মাচু’ ভাব—ভক্তির বিরোধী-চেষ্টার উৎসাহ প্রদান করে। উহা ছায়া-দৈত্য় বা দৈত্য়ের ভাণ, প্রকৃত দৈত্য় নহে। যাহাদের ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয় না—যাহারা দৈত্য়াবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত “তবে লাথি মারোঁ। তাঁর শিরের উপরে”—বাক্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্বেষীর মস্তকে পদাঘাত করিতে পরাঙ্মুখ, তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের “তৃণাদপি স্তনীচ” শ্লোকের আদর্শ কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না। “অহং ব্রহ্মস্মি” মন্ত্র ও “তৃণাদপি” শ্লোকের উদ্দিষ্ট বস্তু একই। “অণোরনীমান্ মহতো মহীয়ান্” একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞাভিমানী বিপথে চালিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন যে, প্রিয়ের প্রতি অনাদর বৈষ্ণব কখনই সহ্য করিতে পারেন না। প্রাণের প্রাণ, ভক্তহৃদয় যে ভগবান্, তাঁহার জন্ত ভক্ত সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিতে, এমন কি নিজের প্রাণ-বিসর্জনেও প্রস্তুত।

শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে—স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে বিশেষ জোরের সহিত বলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজই শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গৌরতীর্থ আবিষ্কারের নির্দেশ ও নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রেরণা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই আরক্ক কার্য আরও উজ্জলভাবে প্রকাশিত করেন। স্বামিজী আরও বলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখনকার দিনে উচ্চনাম-কীর্তনের একজন প্রধান উপদেশক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় দুই বাহু উত্তোলন করিয়া তিনি “হরেকৃষ্ণ” মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া উদ্গু নৃত্য করিয়াছিলেন। কোন আচাৰ্যাভিমানী দানব এই বিচার পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্যাত উচ্চনাম-কীর্তন হইতে বঞ্চিত হইয়া সহজিয়া বাবাজীদের উচ্ছিষ্টভোজী হওয়ার ফলে বৈধাবৈধ স্ত্রী-সন্তাষণের আবাহন করিয়াছে। আমরা বলিতে অত্যন্ত লাজ্জিত হইতেছি যে, উক্ত আচাৰ্যাভিমানী দুৰ্ভক্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া পরে তাহাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মন্তোচ্চারণ করিয়া অবৈধ দারপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা ভক্তিদেবীর চরণে ও ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অপরাধের ফল।

শ্রীগৌর-যোগপীঠে—সভাপতি-মহারাজ জানান যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, অধোক্ষজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মভিটায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরের ভিত্ত-খননকালে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্তি আজও মান্দরে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এহ অধোক্ষজ সেবাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয়। এগোড়ায় বেদান্ত সাম্যত তাহা সমতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত “অধোক্ষজ” বিগ্রহই জগন্নাথের পুঙ্খরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভিটায় আবভূত হন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই অপ্রাকৃত গৌরমুন্দর, যাহারা ‘অধোক্ষজে’ ও ‘অপ্রাকৃতে’ ভেদ বুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাদের ভগবদ্ভজন পুঙ্খ-পর্যন্ত। বস্তুতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি-সকল মহাপুরুষগণের বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে না পারিয়া বিনয়গামী হইয়া থাকে। আজ আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ভ্রামতে উপস্থিত হইবার নোভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই অপ্রাকৃত ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক বালুকণাই বৈকুণ্ঠ। ইহাতে দেশ-কালগত ব্যবধান কিছুই নাই। এখানকার প্রত্যেক বালুকণা বৈকুণ্ঠ। বলায় তাহাতে অনন্তকোণী ভোম জগৎ বর্তমান আছে। ভগবৎতত্ত্ব মায়াশক্তির অধিষ্ঠান যে-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ, বৈকুণ্ঠ-বালুকণাতে তদ্রূপ অনন্তকোণী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান স্বতঃসিদ্ধ। আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে কোন প্রাকৃত সীমাগত ব্যবধানের চিন্তা আনিয়া না ফেলি। সাধুসঙ্গফলেই আপনারা ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে অসর্থ হইবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে—নিয়ামক-মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন যে, আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীর মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ যিনি বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভু এবং গুরু, তিনি এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগদগুরু গুরুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুসেবা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি উচ্ছিন্নতা নামে কথিত হয়। “যস্ত দেবে পরাভক্তিযথা দেবে তথা গুরো”—বাক্যানুসারে আমরা প্রত্যেক আচার্য্যবর্গের জীবনীতে গুরুসেবার আদর্শই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে ভুবনপাবন চারি আচার্য্যের শ্রীমন্দির-চতুষ্টয় গর্ভমন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিতেছে। বৈষ্ণব-দর্শন সর্বদাই শ্রীমন্নমহাপ্রভুর সেবক। বৈষ্ণব-দর্শনের প্রচারকরণ নিত্যকাল গৌরমুন্দের সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করিয়া থাকেন। আচার্য্য শ্রীগুরু শ্রীমন্নমহাপ্রভুর মত-দোষক আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হন নাই। শঙ্কর দূরে ঈশান-কোণে অবাস্থত থাকিয়া শ্রীমন্নমহাপ্রভুর কৃপা-ভারী; গৌর-জন্মস্থলীতে অবস্থিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহের পশ্চাদ্দেশে মোহনশাস্ত্র প্রকাশ করায় বলজ্জমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। শঙ্করের মূল-পুরুষ সদাশিব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, তাহাতে মোহন-ক্রয়ার কোন প্রকাশ নাই। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রী-মধ্ব-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যথাক্রমে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনন্দার্ক আচার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যাদা স্থাপন-কল্প এই বরাহ শ্রীমন্দিরে তাহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অগ্র নাম আচার্য্য-ভবন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের অবস্থিতি-স্থল বলিয়া ইহার নাম—আচার্য্য-ভবন। অথবা জগদগুরু আচার্য্যভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থল বলিয়া ইহা আচার্য্য-ভবন। শ্রীমন্নমহাপ্রভু এখানে কাক্সীগীর্ষণে নৃত্য করিয়া বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নট্যাভিনয়ের সূত্র প্রদর্শন করেন। এই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্ত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই নাট্যমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরে অভিনয়-মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনারা মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে স্থানাভাববশতঃ বহু সজ্জন ব্যক্তিই উক্ত নাট্যমঞ্চে উপবেশন করিয়াছেন।

আমরা এস্থান হইতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-ক্ষেত্র দর্শন করতে যাইব। তৎপক্ষে আপনাদের নিকট আর একটা কথা নিবেদন করা আবশ্যক মনে হইতেছে। আমরা সকলেই মিলন-প্রয়াসী। মিলন-ক্ষেত্রে কে কাহার সহিত মিলিত হইবে—ইহা বিচারের আবশ্যকতা আছে। দূরে অবস্থিত

না থাকিলে মিলনের কোন প্রসঙ্গই হয় না। দূরাবস্থিত তত্ত্ব সমূহকে একীকরণের চেষ্টা করিলে অনেক ক্ষেত্রে মায়াবাদের গায় চেষ্টা লক্ষিত হইয়া থাকে। 'মিলন' শব্দের এরূপ তাৎপর্য্য নহে। বিচ্ছেদ ও মিলন একই তাৎপর্য্যপর না হইলে ভোগী বা ত্যাগীর সম্মেলন-চেষ্টার গায় অপকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম শিক্ষায় আমরা শুনিয়াছি—Love and Rupture অর্থাৎ প্রীতি ও বিচ্ছেদ একই তাৎপর্য্যপর। অর্থাৎ প্রীতি যে উদ্দেশ্যে উৎপন্ন, বিচ্ছেদও সেই উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন—ইহা বুঝিতে না পারিয়া বিচ্ছেদের প্রতি অবাঞ্ছনীয় জেয়-জ্ঞান অপরাধময়। আমরা যেন এইরূপ অপরাধে কখনও পতিত না হই। মিলন ও বিচ্ছেদ—দুইটী তত্ত্ব বিরুদ্ধভাবে প্রকাশ করিলেও একই স্থানে অবস্থিত। উদাহরণের দ্বারা আমরা এইটী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইব। একটি চক্রে পরিধির প্রত্যেক বিন্দুই আদি ও অন্তরূপে গৃহীত হইতে পারে। এবং আরও দেখা যায়, আদি বিন্দু হইতে অগ্রসর হইতে থাকিলে অন্ত-বিন্দু, আদি-বিন্দুর সহিত যুক্ত হইয়া যুগল-সেবা প্রকাশ করে। সুতরাং Love and Rupture অথবা প্রীতি ও বিরহ একই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া যুগল-সেবার ঐজ্জল্য বিধান করে। মিলন যে-স্থলে ভোগের উদ্দেশ্যক এবং বিচ্ছেদ যে-স্থলে ত্যাগের অভিনায়ক, সে-স্থলে যুগল-সেবার ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে। আমরা ভোগীর সহিত মিলিত হইয়া অথবা ত্যাগীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইব না, শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর আনুগত্যে গান্ধার্বিকা-গিরিধরের যুগল সেবায় নিযুক্ত থাকিব। চলুন, আমরা এখন পরমগুরুদেবের সমাধিদর্শন ও পরিক্রমা করিতে যাইব। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই একস্থানে অবস্থিত।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে—
সভাপতি-মহারাজ জানান যে, আমরা যে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এইস্থান ব্রজপতনের অন্তর্গত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি। সম্মুখে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ড-তীরেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের স্থান—ইহা প্রদর্শন করাইবার জন্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি যমুনাতীর হইতে নীত হইয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া অধমকে এই কার্য্যের সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহার সমাধিমন্দিরের সম্মুখে আমরা দণ্ডায়মান, তাঁহারই শ্রীমূর্তি আমরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত শ্রীমূর্তির পূজক নহেন। যে শ্রীমূর্তি আমরা দর্শন করিতেছি ইহাই তাঁহার প্রকট-লীলার মূর্তি। এই অধম।

বক্তা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকট-মূর্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যখন তিনি দর্শন দিয়াছিলেন, তখন এই অধমকে প্রচুর আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—
 “আপনার সকল বিপদ আমি গ্রহণ করিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত ভজন করুন।”
 (এই সময়ে স্বামিজী-মহারাজ গদগদ-কণ্ঠ রুদ্ধস্বরে রোদন করিতে থাকেন)।
 একটু স্থির হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করেন—

যিনি জগদগুরু, নিত্যমুক্ত, অতিমর্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে গুরুকরণ—লোক শিক্ষার নিমিত্ত। বদ্ধজীব অনর্থ-মূর্তির জন্ত গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কখনই ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত যুগল-সেবার অধিকার লাভ করিতে পারে না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ঠাকুর গৌরকিশোরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছিলেন—“আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন। ‘কলির রাজত্ব’ অর্থাৎ কলিকাতায় কখনই যাইবেন না।” আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচরণে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার গুরুদেবের আদেশ ও নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া ‘কলির রাজত্ব’ সেই কলিকাতায় গিয়াই শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি আমরা বুঝিব যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতায় যাওয়ায় অত্যাচার বা অপরাধ করিয়াছেন? আরও দেখিতে পাঠ, শ্রীল বাবাজী মহারাজ বহু শিষ্যাদি না করিয়া নির্জনে একাকী অবস্থান করিয়া ভজনপ্রয়াসী ছিলেন। কেবলমাত্র মদীয় গুরুপাদপদ্মকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মদীয় গুরুপাদপদ্ম ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বহুসংখ্য বদ্ধ-জীবের উন্মোচনকরে তাহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃথিবীময় সর্বত্র প্রচারণা জগতে এক অভিনব ভজন-পদ্ধতি আনয়ন করিয়াছে। এই সমুদয় ক্রিয়াকলাপ বিবিক্তানন্দী নির্বিকল্প বাবাজী-মহারাজের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আদর্শের বিরুদ্ধ বাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ক্রিয়াই গুরুসেবার সর্বোত্তম আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিকটে অবস্থান না করিয়া পরন্তু বহু দূরে থাকিয়াও গুরুসেবার চরম আদর্শ প্রদর্শিত হইতে পারে। যাহারা নিকটে থাকেন, তাঁহারাি গুরুসেবায় নিযুক্ত আছেন—এইরূপ চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় ও অপরাধজনক। শ্রীল প্রভুপাদের এই আদর্শ নূতন নহে।

আমরা যাহার পরিবারভুক্ত হইয়া রূপানুগ বৈষ্ণব পরিচয়ে জগতে গৌরব

বোধ করি, সেই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের আদর্শও এস্থলে আলোচনীয়। তিনি বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া মদীয় গুরু-পাদপদ্মের গায় একই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু নির্জনে একাকী অবস্থান করিয়া নির্বিল পুরুষের গায় লোকালয় হইতে পৃথকস্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন; ‘কাহাকেও শিষ্য করিব না’—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সেবা-কোশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তথাকথিত উল্লিখিত আদর্শ গ্রহণ না করিয়া ‘সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম’—বাক্যের সফলতা সম্পাদন করিলেন। ইহার দ্বারা আমরা কি বুঝিব যে, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গুরুদ্রোহী বা গুরুর আজ্ঞা বা আদর্শ লঙ্ঘনকারী? আপনারা বুদ্ধিমান সজ্জনমণ্ডলী, আচার্য্যবর্গের এই আদর্শ সর্বতোভাবে অনুধাবন করিবেন; আপাতসত্য মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ হইবেন না। ভজনের নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে না থাকিয়া সহস্রাধিক মাইল দূরে শ্রীপাট খেতরী গ্রামে থাকিয়া জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার এই লীলা প্রকাশিত না হইলে লোকনাথ গোস্বামীর মাহাত্ম্য লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া যাইত। একটা ক্ষুদ্র বটের বীজের মধ্যে যে এতবড় বিরাট মহীকুহের সম্ভা রহিয়াছে, তাহা কে অনুমান করিতে পারে? সুতরাং আমরা বুঝিব, বীজ হইতেই বৃক্ষের উৎপত্তি; বীজে বিরাট বৃক্ষের সম্ভা না থাকিলেও ঐরূপ বৃক্ষের উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব আপাত-বিরোধ, বিরোধ নহে; শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকাই প্রকৃত বিরোধ।

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

দৈবী মায়ায় মোহিনী শক্তির কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরম অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিবার উপায়ও তেমনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্”। সূর্য্যের আলোকই যেমন একমাত্র সূর্য্য দর্শন করিবার উপায়, সেইরূপ কৃষ্ণ-সূর্য্যের আলোকই তাঁহাকে দেখিবার একমাত্র উপায়। তাঁহারই পাদপদ্মে প্রপত্তি বা কৃষ্ণভক্তিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র উপায়। শরীর

ও মনের কসরৎ যে কৰ্ম্ম-জ্ঞান, তাহা দ্বারা ভগবান্কে পাইবার উপায় নাই। ‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি’ ভক্তির দ্বারাই ভগবান্কে পাওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা ভগবানের আংশিক দর্শন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রকাশিত হন। কিন্তু ভক্তির দ্বারাই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। সূর্য্য উদিত হইলে জগতের অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং যে বস্তুর যে স্বরূপ তাহা প্রকাশিত হয়। সেইভাবে কৃষ্ণ-সূর্য্যের উদয় হইলে মায়ার অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং সকল বস্তুই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। সেই প্রকার সম্যক্জ্ঞান লাভের পথে ‘দূরত্যায়া মায়ী’ ব্যবধান ঘটাইতে পারে। এই স্থানে ঐশ্বর্য্য হইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করিলেই যদি সৰ্ব্বধৰ্ম্ম কৃত হয়, তাহা হইলে জগতের সকল লোকই একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত। জগতের সকল দেশে সকল লোকেই ভগবান্ এক ভিন্ন দুই নাই, ইহা অগ্নাধিক স্বীকার করে; অথচ সেই একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও সকলে তাঁহার চরণে প্রপত্তি করিতেছে না কেন? যাহারা অপর সাধারণ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অনেকেই একথা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু জগতের বহু বড় বড় পণ্ডিত ও নেতা যাহারা বহু শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন এমন বহু লোকও শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপত্তি করেন না। ইহার কারণ কি? এই কারণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপচ্ছন্তে নরাধমাঃ ।

ময়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ (গীঃ ৭।১৫)

প্রথমতঃ দুষ্ট লোকগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না। জগতে দুই প্রকার লোক সৰ্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। যাহারা ভাল লোক তাঁহারা শিষ্ট, আর যাহারা মন্দ লোক তাহারা দুষ্ট-শব্দবাচ্য। ইহারা সকল দেশে সব সময়েই আছে। কিন্তু সকল দেশেই সব সময়েই তদেশীয় লোকদিগকে শিষ্ট করিবার জন্ত বিধি-নিষেধ-সম্বলিত আচার-ব্যবহার-প্রণালী সৰ্ব্বদাই আছে। যাহারা শিষ্টলোক তাঁহারা সেই সকল আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ পালন করিয়া মনুষ্য-জীবনের ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হন, আর দুষ্টলোকগণ প্রায়ই যথেষ্টাচারী হইয়া কোন বিধি-নিষেধের অধীন হইতে চাহে না। আধুনিক জগতে যে নানাপ্রকার রাষ্ট্র-বিপ্লব, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রভৃতি বহু বিঘ্ন

সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহা এই দুষ্ট লোকগুলির খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারিতার ফলস্বরূপ। শিষ্টলোকগুলি কিন্তু যে-কোন দেশে, সমাজে বা ধর্ম্মে অবস্থিত থাকুন না কেন, নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে বিধি-নিষেধ পালন করিয়া অগ্ন্যাগ্ন দেশীয় শিষ্ট লোকের সহিত নিজ নিজ ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হন। সেই সকল ভাবের আদান-প্রদানফলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু দুষ্টলোকগণ যাহারা নিজের অপস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজীর ছাপ লাগাইয়া কেবল পাপাচরণই করিয়া থাকে। এমন কি, সেই দুষ্টলোকগুলি যে দেশে, যে ধর্ম্মে অবস্থিত তাহারও কোন ধার ধারে না। দুষ্টলোক অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করা দূরে থাকুক, সাধারণ ব্যবহারিক কার্য্যেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধার ধারে না। এই দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্পাপেক্ষাও ভীষণ ভয়াবহ।

দ্বিতীয় নম্বর—যাহারা প্রপত্তি করে না, তাহারা সাধারণ মূঢ় বা বোকা কন্মি-সম্প্রদায়। এই সকল বোকা লোকগুলি ভগবান্ কি? জগৎ কি? সে নিজে কি? কি-জন্ম সে আজীবন খাটিয়া মরিতেছে? তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কি?—এই সকল কথা তদ্রূপে কিছুই বুঝে না। গর্দভ যেমন আজীবন রজকের বস্ত্রভার বহন করিতে করিতে সামান্য ঘাস মাত্র খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেই প্রকার মূঢ় কন্মি-সম্প্রদায় কেবলমাত্র উদর-পূর্ত্তির জন্ম সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। গর্দভই সর্পাপেক্ষা মূঢ়ের প্রতীক; কারণ সে কেবল উদর-পূর্ত্তি ও গর্দভীর সঙ্গলাভের নিমিত্তই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। সেইপ্রকার গর্দভপ্রায় পরিশ্রমী লোকগুলি কেবলমাত্র গৃহকেই বা বৃহৎ গৃহ—দেশকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করে। এবং গৃহে গৃহিণীর পক্ষ অন্ন ভোগ করিয়া এবং তাহার সহিত বহু দুঃখভারাক্রান্ত ইন্দ্রিয়াদি সন্তোষ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। জগতে আহারাদি ব্যাপার ব্যতীত আর কি আছে বা না আছে, তাহার খবর কন্মি-সম্প্রদায় রাখিবার প্রয়োজন মনে করেন না। তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা করিবার জন্ম যাহারা নেতৃত্ব-সজ্জায় সাহায্য করেন, তাঁহারাও মূঢ়গণের মধ্যে বৃহৎ মূঢ়। সুতরাং তাঁহারা গীতার ধার ধারেন না, ভগবদ্গীতার বক্তা যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ত' কথাই নাই। 'প্রপত্তি'-শব্দের অর্থই তাঁহাদের জানা নাই।

তৃতীয় নম্বর—প্রপত্তি করে না যাহারা, তাহারা নরাধম শব্দবাচ্য।

যাহারা মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াও পশুর মত জীবন কাটাইয়া দেয়, অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনে যে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই কার্য্য সমাধা না করিয়া ইতরকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারাই নরাধমবাচ্য। কোন ব্যক্তি বহু ধন-রত্ন লাভ করিয়াও যদি দরিদ্রের মত জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহাকে যেমন নরাধম রূপণ বলা হয়, সেইপ্রকার যে অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্যজীবন, বৃথা পশুর মত কেবলমাত্র আহা-নিদ্রাদি ব্যাপারে ব্যয় করে, সে নরাধম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নরাধমগণের জানা থাকে না যে, বহু বহু মনুষ্যেতর জন্ম-লাভের পর তবে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করা যায়। এই জন্মেই এমন একটী সুবিধা লাভ করা প্রয়োজন যদ্বারা মনুষ্য মায়ামুক্তির পর ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্ববস্তুকে লাভ করত নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। জন্মান্তরে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি মনুষ্য-জীবনে সেই ক্লেশের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নরাধম রূপণই থাকিয়া যাইব। আর যদি মনুষ্য-জীবনোচিত চেষ্টা করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবনের সফলতা লাভে সক্ষম হইব। এখানে জাতি-ব্রাহ্মণের (?) কথা বলা হইতেছে না। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করেন, কিন্তু নরাধম তাহা করিতে পারে না। ভক্তিসঙ্ক-ত্যাগকারীই নরাধম-শব্দবাচ্য।

চতুর্থ নম্বর—ভগবদ্-বিদেষী অশুরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করে না। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতি নৃপতিগণ বহু বিদ্যাবুদ্ধি ও তপশ্চার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াও যেহেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা ‘অশুর’ বলিয়া বিদ্যুৎসমাজে পরিচিত। অশুরগণ সাধারণতঃ বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় কম ‘ডাক্তার’ নহে, কিন্তু যেহেতু সেইসকল ‘ডাক্তার’গণ অশুরভাবাপন্ন বা ভগবদ্বিদেষী সেইজন্ত তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির চরমফল প্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ সেই সকল বিদ্যাবুদ্ধি মায়্যা-কবলিত হইয়া অপহৃত-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহার কারণও পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি না করিলে ‘দুরত্যয়া মায়্যা’র হাত হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ হয় না।

অশুরগণের প্রধান কার্য্যই হইতেছে ভগবান্কে এবং ভগবদ্বক্তাকে বিদেষ করা। তাহারা মনে করে, শ্রীরামচন্দ্র ত’ মানুষই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই-প্রকার আর একজন মানুষ। সুতরাং শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ যদি মানুষ হয় তাহা হইলে তাহারাই বা কম কিসে? তাহারা মনে করে, আমি বিদ্যা ও বুদ্ধিতে

শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষা কিছু কম নাকি? মহাবদান্ত-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপর নাস্তিক পড়ুয়াগণ এইপ্রকার মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া দয়াল প্রভুকে সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোরতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসুরগণ এইভাবে চিরদিন ভগবান্কে মানুষ-বুদ্ধি করে এবং মানুষকে ভগবান্ বুদ্ধি করে। সেই প্রকার মূঢ়গণের সম্বন্ধেও ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।” সূত্রাং এতাদৃশ বৃত্তি অসুরগণের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব অসুরগণের বিদ্যা-বুদ্ধির উপাধিগুলি বিষধর সর্পের মস্তকে বহুমূল্য মণির মত। সর্পের মস্তক মণি-শোভিত থাকিলেও সে যেমন ভয়ঙ্করই থাকে, সেইপ্রকার অসুরগণের বিদ্যাবুদ্ধি, উপাধি-গুলিও তাহাকে কম ভয়ঙ্কর করে না। মরা মানুষকে বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া যেমন একটা লোকরঞ্জন বা লোক প্রবঞ্চনা-কার্য্য, সেইপ্রকার ভগবদ্বিদেবী, নাস্তিক অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কেবল নামমাত্র বিদ্যাশিক্ষার উপাধি দ্বারা ভূষিত করা একটা বিশিষ্ট লোকবঞ্চনা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে যে নিরীশ্বর আত্মরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তদ্বারা পদবীধারী কতকগুলি অসুরের সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তাহার প্রমাণ—উত্তর-প্রদেশে আলিগড়ে প্রিন্সিপ্যাল গার্গকে তদীয় ছাত্রাদি কর্তৃক নিহনন। উত্তরপ্রদেশে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। রাজ্যপাল মহোদয় বিদ্বৎজনকে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার Conference দ্বারা যেমন পূর্বে কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই, সেইরূপ বর্তমান প্রচেষ্টাও বিফল হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। আত্মরিক স্বভাব দমন করিতে হইলে ভগবদ্বক্তার উন্মেষই একমাত্র প্রতিষেধক। এই প্রকার ভগবদ্বিদেবী অসুরগণের হিংসা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জগতে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই লক্ষিতব্য বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(৩য় বর্ষ, ৩য়, সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

‘কটুক্তি’ সম্বন্ধে বক্তব্য

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে আমি শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতি ‘কটুক্তি’ করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে, আমি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই ‘কটুক্তি’ করি নাই। সত্যবাবু এসম্বন্ধে আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শাসন-বাক্য, নির্দেশ-বাক্য, উপদেশ-বাক্যগুলিকে কটুক্তি বলা চলে না। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি প্রভৃতি ঋষিবর্গের বাক্যসমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। কারণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা বদ্ধজীবগণ শাসিত হন। শাসন-বাক্য শাস্ত্রকারগণের কটুক্তি নহে। পরন্তু উহাই জীবের একান্ত মঙ্গলকর নির্দেশ-বাণী ও উপদেশ। নির্দেশ বা উপদেশ দিতে গিয়া, উপদেশক বা নির্দেশক কোন প্রাক্তন আচার, ব্যবহার বা বিচার, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা কটুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ নিরপেক্ষ সমালোচকগণের এই অধিকার শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টতই দিয়াছেন; ধর্মপ্রচারকগণের ত’ কথাই নাই। তারতম্যমূলক বিচারের সর্বত্রই আদর আছে।

শ্রীব্যাসদেব “অর্চ্যে বিষৌ শিলাধীশুর্কষু নরমতিঃ” (পদ্মপুরাণ)—শ্লোকে অদ্বৈত-সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতি ‘নারকী’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও “যস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে” (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) শ্লোকে কর্মজড়-স্মার্ত্ত ও নাস্তিক চার্বাক-সম্প্রদায়কে “স এব গোখর” বাক্যের দ্বারা শাসন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বহুস্থানে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর “এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারে। তার শিরের উপরে ॥ (আঃ ৯।২২৫, ১৭। ১৫৮; মঃ ১১।৬৩, ১৮।২২৩, ২৩।৫২২; অঃ ৬।১৩৭) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধী সম্প্রদায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ‘তৃণাদপি সূনীচ’ বাক্যের ও “প্রাণীমাঞ্চে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব”—ইহার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, আসক্তি, প্রীতি প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাকে বৈষ্ণবগণ কখনও কটুক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যেস্থলে কোন সিদ্ধান্ত বা বিচারের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সেস্থলে এইরূপ বিচারই সর্বতোভাবে আদরণীয়।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপক্ষের মতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া যে ব্যবহার ও কটুক্তি করিয়াছেন, আমি পূর্বে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করের নিরপেক্ষ জীবনীকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কর্ণাট-দেশে ‘ক্ৰকচ্চ’ নামে এক ব্যক্তি কাপালিকগণের গুরু ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাণা সূধতার দ্বারা পাশব বলপ্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যৌগবল ও যুক্তিবল এক্ষেত্রে আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই।

উক্তস্থলে আগার বক্তব্য, বিচার-যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া ক্রোধ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া একজন কাপালিক আচার্য্যের প্রাণ-হত্যা করাকে কোন ধর্ম্ম-জগৎ নিশ্চয়ই গ্রাহ্য-সঙ্গত ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন না। আচার্য্য শঙ্কর আরও বহু ক্ষেত্রে সম্মুখ-বিচারে অপর পক্ষকে প্রাণে বিনষ্ট করিবার জন্ত দস্ত-ভরে যেরূপ অত্যাচার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তাহা হইতেও আগরা তাঁহার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। এমন কি, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই তিনি তিব্বত-প্রদেশে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিত শিবনাথ শিরোমণি মহাশয় “শঙ্কর-মঞ্জরীর” পরিশিষ্টে যে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, আমি পাঠকবর্গের সমক্ষে এস্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম—
“শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ জগদগুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ খৃষ্টাব্দে (?) জগতের উজ্জল জ্যোতিঃ শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে। তেত্রিশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন।” “অতাপি তিব্বতের ঐস্থানকে ‘শঙ্কর-কটাহ’ (কড়াই) বলে।”

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য্য শঙ্করের দ্বারা বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কতদূর সত্য বিবেচনা করা আবশ্যক। অবশ্য বৌদ্ধ-বিতাড়নের চেষ্টার মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের উদ্যম স্বীকার করিলেও তাঁহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলোপ ঘটিয়াছে—ইহা প্রকৃত ঘটনা কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৌম-লীলা আলোচনা করিলে এই প্রকার নিশ্চয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। পরন্তু শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি প্রভূত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াতে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানগণই পরাভব স্বীকার করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অনুগত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তদানীন্তনকার ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-বিচার ও মুসলমানগণের নিরাকার অদ্বৈত-চিন্তাশ্রোত অপেক্ষা

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনে সুগত বুদ্ধকে ‘পাগল’ বলিয়া কটুক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুগত বুদ্ধ বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ভারতের মধ্যে এতবড় একজন ধুরন্ধর আচার্য্যরূপে আবিভূত হইয়াও যিনি বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার তাঁহার প্রতি “অসম্বন্ধপ্রলাপিতম্” বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার যথোচিত মর্যাদার হানি করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত আচার্য্য শঙ্করের শারীরিক-ভাষ্য হইতে সান্নিধ্য ঐ অংশ উদ্ধার করিলাম—

“অপি চ, বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়মিতরেতরবিরুদ্ধমুপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতমাত্মনঃ ‘অসম্বন্ধপ্রলাপিতং’, প্রদ্বেষো বা প্রজাহু—বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা বিমুহেয়ুরিমাঃ প্রজা ইতি সর্বথাপ্যনাদরণীয়াহয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কাটমৈরিত্যভিপ্রায়ঃ।”
(সূত্রভাষ্য—২।২।৩২)

“সুগত পরম্পর বিরুদ্ধ বাহ্যবস্ত্তবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সর্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার ‘অসম্বন্ধ-প্রলাপিতা’ (পাগলামি) ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহাই হউক, শ্রেয়ঃ-কামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধমত সর্বপ্রকারে অগ্রাহ্য।”

যদি যুক্তির ভ্রান্তিকেই ‘পাগলামি’ বলিতে হয়, আচার্য্য শঙ্কর তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন কি? আমরা এসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য্যের উক্তির অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিব। শুধু এক ক্ষেত্রেই আচার্য্য ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন ঐরূপ নহে, আরও বহুস্থলে তাঁহার ঐরূপ ভাষা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। নিম্নে তাঁহার আরও দুই একটি তথাকথিত কটুক্তি ও বিদ্রোপাত্মিক উল্লেখ করিতেছি—

“তদুভয়মপ্যসং” (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)—“বৌদ্ধের এ দুই আশঙ্কাও ‘অসং’ অর্থাৎ সাধু নহে।”

“অহো পাণ্ডিত্যং মহদর্শিতম্” (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)—“অহো! বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন!”

আমি কেবলমাত্র “শঙ্কর-দর্শন অসার অযৌক্তিক, তাহা শিক্ষা দিতে আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি” এইমাত্র বলিয়াছি। ‘বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি’ বলায় কি যত কটুক্তি করা হইল? অবশ্য আচার্য্য শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি পূর্বোল্লিখিত উক্তিগুলিকে নিশ্চয়ই অসঙ্গত উক্তি নয়

বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, মতভেদের ক্ষেত্রে স্বমতের প্রতি নির্ণায়ক এইরূপ উক্তির কারণ। তজ্জন্ম আমরাও ইহাকে হেয়-জ্ঞান করি না। মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এবিষয়ে আমাদের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিষ্মু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বাস্তহারার মর্ম-কথা

আজ যেদিকে চাই, সেদিকেই কেবল বাস্তহারার কাতর-ধ্বনি শুনিতে পাই। সাত পুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মায়ার নিগড়ে বাঁধা নিত্যকাল ভোগের আশায় মরীচিকা-লুকা তৃষ্ণার্ত হরিণীর গায় ক্রমাগত সুখ-লাভের কল্পনায় নিশ্চিন্ত নীড় বাঁধিয়া পত্নী-পুত্রাদি-সহ কাল-যাপন করিতেছিলাম। কিন্তু হায়! কোথা হইতে নিজ নিজ কর্মদোষে নিয়তির দুর্লভ্য বিধানে এক বিপর্যয়ের ঝড় উঠিয়া মুহূর্ত মধ্যে আমার আশা-ভরসামূল—সুখের স্বপনে গড়া নীড়খানিকে ওলট-পালট করিয়া চুরমার করিয়া দিল। আমার জীবন দিয়া তৈরি করা বহুকালের স্মৃতির উৎস—বহু যত্নের গৃহখানিতে আমার আর থাকিবার অধিকার রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে গৃহহীন হইলাম এবং তৎসঙ্গে জীবনও বিপন্ন হইতে চলিল। দু’দিন আগে সব ছিল, কিন্তু এখন কিছুই নাই। আমি এখন গৃহহীন বাস্তহার। বহু আদর-যত্নে লালিত-পালিত স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। আমার ইচ্ছামত শান্তি-লাভের নির্ভয় আশ্রয় আর কোথাও হইতেছে না। রাজ-দরবারে কাতর প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। বাহারা একদিন বহুলোকের পরিচালক ও অন্নদাতা ছিলেন, তাহারা আজ অন্তের দ্বারে অনুরোধপ্রার্থী ও অন্তের কান্দাল। নিয়তির খেলা বুঝিবার উপায় নাই। যদিও শরীরে শক্তির অভাব নাই, অটুট দেহ, সেই সব আত্মীয় পরিজন সকলই বর্তমান আছে, কিন্তু নিজ-স্থান হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার পূর্বের কথা বা পূর্ব-পরিচয়ের অবস্থা আর কার্যকরী হইতেছে না; অধিকন্তু অত্যন্ত হীন অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে যে, নিজ আশ্রয় হইতে বা বাস্ত হইতে বিতাড়িত হইলে রাজাও সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন। ইহাই জগতের নিয়ম ও কালের গতি। বর্তমানে এই

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতের সর্বত্রই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি আমরা বাস্তহারা হইয়া এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি।

একবার চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদের এই দুর্গতির কারণ কি? আমরা এই বাস্তহারা কতদিনের? কেহ বা দশবছরের, কেহ বা বিশবছরের, কেহ বা পঞ্চাশ কি একশ বছরের বাস্ত গড়িয়া তাহাতে বসবাস করিতেছি এবং বাস্তুর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছি। এই কএক বছরের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট গৃহখানি ছাড়িয়া আসার জন্য দুঃখে আগার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে এবং সর্বদা হা-হতাশ করিয়া অশান্তির সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, আমরা সকলে এ-জগতে আপাত-সুখময় ভোগ-নির্লয়ে কতদিন বাস করিয়া জগৎকে ভোগ করিবার সুযোগ পাইব। কেন-না, আমাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কোন এক অদৃশ্য শক্তির নিঃস্বর্ণ লগুড়াঘাতে আমাদেরকে বহুযত্নে পাতান এই সংসার হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে—আমার কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। তাই নিরন্তর চিন্তা হয়—ইহার কারণ কি? এবং ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় কি? কেনই বা আমাকে শোক-মোহ-ভয় সর্ব-সময়ে জর্জরিত করিতেছে? কোথায় বাস করিলে আমাদেরকে আর এই প্রকার বাস্তহারা হইয়া ভবঘুরের মত জগৎ-ভ্রমণ করিতে হইবে না? কে আমাকে সে সন্ধান বলিয়া দিবে?

এখন ‘বাস্ত’ শব্দটির অর্থ জানিতে গিয়া দেখি—শব্দটি ‘বস্’ ধাতু + ‘তুন্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেখানে নিত্যকাল বাস করা যায়, তাহাকে বসতিস্থল বলা হয়। সেই বসতি-স্থল যেখানে অবস্থান করে, তাহাকে বাস্ত বলে। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই সেই বাস্তব-বস্তু পরম পুরুষ, পরাংপর তত্ত্ব, বিশ্বভাবন, জগন্নিবাস, অখিল-রসায়ন-মূর্তি, সচ্চিদানন্দময়তত্ত্ব, পরমেশ্বর, ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এক অংশেতে অবস্থান করিতেছে। নিজ বিভূতির পরিচয়-প্রদানে সখা অর্জুনকে বহু কথা বলিবার পর ভগবান্ শেষ কথা বলিতেছেন—

অথবা বহুর্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কুংস্মেমকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥(গীতা ১০।৪২)

অর্থাৎ হে অর্জুন! আমিই এক অংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। অর্থাৎ একমাত্র আমারই এক অংশে সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে।

অর্জুনের সংশয় ছেদন করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ মূর্তি দর্শন করাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার দেহ-মধ্যেই অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত

কোটি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, আদিত্য, বসু, পাবক, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থান করিতেছে। তদর্শনে অর্জুন কৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,—

অমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,

ত্বমস্মি বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা,

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে । (গীতা ১১।১৮)

[অর্থঃ—আপনি পরমজ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব ; আমি এই বিশ্বের পরম-নিধান ; আপনি অব্যয়, আপনি সনাতন-ধর্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ ।]

অর্জুন আবার ভীত হইবার ছলনা করিয়া বলিতেছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,

নমোহস্ত তে দেববর প্রদীদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাশ্রুং,

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ (গীতা ১১।৩১)

[অর্থঃ—উগ্ররূপ আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন ; হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ।]

অতএব সর্বমাত্ম সর্ব-পূজ্য গীতা-শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আদি কালের নিত্যশ্রয়-স্বরূপ বসতি-স্থল—শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্ম ।

শাস্ত্রে অনন্ত-শক্তিমান্ স্বরাট-পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের অনন্ত কোটি শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে—

অনন্তশক্তির-মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান ।

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫২)

তটস্থা-শক্তিপ্রসূত জীব ভগবানের অংশ, কণা-স্বরূপ । সেই অণু-চৈতন্য জীব যে-দিন তাহার নিত্য কালের আশ্রয় শ্রীহরি-পাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্রতা-বুদ্ধি-বশে নিজ-স্বরূপের পরিচয় ‘কৃষ্ণদাস্ত’ বিস্মৃত হইয়াছে, সেদিন সে নিজেকে কৃষ্ণ-ভোগ্য-জগতের ভোক্তা মনে করিয়া জগতের প্রভু সাধিয়াছে । এই কারণে ভগবানের বিমোহিনী বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবী তাঁহার প্রহেলিকায় আপাত-

মধুর ভোগময় চাকচক্যে পরিপূর্ণ সংসার কারাগারে জীবকে নিক্ষেপ করিলেন ।
তখন হইতে তাহার কপাল ভাঙ্গিল—সে প্রকৃত বাস্তব হইল ।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল ।

এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

তখন তাহার দুবুদ্ধির শাস্তি-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী দুর্গাদেবী তাঁহার জগৎ-
শাসিত প্রভাব বিস্তার করিয়া সেই জীবকে তাঁহার আবরণাত্মিকা শক্তিদ্বারা
তাহার স্বরূপ-ভ্রান্তি করাইয়া ত্রিগুণময়ী জগতে প্রেরণ করিলেন ।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহিস্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

সেই হইতে নিজ-স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া আপন নিলয় হইতে সে বিতাড়িত
হইল বা বাস্তব সন্ধান ভুলিয়া গেল । নিজ-স্বরূপ-বৃত্তি আচ্ছাদিত হওয়ায়
ভোগপর বাসনা লইয়া অবাস্তব কার্য-সিদ্ধির মানসে দেহ-মনের সুখ-শাস্তি-বিধানে
সে তখন জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হঞা ভোগ-বাস্তব করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (প্রেমবিবর্ত ৬।২)

তাহার ফলে তাহাকে মায়া-কবলিত হইয়া কক্ষচ্যুত তারকার গায় ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিতে করিতে এই অশান্তিময় রাজ্যে জাড়াইয়া পড়িতে হইল । লক্ষ লক্ষ
যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে সে কতস্থানে কত জন্মে কত 'বাস্তব' গড়িয়া বসিল ।
এইরূপে স্থান-জন্মাদি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বকৃতি বা পুণ্যফলে অবশেষে কোন
কোন জীব পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-দেহ লাভ করিল ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক

বন্দন

বন্দ্ + ভাবে অনট্ প্রত্যয় করিয়া ‘বন্দন’ শব্দ নিষ্পন্ন ; অভিবাদন, স্তব ও প্রণামার্থে বন্দন শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে । বন্দন অর্থে যদি অভিবাদন বুঝি, তাহা হইলে নামোচ্চারণপূর্বক নমস্কার করাকে বন্দন বুঝায়, যদি স্তবকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে বাক্যদ্বারা প্রশংসা বা গুণ-কীর্তনকে বন্দন বুঝায়, আর যদি প্রণামকে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয়-হেতু অহং-মমতাশূন্য হইয়া বন্দনীয় বস্তুর শ্রীচরণ-যুগলে প্রকৃষ্টরূপে শরণাগত হওয়া বুঝাইয়া থাকে । প্রকৃষ্টরূপে শরণাগত বা প্রণিপাত না করিলে ভগবৎকৃপা লাভ স্বদূর-পরাহত, সেজন্য ভগবানের অপর নাম প্রণতপাল বা শরণাগত-পালক । বন্দন ভিন্ন অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না, সেজন্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদির প্রথমেই ইষ্টদেবকে বন্দনা না করিয়া কোন শাস্ত্র-প্রণেতা বা গ্রন্থকার লেখনী সংযোগ করেন নাই । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রথমেই এইরূপ বন্দনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন—

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।

তং প্রকাশান্ত তচ্ছক্ৰীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।১)

তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ ব্যাখ্যামুখে স্বীয় আরাধ্য বিগ্রহত্রয়ের স্মরণে অভীষ্টসিদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গ্রন্থের আরম্ভে করি ‘মঙ্গলাচরণ’ ।

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ।

অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।২০-২১)

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সর্বপ্রথম স্বীয় আরাধ্য বস্তুর বন্দনা না করিলে বিঘ্নাপসারণ হয় না ও অভীষ্ট-পূরণ হইতে পারে না । এখানে গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট বিঘ্নাপসারণ হইতেছে—কৃষ্ণ-ভক্তির বাধা-স্বরূপ শুভাশুভ কৰ্ম্ম প্রভৃতির নিরসন এবং অভীষ্ট-পূরণ হইতেছে—নিত্য নির্মল কৃষ্ণ-চরিত গুণগান করিতে করিতে নিত্যকাল নাগানন্দে মগ্ন হইয়া থাকা বা কৃষ্ণনাম-মধুপানে মত্ত অলিবৃন্দকে নিত্য নাম-প্রেমবশে নিগঞ্জিত করিয়া রাখা । ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উদ্দিষ্ট মনোঃভীষ্ট পরিপূরণ । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন—

শ্রীগুরু-চরণপদ,

কেবল ভকতি-সদা,

বন্দোঁ মুক্তি সাবধান মতে ।

যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥

* * * *
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন ।

হাহা প্রভো ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুস্কক ত্রিভুবন ॥

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেইদিকেই বন্দনার কথা ছাড়া আর কোন কথাই
নাই । পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশে লে বুলিয়াছেন—

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্তদর্শিনঃ ॥ (গীতা ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সেই পরমতত্ত্ব বেদ-প্রতিপাত বস্তুকে
জানিবার জন্ম সচেষ্ট হও । এই শ্লোকেও প্রথমে প্রণিপাত শব্দটি ব্যবহার
করিয়াছেন ।

বন্দনের অপর অর্থ প্রণিপাত বা প্রণাম, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—

তৎপাদপদমপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ ।

প্রণামো বাহুদেবশ্চ বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ (হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।১)

ভগবৎপাদপদে অমুরক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের কায়, মন ও বাক্য দ্বারা প্রণামকেই
তত্ত্বদর্শিগণ বন্দন বুলিয়া থাকেন । এই 'বন্দন' দ্বারা ভক্তাগ্রগণ্য মহামতি অক্লুর
শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । নিকট ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের নিকট সর্বদা
প্রার্থনা করিয়া থাকেন—হে ভগবন্ ! আমরা বিষয়-সুখের জন্ম অথবা গুরুতর
কুস্তীপাক কিংবা অন্ম নবক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্ম আপনার চরণ-যুগল
বন্দনা করি না ; কিংবা নন্দন কাননে সুন্দরী সুর-ললনাগণের সুকোমল তম্বুলতা-
সমূহে বিহার করিবার জন্মও আপনার চরণ-যুগল বন্দন করি না ; কিন্তু কেবল
ভক্তির প্রতি স্তরে বিলাস করিবার জন্ম আগাদের হৃদয়-মন্দিরে আপনার
শ্রীশ্রীপাদপদ-যুগল বন্দনা করিয়া থা কি । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র
কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্মই ভগবদ্ভক্তগণ, কৃষ্ণ ও তদীয় প্রকাশবিগ্রহ বলদেবাভিন্ন
নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ-যুগল কায়মনোবাক্যে বন্দনা
করিতে আদেশ দিয়া থাকেন ।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্যয়তে গিরিমে ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥”

পরম-করণাময়,

দীন-হীন-জনাশ্রয়,

তুমি দেব ! গৌর-নিজ-জন ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজশক্তি,

গৌরবাণী-কৃপামূর্তি,

জগ-মাঝে তব আগমন ॥ ১ ॥

“পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম,

সর্বত্র প্রচার হ'বে মোর নাম”—

করিতে সফল এই গৌর-কাম,

বিবিধ উপায় করিলে সৃজন ॥ ২ ॥

ভুলি' নিত্য প্রভুসেবা শ্রীহরির,

তাঁর দত্ত ধনে সাজি' ভোগীবীর,

হেরি এই দশা হইয়া অধীর,

বিতরিলে কৃপা অপূর্ব কখন ॥ ৩ ॥

মহিমা তোমার গায় পাখী বনে,

গুঞ্জরে অলি কুসুম-কাননে,

তোমার চরণ-পদ্য মধুপানে,

জীবের অশুভ করে পলায়ন ॥ ৪ ॥

লভিয়া তোমার পদরেণু-কণা,

অবশ্য পাইব শ্রীগৌর-করণা,

হৃদয়ে হৃদয়ে সেবার প্রেরণা,

বিতরিছ প্রভো নব জাগরণ ॥ ৫ ॥

জনক হইতে বৎসল অতি,

স্নেহশীল সদা জীবগণ প্রতি,

অঙ্গকান্তি স্বরূপ সৌম্য মূরতি,

পাপী-তাপী বাঞ্ছে তোমার দর্শন ॥ ৬ ॥

জড়দেহে আত্ম-বুদ্ধি করি' হায়,
বিষয়ের মাঝে ছিনু মত্ত তায়,
হেন জনে দেব ! তুমি ত' কৃপায়,

কৃষ্ণ-সেবা তরে মঠে দিলে স্থান ॥ ৭ ॥

গোলোকের নিধি শ্রীহরির নাম,
শ্রীবিগ্রহ-সেবা মন-অভিরাম,
করিয়া প্রকট নিজ 'ইচ্ছা-কাম'

সেবা-অধিকার করিলে অর্পণ ॥ ৮ ॥

হে মোদের নিত্য আরাধ্যদেবতা,
গাহিতে তোমার করুণা-বারতা,
সুদুর্বলা ভাষা না পায় ক্ষমতা,

মহিমা তোমার করিতে বর্ণন ॥ ৯ ॥

(তব) অমন্দ-উদয়া দয়ার জলধি,
কৃপা-তরঙ্গিতে শোভে নিরবধি,
যাঁর এককণার না পাই অবধি,

কিরূপে করিব লহরী গণন ॥ ১০ ॥

তুলনা-রহিত যে দয়ার বশে,
করিলে উদ্ধার এ-অধম দাসে,
সেই দয়াগুণে শ্রীচরণ-পাশে,

নিয়ত সেবায় কর নিয়োজন ॥ ১১ ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রের্য ভূতলে ।

॥ শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবায় নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

সেবকাধম—

—শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীযুত মুখার্জি মহাশয়ের বেষাশ্রয়

আমরা বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ ত্রিগুণাভীত ব্রহ্মচারী প্রভু, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুরের নিকটবর্তী সিধাবাড়ী গ্রামস্থ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের সেবা ও গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য পরিচালনোপলক্ষে তথায় অবস্থিতিকালে, বিগত ২৭শে বৈশাখ, ১১ই মে শুক্রবার—উক্ত মঠের নবনিৰ্ম্মিত গৃহ-প্রবেশ দিবসে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে ভেকাশ্রয় (বাবাজী-বেষগ্রহণ) করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের

সাক্ষাতে শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকৃত সাহিত্যশাস্ত্র ‘সং-ক্রিয়াসার-দীপিকা’র পরিশিষ্ট ‘সংস্কার-দীপিকা’ অনুসারে যাব-তীয় ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীপাদ ত্রিগুণাভীত ব্রহ্মচারী প্রভু পূর্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত স্তার আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের নিজবাটী ‘বলাগড়’ গ্রামের বিখ্যাত মুখার্জি পরিবারভূক্ত “শ্রীত্রি-পাণাথ মুখোপাধ্যায়” নামে পরিচিত ছিলেন। তদনুসারে তাঁহার গৌরবময় বংশোপাধির উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে “মুখার্জি মহাশয়” বলিয়া সম্মান-সম্বোধন করিতেন। কৌপীন-বহির্বাসাদি দ্বারা বেষ



গ্রহণ করিবার পর তিনি শ্রীমৎ ত্রিগুণাভীত-দাস বাবাজী মহারাজ

নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্তমান বয়ঃক্রম অল্পমান ৬০ বৎসরের উদ্ধ। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত একনিষ্ঠ সেবকগণের অগ্রতম। তাঁহার গুণাবলীর কথা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। আকুমাৰ ব্রহ্মচারী থাকিয়া নিষ্কপটে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ও পূর্বকার “শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনের” যে-সমস্ত সেবাদি করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবাত্রী দর্শন করিয়া পরশ্রী-কাতর গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী-সম্প্রদায় নানাপ্রকারে তাঁহাকে সেবাচ্যুত করিতে বিপুল চেষ্টা করিলেও তিনি অচল ও অটলভাবে যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের অল্পসংখ্যের বিষয়। একনিষ্ঠ গুরুসেবক শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইলে তিনি যেভাবে তাঁহার যত্ন ও শুশ্রূষাদি করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি এই স্পষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈষ্ণবসেবার জীবনের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শন ভোগেরই কারণ। মায়াবদ্ধ জীব সামান্য অর্থ-সম্পত্তি, ঐহিক সুখ ও অনিত্য লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্ত সৈনিকরূপে নানাপ্রকার যুদ্ধাদিতে কামানের গুলীতে অথবা সমুদ্র মধ্যে জীবন বিসর্জন করিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবসেবার জন্ত নিজ জীবনকে একরূপ তুচ্ছজ্ঞান করা বৈষ্ণব-জগতের একটী উজ্জ্বল আদর্শ। আমরা একরূপ মহামুভব বৈষ্ণবের সর্বদাই জয়গান করিব।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসব

গত ২৭শে বৈশাখ, ১১ই মে শুক্রবার দিবসে—শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমন্তকৃষ্ণ কুশল, নারসিংহ মহারাজের পৌরহিত্যে এতদুপলক্ষে নাম-সংকীর্্তন ও বৈষ্ণব-হোমাদি ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন হয়। গ্রামবাসিগণের মধ্যে কয়েকজন এই মঠের ভূমি দান করিয়া এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার সমিতির বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। পঞ্চাশতাবধিক গ্রামবাসী ও অগণিত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মঠ প্রতিষ্ঠাকালে গ্রামবাসীদিগের উৎসাহ ও চেষ্টার জন্ত আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাঁওতাল-পরগণায় হরিকথা প্রচার

‘পাঞ্জনীয়া’ গ্রামনিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত ভাগবতপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ আট মূর্তি ও সিধাবাড়ী গ্রামের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় সমভিব্যাহারে উক্ত গ্রামে শুভ-বিজয় করত গত ৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে পর্যন্ত দিবসত্রয় পাঠ, কীর্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও পরিপ্রশ্নোত্তরমুখে প্রচুর হরিকথা কীর্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষ দিবস গ্রামবাসী-দিগের অত্যন্ত আগ্রহে নিয়ামক-মহারাজও কৃপাপূর্বক বহুবিধ উপদেশ-মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুত ভাগবত-প্রসাদ মহোদয় সঙ্গীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত ও অনুগত জন। তদ্রূপে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রচারফলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানিসমূহ বিদূরিত হউক—ইহাই তাঁহার একান্ত চেষ্টা। আমরা তাঁহার এই মহতী চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি।

কাকদ্বীপে প্রচার

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে এবং ৭ই জ্যৈষ্ঠ ২২শে মে তারিখে কাকদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় সেবাপ্রমের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শোভাযাত্রাযোগে নগর-সংকীর্তন, পাঠ, কীর্তন, সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ন্যূনাধিক অষ্ট সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহারা সমিতির প্রচার-কার্য্য দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় মঙ্গল মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীযুত ধরনীধর পড়ুয়া মহোদয় সমাগত ব্যক্তি-দিগকে যথাযোগ্য আদর-যত্নে আপ্যায়িত করিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ও সেবায়োক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবিজয় মঙ্গল মহারাজ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ এবং অত্র ৩ জন সেবক সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং আহূত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাননীয় সার্কেল অফিসার শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ, বি, সি, এস মহোদয় এই সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সিভিল-সাপ্লাই ইন্সপেক্টর শ্রীযুত স্মৃথময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র জানা বি-এ, শ্রীযুত অরিনাশচন্দ্র শাসমল বি-এ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুত ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ধরনীধর পড়ুয়া জমিদার প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অষ্ট সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সুবিস্তৃত সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ ছিল।

সর্বপ্রথমে—সেবাশ্রমের সম্পাদক মাননীয় মঙ্গল মহারাজ আশ্রমের ইতিহাস বক্তৃতামুখে বর্ণন করিয়া সভাপতি মহারাজের পরিচয় ও আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপর **দ্বিতীয় বক্তা** ডাক্তার শ্রী ত ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জ্ঞাপনমুখে ‘সোহহং-বাদ’, ‘জ্ঞান’, ‘ভক্তি সহজ’ প্রভৃতি কয়েকটি উক্তি করেন। (সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতায় ইহার উত্তর দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় বক্তা মাননীয় সার্কেল অফিসার মহোদয় স্থানীয় জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—মনুষ্য-জীবনের ধর্মের আবশ্যকতা সর্বোচ্চে—ইহা উপলব্ধি করিয়া আপনারা যেরূপ উৎসাহভরে অত্র এই ধর্মমণ্ডপে সমাগত হইয়াছেন তাহা দর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; পরবর্তীকালেও আপনারা ধর্ম-জীবন-যাপনে যেন এইরূপই উৎসাহশীল থাকেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

চতুর্থ বক্তা—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় “কর্মাণ্যারম্ভমাণানাম্ দুঃখহত্যৈ সুখায় চ” শ্লোকের উপদেশানুসারে বক্তৃতামুখে জানান যে, মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক বস্তুদ্বারা সুখলাভ করার যে চেষ্টা, তাহা বিপরীত ফল উৎপন্ন করিয়া কেবল দুঃখই আনয়ন করে। নশ্বর বস্তুদ্বারা চেতন জীবাত্মার কখনও প্রীতিলাভ সম্ভব নহে। ভগবদ্ভক্তজনেই জীবাত্মার প্রীতি অবস্থিত। তজ্জগৎ মায়িক বস্তুদ্বারা প্রীতিলাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করত কায়মনো বাক্যে গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

গুরুদেবতায় হইয়া পরম চেতন-বস্তু শ্রীভগবানের সেবা করিলে প্রকৃত সুখলাভ সম্ভব হইবে। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আরও বলেন জাগতিক দুঃখ-দারিদ্র্য ধর্মযাজনের প্রতিবন্ধক নহে ; দুঃখ-দারিদ্র্য বিদূরিত হইলে ভগবদ্ভজন সম্ভব হইবে—ইহা সত্য নহে। দুঃখ-দারিদ্র্য কেবল বর্তমান সময়েই উপস্থিত তাহা নহে। পরন্তু এই অবস্থাগুলি আবহমানকাল হইতেই অবস্থিত। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল না—এরূপ নহে। দ্বাপরযুগে সূদামা বিপ্র অতীব দরিদ্র ছিলেন, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীধরকে আমরা দরিদ্র দেখি, কিন্তু তাঁহারাই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্য ভগবদ্ভজন না করার কারণ নহে। প্রকৃত সংসঙ্গের অভাবই ভগবদ্ভজনের বিমুখতার কারণ।

সর্বশেষে—সভাপতি-মহারাজ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট এবং প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ-বিষয়ে অগহিত করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপে মুগ্ধ না হইয়া আশ্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহা পালন করিতে অনুরোধ করেন। “সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম” আগামী সংখ্যায় পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে। তিনি এতদেশে তিন দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও পরিপ্রশ্নোত্তরমুখে শত শত নরনারীর নিকট নিরন্তর শ্রীহরিকীর্তন করেন। তাঁহার শুভ-বিজয়ে জীমূত-বারি ও কীর্তন-বারি যুগপৎ বর্ষিত হইয়া এতদেশকে অশীতল করে। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম ও তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে তিনি বিশেষ আনন্দিত হন। বিশেষতঃ সার্কেল অফিসার শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, বি, সি এস মহোদয় এবং শ্রীযুত সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ—সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টর মহোদয়ের ব্যবহারে তিনি অতীব আনন্দ লাভ করেন। পরিশেষে তিনি আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ও সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

—পণ্ডিত শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

প্রচার-সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; আষাঢ়—১৩৫৮

২৬ ত্রিবিক্রম, ১ আষাঢ়, ১৬ জুন, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১৩১। পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর উপবাস। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর তিরোভাব।

২৭ ত্রিবিক্রম, ২ আষাঢ়, ১৭ জুন রবিবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১১২৩।

দিবা ৯।২২ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীপাঠ পানিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব ।

২৯ ত্রিবিক্রম, ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ৬।৩৬ । শ্রী শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা । শ্রীল মুকুন্দদত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব ।

১ বামন, ৫ আষাঢ় ২০ জুন, বুধবার—কৃষ্ণ-প্রতিপদ্ব দি ৪।৭ । শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, গোপীবল্লভপুরে উৎসব ।

৫ বামন, ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন, রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২৯ । শ্রীল বাকেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব ।

৯ বামন, ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দশমী রা ৩।৪১।৮ । শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব ।

১১ বামন, ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন, শনিবার—কৃষ্ণেকাদশী প্রাতঃ ৫।৩৬ । যোগিনী একাদশীর উপবাস ।

১২ বামন, ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৬।৫৮ । দিবা ৬।৫৮ মধ্যে একাদশীর পারণ ।

১৫ বামন, ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই, বুধবার—আগাবস্থা দি ১২।৩৯ । শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব । নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব । চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অজ্ঞ হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব ও শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে একাদশদিবস ব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ ।

১৬ বামন, ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার—গৌর-প্রতিপদ্ব দি ২।৩৩ । শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।

১৭ বামন, ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই, শুক্রবার—গৌর-দ্বিতীয়া দি ৪।১৩ । শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা । শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর তিরোভাব ।

২১ বামন, ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই, মঙ্গলবার—গৌর-ষষ্ঠী রা ৬।৩০ । হেরাপঞ্চমী, শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় ।

২৫ বামন, ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, শনিবার—গৌর-দশমী দি ১।১৮ । শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা । শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহামহোৎসবের সমাপ্তি ।

২৬ বামন, ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই, রবিবার—গৌরেকাদশী দি ১।১০ । শয়নৈকাদশীর উপবাস । সন্ধ্যায় শ্রীহরিয় শয়ন ।

২৭ বামন, ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৫১ । দিবা ৮।৫১ মধ্যে একাদশীর পারণ । দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্দশ্য-ব্রত আরম্ভ ।

২৮ বামন, ৩২ আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ৬।২৪ । কর্কট সংক্রমণারম্ভপক্ষে চাতুর্দশ্য-ব্রত আরম্ভ ।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,

জেঃ ভগলী (পশ্চিম বঙ্গ)

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮, ইং ৯/৬/৫১

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যকুলতিলক ঔবিষুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১৯শে আষাঢ় ১৩৫৮, ইং ৪ঠা জুলাই ১৯৫১, বুধবার হইতে ২৯শে আষাঢ় ১৩৫৮, ইং ১৪ই জুলাই ১৯৫১, শনিবার পর্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুরূতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিঃ প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, বুধবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঔষিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন ।

২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার—নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন ও স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা ।

২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শুক্রবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা । সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত । পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীর মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্ত্তন ।

২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, শনিবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা ।

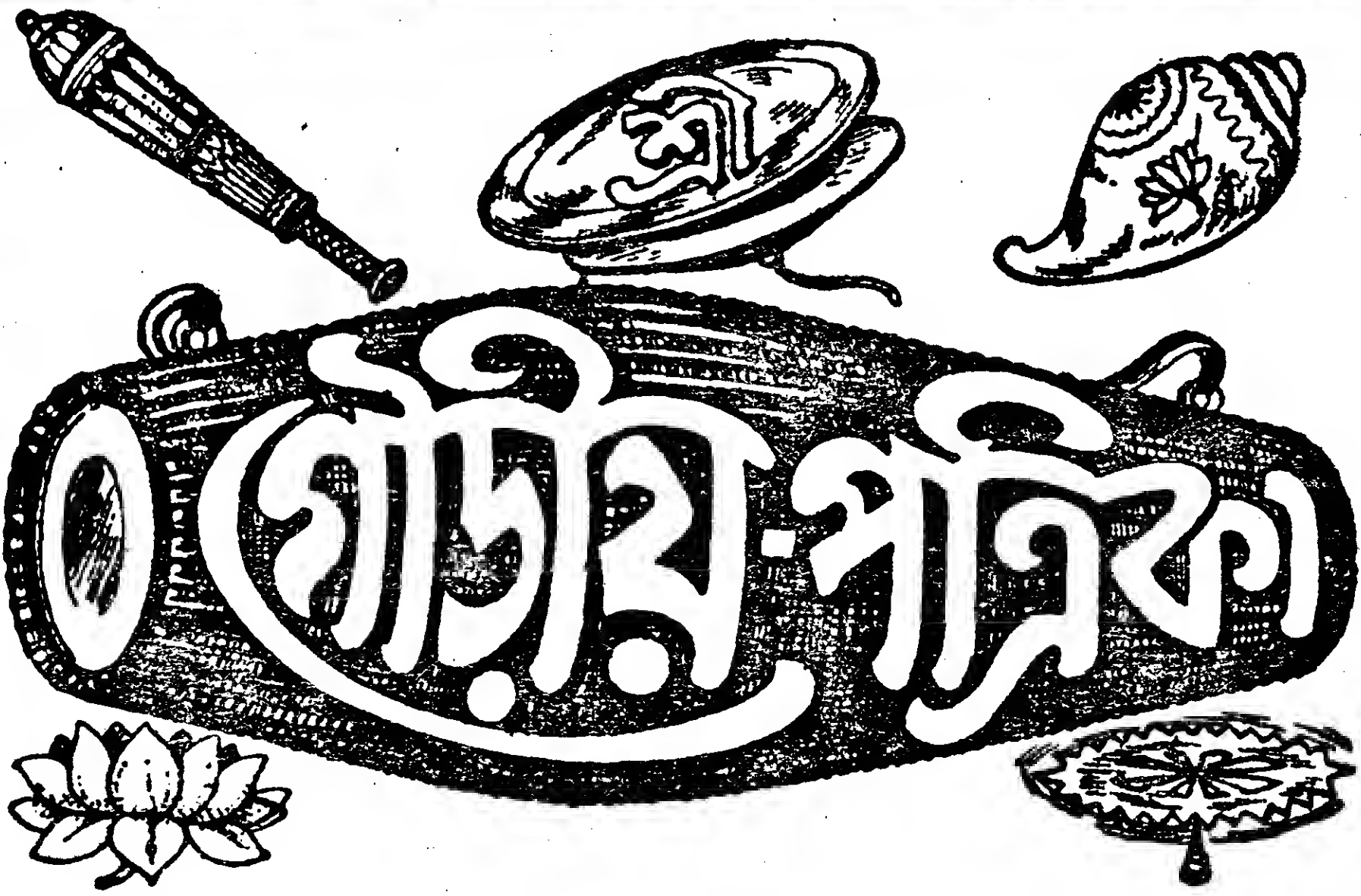
২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব । পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও নগর-সংকীর্ত্তন । অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, বুধবার হইতে ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকাতে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা ।

২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, শনিবার—সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত । পরে আরাত্রিকাতে সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	প্রদ্যুম্ন, ২৮ বামন, ৪৬৫ গৌরাক্ষ মঙ্গলবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৫৮ ; ইং ১৭৭৭।৫১	৫ম সংখ্যা
----------	---	-----------

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম্

Published
2/4

[ইতি স্তবাস্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।

ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রা-সুন্দরং যযৌ ॥ ৫১]

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-স্তোত্রম্—

১। জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি ।

কার্য্য-কারণ-কর্ত্তী ত্বং সর্ববশক্তো নমোহস্তু তে ॥৫২॥

২। সর্ববশ্য হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞান-মোহাত্মিকে সদা ।

কৈবল্য-সুখদে ভজে ত্বাং নমামি সুরারণিম্ ॥৫৩॥

- ৩। দেবি ত্বং বিষ্ণু-মায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্ ।
হৃৎপদ্মাসন-সংস্থাসি বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি ॥৫৪॥
- ৪। ত্বমেব লক্ষ্মীগৌরী চ শচী কাভ্যায়নী তথা ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদাখিলাত্মিকে ॥
তস্মৈ সর্বস্মৈ শক্তিস্বং স্তোতুঃ ত্বাং কস্তু শক্তিমান্ ॥৫৫-৫৬॥
- ৫। জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্বব্যাং ভদ্র-দায়িনি ।
ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোহস্তু তে ॥৫৭॥
- ৬। ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ ।
স্ত্রী-রূপং সর্বমেব ত্বং পুং-রূপো জগদীশ্বরঃ ॥৫৮॥
- ৭। যুবয়ো ন হি ভেদোহস্তি নাস্ত্যন্যং পরমেব হি ।
যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণব-মায়য়া ।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরী ॥
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ ।
আশা ত্বমাশাপূর্ণা চ সর্ববাশা-পরিপূরিকা ॥৫৯-৬০॥
- ৮। মুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি বন্ধহেতুত্বমেব চ ।
সর্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥
ত্রাহি পাদাভলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গ-বিলোকনৈঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

[স্তব্ধেখং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে ।

চক্রং সুদর্শনং বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্ ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরং ॥ ৬৩ ॥]

শ্রীশ্রীসুদর্শন-স্তোত্রম্—

- ৯। সুদর্শনমহাশ্রাল কোটি-সূর্য্যসম-প্রভ ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্ব-প্রদর্শক ॥৬৪॥
- ১০। নমস্তে নিত্য-বিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্র-নিকেতন ।
অবাধ্য-বীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তুং-প্রণমাম্যহম্ ॥৬৫॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোহধ্যায়ে

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রের অনুবাদ

[কমলযোনি ব্রহ্মা, পরমেশ্বর বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে প্রণামপূর্বক অখিল জগতের ঈশ্বরী বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রাকে দর্শনার্থ তদীয় রথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥]

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-স্তোত্র—

১। হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বর! আপনিই কার্য্য-কারণ-কর্ত্তী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥

২। হে কৈবল্য-সুখদে! আপনি অখিল জীবের হৃৎপদ্ম-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন; হে জ্ঞান-মোহান্নিকে! আপনি সুরগণের অরুণি-স্বরূপ; অতএব হে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫৩ ॥

৩। হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়ী। হে বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি! আপনি কমলারূপে বিষ্ণুর হৃদয়-কমলে সতত বিরাজমানা ॥ ৫৪ ॥

৪। মাতঃ! একমাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, আপনিই শচী ও আপনিই কাত্যায়নী; অধিক কি বলিব, জগতে সদসং যে-কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎসমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাঙ্গিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ৫৫-৫৬ ॥

৫। জননি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা; অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক। হে ভদ্রকালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

৬। দেবি! আপনি—অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ—পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়-স্বরূপ ॥ ৫৮ ॥

৭। হে পরমেশ্বর! আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়ী আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃতি বলুন, প্রবৃতি বলুন, ক্ষুধা বলুন,

নিদ্রা বলুন, আশা বলুন, আর আশার পূর্ণতাই বলুন, সকলি আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৫৯-৬০ ॥

৮। মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং আপনিই তাহা-
দিগের ভব-বন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্বকামপ্রদা
কল্পলতিকা-স্বরূপ; অতএব হে ভক্ত-বংশলে! আমি আপনার চরণ-প্রাপ্তে
পতিত হইতেছি, আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৬১-৬২ ॥

[ভগবান্ কমলাসন, সুভদ্রাদেবীকে স্তব করিয়া তৎসমীপবর্তী রথস্থিত
বিষ্ণুর চতুর্থ শরীর সুদর্শন চক্রকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্বক
এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥]

শ্রীশ্রীসুদর্শন-স্তোত্রম্—

৯। হে মহাদীপ্তিশাসিন্ ‘সুদর্শন!’ হে কোটি-সূর্য-সম-প্রভ! তুমি অজ্ঞান-
তিমিরাক্ত ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠ-মার্গ-প্রদর্শক ॥ ৬৪ ॥

১০। (হে সুদর্শন!) তুমি প্রতিনিয়ত বিলসনশীল নানা প্রকার
বৈষ্ণবাস্ত্র-নিচয়ের আধার-স্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর
অনিবার্য্য-বীৰ্য্য মূর্তিস্বরূপ; তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৫ ॥

—উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে

শ্রীমূর্তি ও মায়াবাদ

জড়ীয় ভেদ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে; চিদ্রায় ভেদ বা
বিলাস নিত্য, সত্য বা সনাতন

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার বিচিত্রতা-ক্রমে বস্তু-
সমূহের পরস্পর বিশেষ-ধর্ম্মদ্বারা ভেদ প্রতীত হয়। মায়াবাদী বলেন—এই
জড়জগতে তাদৃশ ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে সেইরূপ চিদ্বিলাস নাই।
তদ্বিদ্গণ বলেন—চিদ্রাজ্যে নিত্য বিচিত্রতা আছে, জড়রাজ্যের বিচিত্রতা
অনিত্য। চিদ্রাজ্যে অদ্বয়-জ্ঞানদ্বারা বিচিত্রতা গঠিত, জড়মায়ায় রাজ্যে
দ্বৈত-জ্ঞানদ্বারা অথও অদ্বয়-জ্ঞান কাল-কর্তৃক ক্ষুর।

‘স্বপ্ন’ তাৎকালিক সত্য, ‘জাগরণ’ নিত্যসত্য ; তাহাতে দ্রষ্টা,
দৃশ্য ও দর্শন উপাদেয়রূপে নিত্যবর্তমান

স্বপ্ন-কালের প্রতীতি কর্তৃ-সত্তায় সত্য ও অনিত্য। জাগর-কালে স্বপ্নোৎপন্ন প্রতীতি অতীত-কালে কর্তৃ-সত্তায় অধিষ্ঠিত সত্য। স্বপ্ন-ভূমি অতিক্রান্ত হওয়ায় জাগর-ভূমিতে অনুভবনীয় বিষয়গুলির অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না। জাগর-ভূমিতে জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং অনুভূতি-যোগ্য বিষয়গুলি সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে। অর্থাৎ এখানে ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। চিদ্রাজ্যে বা আত্মজগতে চিদ্বস্তুর ত্রিবিধ শক্তিগত অধিষ্ঠান আছে। দ্রষ্টা নিত্যকাল নিত্যদৃশ্যকে নিত্য দর্শন করেন। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বস্তুত্রয়ই চিৎ এবং তাহাতে উপাদেয়তা ও আনন্দ-ধর্ম নিরবচ্ছিন্ন নিত্যকাল অবস্থান করে। মায়িক জগতে সচ্চিদানন্দ অনুভূতি অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দময়।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য ও অদ্বয়-জ্ঞানময় ; ব্রাহ্মণ,
যোগী ও ভক্তগণ সেই একই অদ্বয়-জ্ঞানের জ্ঞাতা ও উপাসক

শ্রীভগবান্ নিত্যবিচিত্র লীলাময়। তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলা অদ্বয়-জ্ঞানময়। তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু ; তাঁহার অনন্ত পরিকর নিত্যকাল প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। ভক্তগণের এই তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম-যোগসাধন-নিরত যোগীদিগের বা কেবল-জ্ঞান-নিরত ব্রাহ্মণগণের অভীক্ষিত না হইলেও সেই একই তত্ত্বকে সকলেই লক্ষ্য করেন। ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত সকলেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের জ্ঞাতা। যোগীও উপাসক।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তগণ পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ,
পরন্তু ভক্তই সর্বোত্তম-জ্ঞানী ও ব্রাহ্মণ

ভক্তগণ সকলেই ভক্তি-যোগী ও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসক। ইতর যোগী বা ইতর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। ভক্তগণের সহিত কর্ম্ম-যোগী ও জ্ঞান-যোগীর ভেদ আছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী-ব্রাহ্মণের ভেদ আছে। তাই বলিয়া ভক্ত-ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-যোগীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাস্ত বস্তুর অদ্বয় ও অখণ্ড-জ্ঞানে ভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেখানেই যোগী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভক্তগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিরোধ করিতে গিয়াই ইতর-ব্রাহ্মণ বা ইতর-যোগিগণ ভক্তকে অব্রাহ্মণ ও অযোগী বলেন। পক্ষান্তরে ভক্ত-ধারণায় ভক্তই সর্বোত্তম-ব্রাহ্মণ ও সর্বোত্তম-যোগী।

ভক্ত হরিসেবা ছাড়িয়া ইতর-কর্মময় যোগ এবং জ্ঞানময় যোগ এবং জ্ঞানময় কৈবল্য স্বাকার করেন না। ভক্তি-সংজ্ঞায় কর্ম ও জ্ঞানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীবিগ্রহকে মায়িক মনে করাই ‘মায়াবাদ’

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আছে। জড়বুদ্ধিতে কর্ম-মার্গীয়গণ বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে অদ্বয়-জ্ঞানের পরিবর্তে জড়-ধারণার প্রবর্তন করেন। মুমুক্শু জ্ঞানিগণও মায়াগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্বিগ্রহকেও ন্যূনাধিক মায়িক মূর্তি মনে করেন। মায়াবাদা বলেন—শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে; মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্তিতে নির্দিষ্ট বস্তু আহুত হন, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নির্দিষ্ট বস্তু; তাহার নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা নাই। তদ্বিদ্ বৈষ্ণবগণ বলেন—ইহাই উপাত্ত বিগ্রহের সম্বন্ধে মায়াবাদ।

দীক্ষা-প্রভাবে শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়

দীক্ষারূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্ভিত হইলে এই মায়াবাদ কুজাটিকার গ্রাস বিলীন হয় এবং মন জড়াবদ্বয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। পাপিষ্ঠ মায়াবাদিগণ বিষ্ণু-কলেশ্বরকে প্রাকৃত মনে করেন, কিন্তু তদ্বিদ্ দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিত্য নির্মল প্রীতিতে বিগ্রহ-বিগ্রহীর মধ্যে অখণ্ডজ্ঞানে দ্বৈত-বুদ্ধি নাই। মায়াবাদী বা কণ্ঠিগণ জড়ে চিৎ আরোপ করেন, নৈকর্ম্য-বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্তিতে আদৌ জড়ের ভোগময় অনুভূতি বুঝিতে পারেন না। প্রকটকালীয় বিগ্রহ ও অর্চা-বিগ্রহে বস্তুতঃ অখণ্ডজ্ঞান উদ্ভিত হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞান

স্মার্ত-কর্মী, যোগী, মায়াবাদী প্রভৃতির জ্ঞান—খণ্ডজ্ঞান

জ্ঞান কি?—এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন যে, মানবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় স্পর্শ করিয়া যে অনুভূতি লাভ করে, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগসিদ্ধির দ্বারা যে-সকল অনুভূতি হয়, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মানুভূতিই জ্ঞান। বিলাতে কোন কোন পণ্ডিত জ্ঞানকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগকে Knowledge এবং অপর ভাগকে

Wisdom বলেন। বস্তুতঃ ঐসমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেন না। খণ্ডার্থ লইয়া বাগাড়ম্বরে কালযাপন করেন।

জ্ঞানের অভাবে জ্ঞেয় নিরর্থক

বস্তুতঃ জ্ঞানই জগতে একমাত্র তত্ত্ব। জ্ঞেয়-বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইলেও জ্ঞানাভাবে জ্ঞেয়-বস্তু নিরর্থক হয়। সুতরাং সর্বদেশে এবং সর্বশাস্ত্রেই জ্ঞানের অপরিসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পরস্পর সম্বন্ধ

‘জ্ঞান’-শব্দ উল্লেখ করিতে গেলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার পৃথক্ পৃথক্ ভাব উদয় হয়। যিনি অনুভব করেন, তিনি পরিজ্ঞাতা। যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা জ্ঞেয়। অনুভব-কার্য্যই জ্ঞান। আবার পরিজ্ঞাতা অণুর দ্বারা অনুভূত হইলে জ্ঞেয়-শ্রেণীভুক্ত হন। অপর জ্ঞান দ্বারা আলোচিত হইলে জ্ঞানও জ্ঞেয়-বস্তু হয়। জ্ঞেয়-বস্তু যখন অন্য বস্তুকে অনুভব করেন, তখন তিনি পরিজ্ঞাতা। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং সম্বন্ধতঃ তিন বস্তু।

‘সম্বন্ধ’ ব্যতীত ‘স্বরূপে’র বিচারে অনর্থের উৎপত্তি

স্বরূপকে সম্মান করত সম্বন্ধকে হেয়-জ্ঞান করা অন্ত্যায়। কেন না, স্বরূপ মাত্রেরই সম্বন্ধ-ভাব নিত্য। একটি অথও স্বরূপ মাত্র স্বীকার করিয়া সম্বন্ধ-সকলকে অস্বীকার করিলে তত্ত্বের চরিতার্থতা হয় না। এই কথাটি সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিয়াই মায়াবাদ, বিবর্তবাদ বা কেবলমুদ্রিতবাদ-রূপ মহা-অনর্থ জীবের হৃদয়ে উদ্ভিত হয়। স্বরূপ ও সম্বন্ধ উভয়ই যুগপৎ নিত্য। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা স্বরূপতঃ এক অথও-তত্ত্ব হইয়াও সর্বদা সর্বস্থানে পৃথক্রূপে বর্তমান। এবম্বিধ বিপরীত ব্যাপার কেবল ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি হইতেই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জীবের পরিসীম জ্ঞানে তাহা উপলব্ধ হয় না।

জীবে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্ব

পরমেশ্বর পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ। জীব সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ। পরমেশ্বরের জ্ঞান আমাদের আলোচ্য নয়। জীবের জ্ঞান আমাদের পক্ষে আলোচ্য। অতএব আমরা জীব-জ্ঞানের আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, জীবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতৃত্ব নিত্য বর্তমান আছে।

বদ্ধ ও মুক্ত জীবদ্বয়-মধ্যে বদ্ধজীবের জ্ঞানই আলোচ্য

জীব-জ্ঞান ত্রিবিধ। জীব যাহা অনুভব করিতে পারেন, তাহাই জীব-জ্ঞান। জীব মুক্ত-বদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। মুক্তজীব পরমেশ্বর-প্রসাদ লাভ করিয়া কতদূর

অনুভব-রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন, তাহা আমরা বিচার করিতে সক্ষম নই। কেবল বদ্ধজীবের অনুভব সম্বন্ধে আগাদের বিচার চলিতে পারে।

স্থূল-জ্ঞান ও লিঙ্গ-জ্ঞান-চিন্ময় নহে

বদ্ধজীব জীবের স্বরূপ, লিঙ্গরূপ ও স্থূলরূপ—এইপ্রকার তিনটি পৃথক পৃথক সত্তা আছে। স্থূল-সত্তায় জীবের জ্ঞান পরৈন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তত্ত্ববিষয়-সংস্পর্শের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহাই স্থূল-জ্ঞান। সেই স্থূল-জ্ঞান অন্তরেন্দ্রিয়-রূপ মনে নীত হইলে মনের সংকল্প-বিকল্প, গৌরব-লাঘব ইত্যাদি বৃত্তিক্রমে কল্পনা ও বিভাবনা দ্বারা যে একপ্রকার নূতন শ্রেণীর জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ যে লিঙ্গ-জগতের গূঢ়জ্ঞান লাভ করেন, তাহাও জীবের লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। স্থূল ও লিঙ্গ-স্বরূপগত সমস্ত জ্ঞানই প্রাকৃত। তাহা চিন্ময় নয়। এই কারণেই যোগিগণ চিচ্ছজগতের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন না। জ্যোতির্ময় ‘বিশেষ’ সমস্তই লিঙ্গ-জগতের সম্পত্তি। Astral-Phenomena ও বিভূতি অর্থাৎ অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য সমস্তই লিঙ্গ-জগতে আবদ্ধ। তাহাদের সহিত চিচ্ছজগতের কোন নিকট-সম্বন্ধ নাই।

জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই চিন্ময় ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান

জীবের স্বরূপ-সত্তায় যে জ্ঞান আছে, এবং উদয় হয়, তাহাই চিচ্ছজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি নামধেয় যোগ-দ্বারা সে-জ্ঞানের কোন উপকার হয় না। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ জীবের ‘স্বভাবজ’ ও ‘প্রসাদজ’। জীব-সত্তার স্বভাব হইতে যে জ্ঞান উদয় হয়, তাহাই জীবের স্বভাবজ জ্ঞান। লিঙ্গসত্তা বা স্থূলসত্তা হইতে সে জ্ঞান হয় না।

স্বভাবজ জ্ঞান ৪—

ঈশ্বর ও জীব একজাতীয়, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব বা ধর্ম্যও একজাতীয়

জীব-সত্তা পরম চৈতন্যবস্তুর কণমাত্র। সুতরাং পরমচৈতন্যের যে স্বভাব, তাহারই কিয়নাত্র পরিচয় জীব-স্বভাবে দেখা যায়। স্বভাবের অণু নাম ধর্ম্য। পরমচৈতন্যের ধর্ম্য ও জীবের ধর্ম্য একতা আছে। ভেদ কেবল পরিমাণে। যে ধর্ম্য পূর্ণরূপে ও অসীমরূপে পরমচৈতন্যে নিত্য বর্তমান, তাহাই পরমাণু পরিমাণে জীবেও নিত্য বর্তমান। ঈশ্বর ও জীব একজাতীয় বস্তু, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্যও একজাতীয়। লিঙ্গ-ধর্ম্য বা স্থূল-ধর্ম্য

ঈশ্বরে নাই, কাষে-কাষেই জীবো নাই। স্থূলশরীর-গত ধর্ম বা লিঙ্গ-শরীরগত ধর্ম বদ্ধজীবদিগের ঔপাধিক ধর্মমাত্র,—স্বভাব নয়। চিৎস্বরূপ জীব স্ব-প্রকাশ। লিঙ্গগত মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার-কর্তৃক প্রকাশিত হয় না। স্থূল-দেহের ইন্দ্রিয়, চন্দ্র, সূর্য বা অগ্নির আলোকে প্রকাশ পায় না। সুতরাং স্থূল-ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত জ্ঞান বা লৈঙ্গিক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-উদিত জ্ঞান কখনই জীবকে বা পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীবের স্বভাবগত জ্ঞানই জীবের স্বরূপ-পরিচয়।

স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তার অপসরণে স্বরূপ-জ্ঞান

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত নন, ভস্ম অপহৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপহৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই?—হাঁ, আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যে রূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎ পরিমাণে নিজ-পরিচয় দিয়া থাকেন।

বদ্ধাবস্থায় জীবের নিজ শুদ্ধ পরিচয়-জ্ঞান

সেই পরিচয় এইরূপ ;—

- ১। আমি স্থূল ও লিঙ্গ-জগৎ হইতে একটি পৃথক্ বাক্তি।
- ২। আমার সম্বন্ধ, আশা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা—এই স্থূল ও লিঙ্গ-জগতের অতীত কোন অবস্থায় আছে।
- ৩। আমি স্বতন্ত্র-সত্তা হইয়াও কোন বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তার পরতন্ত্র।
- ৪। আমি স্বভাবতঃ সেই বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তা-কর্তৃক সর্বদা আকৃষ্ট।
- ৫। আমি কোন অপরাধে এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় নীত হইয়া আছি।
- ৬। সেই অপরাধ ক্ষয়পূর্বক আমার শুদ্ধ-অবস্থা লাভ করা আবশ্যক।
- ৭। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতি-সুখই সেই অবস্থার পরিচয়।
- ৮। আমি স্বয়ং ক্ষুদ্র, সুতরাং শক্তিহীন। আমার পরম কান্তের অমুগত থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় বল লাভ করিব।
- ৯। আমি দূরে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার কান্ত স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে আমা হইতে অনতিদূরে আছেন।

১০। আমার বর্তমান অবস্থা—স্থূল ও লিঙ্গাবরণ-সত্তা-জনিত যন্ত্রণা-বিশেষ।

স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তাগত বিতর্করূপ জ্ঞান স্বীয় বল প্রকাশপূর্বক স্বভাবগত আত্ম-প্রত্যয়কে পরের আত্ম অনাদৃত করিয়া রাখিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ এবং অন্তঃসুকৃতিবলে যখন আত্মজ্ঞান বলবান্ হয়, তখন স্থূল ও লৈঙ্গিক জ্ঞান দুর্বল হইয়া নিরস্ত হয়। স্বভাবজ জ্ঞান এইরূপ।

প্রসাদজ জ্ঞান ত্রিবিধ :-

(১) ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান

প্রসাদজ জ্ঞান দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান এবং ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান। শুদ্ধভক্তি-সাধন দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি কৃপা করিয়া জীবকে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করেন। যোগবলে বা ইন্দ্রিয়-চালন-বলে অনন্তকালে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা প্রসাদজ-জ্ঞানের এক কণের সমতা লাভ করে না। সমস্ত অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার ভগবৎকৃপা-বলে ভক্ত লাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও প্রাকৃত পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে যত প্রকার জ্ঞানই লাভ করেন, সে-সমস্তই প্রাকৃত। যোগিগণের চরম প্রাপ্য—কৈবল্য। তাহাতে প্রাকৃত জ্ঞানের অন্ত নির্দিষ্ট হইলেও কিছুমাত্র অপ্রাকৃত জ্ঞান নাই। সেই কৈবল্য ভেদ করিয়া চিদ্বিচিত্রতা দেখিতে পাইলে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আশ্বাদ পাওয়া যায়। কৈবল্য ভেদ করা—জীবের নিজ-চেষ্ঠার অসম্ভব। ভগবৎ-ভাগবত-কৃপা ব্যতীত কৈবল্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

(২) ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান

ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞানও দুর্লভ। যে ভক্ত ভগবৎ-প্রসাদে স্বীয় স্বভাবজ জ্ঞানকে ভগবৎ-কৃপায় সমৃদ্ধ করিয়া সমস্ত ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় শক্তি-সঞ্চার দ্বারা তাঁহার কৃপা-পাত্রকে সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিতে পারেন। এবম্বিধ ভাগবত-সঙ্গ জীবের পক্ষে বিরল, সুতরাং ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করা সর্বত্র সুসাধ্য নয়।

জ্ঞান ত্রিবিধ :- স্থূল, লিঙ্গ ও অপ্রাকৃত

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান তিন প্রকার :-

১। ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূল-জ্ঞান।

২। যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গ-জ্ঞান।

৩। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত-জ্ঞান।

(১) ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূলজ্ঞান এই স্থূল-শরীরের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যা যে-সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত জ্ঞানেরই ঐ একপ্রকার গতি। স্থূলজ্ঞানী যতই অহঙ্কার করুন, মরণের সহিত তাঁহার অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয় দূরীভূত হইবে। এই ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি যে অপ্রাকৃত জ্ঞানের অবমাননা করেন, সে কেবল তাঁহার যথার্থ জ্ঞানাভাব-জনিত উপদ্রব-বিশেষ।

(২) যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গজ্ঞানের সীমা, লিঙ্গ-জগতের সীমার সহিত এক। কর্মফলে যে-পর্যন্ত জীব লিঙ্গ-শরীরের বশবর্তী, সে-কাল পর্যন্ত সেই জ্ঞানের বল। লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ মুক্তি উপস্থিত হইলে, আর যোগাদির ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান কোথায় থাকে? সুতরাং যোগ-প্রাপ্ত জ্ঞানেরও আনন্ত্য-বর্ষ্য নাই। তাহার একটি সীমা আছে।

(৩) জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞানই নিত্য, অসীম ও অনন্ত। সেই জ্ঞানের যত্ন করাই জীবের কর্তব্য।

শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের জ্ঞানোপদেশ

অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

তশ্চৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ সুখং, কালেন সর্বত্র গতীরংহসা ॥

(ভাঃ ১।৫।১৮)

অতএব হে ব্যাস ! বিবেকী লোক সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের জগুই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ-নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে, তাহা গভীর বলযুক্ত কালদ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের গ্রাস বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ ভাগবতই অপ্রাকৃত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই সেই স্বানুভূত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ। অতএব তাহা সর্বশক্তি-গণের সার-শিক্ষা। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞান পাইবার যদি বাসনা থাকে, তবে ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বিচিত্রতা বর্ণন আছে, তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্বেষণ করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

“নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥”

জয় জয় প্রভু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ।
নিখিল জীবেতে যার করুণা প্রচুর ॥
গৌরাভিন্ন-গৌরশক্তি মহা-তেজস্কর ।
যাঁহার কৃপাতে ধন্য হৈল চরাচর ॥
কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-ধ্যানী-অন্য অভিলাষী ।
সকলে যাঁহার পদে নত হৈল আসি’ ॥
যেই জন আনিলেন কৃষ্ণ-প্রেমধন ।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ১ ॥

কলিরাজ বিস্তারিয়া আপনার শক্তি ।
মন্দাক্ষণে আচ্ছাদিলা যবে প্রেম-ভক্তি ॥
সেইকালে গৌরহরি জীব-দুঃখ হেরি ।
পাঠাইলে নিজ-জনে জীবে কৃপা করি’ ॥
সেই গৌরশক্তি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ।
কলির কলুষ-রাশি এবে কৈলা দূর ॥
ভক্তি-অস্ত্রে মায়াবাদ খণ্ডিলা যে-জন ।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ২ ॥

যেই গৌরজন প্রচারিয়া গৌর-তত্ত্ব ।
জীবে জানাইল তবে নিজ শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥
জড় ভোগের দাস হঞা ছিল জীবগণ ।
ভোগ ছাড়াইয়া দিলা কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা করি’ দরশন ।
রূপ-প্রদর্শিত পথ দেখা’য়ে যে-জন—
জীবে উপদেশামৃত-ধারা কৈলা বরিষণ ।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৩ ॥

গৌর-ভক্তি বিনাশিয়া যবে জড় কামে ।
মত্ত হ’য়ে ছিল জীব পরকীয় ভ্রমে ॥

রাধা-কৃষ্ণ-সেবা ত্যজি 'সখীভেকী' হঞা ।

প্রাকৃত সন্তোগ-কথা কহে প্রচারিয়া ॥

জড়-রস আদি শুদ্ধ প্রেমে মিশাইল ।

রূপানুগ-পথ ত্যাগ যে-কালে করিল ॥

সে-কালে জীবেরে দয়া করিল যে-জন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৪ ॥

সকল শাস্ত্রেতে যিনি হ'য়ে পারঙ্গত ।

বিচারিলা বহু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-সম্মত ॥

এ-শাস্ত্র পড়িয়া জীব ভক্তিরস পাঞা ।

জড় ভোগ পরিহারি' বিস্মরিলা মায়া ॥

শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট স্থাপিলা যে-জন ।

শিক্ষা দিলা ভক্তি-প্রেমে কৃষ্ণ বশ হ'ন ॥

ভজনেতে সুখ—শিক্ষা দিলা যেই জন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৫ ॥

যে 'ভক্তিবিনোদ'-নাম করিল ধারণ ।

সৎ-চিদানন্দ-নাম করায় স্মরণ ॥

যে-জন জীবের দূর করি' জড় ভাব ।

শিক্ষা দিলা জড় ত্যাগে হয় ব্রজ-লাভ ॥

শ্রীগৌর-বিমুখ হোঁরি বন্ধ-জীবগণে ।

মুক্ত কৈলা যেই জন কৃষ্ণপ্রেম-দানে ॥

যত দুষ্কৃত-মত যিনি কৈলা বিনাশন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৬ ॥

ভকতিবিনোদ যদি হ'য়ে অবতার ।

শ্রীচৈতন্য-বাণী নাহি করিত প্রচার ॥

অচৈতন্য এ-জগতে অকৃত্রিম-ভাবে ।

না চিনিত জীবগণ শ্রীচৈতন্যদেবে ॥

“প্রেমভক্তি” একমাত্র কৃষ্ণ-বিনোদনে ।

সমর্থ—এ'কথা শিক্ষা দিত কোন্ জনে ?

বিশুদ্ধ ভক্তির বাণী-মূর্তি যেই জন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৭ ॥

যাঁর 'গীতমালা' পড়ি' জীব-সমুদয় ।
 ভব-বন্ধ-মহাক্লেশ হ'তে মুক্ত হয় ॥
 যাঁর 'গীতাবলী' শুদ্ধভক্ত-মুখে শুনি' ।
 জড় জগতের গীত স্বণ্য বলি' মানি ॥
 যে 'কল্যাণ-কল্পতরু'-জাত পক্ষফল ।
 সেবনে জীবের নাশে অনর্থ সকল ॥
 সেই ফল জীবে দান করিলা যে-জন ।
 বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥ ৮ ॥

আচার্যের অপ্রাকৃত চরিত্র-বিষয় ।
 উপলব্ধি হয় যাঁর শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ॥
 হইয়া অনর্থমুক্ত সেই মহাশয় ।
 শ্রীগুরুচরণপদ্মে লভিয়া আশ্রয় ॥
 অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-অধিকারী হ'ন ।
 সম্ভবে তাঁহারে তাঁর চরিত্র বর্ণন ॥
 আমি অতি দুষ্টিমতি অনর্থে জড়িত ।
 চরিত্র বর্ণন মোর বাতুলতা মাত্র ॥
 শ্রীমুকুন্দ-প্রের্ত্ত হ'ন আচার্য্য-প্রবর ॥
 আজিকে তাঁহার হয় নির্য্যাণ-বাসর ॥
 হেন দিনে তাঁর পদে প্রার্থনা আমার ।
 কৃষ্ণভক্তি পাই যেন প্রসাদে তাঁহার ॥ ৯ ॥

ভক্তিবিনোদ জয় পতিতপাবন ।
 তোমা-বিনা কে দয়ালু আছেয়ে এমন ॥
 ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধর দয়াময় ।
 পশু লঙ্ঘ্যে গিরি-শৃঙ্গ তোমার কৃপায় ॥
 তব পাদপদ্ম শিরে করিয়া ধারণ ।
 পূজিতে বাসনা আজি তোমার চরণ ॥
 কিন্তু শক্তিহীন আমি দীন-অভাজন ।
 তাই প্রভু ! তব পদে লইলু শরণ ॥
 করুণা করিয়া প্রভু তুমি নিজগুণে ।
 এ-পতিতে দেহ স্থান ও রাঙ্গাচরণে ॥ ১০ ॥

কলুষ-মলিন জীবেরে হেরিয়া,
 আনিলেন যিনি করুণা করিয়া,
 সেবার বারতা বিশ্ব-মাঝে ।
 তিনি সেই প্রভু ভকতিবিনোদ,
 শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তাঁহার প্রমোদ,
 বিশ্ব তাঁহাকে পূজিছে আজ ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১১ ॥

ভব-দাবানলে দগ্ধ জীবগণ
 পে'তেছিল যবে অশেষ বেদন,
 তাহাদের ব্যথা করিতে দূর ।
 বরষিলা যিনি করুণার বারি,
 সেই তিনি হ'ন পূজিত সবারি,
 জীবের যাতনা করিয়া চূর ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১২ ॥

গৌরান্ধ-আদেশে যেই ভক্ত-শূর,
 যাঁহার প্রকট-ভূমি মায়াপুর—
 করিয়া প্রকাশ নদীয়া-মাঝে ।
 গৌর-নিত্যসেবা করিলা স্থাপন,
 সে-ভক্তিবিনোদ গৌর-নিজজন,
 বিশ্ব লুটিছে তাঁর পদ-রজে ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের দুর্জিত-নাশন ॥ ১৩ ॥

দমি' দুর্জয় 'জৈবধর্ম' ভবে,
 প্রচারি'-বিতরি' মোহগ্রস্ত জীবে,
 যিনি কৃষ্ণ-ভকতি করিলেন দান ।
 ভক্তি-রসে জীবে ডুবাইলা যিনি,
 নিখিল জীবের আরাধনা তিনি,
 জগৎ তাঁর চরণ করিছে ধ্যান ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১৪ ॥

নাম তত্ত্বাবৎ যেই . . মহাজন,

দশ অপরাধ করি' বিশ্লেষণ,

নামের স্বরূপ করি' প্রকাশ ।

বিরিঞ্চি-দুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেমধন,

স্থলভে জগতে কৈলা বিতরণ,

হওরে তাঁহার দাসের দাস ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল অনর্থ-নাশন ॥ ১৫ ॥

‘জীবে দয়া’ ‘নামে রুচি’-শিক্ষা দিয়া,

বৈষ্ণব-সেবায় জীবে নিয়োজিয়া,

(যিনি) জানা'লেন ইহা শুভঙ্কর ।

তিনি সকলের সাধনার ধন,

তাঁর পদে কর আত্মনিবেদন,

তিনি ‘ত’ অসীম শক্তিদ্বর ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল মঙ্গল-কারণ ॥ ১৬ ॥

সর্ববভূতে সমদর্শী যেই জন,

নিত্যকাল হরি-রসে নিমগন,

যিনি সদা মত্ত হরি-কীর্তনে ।

চতুর্বর্গ আদি কামনারহিত,

সর্ববতদ্দর্শী যিনি নিত্য-হিত,

দাও অঞ্জলি তাঁহার চরণে ॥

মন ! বন্দ ভকতিবিনোদ-চরণ সকল গুণের ভাজন ।

তিনি—পরম করুণ নিখিল জীবের সকল কল্মষ-নাশন ॥ ১৭ ॥

আজ—হে ভক্তিবিনোদ ! তব চরণে প্রণতি ।

যেন তব আশীর্ব্বাদে রহে কৃষ্ণপদে মতি ॥ ১৮ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-রত্ন-প্রয়াসী দীন—

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)

নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আমরা শুনিয়া স্থখী হইলাম যে, বিহার প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ এম্, এন্স, আগে মহোদয় গত ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫১ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation (সমাবর্তন)-সভায় নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন। যথা—

“Our youth are being brought up in a tradition of veiled contempt for religion and everything religious. Spiritualists and religious devotees are the laughing-stock of the educated youth and as the general masses are religious-minded and have great respect and reverence for such devotees and spiritualists, they feel generally disgusted with the attitude of the educated classes and have no regard for them as a class. The educated class has also no feeling of affection for the masses whose way of life are mostly moulded and determined by religious ideas. The result is that the educated classes have not been able to produce in sufficient number of servants to look for the amelioration for the masses in a real missionary spirit.

ভাবার্থ এই যে, আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে এমনভাবে মানুষ করা হইতেছে যে, তাহাদের ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন ভগ্নবদ্বিদ্বেষ বা ধর্ম-বিদ্বেষ-ভাব পুষ্টিলাভ করিতেছে। সাহিত্য ভক্ত এবং ধার্মিকগণ, আধুনিক যুবকবৃন্দের নিকট কয়েকজন হাস্যাম্পদ ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ভারতবাসীগণ স্বভাবতই ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া এবং তাহাদের জন্মগত ধর্মপ্রতি একটা শ্রদ্ধা থাকায়, আধুনিক ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও তাহাদের বিশেষ গ্রাহনীয় হয় না। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সাধারণের প্রতি কোন দরদ নাই। ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয় নাই।”

ডাঃ আগের উক্ত বক্তৃতা যাহা কোন বাংলা-দৈনিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া সজ্জদয় পাঠকবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয়ে

ধর্মশিক্ষা-প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অস্বাভাবিক জানাইতেছি—

“ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান সম্পর্কে ডাঃ আণে বলেন, বর্তমানে স্কুল ও কলেজসমূহে যে শিক্ষা-নীতি প্রচলিত, তাহাতে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। স্কুল ও কলেজে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা-প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া আধুনিক যুব-সমাজের মধ্য দিয়া কঠোরভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা প্রবর্তিত না হইলে মানব-মনের পুনর্দীক্ষার পথ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ধর্মশিক্ষার অভাবে সমাজে যুবকদের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে। যে-সব ছাত্র প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা না করে, তাহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মন ‘নিরবলম্ব’ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহাদের মনে নীতি অথবা ধর্মের কোন প্রভাবই বিস্তার লাভ করিতে পারে না। তাহারা যুক্তি-তর্কের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলে এবং প্রায়ই কোন না কোন বিপজ্জনক নীতিবাদের কবলে যাইয়া পড়ে। আজিকার দিনে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক নাই। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ আজকাল ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।”

রাজ্যপাল ডাঃ এম্, এম্, আণে মহোদয়ের সহিত কিছুদিন পূর্বে পার্টনার্স গভর্নমেন্ট হাউসে (১৮।১।৫০, বেলা ১১টা) আমাদের কিছু আলাপ-পরিচয় করিবার সুবিধা হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে আত্মরিক শিক্ষা দমন করিবার জন্য কিছু কথা বলিয়াছিলাম। তিনি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া আমাদের কথা কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আত্মরিক ভাব দমন করিবার জন্য আমাদের যে আন্দোলন, তাহাতে তিনি সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। বর্তমানে তাঁহার এই বক্তৃতায় আমরা কিছু মঙ্গল দর্শন করিতেছি।

ভগবদ্বিদ্বেষী দুষ্ট, মূর্থ, নরাধম ও নষ্টবিদ্য অশুরগণ যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার তাহাদের কোনদিনই দয়া করেন না। পরমদয়াল অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষী গোপাল-চাপালকে এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্”—ভগবানের এই বিচার। বরং সেইসকল অশুরগণ কি-প্রকার ক্রমান্বয়ে অন্ধ-যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং জন্মজন্মান্তর অশুরভাবেই থাকিয়া যায়, তাহাই তিনি ব্যবস্থা করেন। যথা—

তানহং বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধম্যান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মুচ্য জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥

(গীঃ ১৬।১৯-২০)

[অর্থাৎ—সেই বিদ্বদ্বী, ক্রুর, নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মুচ্যকল জন্ম-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।]

কিন্তু ভগবান্ অপেক্ষাও ভগবদুক্তগণ মহামহাবদাণ্ড বলিয়া তাঁহারা আমাদের মত নীচ অসুরগণকেও দয়া করেন। ভগবদুক্তগণ ভগবানের পরিত্যক্ত ব্যক্তি-গণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ—ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সুতরাং পতিত, দুষ্ট, মূর্থ, নরাধমগণকে দয়া করিবার জন্য ভগবদুক্তগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করেন; ইহাই তাঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য। এমন কি, তাঁহারা নিজে দুষ্ট, মূর্থগণের মধ্যে থাকিয়া কি-উপায়ে তাহাদের মঙ্গল হয়—তাঁহারা ভগবদ্ভজন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লগুনে ছাত্রাবাস স্থাপনের পরিকল্পনায় আমাদিগকে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে ঐসকল বিপথ-গামী ছাত্রগণের, Sugar-quoted quinine এর মত, অসদাচারের কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়াও তাহাদিগকে ভগবদুক্তি-লাভের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। অসীম শক্তিশালী গুরু-বৈষ্ণবগণ ইচ্ছা করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই এককালীন উদ্ধার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পঁছাইয়া দিতে পারেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত প্রভু শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি জগতের সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিতে প্রস্তুত—যদি শ্রীমন্নহাপ্রভু এককালে সকল জীবকেই উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। বৈষ্ণবের প্রাণ এমনই উদার যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল, এবং তাঁহাদেরই পাদপদ্মের রজোভিষেক ভিন্ন ভগবানের কৃপা-লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ও নাই।

ভগবদ্ভক্তগণ বুঝেন যে, মূঢ়, নরাধম, দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলেই মায়াদুষ্ট । সেইজন্য উদার-স্বভাব ভগবদ্ভক্তগণ সেইসকল দুর্দৃষ্ট ব্যক্তিগণকে কদাপি হিংসা না করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল লাভের জন্য সর্বদাই যত্নবান্ । ভগবদ্ভক্তগণই তজ্জন্ম ‘পতিতপাবন’ বলিয়া বিখ্যাত । তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষাও বহুগুণে দয়াল । ভগবানের কৃপাতেই তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষা অধিক বলশালী । সেইপ্রকার বলশালী ভগবদ্ভক্তের কৃপায় কিরাত, হুণ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুন্ধশ, আভীর, শুক্ল, যবন, খশ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ পাপ-যোনিতে জাত নরনারী ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে ।

এবস্থিধ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মে অপরাধ করিলে আর কোন উপায় নাই । ভগবৎ-পাদপদ্মে অপরাধ করিলে ভগবদ্ভক্তগণই উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবান্ও তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারেন না বা করেন না । ভগবদ্ভক্তগণ সেইজন্য কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না । প্রভু যিশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিলেও তিনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন নাই । শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, কাজীর বিচারে নবদ্বীপের ২২টি বাজারে বেত্রাঘাতে লাঞ্চিত হইলেও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—যেন বেত্রাঘাতকারীর কোন প্রকার দণ্ড না হয় । শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মার খাইয়া রক্তাক্ত-কলেবর হইয়াও পতিত জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার ‘পতিতপাবন’ নামের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন । ভগবদ্ভক্তগণের এমনই কৃপা । সুতরাং পতিত, নরাধমগণের স্নকৃতিলাভের একমাত্র উপায়—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ ।

আমরা সর্বতোভাবে আশা করি যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুকম্পিত বলশালী ভগবদ্ভক্তগণ আর সময় নষ্ট না করিয়া কলিহত জীবের কল্যাণের নিমিত্ত একযোগে পুনরায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন । শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কলির স্থান-স্বরূপ কলিকাতায় বাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লোকচক্ষে গুরু-বাক্য লঙ্ঘন (?) করিয়াও কেবল কলিকাতায় কেন, স্বদূর বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কলির আড্ডায় ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি নির্জনে গঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া নির্বিবাদে বসবাস করিবার অভিনয়ের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না । জীবনের সমস্ত energy cent per cent যাহাতে ভগবৎসেবায় জীব-কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তিনি তাহারই

একমাত্র প্রচারক ছিলেন। বোম্বাই সহরতলীতে ‘ভিলাপালী’-নামক ‘নিরিবিলি স্থানে’ আমাদের কোন গুজরাটি বন্ধু তাঁহাকে মঠ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার এইপ্রকার আচার-প্রচার-চেষ্টা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্তর্দ্বানের পর কি আবার আমরা পতিত, নরাধম, দুষ্কৃতি-পরায়ণ থাকিয়া যাইব? আমাদের কি উদ্ধার হইবে না? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আবদ্ধ-করুণাসিন্ধু-রূপ ভগবৎ-প্রেমের মোহনা কাটিয়া সর্বত্র উহা দ্বারা প্রাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশজ পরিচিত কয়েকজন জাতি-গোশ্বামী সেই করুণাসিন্ধুকে কৰ্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধিতে রুদ্ধ করিবার হুঁশা পোষণ করিলে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আবার সেই মোহনা কাটিয়া দিয়াছিলেন—সর্বত্রই প্রেম-বন্যায় প্রাবিত করিয়াছিলেন। আমরা কি জাতি-গোশ্বামীর অহুকরণে আবার তাহা রুদ্ধ করিয়া দিব?

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে আমার গ্রাম ছুপ্ত, মূর্থ, নরাধম এবং অশ্রু-প্রবৃত্তির লোকও অজ্ঞাত স্কৃতিবলে ভগবদ্-ভক্তনোমুখী হয়। চঞ্চলমতি বালকগণকে যেমন বস্ত্র-পাঠ, খেলানা, গান প্রভৃতি আমোদজনক উপায়ে ‘কিণ্ডার গার্টেন’ (Kinder-garten) বিধিমতে ক্রম-শিক্ষা দিয়া লেখাপড়ায় একটা আসক্তি জন্মান সম্ভব হয়, সেই প্রকার যজ্ঞার্থে কৰ্ম্ম করিয়া অর্থাৎ অর্চনমার্গে তৎতৎ অধিকারীকে বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ কোশলে ভগবানের বীৰ্য্যবতী কথারূপ ঔষধ এবং ভগবানে উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য-প্রসাদ দান করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করেন। এতদ্বারা নিম্নাধিকারীর ভবরোগ-ব্যাদি প্রশমিত করা সম্ভবপর হয়। **কৃষ্ণভক্তি জীব-মাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ সম্পত্তি (birth-right)**, তাহা নূতন আরোপিত কোন মনগড়া জিনিষ নহে। মূঢ়ব্যক্তিগণ এই ভগবদ্ভক্তিকে একটা মনের জড়াবস্থা-বিশেষ ধারণা করিয়া অধিকতর মূঢ়তার পরিচয় দিয়া থাকে। এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুটি (যাহাকে ভাগবতে “বাস্তব বস্তু” বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) শুদ্ধচিত্তে স্বতঃই উদ্ভিত হয়। রোগ-শান্তি হইলে যেমন স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্গে স্কৃতি অর্জিত হইলেই কৃষ্ণভক্তির স্বতঃই উন্মেষ হয়।

সেইপ্রকার স্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে তর-তম-হিসাবে চারি-শ্রেণীর ব্যক্তি, যথা—আৰ্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। যথা—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গী: ৭।১৬)

ভগবৎ-প্রবর্তিত এবং আর্ধ্য-ঋষিগণ-প্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালনে একপ্রকার স্কৃতি অর্জিত হয় । যথা—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যতে পশ্বা নাশ্রুং ততোষকারণম্ ॥ (বি: পু: ৩।৮।২)

অর্থাৎ ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্তব্য কর্ম । স্বীয় স্বভাবানুসারে যিনি যে-বর্ণে বা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সেই বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম-পালন করিলেই সর্বোত্তম বিষ্ণু যথোচিত আরাধিত হন এবং তদ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণী স্ব-স্ব স্বভাবে শাস্ত্রোক্ত ধর্মযাজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলেই স্কৃতি অর্জনে সক্ষম হন । সেইপ্রকার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সম্যাসিগণও স্ব-স্ব আশ্রমোচিত ধর্মোচরণ করিলেই স্কৃতি অর্জিত হয় । কিন্তু কলির প্রভাবে যখন এই সকল বর্ণাশ্রমে আত্মরিক-ভাব আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই মনুষ্য-সমাজে ব্যাভিচারসমূহ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বিষ্ণুমায়া-সজ্জাটিত নৈসর্গিক বহুপ্রকার উৎপাত আরম্ভ হয় । রাজার আইন মানিয়া চলিলেই রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চালিত হয় এবং সকলেই সুখে বাস করে । কিন্তু রাজার আইন অমান্য করিয়া কতকগুলি আত্মরিক বর্ণাশ্রমী বা বর্ণ-সঙ্কর চোর, বদমাশ এবং গুণ্ডার বৃদ্ধি হইলে রাজ্যে বহু প্রকার বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয় । (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সজ্জ

বাস্তহারার মর্ম্ম-কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য দেহটা স্থলভ ও সূক্ষ্মভ । সৌভাগ্যক্রমে ইহা পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য ইহা স্থলভ । আবার বহু বহু জন্মের পর ভগবদ্ভজনোপযোগী এই দেহটা লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা সূক্ষ্মভ । ভগবানের শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি এই মনুষ্য-জন্মে জীব সাধন-বলে তাহার নিজ পরিচয় অবগত হইতে পারে এবং তাহার নিত্য বসতিস্থলে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় । কিন্তু তাহা না করিয়া মানুষ প্রায়ই তাহার অফুরন্ত

ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত নবনবায়মান ভোগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল এবং সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি তাহাতেই নিয়োগ করিল। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়-বস্তুগুলি ভোগ করিবার জন্ত প্রত্যেকে নিজ নিজ গতি রচনা করিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। অবিরাম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ ভোগায়তনগুলির সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে বন্ধ-পরিকর হইল। “ন গৃহং গৃহমিত্যাহঃ, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে”—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করত গৃহিণীকে কেন্দ্র করিয়া স্নেহের সংসার পত্তন করিল। পরিণামে পরপর কতকগুলি নবাগত প্রাণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেই সংসার-বৃক্ষের ফলরূপ পুত্র-কন্যার প্রীতি-বিধান ও লালন-পালনের জন্ত ভোগের আগার-স্বরূপ বাস্ততে একটি ঘর পাতিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিল। কিন্তু হায়—

“স্নেহের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলু, অনলে পুড়িয়া গেল ॥”

বর্ত্তমানে আমার সে আশা কোথায় রহিল? নিয়তির চক্রে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কর্ম্মানুসারে বাসনার বিপরীত ফলভোগ করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছি। তাই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের প্রতি পূর্ক্সাহেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহৃত্যে সুখায় চ।

পশ্চোং পাকবিপর্ষ্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

নিত্যার্তিদেন বিভেন দুঃখভৈনাশ্মতু্যনা।

গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ (ভাঃ ১১।৩।১৮-১৯)

[অর্থাৎ—জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্ত একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল-বিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীত-ভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে। নিরন্তর দুঃখপ্রদ, অতি-আয়াসলভ্য, আত্মমৃত্যু-জনক বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে-সকল অনিত্যবস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের দ্বারা মানবগণের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখলাভ হয় না।]

সংসারাসক্ত জীবের দুরবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া ত্রাসাত্মক দৈন্ত জ্ঞাপনমুখে কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে, হইলু বিপুল কামী।

ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর, ধরিলু তখন আমি ॥

সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত, কালক্ষয় কৈলু কত।

বহু স্মৃত-স্মৃতা, জনম লভিল, মরমে হইলু হত ॥

সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে, অচল হইল গতি ।

বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আগারে, অস্থির হইল মতি ॥

পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত, অভাবে জলিত চিত ।

উপায় না দেখি, অন্ধকারময়, এখন হ'য়েছি ভীত ॥

সংসার-তটিনী-শ্রোত নহে শেষ, মরণ নিকটে ঘোর ।

সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়, এ-আশা বিফল মোর ॥

(শরণাগতি)

মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান কালের দুর্কিসহ যন্ত্রণার কথা ও মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা আমার এখন আর স্মরণ হয় না । আমি বেশ ভাল আছি—এইরূপ বোধ হইতেছে । কিন্তু যখন মায়াদেবীর কঠিন নির্মম কশাঘাত প্রাপ্ত হই, তখনই চমকাইয়া উঠি ও চীৎকার করিতে থাকি । সম্প্রতি ইহ-জন্মের গড়া এই ‘বাস্তব’ হারাইবার জন্য যে দুঃখ পাইতেছি, ইহা মাত্র কএক দিনের মত ; কারণ আমার মৃত্যুর পর আর এই বাস্তব আমার থাকিবে না । কিন্তু স্বরূপ-ব্রাস্তব হইয়া আত্যন্তিক দুঃখের হাত হইতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্থ, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-যুবা ইত্যাদি কাহারও নিস্তার নাই ।

ভাই বাস্তবহারা ! একবার চিন্তা করিয়া দেখ ! আমাদের আপাত ভোগের আশা-তরুর মূলে কালের কুঠারাঘাতে বিচলিত হইও না, বরং ইহাতে বিবেক লাভ করিয়া মনকে প্রবোধ দাও এবং এই শিক্ষা লাভ কর যে, ইহা আমাদের নিত্যকালের আরামে বসিয়া থাকিবার মত স্থান বা বাস্তব নহে এবং এই বাস্তবতে আমরা যে-সকল বস্তুগুলি আঁকড়াই বসিয়া আছি, তাহাও প্রকৃত বস্তু নহে । নিত্যসত্য বাস্তব-বস্তু শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার পাদপদ্মই—সমস্ত জীবের আশ্রয়-স্থল । “স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি”—ইহ-জগতের ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যদি আমরা সেই শান্তিময় নিত্য শাস্বত পরমসত্য ধামে গমন করিতে পারি, তজ্জন্ম চেষ্টা করা উচিত । যে-স্থানে গমন করিলে এই দুঃখময় জগতে আর আসিতে হয় না, তাহাই আমাদের নিত্য-বসতিস্থল । ভাই ! শ্রীভগবানের বাণী স্মরণ কর—

“যদুগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ব্যম পরমং মম ॥” (গীতা ১৫।৬)

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, বহু দেশে বহু বাস্তব, বহু স্ত্রী-পুত্র পাইয়াছি, কিন্তু কোথাও অশান্তি ভিন্ন শান্তি লাভ হয় নাই । সর্বসময়ে ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়াছি ও হইতেছি, তথাপি আমাদের ভুল ভাঙ্গিতেছে না । আমাদের এই

দুর্দশায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপরবশ হইয়া সখা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের পরমশান্তি-লাভের একমাত্র উপায় নির্দেশ করিতেছেন—

অমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥

(গীতা ১৮।৬২)

[অর্থাৎ—সকল জীবই পরমেশ্বরের অধীন, অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া] হে ভারত ! সর্বাস্তঃকরণে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যধাম (বাস্তু) প্রাপ্ত হইবে ।

পরমপাবন পরমাশ্রয়-দাতা ভগবানের বাণী নিত্য কল্যাণময়ী । তাঁহার দয়ার কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করত সেই বাণীতে উদ্ধুদ্ধ হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের পশ্চাৎ অবলম্বন করিলে আমাদের এই অশান্তি ও দুঃখের অবসান ঘটিবে ।

তবে তাহা লাভ করিবার পশ্চাৎ আমাদের জানা নাই । ইহ-জগতের বাস্তুহারা হইয়া আমরা যেমন রাজ-দরবারে নিজেদের দুঃখের কথা রাজার অনুগত প্রিয় ব্যক্তির নিকট জানাইলে তাহার প্রতিকার লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রিয় সাধুগণের নিকট আমার এই আত্যস্তিক ত্রিতাপ-দগ্ধ দুঃখের কথা জানাইলে, দয়াময় ভক্তগণের দ্বারা ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন । আমার সকল প্রকার দম্ভ-অহঙ্কার দূরে রাখিয়া যদি নিষ্কপটে ভগবৎপ্রিয়গণের অনুগত্য লাভ করিতে পারি এবং নিজের দুঃখের কথা জানাইতে পারি, তবেই আমার মঙ্গল-লাভ হইবে । ঠাকুর মহাশয়ের কথায় যদি বলিতে পারি—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া ।

কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া ॥

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান ।

কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥

গলবস্ত্র কৃতাজলি বৈষ্ণব-নিকটে ।

দস্তে তুণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগাম ।

সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর ।

আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় ।

এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥ (কল্যাণকল্পতরু)

তখন আমার আর এই দুঃখ-শোক-মোহ ইত্যাদির ভয় থাকিবে না । দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর তখন আমাকে আমার বিরূপের ধর্ম মায়ার দাস্ত্র ছাড়াইয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবেন । তখন জানাইবেন “শৃঙ্খল বিংশে অমৃতস্য পুত্রাঃ”—তোমরা অমৃতের সন্তান ।

“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুরত্যয়া ।

দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি ॥” (কঠ ২।৩।১৪)

ক্ষুর-ধারার জ্বালায় এই সংসৃতির দুর্গম-পথে তোমাকে চলিতে হইবে—তোমার স্বরূপের-বৃত্তি যে ‘কৃষ্ণ-দাস্ত্র’ তাহাতে উদ্ধুদ্ধ হও । আর মায়িক নেশায় অচেতন-প্রায় থাকিও না । এই দুরত্যা দুর্গম-পথে তোমার দুর্বল শক্তি লইয়া চলিবার সামর্থ্য নাই । তুমি যদি বাঁচিতে চাও, যদি প্রকৃত শান্তি চাও, তবে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হও, দেখিতে পাইবে তাহাতে কত শান্তি, কত আনন্দ ! তখন তুমিই বলিতে পারিবে—

“অশোক, অভয়,

অমৃত-আধার,

তোমার চরণ দ্বয় ।

তাহাতে একম,

বিশ্রাম লভিয়া,

ছাড়িলু ভবের ভয় ॥” (শরণাগতি)

তখন এই জগতে থাকিলেও তোমার চিত্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকায় ইহ জগতের কোনরূপ ধন্দ্ব-ধর্ম তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না । তোমার আশ্রয়-স্থল তুমি নিজেই নির্ণয় করিতে শিখিবে—“কৃষ্ণ-বসতি, বসতি বলি’ পরম-আদরে বরি ॥” তখন জানিবে, ভগবদ্ধামই একমাত্র বরণীয় ও নিত্যবসতি-স্থল ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

—শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক-

কাকদ্বীপে সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম

[তারিখ—৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৮, ইং ২২।৫।৫১]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, কাকদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম-কর্তৃক আহৃত জনসভায় তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে সর্বপ্রথম উক্ত সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি বলেন—মনুষ্য-জন্মে পরম মঙ্গল লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্তব্য; কিন্তু সেই মঙ্গল-লাভের প্রকৃত পন্থা নিষ্কারণ করাই আজকাল কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত মঙ্গলের পথ কি, সে-বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক। সাধারণ বুদ্ধজীব অমঙ্গলকে মঙ্গল এবং মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া ধারণা করে। গিল্টি সোনা প্রকৃত সোনা নহে। প্রকৃত স্তব্ধ লাভ করিতে হইলে যেরূপ স্তব্ধ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য, তদ্রূপ প্রকৃত-মঙ্গল-লাভেরূপ ব্যক্তিগণ গুরুপদ আশ্রয় করিবেন। **গুরুপদই একমাত্র মঙ্গল।** তদ্বিন্ন অণু কিছু মঙ্গল নহে। আমরা পাঠশালায়, হাইস্কুলে, কলেজে, সমাজে, রাস্তা-ঘাটে বহু গুরু করিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা প্রকৃত গুরু শব্দবাচ্য নহেন। পার্থিব জিনিষের জগৎ পার্থিব গুরুর প্রয়োজন বটে; কিন্তু পার্থিব বস্তু অমঙ্গলজনক। ভগবৎ আরাধনা ব্যতীত অণুপথে মঙ্গল নিহিত নাই। ইহা লাভ করিতে হইলে প্রকৃত গুরুর নিকট যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জীব কর্মমার্গে বিচরণ করিয়া কখনই স্তব্ধলাভ করিতে পারে না; পরন্তু বিপরীত ফল দুঃখই লাভ করে। বেদান্ত সূত্র বলেন—“কৃতাত্যয়েহুশয়বান্ দৃষ্টস্থতিভ্যাম্”, গীতা বলেন—“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি”, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“এবং লোকং পরং বিদ্যানশ্বরং কর্মনির্মিতম্”। শাস্ত্রকারগণ সর্বত্রই কর্মমার্গে বিচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি—শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ ; বি, সি, এস্ মহোদয়ের উক্তি-তে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—মনুষ্য-জীবনে ধর্মের স্থান সর্বোচ্চে। ধর্ম-যাজন করা সকলেরই সর্বকালে একান্ত আবশ্যক—ইহা অতীব সত্য কথা। ধর্মকে বাদ দিয়া সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই অহিতকর। ধর্মই সকল কার্যে সফল আনয়ন করে।

আচার্য্য শঙ্করের “সোহং”—চিন্তাটি সমাজের পক্ষে অহিতকারী। ‘আমিই ভগবান্’—এই চিন্তাশ্রোতের দ্বারা পিতার প্রতি পুত্রের অমর্যাদা, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অবজ্ঞা, গুরুজনের প্রতি লঘুব্যক্তির তাচ্ছল্য প্রকাশিত হইয়া সমাজ আজ বিশৃঙ্খল হইয়াছে। সমাজে কেহই গুরুজনকে গুরুবুদ্ধি করে না। ‘সোহং’-বিচারের প্রাবল্যই ইহার মূল কারণ। ‘সোহং’-বাক্যের প্রকৃত অর্থ—আমি জীবাত্মা, সচ্চিদানন্দ বস্তুর কণামাত্র অর্থাৎ স্তংগুণকণা-সম্পন্ন।

মহাপ্রভুর ‘তৃণাদপি’-শ্লোকে ‘সোহং’ বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ‘সোহং’ বেদবাক্য—স্বয়ং ভগবান্ হইতে উদ্ভূত। তদ্রূপ ‘তৃণাদপি’ বাক্যও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে আবিভূত। সুতরাং উভয় বাক্যই এক-তাৎপর্য্যপন্ন ও সমগৌরবময়। একটি গোলকের পরিধির প্রথম বিন্দুকে ‘সোহং’ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শেষ বিন্দুর দিকে আসিলে ‘তৃণাদপি’-ভাব ও ‘সোহং’-ভাব একই স্থানে অবস্থিত হইয়া ব্যবধান-রহিত হইয়া পড়ে।

‘তৃণাদপি সুনীচ’-ভাবের দ্বারা জগতের দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। পরন্তু ইহার দ্বারা সর্বোচ্চ শক্তি লাভ করিতে পারা যায়। মহাত্মা গান্ধীজী প্রভৃতি এই ‘তৃণাদপি সুনীচ’-শিক্ষার এক কণামাত্র আশ্রয় করিয়া সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সংখ্যায় সমগ্র ভারতের তুলনায়, অতীব মুষ্টিমেয়। কোনও কোনও প্রাদেশিক ধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ডিগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দ্বারা ভারত পরাধীন হইয়াছে। এরূপ বিচার সর্বতোভাবে যুক্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক। পরন্তু যাহারা শ্রীমদমহাপ্রভুর বিচার গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। সুতরাং তাঁহারা ভারতের সর্বতোভাবে পরাধীনতার কারণ। মহাপ্রভুর উক্ত শিক্ষা পূর্বে সকলে গ্রহণ করিলে দেশ আরও পূর্বে স্বাধীন হইত। মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংসা-নীতি ও Non-violenceই ‘তৃণাদপি সুনীচ’ ও ‘তরোরিব সহিষ্ণু’-বাক্যের শিক্ষাকণা, যাহাদ্বারা ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে।

শাস্ত্রে সর্বত্র ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বস্তু নহে। ধর্ম্মজগতের বালকগণই অদ্বৈত-চিন্তাশ্রোতে বা নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বলেন—Indians are born philosopher অর্থাৎ ভারতবাসী জন্মগত জ্ঞানী। সুতরাং উহা বালকের ধর্ম্ম। যাহারা

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করেন নাই, তাঁহারাই অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন ; পরন্তু ভক্তিই সর্বোত্তম ।

ভক্তিধর্ম সহজ । সহজ-শব্দের দ্বারা সাধারণ সাহিত্যিক যাহা বুঝেন, ‘সহজ’-শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে । ‘সহজ’ অর্থে আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে বৃত্তি জন্মগ্রহণ করে । অর্থাৎ ভক্তিই আত্মার নিত্য সহচর । জ্ঞান ও কর্ম, মন ও দেহের ধর্ম-হেতু তদ্বারা চিত্তের ময়লা কিছু পরিমাণে শোধিত হইয়া সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিতাভের সহায়তা করে । ভগবানের সহিত লীন বা এক হওয়া অসম্ভব । ভগবানের সহিত কেহ মিশিয়া গিয়া লীন হইয়াছেন, একরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু মুক্তির পরও পৃথক্ সত্ত্বা রক্ষিত হইয়া ভগবানের ভজনা নিত্যকাল চলিতেছে—ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় । যথা—‘মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎবা ভগবন্তং ভজন্তে’ ইত্যাদি । মুক্তির পর ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়ার ধারণা, ধর্মজগতে প্রচলিত কয়েকটি Common errors-এর অন্যতম ।

মহাপ্রভু এই বঙ্গদেশে আবিভূত হইয়া ধর্মজগতের সর্বোচ্চ বিষয়টি এই দেশেই প্রকাশ করেন, যেহেতু বঙ্গদেশের লোক সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জাতি । মাদ্রাজ প্রভৃতি অগ্ৰাণু দেশ সর্ববিষয়ে বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া আছে । গত বৎসর দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমা-কালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ইহার সত্যতা অনুভব করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার সাধারণ অধিবাসী মহাপ্রভুর এই সর্বোচ্চ দান সম্বন্ধে উদাসীন । আবার কেহ কেহ ধারণা করেন, মহাপ্রভুর এই সর্বোচ্চ শিক্ষা নিয়শ্রেণীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ । বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে । মহাপ্রভুর ধর্মের স্মৃতিতম সর্বোচ্চ বিচারগুলি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে ; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প । তাহার প্রকৃষ্ট প্রচার না হওয়ায় ইহার এইরূপ অবস্থা ।

পূর্বে অনেকে বলিতেন—দেশ স্বাধীন না হ’লে ধর্ম আলোচনা চলবে না । আচ্ছা, যে দেশ স্বাধীন, সে দেশ কি ধর্মপরায়ণ ? ভারতীয় হিন্দুস্থান ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র । ‘ধর্ম-নিরপেক্ষ’ অর্থে ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন—এরূপ নহে । পরন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম আছে, হিন্দুস্থান তাঁহাদের কাহারও উপর ধর্মাস্তর গ্রহণের জন্ত জোর জবরদস্তি করেন না । সহনশীলতাই ভারতের গৌরব । অসহন-ভাবই ধ্বংসের কারণ ।

ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই । কারণ

ভারতবর্ষ এখনও পশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত নিয়মাবলী ও শাসন-পদ্ধতির দ্বারা শাসিত হইতেছে। স্বায়ত্ত-শাসন তখনই সম্ভবপর, যখন দেশীয় কৃষ্টি—যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের অনুশাসন দ্বারা ইহার শাসন-কার্য পরিচালিত হইবে। আমাদের প্রাচীন ঋষিবর্গের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চিন্তাধারা সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা ও চিন্তাধারা অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত-শিক্ষার অভাবে আমাদের বর্তমান কর্তৃপক্ষগণ ইহা অনুধ্যান করিতে পারিতেছেন না। পশ্চাত্য দেশে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের প্রচুর আদর হইয়া তদনুসারে রাজনীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সংগঠনের প্রয়াস দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতিক গঠনমূলক চিত্তবৃত্তি তাহাদিগকে ক্রমশঃ আঙ্গুরিক-ভাবাপন্ন করিয়া ভারতীয় কৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতেছে। ভারত একদিন ধর্মের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবেই।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিহারের রাজ্যপাল মাননীয় ডাঃ মাধব শ্রীহরি আগের বক্তৃতার উল্লেখ করেন। ডাঃ আগের সত্যই বলিয়াছেন “যদিও এক শতাব্দী ও তদধিককাল সংস্কৃত ভাষার প্রতি মৃতবৎ আচরণ করা হইয়াছে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উহাকে মৃত ভাষারূপেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সংস্কৃত ভাষাকে আমি মৃত ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহি। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বজ্জনরূপে জগৎ-সভায় বরণীয় আসনসমূহ অলঙ্কৃত করার পূর্বে তাহারা যাহাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অমূল্য ও অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞান-রাশির সম্যক পরিচয়লাভে সমর্থ হয়, তজ্জন্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।”

স্বামিজী অতঃপর মাননীয় প্রধান অতিথি Circle officer মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—তাহাদেরই উপরে এই দেশের শাসনভার গুরুত্ব ; এবং তাঁহারা শাসন-সংক্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়টি তাঁহাদের সকলেরই অনুধাবন করা বিশেষ আবশ্যিক।

উপসংহারে তিনি সভাস্থ সকলকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

দাস্ত্র

আমরা ধারাবাহিকরূপে নবধাভক্তির আলোচনা করিয়া আসিতেছি। গতবারে 'বন্দন' সম্বন্ধে কিছু আলোচনার সুযোগ ও লাভ করিয়াছিলাম। বর্তমান সংখ্যায় দাস্ত্র-ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া স্বীয় চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার চেষ্টা পাইব। 'দাস' শব্দে 'ষ্য' প্রত্যয় করিয়া 'দাস্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন, দাস-শব্দে ভূতা, পরিচারক ও শূদ্রজাতি বুঝাইয়া থাকে। স্থলবিশেষে দাস-শব্দের অর্থ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যখন 'দাস'-শব্দ কেবলমাত্র কৃষ্ণেতর বিষয়ের অথবা মায়িক জীব-গণের সাময়িক ভূতা বা পরিচারক-হিসাবে নিয়োজিত হয়, তখন এই দাস-ভাবই কৃষ্ণভোলা জীবকুলের বন্ধনের কারণ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, এতাদৃশ দাসত্বের দ্বারা জীবকুল অনাদি-বহিস্মুখ হইয়া চিরতরে কৃষ্ণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে থাকে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব — অনাদি-বহিস্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল ।

এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

আর 'দাস' শব্দ যখন কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও কার্য্যগণের নিত্য-ভূতা বা পরিচারক-রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এই দাস্ত্র-ভাবই জীবগণের বন্ধন মুক্তির কারণ হয়। তখনই জীবগণ সাধুগুরু-পদাশ্রয়ে নিত্যদাস্ত্র-প্রভাবে নিজদিগকে মায়াব কবল হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া পরাশান্তির আকরস্বরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনজীউর নিত্যকালীন সেবায় সর্বতোভাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একই দাস-শব্দের স্থলবিশেষে ব্যবহারভেদে অর্থ-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। মায়ার দাসত্ব দ্বারা রোরব নরকের দ্বার সদাই উন্মুক্ত এবং ভগবদাস্ত্র দ্বারা অনর্পিত অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার-দ্বার চির-উন্মুক্ত। মায়াদাস্ত্র দ্বারা জীবগণ ধর্মহীন পশুর শ্রায় জীবন-যাপন করিতে করিতে ক্রমশঃ ভগবৎস্মৃতি-বিরহিত হইতে থাকে। তখন—

অর্থলাভ এই আশে,

কপট-বৈষ্ণব-বেশে,

ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ।

হইয়া মায়ার দাস,

করি' নানা অভিলাষ,

তোমার স্বরণ গেল দূরে ॥

(সাধক-কণ্ঠমালা)

“কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়”—এই বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া, কেবলমাত্র আহাৰ, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাदিতে অনর্থক কাল কাটাইতে থাকি। তখন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বয়ং কৰ্ত্তা, ভোক্তা, পালয়িতা প্রভৃতি অভিমান করিয়া বসি। এতাদৃশ বুদ্ধিকে ভাগবতে ‘গোখর’-বুদ্ধি বা নির্বোধের বুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দেহীন্দ্রিয়বাক্ চেতো ধর্মকামার্থকর্মণাম্ ।

ভগবত্যাৰ্পণং শ্রীত্যা দাস্ত্ৰমিত্যভিধীয়তে ॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১০।১)

অর্থাৎ শ্রীতি-সহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্, চিত্ত, ধর্ম, কাম, অর্থ ও কর্ম-সকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে, তাহা ‘দাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয়। দশদিক্ যেমন আকাশে মিশিয়া থাকে, ভগবান্ বাহুদেবে যেমন জগৎ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ অপর ভক্তিসমূহ দাস্ত্রে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ভগবদাস্ত্র সহযোগ-ব্যতীত কোন ভক্তিদ্বারা ভগবান্ বাহুদেব হৃদয়ে উদিত হন না।

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং পাদসেবনমর্চনম্ ।

বন্দনং স্বাৰ্পণং সখ্যং সৰ্বং দাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১০।৩)

সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানের সেবায় আদর ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে পূজা, সর্বভূতে ভগবৎসত্তা বিরাজিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, বাক্যদ্বারা ভগবদ্গুণানুবর্ণন, ভগবানে চিত্ত সমর্পণ ও সর্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ—এ-সমস্ত ভগবদাস্ত্রের অঙ্গ-স্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবদাস্ত্র ব্যতীত কেবল শ্রবণাদি দ্বারা ভগবৎ-সেবা সুলভ নয়। তাই ভক্ত কামনা করিয়া থাকেন—হে ভগবন্! আমি কামাদি রিপু কতই না দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। আমারও লজ্জা ও শাস্তির উদয় হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক

তোমার অভয় শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্ত্র নিযুক্ত কর।

কলিযুগপাবনাবতারী উন্নতোজ্জ্বল-রস-প্রদানকারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি দাস্ত্রভক্তির মহিমা বাড়াইবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবদাসগণের দাসের দাসাছুদাসত্ব-রূপ সৌভাগ্য লাভ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বণী ন চ গৃহপতিনো বনস্থো যতিব।

কিন্তু প্রোঢ়নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্ষে-

গৌপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাসদাসাছুদাসঃ ॥

(পদ্মাবলী-৬৩)

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু নিত্য সতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃত-সমুদ্র-স্বরূপ ‘শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসাছুদাস’ই আমার আত্ম-স্বরূপের পরিচয়।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী,

সহঃ সম্পাদক

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কোনও কোনও প্রাকৃত সাধারণ ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলেন—
“পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।” এই যুক্তি অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে পারেন—শঙ্করের যুক্তি-বিচারকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়া ঘৃণা বা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে কখনও নিন্দা করা চলে না। আপাততঃ কথাটী শ্রুতিমধুর হইলেও উহা আদৌ বিচার-সঙ্গত নহে। গুণী ব্যতীত গুণের অধিষ্ঠান অসম্ভব। গুণ কোন বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। তজ্জগুই বৈদান্তিক শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—“শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।” ঠাহারা গুণ ব্যতীত ‘গুণী’র বিচার করিয়া থাকেন, ঠাহারা অবৈদিক ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বেদে বহু পাপ-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাপী যদি স্বণিত না হইল, পুণ্যবানের সহিত সে যদি সমান হইল, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে? এমন কি, বর্ত্তমান জগতের আইন-আদালতগুলিও তাহা হইলে

তুলিয়া দিতে হয়। কারণ চোরকে কিছু বলা চলিবে না—তাহার ভ' কোন দোষ নাই, তাহার কর্মের দোষ। সুতরাং চোরকে শাস্তি দিয়া লাভ কি? এমন কি, কাহারও গৃহে চোর বা ডাকাইত প্রবেশ করিলে নিষেধ করা অগ্রাঙ্গ হইবে। গৃহস্থকে সাবধান করা পাপকার্য্য হইবে—চোর-ডাকাইতের সাজা দেওয়া অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। সুতরাং যাহারা “পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না”—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারা তাহাদের পাপ-কার্য্যের প্রশ্রয় পাইবার জন্য এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাহারা পাপকার্য্য করিবেন অথচ তাহাদিগকে নিন্দা করিও না—ইহাই তাহাদের শিক্ষা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এইরূপ মতবাদের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ যুক্তির প্রতিযোগিতায় আরও বলা যাইতে পারে—পুণ্যকে প্রশংসা করিও, পুণ্যবান্কে প্রশংসা করিও না। এই যুক্তি কি কোন নীতিবাদী ধার্মিক-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন? যদি পুণ্যবান্কে প্রশংসা করিতে হয়, তবে পাপীকে নিন্দা করিতেই হইবে। নচেৎ পুণ্য ও পাপের অনাদর ও আদর করিয়া পুণ্যবান্ ও পাপীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে অর্থাৎ প্রশংসা বা ঘৃণা করিতে হইবে না। এইরূপ উর্বর-মস্তিষ্কের লোকবঞ্চনাপর শিক্ষাগুলি যে সমাজের কত হানিকর হইয়াছে, তাহা সমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে পূর্বপরিচিত চোর বা ডাকাইত এবং সাধু বা সম্যাকী উপস্থিত হইলে সমানভাবে আদর পাওয়া কর্তব্য কি? কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—“ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংসু সজ্জত বুদ্ধিমান্।” বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সংসঙ্গ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসিত ও বহুমানিত শ্রীল শঙ্করাচার্য্যও আমার এই যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাহার শারীরক-ভাষ্যে এবিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এমন কি, তিনি মোহ-মুদগরেও লিখিয়াছেন—“ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবান্নবতরণে নৌকা।” (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিষ্কু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় :—

(ক) ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৮ম ছত্রে জেয়-জ্ঞান স্থলে হেয়-জ্ঞান হইবে।

(খ) ১৩৬ পৃষ্ঠায় ৮ম ছত্রে অনর্থ-মুর্তির স্থলে অনর্থ-মুক্তি হইবে।

গৃহে সুখ কোথায় ?

জন্মাবধি আমরা সুখের কান্দন। গার্হস্থ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া সুখলাভের আশায় আমরা বাল্যজীবন বিদ্যাশিক্ষায় ও অগ্রাণু সময় অর্থোপার্জনাदिতে অতিবাহিত করি। কিন্তু সকল বস্তুর মালিক কৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া গৃহে প্রমত্ত হইলে যে দুঃখ অবগুস্তাবী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাই আজ আমরা গৃহব্রত ধর্মের প্রতীক একটি আদর্শ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এক কপোত বনে মহাবৃক্ষে নীড় নির্মাণ করিয়া ভাৰ্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। এই পারাবত-দম্পতি পরস্পরের স্নেহে আবদ্ধ-হৃদয় হইয়া গৃহধর্ম পালন করিতে করিতে একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া, ভোজনাদি ব্যাপারসমূহ সম্পাদন করিয়া অরণ্য-মধ্যে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের দিন বেশ কাটিতেছিল। সেই কপোতী যখন ঈষৎ হাত্তের সহিত কটাক্ষপাত করিয়া আলাপ করিতে করিতে প্রিয়ের চিত্ত হরণ করিয়া স্বামী সন্নিধানে কোন বাঞ্ছা প্রকাশ করিত, তখন সেই অজিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বণ কপোত তাহাই গুরুর আজ্ঞা-স্বরূপ স্বীকার করিয়া সেই সেই দ্রব্য অতিকষ্টে ও প্রাণ বিপন্ন করিয়াও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। এইরূপে আপাত-রমণীয় দাম্পত্য-প্রণয়োপভোগ করিতে করিতে সে স্বর্গ-সুখের কল্পনা করিতেছিল। কালক্রমে কপোতী গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে নীড়ে স্বামীর সমক্ষে ক্রমে ক্রমে বহু ডিম্ব প্রসব করিল। শ্রীহরির দুজ্জের শক্তিপ্রভাবে সেইসকল ডিম্ব হইতে ক্রমশঃ শাবকগণের অঙ্গ প্রস্ফুটিত হইল। তখন সেই দম্পতি পুত্রবৎসল হইয়া তাহাদের অস্ফুট কল-ভাষিত শব্দ শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিতে করিতে শাবকগণকে পালন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিতে লাগিল, চিরদিন এইরূপ আনন্দে জীবন যাপন করিবে। শাবকগণের সুকোমল নবোদগত পক্ষস্পর্শে, তাহাদের অঙ্গচেষ্টা ও সুমধুর কুঞ্জে এবং মাতাপিতা নীড়ে প্রত্যাগত হইলে তাহাদের সানন্দ মিলনে উভয়ে যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইত—তাহা বুঝি মরলোকে তুল্য। মায়া-কর্তৃক বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয় অল্পদিত-বিবেক এই কপোত-দম্পতি পরমানন্দে শিশু-পালনে মত্ত রহিল।

একদিন সেই পারাপত-দম্পতি শাবকগণের আহার সংগ্রহের জন্ত কুলায় হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যের চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে

যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাধ নীড় হইতে বহির্গত অদূরে ক্রীড়োন্মত্ত সেই শাবকগুলিকে দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্বক তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে কপোত-কপোতী অপত্য-পালনে সমুৎসুক হইয়া আহাৰ্য্য সংগ্রহপূর্বক নীড় সমীপে উপনীত হইয়া দেখিল, তাহাদের অতি আদরের পরম স্নেহের পুত্রকণ্ঠা ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। হায়, হায়, কি ভীষণ দর্শন! যে শিশুগুলিকে এত ক্রেশে গর্ভধারণ ও মোচন-বেদন সহ করিয়া প্রসব করিয়াছি, যাহাদিগকে এত যত্নে পালন করিয়া আসিতেছি, যাহারা আমাদের নয়নানন্দ-বর্দ্ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুতলী—আজ কিনা তাহারা নির্দয় কঠোর-হৃদয় লুপ্তকের হস্তে! হা ধিক্ ভাগ্য! কে জানিত, জীবনে এত শোক হইবে! কে মনে করিয়াছিল যে, এত সৌভাগ্য, এত সুখ, এত আনন্দ,—সব এক মুহূর্তের মধ্যে কালের অতল জলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইবে! কি মর্শ্মভেদী যাতনা! এ অপেক্ষা বুঝি মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উভয়ে মোহাক্ক হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কপোতী এই করুণ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া মোহে ব্যাধের পাশের কথা ভুলিয়া গেল। সে অবিলম্বে রোদন করিতে করিতে ক্রন্দনশীল শাবকগুলির প্রতি প্রধাবিত হইল। তখন অত্যধিক স্নেহান্বিতাবশতঃ জালাবদ্ধ শাবকগণকে দেখিতে গিয়া কপোতী স্বয়ং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে কপোত আত্মাধিক প্রিয় আত্মজগণকে আবদ্ধ দেখিয়া ও আত্মসমা প্রিয়ার তদবস্থা লক্ষ্য করিয়া শোক প্রকাশ-পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিল—হায়, হায়! আমি সন্নপুণ্যবান্, দুর্মতি; আমার এ কি বিপদ হইল? আমি এখনও সুখ ভোগে অতৃপ্ত ও অকৃতার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ-সাধনের ক্ষেত্ররূপ গৃহ বিনষ্ট হইল; আহা! আমার অনুরূপা, অনুরূপা, পতিব্রতা সতী ভাৰ্য্যা আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া সন্তানগণের সহিত মৃত্যুবরণ করিতেছে, এখন শূন্যগৃহে দীনচেতা, মৃতদার, হতপুত্র, কাতরভাবে এ দুঃখময় জীবনধারণ করিয়া কি লাভ? এইরূপ করুণ বিলাপবৃত্ত, মৃত্যুগ্রস্ত, যন্ত্রণায় অঙ্গচেষ্টা-তৎপর, পাশাবৃত স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে দেখিতে সেই দুর্ভাগ্য বুদ্ধিহীন কপোতও ব্যাধজালে আবদ্ধ হইল। তখন ক্রুর ব্যাধ সেই গৃহসুখমত্ত গৃহমেধী কপোত, কপোতী ও কপোত-শিশুগুলির প্রাপ্তিতে পূর্ণকাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

এই প্রকার গৃহাসক্তি তিথ্যগ যোনিজাত ইতর প্রাণীর পক্ষেই এইরূপ অনর্থের

হেতু, আর ইহা যে মনুষ্যের পক্ষ অতি নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুগলারামী গৃহস্থস্বত্ব-মত্ত কুটুম্ব-পালনাসক্ত অশাস্তচিত্ত দুর্ভাগা জীব এইরূপেই কপোতের গায় সখংশে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহার দুর্দশার সীমা থাকে না। তাই শাস্ত্র এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত জীবের দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভাৰ্য্যা বালাঅজ্ঞানজাঃ ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়া মৃতধীরয়ম্ ।

অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধঃ বিশতে তঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

“হায় ! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভাৰ্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাব বিরূপেই বা জীবন-ধারণ করিবে”— এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাাদিগকে সৰ্বদা ধ্যান কর এবং মৃত্যুর পর ‘অন্ধ’ নামক অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

যে জীব মুক্তির দ্বার-স্বরূপ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াও ঐ কপোতের গায় গৃহে আসক্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে “আকুট্যুত” বলেন। অর্থাৎ সে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে যযাতিপুত্র যদুর নিকট অবধূত বিপ্রেন্নর উক্তি—

“নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গে বা কর্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ ।

কুৰ্ব্বন্ বিদেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥” (ভাঃ ১১।৭।৫২)

“কোন বস্তুর জন্য কোনও কারণে অতি স্নেহ ও অত্যাশক্তি করবে না। যে সেরূপ করে সেই দীনাত্মা কপোতের গায় অবশ্য সন্তাপ পাইয়া থাকে।”—এই উপদেশ দিয়া পূৰ্ব্বলিখিত উপাখ্যানটি বিবৃত হইয়াছে। অবধূত জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্বিংশতি শিক্ষা-গুরু মध्ये এই কপোত একটি অর্থাৎ এই কপোতের দুর্দশা হইতে তিনি গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্বিত যে এই কপোত-চরিত্র হইতে শিক্ষালাভ করা দূরে থাকুক, কপোত-কপোতীর জীবনকে অতি লোভনায় মনে করিয়া তাহাদের গায় জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করি। হায়, হায় ! আমাদের এই ঘণিত গৃহ-মত্ততা কবে দূর হইবে? এবং কবে আমরা সাধুগুরু-চরণে প্রণম হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগপূর্বক ভগবচ্চরণ-লাভরূপ পরামুক্তির সন্ধান পাইব? আমি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি না যে, এই গৃহমত্ততাই নরকের দ্বার।

সাধারণ ভাষায় যাহাকে “ঘর-পাগলা” বলিয়া থাকে, সেই “ঘর-পাগলাগণ” যমদূত-গণের দণ্ড। শ্রীধররাজ তাঁহার দূতগণকে প্রেরণ করিয়া “ঘর-পাগলা-সম্প্রদায়”কে নরকে আনাগন করিতে আদেশ দিতেছেন—

“তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-

পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজশ্রম্ ।

নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-

জুষ্টাদগৃহে নিরয়বত্নানি বদ্ধতৃষণান্ ॥” (ভাঃ ৬।৩২৮)

সেই সব অসৎ ছুরাআকে আমার সমীপে লইয়া আসিবে—যাহারা দুঃসঙ্গ-বিবর্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ-সেবিত মুকুন্দ-পাদপদ্ম-মধুপানে বিরত হইয়া নরকের দ্বারস্বরূপ যে গৃহ, তাহাতে গাঢ়ভাবে আসক্ত।

বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিকুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

—শ্রীহরিদাস রায়

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

গোস্থামি-মতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

(৮ই ভাদ্র, শনিবার—৭ই ভাদ্র নহে)

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রায় সকল পঞ্জিকাকারগণই একবাক্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রদর্শিত বিধান অনুসারে বর্তমান বর্ষে শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত-উপবাসাদি নিরূপণ করিয়াছেন। গত বৎসরের প্রায় এ বৎসরও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বেদ-বিচার ও পরতিষি-যোগে অষ্টমীর উপবাস লইয়া কাহারও কাহারও মতে গোলযোগ উপস্থিত হইলেও, প্রায় সর্ববাদিসম্মত-রূপে গোস্থামি-মতে ৮ই ভাদ্র, শনিবার—শ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে। ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার জন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে না। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পূর্ব হইতেই ইহা প্রকাশ করিলাম। ৯ই ভাদ্র, রবিবার—শ্রীনন্দোৎসব ও প্রাতঃ ৭।৫০ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতের পারণ।

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, মাননীয় স্মার্ত্ত শ্রমণ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে এবৎসরও একথানা ‘নবদ্বীপ-পঞ্জিকা’ নামক দিনপঞ্জী যেরূপভাবে ভুল-ভ্রান্তিযুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আর কোন দিন না করিলেই বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গল হইবে। পঞ্জিকাখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভুল দৃষ্ট হয়। ইহাতে মুদ্রাকর প্রমাদাদি ব্যতীত সিদ্ধান্ত ও বিচারসম্পত্ত ভুলেরও অভাব নাই। বহু একাদশী ও জয়ন্তী-ব্রত

প্রভৃতির পারণের সময় নির্দেশ করিতে না পারিয়া পারণের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। “বিধিগত পারণ না করিলে উপবাসে কাহারও কোন ফল হইবে না”—ইহা তাঁহারা জানিয়াও নির্বাক হইয়া আছেন। তাঁহার শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাম-নবমী প্রভৃতির বিচারও গোষ্ঠামি-সম্মত নহে। আমাদের বিচার ও নির্দেশমত ২।১টী বৈষ্ণব-পার্শ্বের সংশোধন করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি বটে, কিন্তু অগ্রত এত ভুল বহিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করায় মনে হইতেছে—পঞ্জিকা-প্রকাশক নিরাজ্ঞ ও হিতাহিত-জ্ঞানহীন। “স্বভাব যায় না ম'লে।”

শ্রীজন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিচার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাকুশল নারসিংহ মহারাজ এবং কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার-উদ্দেশ্যে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলারচক, সরবেড়িয়া একতারা, ডায়মণ্ডহারবার, চাঁদনগর, মথুরাপুর, কাশীনগর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, অমূলিক, পারাণীঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে শুভ-বিজয় করেন। প্রত্যেক স্থলেই সভাপতি-মহারাজের শুভাগমন সংবাদে তত্তস্থানের ভক্তবৃন্দ স্বামিজীর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গভীর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও স্মৃতিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া পরমার্থিক কল্যাণ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে কলারচক, সরবেড়িয়া, কাশীনগর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বামিজী-মহারাজকে বিবিধ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। স্বামিজী প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা অথবা ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দ্বারা তত্তৎ প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করেন। ডায়মণ্ডহারবার, কাশীনগর প্রভৃতি অঞ্চলের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ আইনজীবী এবং দার্শনিক-পণ্ডিতগণ, স্বামিজী-মহারাজের বাগ্মিতাপূর্ণ ও শাস্ত্রাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-সম্বলিত বক্তৃতা শ্রবণ করত সভাপতি-মহারাজকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের অনেকেই স্বামিজী-মহারাজের বাসা-ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর পরিপ্রশ্নাদি করিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রবিচারাদি শ্রবণ করেন এবং তত্তদ্রূপে স্বামিজী-মহারাজকে আরও কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান। নানা বধ সেবাকার্যের গুরুভার থাকায় তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হন। উল্লিখিত স্থান সমূহে গুণমুগ্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী, পাবলিক প্রেসিকিউটর শ্রীযুত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুত হিরণ্য চক্রবর্তী বি, এল; শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ হালদার, বি, এল; শ্রীযুত-মন্মথনাথ মিত্র, বি, এল; শ্রীযুত সুশীল কুমার সর্দার বি, এল; শ্রীযুত পঙ্কজ কুমার বসু, মোক্তার, শ্রীযুত অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ; উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক

শ্রীযুত অনুকূল দাস বি, এল ; শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এল ; শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ কাজি বি, এল ; শ্রীযুত ফণীভূষণ সেন বি, এল ; শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মাইতি বি, এল ; শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্তী বি, এল ; প্রফেসর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষে আমরা শ্রীযুত আনন্দমোহন দাসাধিকারী মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহারই উৎসাহ এবং বিশেষ আগ্রহে নানাবিধ সেবাকার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও স্বামিজী-মহারাজ এতদেশে শুভাগমন করেন। শ্রীযুত দাসাধিকারী মহোদয়ের এই সেবাচেষ্টা এবং প্রচারোত্তম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; শ্রাবণ—১৩৫৮

২৯ বামন, ১ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই, বুধবার—পূর্ণিমা রা ১২২। পৌর্ণ-
মাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্দশ্য ব্রতরম্ভ। শ্রীমদীশ্বর বেদান্ত সমিতি ও
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ-পক্ষে চাতুর্দশ্য ব্রতরম্ভ। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর
তিরোভাব।

৫ শ্রীধর, ৬ শ্রাবণ ২৩ জুলাই, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৪।৩৮। শ্রীল
গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর, ৯ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৪।১৪।
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

১১ শ্রীধর, ১২ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই, রবিবার—কৃষ্ণেকাদশী রা ৮।৯। কামিকা
একাদশীর উপবাস।

১২ শ্রীধর, ১৩ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১০।৬। পূর্বাব্দ
৯।৩০ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৬ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট, সোমবার—গৌরেকাদশী রা ৬।১২।
পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা
আরম্ভ ; চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় গঠে মহোৎসব।

২৭ শ্রীধর, ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৩।৫০।
পূর্নাব্দ ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব ; মতান্তরে
পরাহে।

৩০ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট, শুক্রবার—পূর্ণিমা দি ৮।৫২। শ্রীশ্রীরাধা-
গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর
উপবাস। (আগামী কল্য দি ৯।৩১ মধ্যে পারণ)

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	*
ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।		নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	গর্ভোদশায়ী, ৩০ শ্রীধর, ৪৬৫ গোবিন্দ শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৫৮ ; ইং ১৭।৮।৫১	৬ষ্ঠ সংখ্যা
----------	---	-------------

5/3

শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

[শ্রীমদ্রূপ-গোবিন্দ-বিরচিতম্]

শ্রীহরয়ে নমঃ

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং
 রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদং ।
 মদনারবুদ-রূপ-মদন-রুচিং
 রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখম্ ॥১॥

মুখরীকৃত-বেণু-হৃত-প্রমদং
 মদ-বল্লিত-লোচন-তাম-রসং ।
 রসপূর-বিকাশক-কেলি-পরং
 পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিম্ ॥২॥

গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীর-ভুবং
 ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদং ।
 পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠ-রুচং
 রুচকান্ত-বিশেষক-বল্লভ-তরম্ ॥৩॥
 তরল-প্রচলাক-পরীত-শিখং
 শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজং ।
 ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গণ-রঙ্গ-ধরং
 ধর-কন্দর-খেলন-লুক্র-হৃদম্ ॥৪॥
 হৃদয়ালু-সুহৃদগণ-দত্ত-মহং
 মহনীয়-কথা-কুল-ধূত-কলিং ।
 কলিতাখিল-দুর্জয় বাহু-বলং
 বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতম্ ॥৫॥
 হিত-সাপু-সমীহিত-কল্পতরুং
 তরুণীগণ-নূতন-পুষ্প-শরং ।
 শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং
 তমসাপু-কুলোৎপল-চণ্ডকরম্ ॥৬॥

কর-পদ্য-মিলং কুসুম-স্তবকং
 বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিং ।
 হরিণীগণ-হারক-বেণু-কলং
 কল-কণ্ঠরবোজ্জ্বল-কণ্ঠ-রগম্ ॥৭॥
 রণ-খণ্ডিত-দুর্জয়-পুণ্ড্রজনং
 জন-মঙ্গল-কীর্তি-লতা-প্রভবং ।
 ভব-সাগর কুন্তজ-নাম-গুণং
 গুণ-সঙ্গ-বিবর্জিত-ভক্তগণম্ ॥৮॥
 গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং
 সিতরস্মি-সহোদর-বক্তৃ-বরং ।
 বর-দৃপ্ত-বৃষাসুর-দাব-ঘনং
 ঘন-বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ম্ ॥৯॥
 ময়-পুল্ল-তমঃক্ষয়-পূর্ণবিধুং
 বিধুরীকৃত-দানব-রাজকুলম্ ।
 কুল-নন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥১০॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-অজোল্লসিতং ।

হরি-মঙ্গলাতি-মঙ্গল-মচ্চন্দনং বন্দে ॥.১॥

ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

শ্রীহরিকুসুম স্তবকের বঙ্গানুবাদ

মত্ত-মাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতিসুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী
 অপেক্ষাও যাঁহার দশন-পঙ্ক্তি অতি মনোজ্ঞ, অর্কুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা
 অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা, এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত ॥১॥

যিনি বংশীধ্বনি দ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবন-মদহেতু
 যাঁহার নয়ন-পদ্য অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা—রসপ্রবাহ-প্রকাশক এবং যিনি
 পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥২॥

যাঁহার ধ্বজ-বজ্রাকুশাদি চরণ-চিহ্ন দ্বারা যমুনার তীরস্থ ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধি-রুদ্রাদি দেবগণ কর্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জল পদক-ভূষণ দ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ অশোভিত এবং গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক ধারণ করায় যাঁহার লালার অতিশয় মনোহর ॥৩॥

ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা যাঁহার চূড়া অশোভিত, যিনি বামহস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভূজগেদ্র কালিয়ার মণ্ডকে যিনি নৃত্য করেন, গিরি-কন্দরে খেলা করিতে যাঁহার চিত্ত সমুৎসুক ॥৪॥

সহদয় অহুদগগকে যিনি সর্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা-প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ভ খর্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুষ্কেষ্ট এবং যিনি বলরাম ও ব্রজ-বালকগণের নিকটে সর্বদা বিরাজমান ॥৫॥

যিনি অনুবর্তী ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতীগণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে তংপর এবং যিনি দৈত্যবৃন্দ-রূপ কুমুদ পুষ্পসকলের স্নান বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥৬॥

কুসুম-স্তবকে যাঁহার কর-পদ্ম অশোভিত, যিনি বকাস্বরূপ মত্ত-মাতঙ্গের প্রতি সিংহ-স্বরূপ, যিনি অমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি অমধুর ॥৭॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম, গুণ ও লীলা ভব-সাগর শোষণে অগন্ত্যমুনি-স্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিসর্জিত ॥৮॥

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য অদ্বিত্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ, যিনি অতি গর্বিত বৃষাস্বরূপ দাবানল নির্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী ও তহুচিত বেশ-ভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তংপর ॥৯॥

যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব-রাজবংশ ক্রেশাবিত হইয়াছে, সেই স্ব-বংশের আনন্দকর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তী-মালায় যিনি অশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর এবং মলয়াদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১॥

ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবক সমাপ্ত

অসুরিক প্রবৃত্তি

অসুরগণ বৈষ্ণব-অপরাধী

কলিকালে আমরা কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া অসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়ি। আমাদের অসুর-প্রবৃত্তি কখনই সং-সমাজ আদর করিবেন না। সাধুর সমাজ আমাদেরকে অনাদর করিতে শিখিলে আমরা অমুতপ্ত হইয়া অসুরিক প্রবৃত্তি হইতে অবসর পাইব। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া আমাদের কেহ কেহ নানাপ্রকার অযথা উৎপাতের আवाহন করি।

অসুরগণ শাস্ত্র-নিন্দুক

আমাদের অসুর-স্বভাবের সহিত সং-শাস্ত্রের কথা মিল না পাইলে আমরা শাস্ত্র-নিন্দা করি, কখনও কখনও তৎপ্রদর্শিত সত্য লঙ্ঘন করিয়া মহাভারত ছিঁড়িয়া ফেলি, শাস্ত্রাঙ্গবনুর্ভি—শ্রীমদ্ভাগবত ছিঁড়িয়া ফেলি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রকে পক্ষমধ্যে ফেলিয়া দিতে বলি। এইগুলিই আমাদেরকে বিষ্ণুভক্তি হইতে চিরকালের জন্য অসুর-সম্প্রদায়ে পাতিত করে। আবার, আমরা অসুর, এই কথা শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে নিজে নিজে অসন্তুষ্ট হই।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবকই দেবতা, তদিতর-সমূহ দেব-দ্বিজকুলে

উদ্ভূত হইলেও অসুর

এখন দেখা যাক, আমরাই দেবতা হইতে পারি, আমরাই অসুর হইতে পারি। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিলেই আমরাই বৈষ্ণবের দাস, দেবতা, ব্রাহ্মণ; আর শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের অবমাননা করিয়া পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও—কণ্ঠপের সন্তান হইয়াও হরি-বিদ্বেষ-পূর্বক কুপথে নরকে চলিয়া যাই, বিশ্ববাতনয় হইয়া মাতা-হরণে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই। অঘ-বক-পুতনা হইয়া কৃষ্ণ-বিদ্বেষ করি। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু হইয়া প্রাধাত্য-লাভে যত্ন করি। জগাই মাধাই হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-কুলের কলঙ্ক হই। আবার নিত্যানন্দ হরিদাসকে মারিতে গিয়া অমুতপ্ত হইয়া নিজের নিজের পুনরুৎপাদি করি। এ সকল যজ্ঞ-ভঙ্গরূপ রাক্ষস-প্রবৃত্তি আমাদের ভাল নহে।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্তৃক অশুর নিধন, এবং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের তারতম্য

মানব-ধর্মশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২।১৬৩ শ্লোক পড়িলে ব্রাহ্মণ আমরা জানিতে পারি যে,—

“সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজ়েত বিবাদিব ।

অমৃতশ্চেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানশ্চ সর্বদা ॥

সুখং হবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে ।

সুখং চরতি লোকেহস্মিন্ণবমস্তা বিনশ্চতি ॥”

[ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের গ্রায় বোধ করিবেন, তাহাতে প্রীতি লাভ করিবেন না এবং সর্বদা অমৃতের গ্রায় বোধ করিয়া অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করিবেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সম্মান করিলে তাহা ত প্রীত হইবেন না বা অপমান করিলেও তাহাতে খেদ করিবেন না ; মানাপমান সমান বোধ করিবেন । যেহেতু ইহ লোকে কোন ব্যক্তি অপমান করিলে যিনি খেদ না করেন, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে প্রতিবুদ্ধ হন এবং কর্তব্য কর্মে বিচরণ করিয়া বেড়ান ; কিন্তু অপমানকর্তা সেই পাপে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।]

এই সকল কথা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আলোচনা করেন । অশুর স্বভাবসম্পন্ন হওয়া কেহই আদর করেন না । অশুরগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্তৃক নিহত হ'ন । ভগবান্ অশুরদিগকে মোহিত করিবার জন্ত অনেকবার দেবতা-গণকে পীড়ন করাইয়াছেন । তাহা অশুরগণেরই অকল্যাণের জন্ত । কলিকালে বিষ্ণুভক্তি নিতান্তই বিরল । বিষ্ণুভক্তির নামে নির্বুদ্ধিতা ও আত্মরিক প্রবৃত্তি জীবের কখনই মঙ্গল উৎপাদন করে না । শ্রীআচার্য্য শ্রীকৃপগোস্বামিপাদ বলেন,—

“শাস্ত্রতঃ শ্রয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রাশ্রাধিকারিতা”

আর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন,—

“গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

[বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’ ।]

শাস্ত্র আরও বলেন,—

“ন শূদ্রা ভগবদ্বক্তৃত্বেন্ধপি ভাগ্যতোত্তমাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা য়ে ন ভক্তা জনাৰ্দনে ॥ (পদ্মপুরাণ)

[ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হন না, তাঁহাদিগকে ‘ভাগবত’ বলিয়াই কীৰ্ত্তন করা যায়। জনার্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা ‘শূদ্র’ বলিয়াই গণনীয়।]

গুরুর অবজ্ঞাকারী—কৃতঘ্ন, অশুর

যাহারা শ্রীগুরুদেবকে অমাণ্ড করিয়া গুরুদেব শূদ্র—একথা বলেন, তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর অবজ্ঞাকারী কৃতঘ্ন অশুর। আমরা যেন কোন দিন আশুরিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বৈষ্ণব-গুরুর চরণে অপরাধ না করি। আচার্য্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

“বৈষ্ণব-বিদেষী চেৎ গুরুস্ত্যাজ্য এব।”

আমরা অশুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া যদি বৈষ্ণব-বিদেষ বা গুরুবজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমাদের যাবতীয় ধন, জন, পাণ্ডিত্য অচিরে বিধ্বংসিত হইবে।

শ্রী-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের প্রতি

জাতিবুদ্ধিকারিগণ অশুর

শ্রীআলবন্দারু ঋষির স্তোত্র হইতে এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলি—

“মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ

সর্বঃ যদেব নিয়মেন মদনয়ানাং।

আদ্যশ্চ নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং

শ্রীমত্তদজিৎ যুগলং প্রণমামি মূৰ্দ্ধন্য ॥”

শ্রীবকুলাভিরাম বা শ্রীশঠকোপ দাস শৌক্য ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হ’ন নাই। তিনি আলবন্দারু ঋষির পূর্বপুরুষ। এই আলবন্দারু ঋষির শিষ্য কোটী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পূজিতচরণ ভগবদ্রামাজুজাচার্য্য। এই সকল পড়িয়া শুনিয়াও যদি আমাদের আশুরিক প্রবৃত্তিবলে ছয় গোস্বামীর কেহ কেহ শূদ্র ছিলেন, বলিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী বংশে-জন্ম করিবার প্লাঘা করিতে গিয়া যদি ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের যজ্ঞ-সূত্র অযোগ্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ছিঁড়িয়া দিবেন এবং সূক্ষীতল চরণচ্ছায়ে আশ্রয়গ্রহণের কপটতা করিতে গেলে আমাদের গলদেশস্থ তুলসীমালিকা কাড়িয়া লইবেন এবং মূৰ্ত্ত্য-বশতঃ নিজ-নামের সহিত “গোস্বামী” লিখন হইতে চিরদিনের জন্ত আমরা বঞ্চিত হইব।

ক্রিয়াহীন জাতিগোষ্ঠামিগণ বৈষ্ণব-বিদেষী অসুর

গোষ্ঠামি-কুলোচিত ক্রিয়া পরিহার করিয়া আমরা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই, তাহা হইলে শিশ্নোদর-পরায়ণ জানিয়া আমাদের লোকে ঘৃণা করিবে। সামান্য কপর্দকের লোভে ইন্দ্রিয়-তর্পণের পিপাসায় আমরা নিত্যকালের জন্য বৈষ্ণব-বিদেষী হইয়া যাইব এবং পিতৃকুলের তর্পণ করিবার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন—

“নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া নৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।

পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

[যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়।]

—শ্রীল প্রভুপাদ.

অত্যাহার

ভক্তি-সাধনে “অত্যাহার”-শ্লোকের পালন একান্ত আবশ্যক

শ্রীমদ্রূপ-গোষ্ঠামী স্বকৃত উপদেশামৃত-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ ভিত্তিক্তির্ভিনশ্চতি ॥”

(উপদেশামৃত-২)

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিগুহ্ণ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য ঐহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে (১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক পৃথকরূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল ‘অত্যাহার’ শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে।

‘অত্যাহার’-শব্দের অর্থ অধিক ভোজন-মাত্র নহে

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ‘অত্যাহার’-শব্দে এস্থলে ‘অধিক ভোজন’-মাত্র উদ্दिষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। উপদেশামৃত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

যাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

যিনি ধৈর্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য বস্তুর অস্বাদন-স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে ‘অত্যাহার’ শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিকৃত্তি-দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গভীর শ্রীকৃষ্ণ-গোস্বামীর ‘অত্যাহার’ শব্দে অন্য তাৎপর্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্তব্য।

‘ভোজন’এর অর্থ—পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয়-ভোগ

ভোজনই ‘আহার’-শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয় ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়। সুতরাং ‘বিষয়-ত্যাগ’—এই পরামর্শ কেবল কুলনারুঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তির অনুকূল কর্মের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ কর্তব্য

ভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈস্তু নৈঃ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ (গীঃ ৩।৫-৬)

[অর্থাৎ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম-ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্মসকল করিতে থাকে ; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয় । চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে ; অতএব সেই মুঢ়কে ‘নিথ্যাচারী’ বলা যায় ।]

কর্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু সেই কর্ম যদি বহিস্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয় । অতএব শরীর-কর্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অতুল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয় ।

যুক্ত বা পরিমিতভাবে বিষয়-গ্রহণের উপায়

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্চতঃ ।

ন চাতিষ্পল্লীলশ্চ জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্মশ্চ ।

যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গীঃ ৬।১৬-১৭)

নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো মথ্যেত তত্ত্ববিৎ ।

পশুন্ শব্দন্ স্পৃশন্ জিহ্বন্নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥

প্রলপন্ বিস্মজন্ গৃহ্নন্ মিষস্মিমিষস্মপি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ (গীঃ ৫।৮-৯)

[অর্থাৎ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূণ্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় । যুক্তাহার ও যুক্তবিহারশীল, কর্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় । কর্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ ‘আমি কিছুই করি নাই’—এরূপ মনে করেন । প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ কার্য্যকালে মনে করেন,—আমি যে জড় দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে ; অবিজ্ঞা-বদ্ধ ‘আমি এইসকল কার্য্যে নির্দ্বারপ্রাণ ও মনন মাত্র করিতেছি । আত্মযথাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে’ ।]

অতি-ভোজন, অত্যন্ন-ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না । কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্টে, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয় । তাহার প্রকার এই যে, আগার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এইসকল কার্য্য করি না,—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে ।

কর্ম্ম ও জ্ঞান ত্যাগ করিলে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যানুকূল হইতে পারে । গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয় ।

যুক্ত-বৈরাগ্য ও জীবনযাত্রা-বিধি

অতএব শ্রীরূপ রসায়নসিদ্ধিতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাইমুপযুক্ততঃ ।

নির্লব্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুরঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্য কথ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৫ ২৬)

[অর্থাৎ—কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্লব্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে । মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু-প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্য-বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয় ।]

উক্ত দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন । তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে । কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল-রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয় । ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে । তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে । শ্রীমন্মহা-প্রভুর আশ্রয় এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর । ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জগু যত্ন করিবে না । স্বল্পায়াস-লব্ধ

পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভক্তনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

অত্যাহার-দমন নিত্য এবং জিহ্বা ও উদরবেগ দমন—

নৈমিত্তিকী ক্রিয়া

(উপদেশামৃতের) প্রথম শ্লোকে—জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য-দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোন্মুগ হন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন ষে রূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি অমুণীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে—যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটি ভক্তি-সাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্বটি নৈমিত্তিক, শেষটি নিত্য।

গৃহী ও গৃহত্যাগীর অত্যাহার পৃথক্

ইহাতে আর একটি কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্ত গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম-সঙ্কিত ও ধর্মোপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎসেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার, এবং অধিক উপার্জনও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাহার অত্যাহার-দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী—সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পূজিত
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসবোপলক্ষে

শ্রীশ্রীজগন্নাথফটক



শ্রীমঠে সেবিত শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারী-জগন্নাথজীউ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবায় নমঃ

(যিনি)—যমুনা-পুলিনে-বিপিন-মাঝারে গাহিতে গাহিতে সুমধুর গান,
মধুপ-সমান আনন্দে, গোপিনী-মুখপন্ন-সুধা করেন পান ;
কমলা-মহেশ, গণেশ-দেবেশ, ব্রহ্মা আদি যত দেব-দেবীগণ—
করেন অর্চনা নিয়ত আনন্দে যাঁহার অভয় যুগল চরণ ;

রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥১॥

(যাঁর)—বামকরে বেণু, শিরে শিখিপাখা, গলে বনমালা, চরণে নূপুর,
কটিতে-পীতবদন সুন্দর, আননে হাস্য মধুর মধুর ;

(যিনি)—সখাগণ-প্রতি নয়ন-উপান্তে আনন্দে কটাক্ষ করিয়া ধারণ ।
বৃন্দাবনে সদা করেন বসতি—মায়া-বদ্ধজীব-মুক্তি-কারণ ।

রম্য মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥২॥

(যিনি)—সুগম্ভীর মহাজলধির তীরে, কনকোজ্জ্বল নীলাচল শিরে—
অভভেদী-চূড়-নয়নাভিরাম সুরম্য-বিশাল প্রাসাদ ভিতরে,
সহোদর রাম-সহ সুভদ্রারে, রাখি' মধ্যস্থানে করি' অবস্থান
দেবগণে স্বীয় সেবার সুযোগ সতত কারুণ্যে করেন প্রদান ;

রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৩॥

(যিনি)—দয়ার সাগর ; সজল জলধি-সম অঙ্গকান্তি, নিরখি যাঁহার,
নিয়ত বৈকুণ্ঠে রমা-বাণী-সহ পরম আনন্দে করেন বিহার ।
অমল কমল-বদন যাঁহার, “অমরোত্তমৈঃ” আরাধ্য রতন ।
তন্ত্রাদি বেদসমূহ পুরাণ যাঁহার চরিত্র করেন কীর্তন,

রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৪॥

রথে আরোহিয়া গমনের কালে পথ-মাঝে যত ব্রাহ্মণের গণ—
কৃত স্তব-স্তুতি-কীর্তন শুনি' যিনি পদে-পদে সুপ্রসন্ন হ'ন,
যে জন দয়ার সাগর, নিখিল জনের পরম বন্ধু,
বারিধির প্রতি করুণা করিয়া বিরাজেন কুলে যেই দয়া-সিন্ধু,

রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৫॥

(যিনি)—পরমার্চনীয় পরমেশ্বর জগত-জীবন অনাথ-শরণ,
প্রফুল্ল নলিনী-দল-সম যাঁর আকর্ষণ-বিসারী যুগল নয়ন,

রয়েছেন যিনি অনন্তনাগের অগণিত শিরে করি পদার্পণ ।

(যিনি) প্রেমানন্দময়, সুখী—শ্রীরাধার রসময় দেহ করি' আলিঙ্গন ॥

রম্য-মনোরম রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৬॥

(আমি)—বিশাল রাজত্ব, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি মানবের কাম্য বিভব চাহি না,

সকল মানব-সদা স্পৃহণীয় অনবদ্য অঙ্গী নারীও চাহি না,

চাহিমাত্র শুধু নিবেদিতে তব রাঙাপদ-তলে জাতি-কুল-মান ।

প্রমথ-ঈশ্বর, রুদ্র-গঙ্গাধর করেন যাঁহার সদা গুণগান—

রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৭॥

ওহে সুরপতে ! ত্বরায় আমারে এ' সংসার হ'তে করহ উদ্ধার,

ওহে যদুপতে ! কর বিমোচন, অসহ আমার কলুষের ভার ;

(যিনি)—সৎ-চিদানন্দ-কৃষ্ণ-ভগবান্, পতিতে করেন শ্রীচরণ দান,

(যিনি)—নারদ-কীর্তনে বিগলিত, যাঁর চরণে জাহ্নবী জনম পান,

রম্য-মনোহর রথের উপর সুভদ্রাভগিনী বলরাম সাথ ।

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন সতত সেই জগন্নাথ ॥৮॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবক-দাসাভাস

—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ভক্ত ও ভোগী

”নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশুন্তি পুত্রমার্থিনঃ ।

জগদ্বনময়ং লুকাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥”

শ্লোকটী হইতে আগরা জানিতে পারি যে, একই জগৎ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট

দর্শকের নিকট বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে জগৎকে সাধুগণ শ্রীভগবানের

সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন, কামুকগণ তাহাকেই কামিনীময় দর্শন করিয়া থাকে ।

ভোগিকুল সর্বদা ভোগবুদ্ধিতে প্রধাবিত বলিয়া সেব্যদর্শন লাভে একান্ত অক্ষম। তাহারা ত্যাগের চিত্র দর্শন করিয়া তাহাকে কখনও কখনও বহুমানন করে, পরন্তু ভোগ-ত্যাগাভীত সেবাবৃত্তি হইতে বঞ্চিত বলিয়া সেবার স্বরূপ বিষয়ে তাহারা প্রবেশাধিকার পায় না। তাই তাহারা ভোগনেত্রে সেবাকে দর্শন করিয়াও ভোগ-সাম্যে গ্রহণ করিয়া নিরয়গামী হয়।

“মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ”—বিচারটি ভোগিবৃন্দ কখনও বুঝিতে পারে না। ভোগ এবং ত্যাগ—এই দুই ধর্মই স্বরূপের ধর্ম নহে; নৈসর্গিক অনাত্মীয় ধর্মে ইহার স্থিতি। ভোগী যখন ভোগের পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় অর্থাৎ যখন সে “পশ্চেৎ পাকবিপর্যাসঃ” এর সত্যতা সম্যক্ অবগত হইয়া, ভোগপ্রবৃত্তিই তাহার দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তখন সে “ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরম্” এর মোহে পতিত হইয়া তৎপ্রতি প্রধাবিত হয়। পরন্তু ত্যাগের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিলেও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে। দুঃখ নিবৃত্তি এবং শান্তিলাভ—অবস্থা দুইটি এক নহে। রোগীর বিজ্ঞের অবস্থা ঘটিলেই যেমন তাহাকে সুস্থ বলা যায় না, তাহার সুস্থশরীর লাভের পক্ষে এখনও সময়ের অপেক্ষা বর্তমান এবং যেমন যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার পুনরাক্রমণ সম্ভবপর, তদ্রূপ ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার-সম্পন্ন মুক্তাভিমानी ত্যাগীর যে মুক্তি তাহাও নিরাপদ এবং শান্তিপ্রদ নহে।

জ্ঞানী জীবমুক্তদশা পাইলু করি’ মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি ‘শুদ্ধ’ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২২)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

“যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্যাস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়।

আকৃহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদজ্যুঘ্নঃ ॥”

(ভাঃ ১০।২।৩২)

[অর্থাৎ হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা ‘বিমুক্ত হইয়াছি’—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিগুণ হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্রেশে মায়াভীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্বক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।]

সুতরাং ত্যাগের দ্বারা কখনও জীবের শান্তিলাভ হয় না—ভোগিকুল ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়। পরন্তু ভক্তগণ ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত নহেন, তাহারা তৃতীয় বস্তু—সেবা-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত—তাই মুরারির তৃতীয় পন্থা।)

পঞ্চতপা প্রভৃতির তামসিক বৈরাগ্য দর্শন করিয়া ভোগিকুল চমৎকৃত হয় এবং ঐপ্রকার অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু ঐপ্রকার বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রীভগবানের কোন প্রীতির সম্বন্ধ না থাকায় পরন্তু জড়ীয় প্রতিষ্ঠায় রৌরব-লাভ ঘটে—ইহা দর্শন করিয়া ভক্তগণ ইহা হইতে শত যোজন দূরে অবস্থান করেন। তাহারা ঐপ্রকার ত্যাগ দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগীতার নিম্নোক্ত বাক্যটি স্মরণ করেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ধোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দন্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিক্যাংস্বরনিশ্চয়ান্ ॥

[অর্থাৎ—যে-সকল ধোর তপশ্চা শাস্ত্র বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বলযুক্ত, তাহা দন্ত ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকগণ অবলম্বন করে। যাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপশ্চা দ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং তদন্তঃস্থিত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আগ্নেয়-নিষ্ঠায় অবস্থিত]

ভক্তগণ জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্য কথ্যতে ॥

অর্থাৎ—

“শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল ।

বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥”

তাহারা জানেন, বর্তমান প্রারব্ধ শরীরটি হরিসেবার অনুকূল। সুতরাং তাহাকে অযত্ন করা হরিসেবার প্রতিকূল বিচার। যে বস্তুদ্বারা সেব্যবস্তুর প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনাদর করা সেবকের কর্তব্য নহে। ভগবানের সেবার উপকরণগুলি যত্নপূর্বক সংরক্ষণ এবং তদ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিধান করাই ভক্তগণের কৃত্য। ভক্তের শরীর-রক্ষণাদি ব্যাপারগুলি দর্শন করিয়া ভোগী তাহারই মত ভোগ্যপদ বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে। পরন্তু ভোগমুগ্ধে দর্শন করিয়া এক বলিয়া ধারণা হইলেও উহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, উহা ভোগী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভোগীর আহার-বিহারাদিযুক্ত শরীর রক্ষা দ্বারা তাহার নিজ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য। সে ভাল ভাল খাদ্য গ্রহণ

করিয়া, উত্তম উত্তম সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, বৈদ্যাতিক পাখার বাতাস সেবন করিয়া এবং মোটর, হস্তী, ঘোটকাদিতে আরোহণ করিয়া তাহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকে ; আর ভক্ত যদিও উক্ত প্রকার আহাৰ্য্য, শয্যাাদি ও যান-বাহনাদি স্বীকার করেন, তদ্বারা নিজেই-তর্পণের পরিবর্তে শ্রীভগবানের প্রীতিই সাধন করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলি যাইতে পারে—পিতামাতা তাঁহাদের পাঁচটি পুত্রকে নানা-যত্নে পালন করিলেন। পুত্রগণ উপযুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রগণসহ পৃথকভাবে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন এবং পিতামাতার পালনাদি না করিয়া তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিরত থাকিলেন ; পাঁচপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রটি যথাশক্তি পিতামাতার সেবা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে যেমন বলি হয় যে, জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে লালন-পালন করিতে পিতামাতার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে ; অন্তর্গত লালন-পালন করিতে একইরূপ কষ্ট হইলেও তাহা সার্থক হয় নাই। ঠিক তদ্রূপ, ভক্তগণ শরীর রক্ষার জন্ত যাহা কিছু স্বীকার করেন তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের সেবাই সাধিত হয়। আর অভক্তগণ একই উপকরণে শরীর রক্ষাদি করিলেও তাহার দ্বারা ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয় না ; পরন্তু গীতার “যজ্ঞার্থং কৰ্ম্মণোহুগ্ৰাহ লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ” বাক্যানুসারে তাহারা বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেবায় সন্তুষ্ট পিতামাতা যেমন সর্বদা জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুশল-কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্ সর্বদা তাঁহার ভক্তগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্ত সচেষ্ট থাকেন। যদিও ভক্তগণ ইহা ভগবানের নিকট কখনও কামনা করেন না, তথাপি ভগবান্ ভক্তের সেবায় বশীভূত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। “তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্”—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাক্যই উহার প্রমাণ।

আর অভক্ত ভোগিগণ শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত বলিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম হইতেছে। তাহারা মনে করে, নিজের চেষ্টায় তাহারা তাহাদের অসুবিধা দূর করিবে। কিন্তু তাহারা জানে না—

“আপন ইচ্ছায় জীব কোটা বাজা করে।

কৃষ্ণইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাই ধরে ॥”

ভগবদ্ভক্তিহীন ভোগী কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবার উপকরণেও ভোগবুদ্ধি করিতে কুঠা বোধ করে না। রাবণ যেৰূপ ভগবানের অক্ষয়ানী সীতাদেবীকেও ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, ভোগী ব্যক্তিগণ তদ্রূপ

ভগবৎ-সেবা বন্ধ করিয়া, 'সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবা'র নাম করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকে আবাহন করে। ভক্ত ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভোগীর তাহাতেও লোভ জন্মে এবং কি-প্রকারে তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে লাগাইতে পারা যায়, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাবণের সীতা-হরণের পরিণাম দর্শন করাইয়া ভক্তগণ তাহাদিগকে সততই সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

“ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন তান্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চস্বিদ্ধনম্ ॥ (ঈশোপনিষৎ—১)

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ-সম্পাদক.

ভগবান্ কি নাই ?

ভগবানের অস্তিত্ব আছে কিনা, এসম্বন্ধে এর আগে থেকেই লিখতে আরম্ভ করা হ'য়েছে। পাঠকবর্গের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম ওটা ঠিক মাসের পর মাস ধরেই বেরবে। কিন্তু তা' আর হ'য়ে ওঠেনি, কারণ—এ সংসার দাবানল-স্বরূপ। এই সংসার-দাবানলে মানুষ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। মানুষ নিজ চেষ্টায় এটা এড়াতে পারে না। সেজন্য তা'কে নির্ভর করতে হয় এ-জগতের সৃষ্টিকর্তার উপর। আমি মানুষ, তাই আমিও সময়ের গতিকে এড়াতে পারিনি ব'লেই এই শেষাংশটুকু প্রকাশ করতে দেবী হ'য়ে গেল। তজ্জন্ম এই দীন সেবক পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

এর পূর্বে যা' লিখেছি, তাতে শুধু বহুবিধ মতামত নিয়ে তর্কের অবতারণাই করা হয়েছে—তর্কের শেষ নাই। কাউকে তর্কের দ্বারা তত্ত্ব-বস্তুতে বিশ্বাস করানো সম্ভব হয় না। বিশ্বাস—বিশ্বাসই। আমরা যা' করছি, যা' দেখছি, যা'তে পরিচিত হচ্ছি, যা' শুনে আনন্দ পাচ্ছি, এ-সবগুলিরই একটা না একটা antecedent ground আছে। মানুষ যখন সব 'কেন'র বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা'র মন কি নীরব থাকে ? তা' হয় না, একটা কিছু solution চাই-ই। তা'কে এমন একটা বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, যে বস্তুটা হ'বেন তা'র কাছে Final Authority. ঐ Final Authority হ'ছেন—“God” অথবা Direct representation of 'God'.

এজগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়—এই তিনটী জিনিষ আমাদের কাছে বরাবরই
দুজ্জেষ্ট রহস্য ব'লেই প্রতীয়মান হ'চ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের
১ম শ্লোকে—

দেবদেব নমস্তেহস্ত ভূতভাবন পূর্বজ ।

তদ্বিজানীহি যজ্ঞজ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥

মহর্ষি নারদ প্রভৃতি, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন— “প্রভো! আপনি সকলের পূর্বজ, ও আপনিই এ-জগতের সৃষ্টিকর্তা ব’লে আমাদের ধারণা ছিল, কিন্তু আপনাকেও তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দে’খে আমাদের সংশয় হ’চ্ছে যে—আপনার থেকেও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন। আপনার আরাধ্য সেই পুরুষটী কে?”

ব্রহ্মা বলছেন :—

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫.১)

সং, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমারাধ্য, পরম-ঈশ্বর এবং সকল কারণের কারণ ।

Proper selection, combination এবং gradation ছাড়া এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি অসম্ভব । এ-গুলিতে **Planned method** দরকার । এই **Planned method** এর অধিকারী মানুষ বা অণু কেউ হ’তে পারে না । যেখানে সামান্য ভুল হ’লেই সব নষ্ট হ’য়ে যেতে পারে, সেখানে mortal mind এর **Planned method** এর দৌড় কতখানি হ’তে পারে তা’ সহজেই অনুমেয় । অবিভুদ্ধ আত্মাই ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ভগবান্ চির শান্তিময় বস্তু । তাঁ’কে পেতে হ’লে, তাঁ’কে বুঝতে হ’লে, চাই বিশুদ্ধ, সদানন্দ, অনাসক্ত, নিত্য সেবাময় মন । এইরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পার্থিব মায়াজাল ও পাপাচার-মুক্ত হ’য়ে বিশুদ্ধ আরাধনাতে ভগবানকে পেয়ে থাকেন ।

এ-জগতে আমরা যাই করছি, সবই পূর্ব দৃষ্টান্তের অনুসরণ মাত্র । আমরা জন্মগ্রহণের পর শিশুকালে মাতৃ-ক্রোড়েই লালিত-পালিত হই । জ্ঞান-লাভের পূর্বে পিতার সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তখন হয় না । পিতাকে পিতা ব’লে চেনার আগে ‘মা’ই চিনিয়ে দেন—ইনি তোমার পিতা । তার থেকেই বাবাকে ‘বাবা’ বলা যায় । এটাতে যদি কারুর আপত্তি না হয়, তবে তপস্বী, ঋষী বা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি থেকে আমরা যে ভগবানের অস্তিত্বের কথা বা তাঁ’র স্থিতির প্রমাণ পাই, তা’তে আমাদের অবিশ্বাস হওয়ার কোনও কারণ দেখি না । এসম্বন্ধে কাউকে বাতুল মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়, তা’ন্তে শুধু নিজের বাতুলতাই বৃদ্ধি পায় ।

আরও ধরা যাক, মাষ্টার-মশায় grammer পড়াতে গিয়ে ছেলেকে বলছেন—
 “ওহে, Third Person, Singular Number দেখলেই ক্রিয়াপদের সহিত
 ঝপ্ ক’রে ‘s’ বা ‘es’ যোগ ক’রে দিও, তা’ নাহ’লে সব ভুল হ’বে।” কৌতূহলী
 ছাত্র জিজ্ঞেস করছে—“Sir, অত্যাঁচ First person বা Second person এ
 ঐরূপ হয় না কেন ?” মাষ্টার মশায়ও ভেবে ঠিক পান না, কেন ঐরূপ হয়। যাই
 হোক ক’রে তখন বলা হ’ল—“বাপু, ও সবের প্রয়োজন তোমার নাই। যা’ বলা
 হ’ল ওটা ঠিক। ওটা ঐরূপই হ’য়ে থাকে। ওসব প্রশ্ন করার বা আপত্তি
 করার অধিকার কারুর নাই।” সেই প্রকার মায়াবদ্ধ মানুষের ভগবানের অস্তিত্ব
 বা স্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ; কারণ যা’র সম্বন্ধে ভেবে কিছু স্থির
 করা যায় না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত থাকাই ভাল। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব মায়িক ইন্দ্রিয়-
 গ্রাহ—এরূপ মনে করলেই ভুল করা হ’বে।

ভগবানের স্থিতি নিত্যসত্য। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন
 কিছু করার আগে যেমন আমরা পূর্বেরকার আইনে বাঁধা থাকি, সেই-
 প্রকার ভগবৎ-বিশ্বাসের সময়েও আমরা আগেকার আইনে বাঁধা। এ
 সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বাতুলতা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্বাস করলেই যদি মঙ্গল হয়,
 তখন অবিশ্বাসে কাজ কি ? “তিন-কোণের সমষ্টি দুই-সম-কোণ”—এরূপ না ব’লে
 চার-সম-কোণ বা পাঁচ-সম-কোণ ব’লে যেমন ভুল করা হ’বে, ভগবানের
 অস্তিত্বে অবিশ্বাস করলে তেমনিই ভুল করা হ’বে। ভগবানের অস্তিত্ব
 স্বতঃসিদ্ধ।

—শ্রীকৃষ্ণদাস রায়, বি, এ

সহকারী প্রধান-শিক্ষক,

মদনমোহনচক্ চৌধুরী বিদ্যাপীঠ

(মোদনীপুর)

শান্তিলাভের অধিকারী কে ?

আমার বড় প্রিয় ও সাধের এই দেশে আমি চাই চির-শান্তি। নূতন নূতন রূপ,
 রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের ব্যরণায়—নূতন নূতন উন্মাদনায় আমি চাই সীমাহীন, অক্ষয়
 আনন্দের হিল্লোল। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দেশের শান্তি বলিতে
 বুঝি—মুষ্টিমেয় মানব-জাতির শান্তি। মানব-দম্ভ-শূন্য কোন দেশ, নদ, নদী,
 গিরি, উপত্যকা, বন—আমার প্রিয় নয় ; কোন দেশে, কোন দ্বীপে আমি যদি

উপস্থিত হইয়া দেখি—তথায় কোন মানব নাই, তবে আমার সবই শূন্য বোধ হয়। হাজার হাজার পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গিরি-কানন ধ্বংস হইয়া গেলেও আমার কোন দুঃখ হয় না—যদি সেগুলি মানবের সম্বন্ধযুক্ত না হয়। সুতরাং আমি এত উদার দেশ-সেবক যে, দেশের শান্তি বলিতে বুঝি—কেবলমাত্র আমার স্বজাতি মানব-জাতির শান্তি।

চারু-কলা, শিক্ষা-কলা, সঙ্গীত-কলা ও বাণিজ্য-কলা প্রভৃতি চৌষষ্টি রকমের ষত কলা আছে, আমার সেই কলাগুলির সৌন্দর্য যদি কোন মানবের দৃষ্টি-পথে, শ্রবণ-পথে, গন্ধ-পথে, আশ্বাদন-পথে ও স্পর্শ-পথের পথিক না হয়, তবে আমার কোনই আনন্দ হয় না। যদি কোন মানব তাঁহার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমার সম্বন্ধযুক্ত দেশের মৃত্তিকা, জল, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির পূর্ণ বা আংশিক সংযোগ লাভ করে, তবেই আমার কল্পনার ক্ষণিক চপল আনন্দ! আমার ও আমারই মত আর একটা মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-সম্বৃত বস্তুগুলি যেখানে যত আকর্ষণ-দর্শনে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সেখানেই আমার নিকট সেই মানব বা সেই মানবের নিকট আমি তত অধিক প্রিয়।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে-সকল প্রাণীক নিরন্তর লক্ষ্য করি, শাস্ত্র-পুরণাদি “জলজ্ঞা নবলক্ষণি” ইত্যাদি শ্লোকে তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা চৌরানী লক্ষপ্রকার বলিয়া জানাইয়াছেন। আবার তন্মধ্যেই শান্তি-লাভের অধিকারী বলিয়া মানব-দেহের বিশেষ প্রণয়সা করিয়াছেন।

আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে চলচ্চিত্র-প্রেমগৃহে বিভিন্ন ছায়া-ছবির নৃত্য-ভঙ্গি, দৃষ্টি-ভঙ্গি ও গীতি-ভঙ্গির ভাব-লহরীর তরঙ্গায়িত স্পন্দনে আনন্দের স্বপ্ন-কল্পনা অনুভব করিতেছেন, তাহার কারণ—সেই সব ছায়া-পশ্চাতে চেতনের ক্রিয়া আছে বলিয়াই আজ উহা দেখিবার জন্ত লোকের এত উত্তম। প্রাণহীন মৃত শরীরের স্পন্দন যদি আমাদের সুখের কারণ হইত, তবে মৃত শরীরগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত হইলে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হইতামু; কিন্তু কৈ তাহা হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া চলচ্চিত্র-সংরক্ষক-সমিতি যে প্রাণযুক্ত শরীরের স্পন্দনকে ছায়া-পথে বিতরণ করিতেছেন, তাহা শত আবরণ ও শত বন্ধনযুক্ত চেতনের অতি ক্ষীণ স্পন্দন মাত্র। এইরূপ শত আবরণযুক্ত অনিত্য প্রণয়ের স্পন্দন-ছায়া যদি এত সুখের কারণ হয়, তবে আবরণমুক্ত বিভূ-চেতনের প্রণয়-স্পন্দনে যে কত আনন্দ, তাহা আজও কি মানব-সমাজের চিন্তার বিষয় হইবে না?

জগতে কোটি কোটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত—
আমরা কল্পিত স্বার্থের শান্তি-আশায়, কেবল দেহাত্মবাদের মরীচিকায়, প্রতি পলে,
অনুপলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বারা আজ নিজের ও অত্রের যে সুখ-দুঃখেব ভাগীদার
হইতেছি, তাহাতে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য কৰ্ম-বীজই মাত্র বদ্ধিত
হইতেছে। আজ দেশের সর্বত্রই অশান্তি, নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগ পরিলক্ষিত
হইতেছে। সুখ বা শান্তির জন্য সকলেই লালায়িত। তাই যে-কোন অনুষ্ঠানের
বশবর্তী হইয়া, এমন কি, বিষপান ইত্যাদি দ্বারা আত্মমৃত্যু বরণকেও আজকাল
কেহ কেহ আশু শান্তিলাভের উপায় বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। অজ্ঞ ও
মাতালগণ নিজেদের অনুষ্ঠানগুলিকে শান্তি-অনুষ্ঠান বলিলেও স্বধীগণ যেমন তাহা
বলেন না, তদ্রূপ আত্মদর্শী সাধুগণ হরিবিমুখ জীবগণের ঐসকল সম্মেলনকে
‘শান্তি-সম্মেলন’ আখ্যা প্রদান করিয়া কখনই সত্যের অপলাপ করেন না।

সংসারে জন্ম-সংপ্রাপ্তে যেন নরাধিতো হরিঃ।

আত্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

দেবতা-বাস্তিত মানব-জন্ম লাভ করিয়া যিনি শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করেন না,
তিনি সৰ্ব্বধৰ্ম্ম-বহিষ্কৃত ও আত্মঘাতী। স্ততরাং ব্যাকুলভাবে আর ইতস্তত ছুটাছুটি
না করিয়া সাময়িক সকল মতবাদ পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র উক্ত শ্লোকোপদিষ্ট
মঙ্গলার্থ অনুভব করিতে পারিলেই শান্তি-সমস্তার সমাধান হইবে। এইজন্য বেদ
বলিতেছেন,—“য আত্মস্থমনুপশুন্তি ধীরাশ্চেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্”।
অর্থাৎ মেধাবান্ জনসকল সদগুরু-পাদাশ্রয়ে আত্মাত্মধামী ভগবৎ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত
হইলেই শাস্বতী শান্তি-লাভে সমর্থ হইবেন ; এতদ্ব্যতীত অণু কেহ হইবেন না।

বাস্তব শান্তি-লাভের অধিকারী কে ?—ইহার সূত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি “আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং” (গীঃ ২।৭০), “বিহায় কামান্
যঃ সৰ্ব্বান্” (গীঃ ২।৭১), “শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং” (গীঃ ৪।৩৯), “যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং
ত্যাগ্যা” (গীঃ ৫।১২), “ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং” (গীঃ ৫।২৯), “যুঞ্জন্নৈবং সদা আনং”
(গীঃ ৬।১৫), “প্রশান্ত-মনসং হেনং” (গীঃ ৬।২৭), ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা”
(গীঃ ৯।৩১), “শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ” (গীঃ ১২।১২), “ত্বমেব শরণং গচ্ছ”
(গীঃ ১৮।৬২) বিশেষভাবে আলোচ্য ;

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা-শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত । স্বর্গাদি ভুক্তিকামী কৰ্ম্মী, নির্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অগ্নিমাди অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগী, স্ব-স্ব-কামের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া তদভাবে অশান্ত ।

নিজে শান্তি-লাভের অধিকারী না হইলে অতীত কখনও অধিকারী করা যায় না । তাই কলিযুগ-পাবনাবতারী মহাবদান্ত শ্রীগৌরহরির উপদেশাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে,—সর্বাকর্ষক ও সর্বানন্দবর্দ্ধক, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগতিই বাস্তব শান্তি-লাভের একমাত্র উপায় । স্বতরাং বহু ভাগ্যফলে যখন আমাদের শ্রীগৌর-জনের সঙ্গ লাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারি—শান্তি লাভের অধিকারী কে ? (ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

প্রার্থনা

পরম দয়ার সিন্ধু পতিত জনের বন্ধু

প্রভু মোর শ্রীল সরস্বতী ।

তোমার করুণা বিনে উদ্ধারিতে এ দুর্জনে

নাহি দেখি আর অণু গতি ॥

জন্ম মোর বৃথা গেল সাধুসঙ্গ নাহি হ'ল

অসংসঙ্গে মজিনু সতত ।

কি মোর পামর মতি বৈষ্ণবে না হৈল রতি

হৃদয় না হৈল নিকপট ॥

ষড়রিপু, পঞ্চেন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে প্রিয়

করি' সদা দেয় উত্তেজন ।

ভোগানলে দগ্ধচিত অসহিষ্ণু সদা ভীত

স্থির নাহি হয় কোনক্ষণ ॥

বহু অপরাধ ফলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে

জুড়াইতে না দেখি উপায় ।

অধম-তারণ তুমি পাপে প্রপূরিত আমি

তোমা বিনে কেবা আছে হায় ॥

করিয়াছি অপরাধ তোমার চরণে নাথ

ওহে প্রভু ! তুমি দয়াময় ।

তথাপিহ আশা মনে ক্ষমা কর নিজগুণে

আমাপ্রতি হইয়া সদয় ॥

মোর চিত্ত, তনু, মন যতেক ইন্দ্রিয়গণ

প্রতিবন্ধ হয় অনুক্ষণে ।

এই সব অন্তরায় কেমনে ত্যজিব হায়

নিবেদিমু তোমার চরণে ॥

আমি অতি নীচমনা সদা মনে দুর্ভাবনা

ছাড়িতে নারিমু কভু তায় ।

কি হইবে গতি মম ওহে প্রভো সর্বোত্তম

শরণ লইমু তব পায় ॥

তোমার চরণ বিনে তরিবারে দীনজনে

মাহি পারে ইহ ভবসিন্ধু ।

তব পাদপদ্ম-যুগে জনমে জনমে মাগে

ভকতি-সিন্ধুর কণাবিন্দু ॥

—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী
বড়দিয়া

শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ-বিচার

প্রতিপক্ষের প্রতি আবেদন

আমরা শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার-প্রসঙ্গে, স্মার্ত্ত শ্রমণ মহারাজের জন্মাষ্টমীর ব্রত-পালনের বিচারে যে-সমস্ত দোষ লক্ষ্য করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদের সন্তুস্তর প্রদান করিলেন বিশেষ আনন্দিত হইব । জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে তাহার যত প্রবন্ধ ও প্রতিবাদ দেখিয়াছি, সর্বত্রই “খাড়া বড়ি খোড়, খোড় বড়ি খাড়া”র নাম একই কথার পুনঃ পুনঃ চর্কিত-চর্কণ । কোন পবেষণামূলক প্রবন্ধ বা প্রতিবাদ কুত্রাপি তাহাতে দৃষ্ট হয় নাই । বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশের ষাবতীয় পঞ্জিকাকারগণই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মতের অনুমোদন করিয়া পঞ্জিকায় “গোস্থামিমতে

‘পর্যাহে’ অর্থাৎ চাই ভাদ্র, শনিবার—জন্মাষ্টমীব্রত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রমণ মহারাজ তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র স্মার্ত পঞ্জিকাকার পি, এম, বাকুচিকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন। উভয়ই স্মার্ত, উভয়ের পঞ্জিকার ভূমিকায় প্রবন্ধ একই প্রকার। তাহাতে গবেষণামূলক বিচার কাহারও নাই। বাকুচি মহাশয় আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে তিনি তাঁহার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিবেন। শুধু একঘ’রে হইয়া থাকা কর্তব্য নয়। বিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকার-গণের অনুগত হইলে কাহারও পক্ষে দোষের হইবে না।

আমরা নিম্নে জন্মাষ্টমীর বিজ্ঞানবিচার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই প্রবন্ধ কয়টি পাঠকবর্গকে পর পর পর্যায়ক্রমে বিশেষ ধীরভাবে পাঠ করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। প্রবন্ধগুলি, যথা :—

(১) হরিবাসর

(২) ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ

(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম

(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটি বিচার

(৫) শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ

(৬) ‘বলদেব’-বাক্যের অনুসরণ ও গুরুবাক্য

(১) হরিবাসর

‘হরিবাসর’ বলিলে কেবলমাত্র একাদশীকে বুঝায় না। ‘হরিবাসর’-শব্দে বিষ্ণু-জয়ন্তীকেও লক্ষ্য করা হয়। দ্বাদশীর প্রথমপাদের নামও ‘হরিবাসর’—“দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ” (হঃ ভঃ বিঃ ১৩।১০৪ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন)। একাদশীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা—নন্দা। কিন্তু নন্দা বলিলে একাদশী ব্যতীত আরও দুইটি তিথিকে লক্ষ্য করা হয়। “প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্যেষ্ঠ মনীষিভিঃ”—নন্দা বলিতে একাদশী ব্যতীত প্রতিপৎ ও ষষ্ঠী-তিথিকেও লক্ষ্য করে। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে ‘নন্দা’-শব্দে কেবল একাদশীকেই বুঝায়। তদ্রূপ ‘হরিবাসর’ বলিলে ক্ষেত্রবিশেষে কেবল একাদশীকেই বুঝাইলেও দ্বাদশী, জয়ন্তী প্রভৃতিকে বুঝাইবে না—ইহা কখনও শাস্ত্রকারগণের অভিমত নহে। আমরা শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্র দেখিতে পাই, হরিবাসর বলিলে দ্বাদশী ও জয়ন্তীকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে

বহুস্থলে একাদশীকে ‘শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসর’, ‘কৃষ্ণবাসর’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে ।
নম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল :—

সত্যং সৰ্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।

সন্তোষোদনমাত্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬।১৩)

সশল্যং যে প্রকুৰ্ব্বন্তি বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্ ।

শ্রেতস্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমঘাতনাঃ ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১২।৯৫ সংখ্যাস্থিত দ্বারকা-মাহাত্ম্যে)

আবার জন্মাষ্টমীকেও ‘কৃষ্ণবাসর’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে, যথা—

অতীতানাগতন্তেন কুলমেকোত্তরং শতং ।

পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা কৃষ্ণবাসরে ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১৪।১৪৬)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণবাসরে
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিনে ।” তিনি “একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা ।
পলাক্কেনাপি বিদ্ধন্ত ভোক্তব্যং বাসরং তব ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৫৯) শ্লোকের
টীকায়ও ‘বাসর’ শব্দের অর্থ “বাসরং একাদশী জন্মাষ্টম্যাদি” বলিয়া
লিখিয়াছেন । ‘আদি’ শব্দে রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দশী প্রভৃতিকে বুঝায় ।
“ইথঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি” (১২।১৪৩) শ্লোকের টীকায় গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন—
“আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দশ্যাদি ।” এতদ্ব্যতীত তিনি হরি-
ভক্তিবিলাসের টীকায় ‘ব্রত’ শব্দের অর্থ “ব্রতানি একাদশী-জন্মাষ্টমী-
কাৰ্ত্তিকাদি নিয়মাঃ” ও ‘পৰ্ব’ শব্দে “পৰ্বাণি জন্মাষ্টমী চাতুর্মাষ্টিকা-
দশ্যাदीনি” এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ইহা ছাড়া হরিভক্তি-বিলাসের
বিভিন্ন স্থানে :— একাদশীকে ‘হরেদিন’ (১২।৮৯, ১৩।১১১), (১) ‘বৈষ্ণবীতিথি’
(১২।১৪৯ ও টীকা), ‘হরিদিন’ (১২।১১৩); ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে :—একাদশী তিথিকে
(২) ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজমক’ (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬।৪) ; পদ্মপুরাণে :—একাদশীকে
‘হরেদিন’, ‘বাসুদেবদিন’ (৩) বাসুদেববাসর’, ‘বাসুদেবদিবস’ (ক্রিয়াযোগ-
সার ১৪শ অধ্যায়), ‘বিশ্বোদ্দিবস’ (ক্রিয়াযোগসার ১৫শ অঃ), ‘হরিদিন’,
(৪) ‘পদ্মনাভদিন’ (স্বৰ্গখণ্ড ১৫শ অঃ), ‘বিষ্ণুদিন’, (৫) ‘জগন্নাথবল্লভা’,
(৬) ‘জয়ন্তীবাসর’ (স্বৰ্গখণ্ড ৪৪শ অঃ), (১) ‘বৈষ্ণবীতিথি’, ‘মদিন’;

‘মম বাসর’ (উত্তরখণ্ড ২১শ অঃ) ‘বিষ্ণুব্রত’, ‘হরেবাসর’, (৫) ‘বিষ্ণুবল্লভা’, (৭) ‘হরিপ্রিয়া’ (উত্তরখণ্ড ২২শ অঃ), ‘বিষ্ণোবাসর’ (ঐ ২৩শ অধ্যায়), (৮) ‘পাপনাশিনী’ (ঐ ২৪শ অঃ) প্রভৃতি বলা হইয়াছে ।

আবার হরিভক্তিবিলাসের বহুস্থলে :— জন্মাষ্টমীকেও (১) ‘বৈষ্ণবীতিথি’ (১৫।১৫৮), (৩) ‘কৃষ্ণবাসর’ (১৫।১৪৬), (৮) ‘পাপনাশিনী’ (১৫।১৫৮), (৫) ‘কৃষ্ণবল্লভা’ (১৫।১৪১) ; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে :—জন্মাষ্টমী তিথিকে (২) ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতুক’ (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৫), (৬) ‘জয়ন্তীবাসর’ (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৬৫) ; পদ্মপুরাণে :—জন্মাষ্টমীকে (৬) ‘জয়ন্তী-বাসর’ (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ, উত্তর খণ্ড ১৯শ অঃ), (৭) ‘হরিপ্রিয়া’ (উত্তর খণ্ড ২৪শ অঃ), (৫) ‘হরি-বল্লভা’, (৪) ‘পদ্মনাভবাসর’ (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ), ‘জন্মবাসর’, ‘হরেব্রত’ প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একাদশীকে ব্রত এবং জন্মাষ্টমীকে ‘মহাব্রত’ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে (পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড) । সুতরাং শাস্ত্রের বহু স্থলে ‘একাদশী’ ও ‘জন্মাষ্টমী’ শব্দের পরস্পর সাম্য-সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এসম্পর্কে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের—দশমী “হরিদিন” এবং উহাতে কেশবব্রত (১৩।২-৩), একাদশী-সংকল্প-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণপূজাবিধি (১৩।২), দ্বাদশীতে দেবকীমুখুর মাহাত্ম্য-পাঠে একাদশী অপেক্ষা ফল-শ্রেষ্ঠত্ব (১৩।৭২-৭৩), “একাদশাদি জাগরঃ” শ্লোকের টীকা (১১।৩৭৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

সুতরাং উক্ত প্রমাণাদি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ‘হরিবাসর’ বলিলে একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাди জয়ন্তী-তিথিসমূহকেও লক্ষ্য করে। প্রতিপক্ষগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে কখনই ইহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি জন্মাষ্টমী প্রভৃতিকে ‘হরিবাসর’ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে “হরিবাসরবজ্জিতা” (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০) বাক্যের অর্থে আমরা জন্মাষ্টমীকেও পাইয়া থাকি। সুতরাং একাদশীর ত্রায় বিষ্ণু-জয়ন্তী-বাসরে অকুণোদয়-বিচার কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে।

(২) ব্রতাদি পালনে বিধি ও নিষেধ

আমরা ব্রতাদি পালন করিতে গিয়া কেবলমাত্র বিধিকেই অবলম্বন করিলাম, নিষেধকে অগ্রাহ্য করা হইল—এইরূপ হইলে ব্রতের সূষ্ঠতা পালন হয় না। শাস্ত্রে যেরূপ বিধি পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ নিষেধ গর্হণ করিবার আদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। ‘অম্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ যুগপৎ সমভাবে গৃহীত না হইলে

শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যাবায়-দোষে দোষী হইতে হয়। একপক্ষে যেমন বিধি পালন করিতে হইবে, সঙ্কে সঙ্কে অপরপক্ষে নিষেধও গর্হণ করিতে হইবে। ব্রতাদি-পালনে আমরা কেবল নিষেধই গর্হণ করিব, বিধি পালন করিব না—ইহা সর্বতোভাবে স্মৃষ্ট বিচার নহে। ব্রতাদি পালনে পূর্বতিথি-সংস্পর্শ-দোষ অগ্রাহ্য করিতে হইবে—ইহা নিষেধার্থক ক্রিয়া; অপরপক্ষে পরতিথি-সংযোগে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। জন্মাষ্টমী পালনে পূর্বতিথিতে সপ্তমী-সংযোগে ষেক্ষপভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ঠিক সেইরূপভাবেই পরতিথি নবমী-সংযোগে অষ্টমী পালন করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। স্মৃতরাং আমাদের সর্বদা কর্তব্য—সপ্তমী-সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নবমী-সংযোগে উপবাস করা। কেহ যদি সপ্তমী-সংযোগ-পরিত্যক্ত অষ্টমীতেই উপবাস মনে করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের এক পক্ষ রক্ষা করা হইল, অপরপক্ষ রক্ষিত হইল না। অর্থাৎ পরতিথি-যোগে উপবাস—ইহা পালিত হইল না। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজ সন্নাতন গোস্বামী যেসকল বিধি ও নিষেধ-বাক্য আমাদের পালন ও গর্হণের জন্য জানাইয়াছেন, নিয়ে তাহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিলাম :—

(ক) পরবিদ্ধা সদা কার্য্য, পূর্ববিদ্ধান্ত বর্জয়েৎ ।

অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হস্তাং পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[সর্বদা পূর্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া (নিষেধ-বাক্য), পরবিদ্ধায় অর্থাৎ নবমীবিদ্ধায় ব্রত করিবে (বিধি-বাক্য), যেহেতু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পূর্বকালের সঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট করিয়া দেয়।]

(খ) বর্জমীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ।

বিনা সঙ্কেণ কর্তব্য। নবমীসংযুতাষ্টমী ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

[সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমী যত্নসহকারে বর্জন করিবে (নিষেধ-বাক্য), রোহিণী নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও কেবল নবমীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে (বিধিবাক্য) ।]

(গ) জন্মাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সঙ্ক্কাং সকলামপি ।

বিহার্য নবমীং শুক্রামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত জন্মাষ্টমী হইলে পূর্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া (নিষেধ-বাক্য), কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে (বিধি-বাক্য) ।]

(ঘ) বিনা ক্ষেপণ কর্তব্য। নবমীসংযুক্তাষ্টমী ।

সপ্তমীসংযুক্তাষ্টমী ন কর্তব্য। সপ্তমীসংযুক্তাষ্টমী ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[রোহিণীনক্ষত্র ব্যতিরেকেও নবমীসংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে (বিধি-বাক্য), কিন্তু রোহিণী নক্ষত্রাধিত সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিবে না (নিষেধ-বাক্য) ।]

পূজাপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) চিহ্নিত শ্লোক-চতুষ্টয়ে বিধি ও নিষেধবাক্য সম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে না—ইহা যেরূপ নিষেধ-বাক্য, তদ্রূপ নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে—ইহা বিধি-বাক্য। ব্রত-পালন করিতে হইলে শাস্ত্রের উক্ত উভয় বাক্যই অবশ্য স্বীকার ও আদর করিতে হইবে।

এস্থলে একটি বিচার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জন্মাষ্টমীর উপবাস করিতে হইলে নবমীযুক্ত অষ্টমীর উপবাসের বিধি কেন? শাস্ত্রকারগণের জন্মাষ্টমীর পর নবমী-তিথির এত মর্যাদা দিবার কারণ কি? ইহা বৈষ্ণবগণেরই অচুসন্ধান করা কর্তব্য। এতৎসম্বন্ধে অচুসন্ধান করিতে গিয়া হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম

অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ ।

সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাজিভীরোহিণীং বিনা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[অষ্টমী যদি নবমীবিদ্ধা হয়, তাহা হইলে উহার নাম—উমামাহেশ্বরী-তিথি। যাহারা পুণ্য আকাজক্ষা করেন, তাহারা রোহিণী-যোগ ব্যতিরেকেও সর্বদা ঐ তিথিতে উপবাস করিবেন ।]

নবমীতিথিতে উপবাসের মাহাত্ম্য “উমামাহেশ্বরী-তিথি”তেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরও জানাইয়াছেন যে, অষ্টমী-তিথিতে হরির (কৃষ্ণের) জন্ম হইয়াছে এবং তৎপরেই নবমী-তিথিতে যোগনিদ্ৰা

বা যোগমায়াদেবীর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং লীলাবিস্তারিণী শক্তি যোগমায়াদেবীর জন্ম-তিথিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জন্মাষ্টমীর উপবাস 'রাজ্যহীন রাজার পূজা'র স্থায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে লীলাবিস্তারিণী-শক্তি যোগমায়াদেবী, সর্বতোভাবে যিনিকুললীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার জন্ম-তিথিকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রকাশে যোগ-নিদ্রাই প্রধানা নায়িকা। কৃষ্ণজন্মের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার জন্ম—ইহা কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে প্রধান আলোচ্য বিষয়। জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করিতে হইলে যোগমায়া কর্তৃক কৃষ্ণের এই জন্মলীলা অবশ্য পাঠ্য, আলোচনীয় ও শ্রবণীয়। যে-ক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণ-জন্মদিনে যোগমায়ার স্মৃতি কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারি না, সে-ক্ষেত্রে যোগমায়াদেবীর জন্মতিথি কি করিয়া উপেক্ষিত হইবে? তজ্জন্মই শাস্ত্রকারগণ সর্বত্রই নবমীযুক্ত জন্মাষ্টমীতে ব্রতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যক্ত হইলেও, কেবলমাত্র অষ্টমীতে জন্মাষ্টমী-ব্রত-পালন সুসঙ্গত নহে। এইপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে-সনাতন গোস্বামী আনাঁইয়াছেন—

নবম্যাং যোগনিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরেন্দ্রতঃ ।

নবম্যা সহিতোপোস্তা রোহিণীবৃধসংযুতা ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭০)

উক্ত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, নবমীতে যোগনিদ্রার জন্ম হইয়াছে, এবং অষ্টমীতে শ্রীহরি কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই জন্মই যোগনিদ্রার জন্ম এবং কৃষ্ণজন্ম উভয়েরই মিলিত তিথিতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করার বিধি শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিব এবং পার্বতী অর্থাৎ উমা ও মহেশ্বর উভয়েই এই নবমীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার বিশেষ সংজ্ঞা—“উমা-মাহেশ্বরী-তিথি”। “বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰুঃ”। আমরা শত্ৰুকে বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সুতরাং তাঁহার সঙ্গীক আচরিত জন্মাষ্টমী-ব্রত সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অন্যান্য শাস্ত্রেও যোগনিদ্রার জন্ম-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণজন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই নবমীতিথিতেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এসম্বন্ধে হরিবংশে—

যা তু সা নন্দগোপশ্চ দয়িতা ভূবি বিস্কতা ।

যশোদা নাম ভদ্রং তে ভার্য্যা গোপ-কুলোদ্ভবা ॥

তস্মাৎ নবমো গর্ভঃ কুলেহয়াকং ভবিষ্যসি ।

নবম্যামেব সঞ্জাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ ॥

অহং ‘ভভিজিতো যোগেন’ নিশায়াং যৌবনে স্থিতে ।

অর্করাত্রৌ করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাসুখম্ ॥

অষ্টমশ্চ তু মাসস্য জাতাবাবাং ততঃ সমম্ ॥ (হরিবংশ-বিষ্ণুপর্ব ২।৩৪-৩৭)

[হে দেবী! তোমার মঙ্গল হউক, গোপতি নন্দগোপের যশোদা নাম্নী যে গোপকুলশ্রেষ্ঠা দয়িতা ভাৰ্য্যা আছে, তুমি আমাদিগের কুলের নবম-গর্ভস্বরূপ হইয়া তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি কৃষ্ণপঙ্কজের নবমী-তিথিতে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমিও অর্দ্ধরাত্র সময়ে ‘অভিজিৎ - যোগে’ গর্ভ হইতে যথাস্থখে নির্গত হইব এবং আমরা অষ্টম মাসেই সমকালে প্রসূত হইয়া বাসুদেব কর্তৃক পরিবর্তিত হইব।]

যোগমায়া ও কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে হরিবংশে আরও বিস্তারিত লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

দেবক্যজন্ময়দ্বিমুখং যশোদা তাং তু দারিকাম্ ।

যুহুর্ভেহভিজিতি প্রাপ্তে সার্করাত্রে বিভূষিতে ॥

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ক ৪।১৪)

[বিভূষিত অর্দ্ধরাত্র-সময়ে ‘অভিজিৎ’ নামক যুহুর্ভে দেবকী বিষ্ণুকে (বাসুদেব) ও যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়া) প্রসব করিলেন।]

মহাভারতের টীকাকার আচার্য্য শ্রীনীলকণ্ঠকৃত উক্ত শ্লোকের টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচ্য :— “দেবকী বিষ্ণুং ‘অভিজিতি যুহুর্ভে’ জনয়ৎ । ‘বিভূষিতে’ বিভোঃ বিষ্ণোঃ উষিতে প্রোষিতে ব্রজং প্রতি প্রবাসে জাতে সতি ‘সার্করাত্রে’ চতুর্থাগায়া রাত্রেঃ সার্কভাগেহবশিষ্টে সতি যশোদা তাং কন্যকামজন্ময়-দিত্যর্থঃ । অর্দ্ধরাত্রে জাতস্ত্র বিক্ষোৰ্যশোদাং প্রতি আনয়নে অর্দ্ধযাম-মাত্রং জাতং তদানয়ন-সমকালমেব যশোদা দারিকামসুত, অতএব তস্তাঃ জন্ম নবম্যামিতি প্রাপ্তকঃ সঙ্গচ্ছতে ।”

‘বিভূষিতে’ অর্থাৎ বিভূ বিষ্ণুর উষিতে, প্রকৃষ্টরূপে ‘উষিতে’ অর্থাৎ ব্রজের প্রতি প্রবাসে গমনকালে, ‘সার্করাত্রে’ অর্থাৎ রাত্রির চতুর্ভাগে দেবকী ‘অভিজিৎ-যুহুর্ভে’ বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রসব করলেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্র-ভাগে যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়াকে) প্রসব করিলেন । অর্দ্ধরাত্রে প্রসূত বাসুদেবকে যশোদার নিকট আনয়নে অর্দ্ধযামমাত্র অর্থাৎ ৯০ মিনিট সময় অতিবাহিত হয় । উক্ত সময় মধ্যে যশোদা যোগমায়াদেবীকে প্রসব করেন । অতএব যোগমায়া-দেবীর জন্ম নবমীতে । ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ।

আচার্য্য নীলকণ্ঠ উক্ত টীকায় যোগমায়াদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-বর্গই মহাভারতের নীলকণ্ঠ-টীকার সম্মান করিয়াছেন । সুতরাং উক্ত টীকা

আলোচনায় আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণের জন্মরাত্রির প্রথম অর্দ্ধ-ভাগের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্রির প্রথম মুহূর্ত্তে যোগমায়াদেবী জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে মেঘগন্তীর হৃষ্কারে সর্বত্র নবমীযুক্ত অষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্রত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা উপেক্ষা করা কোন বৈষ্ণবের সম্ভবত হইবে কি ?

(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটি বিচার

(ক) শ্রীহরিভক্তিবিনাসে পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ :—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দশী ।

তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবশ্যাষ্টমী তথা ।

উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্বসংযুতাঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৭৪)

[একাদশী, ষষ্ঠী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবশ্যা এবং অষ্টমী—এই সকল পরসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য, পূর্বসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য হয় না।]

বৃহন্নারদীয়পুরাণেও এসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

একাদশাষ্টমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দশী ।

অমাবশ্যা দ্বিতীয়া চ উপবাসব্রতাদিষু ॥

পরবিদ্ধাঃ প্রশস্তাঃ স্যূর্ন গ্রাহাঃ পূর্বসংযুতাঃ ॥

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২৭।৩-৪)

[উপবাস প্রভৃতি ব্রতে একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অমাবশ্যা এবং দ্বিতীয়া—এই সমস্ত তিথি পরতিথির ঘোণে প্রশস্ত ; পূর্বতিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না।]

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রতাদি ব্যতীত অনেকেই তিথি পালন করিয়া থাকেন। ইহাও যদিও একপ্রকার ব্রত, তথাপি ইহাকে সাধারণতঃ তিথি-পালন বলে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যাহারা তিথি পালন করিতে গিয়া অষ্টমী তিথি পালন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি মাসে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাস বিধেয়। এবং সেই অষ্টমী নবমীসংযুক্তা না হইলে উপবাসযোগ্য নয়। যিনি এই অষ্টমী পালন করিবেন তাঁহার পক্ষে মাননীয় শ্রমণ মহারাজের বিহিত জন্মাষ্টমী দিবসে কি কর্তব্য, তাহাই বিবেচ্য। তিথি-পালন-বিষয়ে নবমীযুক্ত

অষ্টমীতে উপবাস বিধেয়। কিন্তু বর্তমান বর্ষে শ্রমণ মহারাজের নির্দিষ্ট জন্মাষ্টমী-দিবসে নবমী না থাকায় দুইদিবস উপবাস বিহিত হইতেছে। তিথি-পালক একপক্ষেত্র কি দুইদিবস উপবাস করিবেন? তাহা হইলে দ্বি-উপবাস-দোষ উপস্থিত হইবে। আমাদের বিচার অনুসারে জন্মাষ্টমী-ব্রত গ্রহণ করিলে এই প্রকার দুই-উপবাস-দোষ সজ্যটিত হইবে না।

(খ) শাস্ত্র বলেন,—এক তিথি তিন দিবসকে স্পর্শ করিলে ‘ত্র্যহস্পর্শ’ হইয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান সময়ের পঞ্জিকাকারগণ একাদিবসে ৩টি তিথির স্পর্শ হইলে তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ লিখিয়া থাকেন। ইহা শাস্ত্রসম্মত সুবিচার নহে। ‘ত্র্যহস্পর্শ’ও ‘অবম’ উভয়ই অশুভ। ইহাতে শাস্ত্রকারগণ কোন শুভ কার্যের বিধান দেন নাই। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণের মতঃ—তাহারা এক তিথি সাবন-তিন-দিবসকে স্পর্শ করিলে তাহাকে ‘ত্র্যহস্পর্শ’ না বলিয়া ‘অবম’ বলিয়া থাকেন। সুতরাং বর্তমান জন্মাষ্টমী-তিথি সাবন-দিবসত্রয়কে স্পর্শ করায় ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার ‘অবম’ অথবা ‘ত্র্যহস্পর্শ’ হইয়াছে। এই অবম বা ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে কোন শুভ কার্য সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। তজ্জন্তু শাস্ত্রকারগণ বলেন—

“স্বাস্তিঅস্বাস্তিথয়ো বাবে একস্মিন্নবমা তিথিঃ।

তিথিবারদ্বয়ে চৈকা ত্রিহ্যস্পর্শং দ্বৈপি নিন্দিতে ॥

কৃতং যন্মঙ্গলং তন্ন ত্রিহ্যস্পর্শবমে দিনে।

ভস্মীভবতি তং ক্ষিপ্ৰমগ্নৌ সমাগ্ যথৈ দনম্ ॥” (বশিষ্টসংহিতা)

এসম্বন্ধে রত্নমালা টীকায় বলিতেছেন—“যাবদবম-ত্রি স্পৃশোভোগস্তাবম্ শুভকর্ম কুর্যাৎ।”

সুতরাং বর্তমান বর্ষের ৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী এক সূর্যোদয়ের পূর্বে হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নি সূর্যোদয়ের পরেও অবস্থিত থাকায় উহা বর্তমান মতে ‘অবম’ অথবা অগ্ন্যমতে ‘ত্র্যহস্পর্শ’ হইয়াছে। এই দিবস কোন শুভকার্য সমাধা হইতে পারে না। আমাদের মতে পরদিবসে জন্মাষ্টমী-ব্রত করিলে এইরূপ দোষ ঘটিবে না।

(গ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—জন্মাষ্টমী একাদশীর গায় পূর্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা আমরা কি কেবল ইহাই বুঝিব যে, একাদশীতে বিদ্ধা উপবাসে যে দোষ, জন্মাষ্টমীর বিদ্ধা উপবাসে সেই দোষ, ইহা ছাড়া অগ্নি কিছু বুঝাইবে না?—অথবা স্মার্তমতে একাদশী সূর্যোদয়-বিদ্ধা পালন না করিলে যে দোষ হইবে, জন্মাষ্টমীও সূর্যোদয়বিদ্ধা হইলে সেইরূপ দোষ হইবে?

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, হরিভক্তিবিলাসে স্মার্তমতে একাদশী পালিত না হইলে অর্থাৎ সূর্যোদয়বিক্রা একাদশী পালিত না হইলে যে কি দোষ হইবে, তাহা কুত্রাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই। অথচ হরিভক্তিবিলাস বলেন—

ইথঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতান্তপি ন বৈষ্ণবৈঃ ।

বিক্লেবহঃস্ব-কাৰ্য্যাণি তাদৃগ্-দোষগণাশ্রয়াৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২ ১৪৩)

[বৈষ্ণবগণ এইপ্রকার একাদশীর জন্ম জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসকলও বিদ্ব-
দিনে করিবেন না, করিলে লিখিত দোষসকল উপস্থিত হইবে ।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

“আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দশাদি তাদৃশানাং ‘বিক্লেবকাদশী-
ব্রতোক্তসদৃশানাং’ দোষাণাং গণশ্রয়াৎ ।”

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, সনাতন গোস্বামীর “বিক্রা একাদশী-ব্রতোক্ত-সদৃশানাং”
বাক্যের তাৎপর্য্য কি? রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমুদয় জয়ন্তী তিথিই
একাদশী-তিথির জন্ম বিদ্বোপবাসে যাবতীয় দোষসমূহ ব্রতচারী ব্যক্তির পক্ষে
আশ্রয় করিবে। এস্থলে আমরা কেবল সূর্যোদয়বিক্রা একাদশীর কথা কোনক্রমেই
বুঝিতে পারিতেছি না; যেহেতু একাদশীর বিদ্বোপবাসে চারিপ্রকার দোষের
উল্লেখ হরিভক্তিবিলাসে ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই চারি প্রকার
দোষ, যথা—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ। এই ৪টি দোষই অরুণোদয়কাল
হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত চারি দণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ আছে। জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে
বিদ্বোপবাসে এই ৪টি দোষ পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর বিচার অনুসারে স্বীকার
করিতে হইলে জয়ন্তী-বাসরেও অরুণোদয়-বেধ স্বীকার করাই একান্ত কর্তব্য হইয়া
পড়ে। নচেৎ “দোষাণাং গণশ্রয়াৎ” বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

(ঘ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৪শ বিলাস) কোন কোন সকাম বৈষ্ণবের পক্ষে
শিবচতুর্দশী-ব্রত-পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেস্থলেও অবিদ্ব-চতুর্দশী-ব্রত-
পালনের কথাই লিখিত হইয়াছে। তাহাতে সূর্যোদয়ের দুই দণ্ডের মধ্যে
ত্রয়োদশী থাকিলে বৈষ্ণবের পক্ষে উপবাস হইবে না—লিখা আছে। ‘যোগ’ ও
‘বেধ’ সেস্থলে মানা হইয়াছে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, শিবচতুর্দশী
ব্রতের সময় সূর্যোদয়-বেধ মানা হয় নাই। অবশ্য অরুণোদয়-বেধও গৃহীত না
হইলেও সূর্যোদয় ও অরুণোদয়ের মধ্যবর্তী সময় গৃহীত হইয়াছে। শিবরাত্রের
যদি এইরূপ মহিমা দৃষ্ট হয়, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া কর্তব্য?

(৫) শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ

~~অর্থান্তর গ্রহণ করাই কর্তব্য~~ আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গকে বর্তমান ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত “অত্যাহার” প্রবন্ধটির ২০৮ পৃষ্ঠার ১৪শ ও ১৫শ পংক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতের শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। ‘অত্যাহার’ শব্দটি দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম শব্দ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলে দ্বিক্রুতি-দোষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ‘অত্যাহার’-শব্দে ‘অধিক আহার’ অর্থ গ্রহণ করা এস্থলে যুক্তিযুক্ত নহে, যদিও ইহাই তাহার স্বাভাবিক অর্থ। কারণ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রথম শ্লোকেই জিহ্বাবেগ ও উদরবেগের কথা প্রকাশ করিয়া ‘অত্যাহার’ অর্থাৎ অধিকভোজনের কথা নিষেধ করিয়াছেন। উহাই পুনরায় উক্ত হইলে দ্বিক্রুতি-দোষ হয়। তজ্জন্ম উহার অর্থান্তর গ্রহণই অসিদ্ধান্ত বলিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিচার করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীল ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীহরি-ভক্তিবিনোদসোক্ত (১৫।১৭৪) শ্লোকের পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকায় পূর্বাপর সঙ্গতি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত না হওয়ায়, উহার অর্থান্তর করাই অসঙ্গত বিচার। তজ্জন্ম আমরা এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গত বিষয়-সংশয়-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি প্রভৃতি বিচার অবলম্বনপূর্বক নিম্নে উহার আলোচনা করিতেছি,—

পাঠ্য—

পূর্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জিতা শ্রবণাশ্রিতা।

তথাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সঞ্চক্ষ্যাক্ষ বিবর্জয়েৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৪ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

[যেমন পূর্ববিদ্ধা একাদশী শ্রবণানক্ষত্র-সংযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে, তদ্রূপ পূর্ববিদ্ধা অষ্টমী রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত হইলেও তাহাকে আদর করিবে না।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মতন্তে। অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি

তাজ্য। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যোবোপোষ্যা। অত এবোক্তং
স্কান্দে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সঙ্ক্ষাং সকল্যামপি।

বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেদিত্যাদি ॥

(হং ভঃ বিঃ ২৫।১০৬)

[জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণ হইলে এবং তাহা রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত হইলেও কেবল
শুদ্ধা নবমীতে উপবাসদ্বারা ব্রত করিবে।]

অনেনাভিপ্রায়ৈণৈব পাদ্যে স্কান্দাদৌ—নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্ত
প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি। তচ্চ ন সুসঙ্গতম্ :—একাদশী তরাশেষতিথীনাং
রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানাংমেব সম্পূর্ণত্বে ন অরুণোদয়বেধা অসিদ্ধেঃ। তচ্চ
পূর্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব ॥ ১৫।১৭৪ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—‘যথা’-শব্দ-বলে কেহ কেহ
‘অরুণোদয়-বেধ’ অর্থ করিয়া থাকেন। কারণ ‘অরুণোদয়-বেধ’ সম্বন্ধে তিনি
পূর্বেই পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের পূর্বোল্লিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া জন্মাষ্টমীর
অরুণোদয়-বেধ-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশ
“সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।” (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩৩৮)—এই বাক্যের
সার্থকতাস্বরূপ আমরা অরুণোদয়বেধ-পক্ষে বহু পুরাণ-বচন প্রমাণ পাইতেছি।
সনাতন গোস্বামীপাদ এই প্রমাণসমূহ উদ্ধার করিয়া “তচ্চ ন সুসঙ্গতম্”
বাক্য বলায় কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি উক্ত শ্রীব্যাসবাক্য খণ্ডন করিতেছেন ?
শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ—ব্রতাদি নির্ণয়কালে ব্যাসের পুরাণবাক্য প্রমাণস্বরূপ
লিখিতে হইবে, তাহা খণ্ডন করিতে হইবে না। এস্থলে কি আমরা বুঝিব—
শ্রীল গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীব্যাসের মত খণ্ডন করিতে
বসিয়াছেন ? ইহা বোধহয় কোন সুদী ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। সুতরাং
ইহার অর্থান্তর বিচার করাই সুসিদ্ধান্ত, সাধারণ অর্থ গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ
কেহ কেহ যদি ‘যথা’-শব্দ-বলে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি দ্বয়ন্তী-তিথি ব্যতীত অন্যান্য
তিথিতেও ঐরূপ অরুণোদয়-বিচার করেন, তাহা সুসঙ্গত নহে। এস্থলে
জন্মাষ্টমী ব্যতীত অন্যান্য অষ্টমী ও অপরাপর তিথিসমূহের বিচার-ক্ষেত্রেও
অরুণোদয়-বিচার, ~~সুসঙ্গত~~—ইহাই পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর বলিবার
উদ্দেশ্য। কারণ তৎপরবর্তী ছত্রে তিনি বলিয়াছেন—একাদশী ব্যতীত অন্য
অশেষ তিথি অর্থাৎ যাবতীয় তিথিসমূহ সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া
পরসূর্যোদয় তিথি পর্যন্ত স্পর্শ করিলে তাহা ‘সম্পূর্ণ’ হইবে। সুতরাং

গোশ্বামিপাদ বলেন—তিথি সম্পূর্ণ হইলেই পালনযোগ্য, কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি জয়ন্তী-তিথিগুলি সম্বন্ধে “রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্ব (সম্পূর্ণ) ন অরুণোদয়বেধা অসিদ্ধেঃ।”—অর্থাৎ সূর্যোদয় হইতে তিথি আরম্ভ হইলে তিথির সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইলেও জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধ নহে। শ্রীল সনাতন গোশ্বামীর টীকা ইহাই তাৎপর্য। ইহার অর্থ কোন অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে গোশ্বামিপাদের পূর্বাঙ্গর যাবতীয় বাক্য উল্লিখিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহা কোন মতেই সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না।

শ্রীল সনাতন গোশ্বামীর বাক্যের যে ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্ত তিনি স্বয়ং ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধার করিয়া সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—

সম্পূর্ণা চার্করাণ্ডে তু রোহিণী যদি লভাতে ।

কর্তব্য সা, প্রযত্নেন পূর্ববিদ্ধাং বিবর্জয়েৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৮ সংখ্যাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি-বাক্য)

[সম্পূর্ণা অষ্টমীর অর্করাণ্ডে যদি রোহিণী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাতে ব্রত বিহিত হইলেও পূর্ববিদ্ধা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে ।]

এই শ্লোকের অর্থ অতি সুস্পষ্ট হইলেও, পাঠকবর্গের দৃঢ়তার জন্ত ইহার বিশ্লেষণ করিতেছি :—অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণা হইলেও অর্থাৎ এক সূর্যোদয় হইতে পরসূর্যোদয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলেও এবং তাহাতে রোহিণী-নক্ষত্র সংযুক্ত থাকিলেও, পূর্ববিদ্ধা বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিথি যদি সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ‘সম্পূর্ণা’ হইয়াছে বলিয়া বিচার করাই শ্রীল সনাতন গোশ্বামীর মত। এইরূপ ক্ষেত্রেও (ন অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধেঃ)—অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধ নহে অর্থাৎ “প্রযত্নেন পূর্ববিদ্ধাং বিবর্জয়েৎ।” সূর্যোদয় হইতে তিথি আরম্ভ হইলে, তাহার পূর্ববিদ্ধা বিচার করিতে গেলে একমাত্র অরুণোদয়-বিদ্ধাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়। তিথি সম্পূর্ণা হইলেও যদি পূর্ববিদ্ধা-প্রসঙ্গ থাকে, তাহা হইলে একমাত্র ‘অরুণোদয়-বিদ্ধা’ ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ এস্থলে আসিতে পারে না। তজ্জন্ত গোশ্বামীপাদের ইহাই মত যে, ‘জয়ন্তী-তিথি’ সম্পূর্ণা হইলেও পূর্ববিদ্ধা অর্থাৎ অরুণোদয়বেধ-বিচার অবশ্য কর্তব্য।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মাননীয় পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্মা, কাব্য-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ মহোদয় উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকটির সঙ্গতি করিতে না পারিয়া একাদশীপক্ষে তাহার অর্থ করিয়াছেন। (“সারস্বত গৌড়ীয়”,

৪র্থ পৃষ্ঠা, ১ম সংখ্যা, ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা তাঁহার গায় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য ঐ শ্লোকটির সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থ না করিলে তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। “সম্পূর্ণা চার্করাত্রে তু” শ্লোকটি শ্রীল সনাতন গোষামি-কর্তৃক শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে-জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত হইয়াছে। সেস্থলে একশ্লোকের কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্রত অপেক্ষা যোগেরই প্রাধান্য দিয়াছেন; ইহা হরিভক্তি-বিলাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

রোহিণ্যাদেবিষুস্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।

তত্ত্বযোগন্তু বৈলিষ্ট্যে ব্রতলোপোহন্যথা ভবেৎ ॥

ইথং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বল্লবিধাষ্টমী।

ভ্যাজা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্বৈকাদশী যথা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭১-৭২)

[রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হইলে কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে, আর যদি (ব্রত অপেক্ষা) যোগের শ্রেষ্ঠতা বলা যায়, তাহা হইলে কখন কখন ব্রত-লোপের সম্ভাবনা হইতে পারে। যদি অষ্টমী-যোগের প্রতি আদর করা হয়, তাহা হইলে কখন সপ্তমীবিকা অষ্টমীতে উপবাস ঘটিতে পারে, একারণ সপ্তমীবিকা অষ্টমীতে সোমবার বা বুধবার অথবা রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হইলেও তাহাতে ব্রত করিবে না। এইপ্রকার যোগভেদে অষ্টমী বহুপ্রকার হইলেও শুদ্ধাই লিখিত হইয়াছে; যেমন বিদ্ধা-একাদশী পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সপ্তমীবিকা অষ্টমী পরিত্যাগ করিতে হইবে।]

যোগ যতই প্রবল হউক না কেন, সর্বত্র ব্রতেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যদি ব্রতের আদর না করিয়া কেবল যোগের আদর করা হয় তবেই সপ্তমীবিকা উপবাস হইবে, নচেৎ নহে। অর্থাৎ যোগ অপেক্ষা ব্রতেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেইহেতু ব্রতেরই আদর করিয়া সমস্ত যোগ ত্যক্ত হইলেও বিদ্ধায় উপবাস হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বথযাত্রা মহোৎসবের বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; ভাদ্র—১৩৫৮

৮ জ্যৈষ্ঠ, ৮ ভাদ্র, ১৫ আগষ্ট, শনিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৬।১৭।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজয়ন্তী।

৯ জ্যৈষ্ঠ, ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট, রবিবার—কৃষ্ণনবমী দি ৭।৫৮। প্রাতঃ
৭।৫৮ মধ্যে শ্রীজন্মাষ্টমীর পার্ণ। শ্রীনন্দোৎসব।

১১ জ্যৈষ্ঠ, ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট, মঙ্গলবার—কৃষ্ণেকাদশী দি ১১।৫৯।
অম্বদা একাদশীর উপবাস।

১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১।৫৭। দি ৯।৩১
মধ্যে একাদশীর পার্ণ।

২০ জ্যৈষ্ঠ, ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌরপঞ্চমী দি ৩।১১।
শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২২ জ্যৈষ্ঠ, ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার—গৌর-সপ্তমী দি ১১।১৮।
শ্রীললিতাসপ্তমী।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার—গৌরাষ্টমী দি ৯।২।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।

২৬ জ্যৈষ্ঠ, ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর, বুধবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১।৩০।
পার্শ্বেকাদশী, বামন-দ্বাদশী ও শ্রবণ-দ্বাদশীর উপবাস। সন্ধ্যায়
শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তন। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ৯।২৪।
প্রাতঃ ৫।৫৮ গতে পূর্বাহ্ন ৯।২৯ মধ্যে পার্ণ।

“দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পার্ণাৎ।

ত্রয়োদশ্যাং পার্ণং হি শ্রবণেহপি নিষেৎস্রতে ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৫৭)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। চুঁচুড়াস্থ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—গৌর-চতুর্দশী রা ৭।৩৪।
শ্রীঅনন্তচতুর্দশীব্রত। শ্রীম হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার—পূর্ণিমা রা ৬।৫।
শ্রীবিষ্ণুরূপ-মহোৎসব।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।	*
ধর্ম: সমুৎপত্তি: পুংসাং বিশ্বক্‌সেন-কথাসু য: ।		নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	সঙ্করন, ২ পদ্যনাভ, ৪৬৫ গৌরাঙ্গ সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৫৮ ; ইং ১৭।৯।৫১	৭ম সংখ্যা
----------	---	-----------

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতম্

১। ইত্যুক্তো ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ ।
প্রত্যাহ প্রণতান্ দেবান্মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

২। হে সুরজ্যোষ্ঠ হে শস্তো দেবাঃ শৃণুত মদ্বচঃ ।
যাদবেষু চ জন্মধ্বমংশৈঃ স্ত্রীভির্মদাজ্জয়া ॥ ২৪ ॥

৩। অহং চাবতরিষ্যামি হরিষ্যামি ভুবো ভবম্ ।
করিষ্যামি চ বঃ কার্য্যং ভবিষ্যামি যদোঃ কুলে ॥ ২৫ ॥

- ৪। ইত্যুক্তবন্তং জগদীশ্বরং হরিং, রাধা পতিপ্রাণ-বিয়োগ-বিহ্বলা ।
দাবাগিনী দুঃখলতেব মূর্চ্ছিতাক্র-কম্প-রোমাক্তিত-ভাবসংবৃত্তা ॥২৮॥

শ্রীরাধোবাচ—

- ৫। ভুবো ভরং হর্তুমলং ব্রজেভূবং, কৃতং পরং মে শপথং শৃণোত্বতঃ ।
গতে ত্বয়ি প্রাণপতে চ বিগ্রহং, কদাচিদত্রৈব ন ধারয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

- ৬। ত্বয়া সহ গমিষ্যামি মা শোকং কুরু রাধিকে ।
হরিষ্যামি ভুবোঃ ভারং করিষ্যামি বচস্তব ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধিকোবাচ—

- ৭। যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি যত্র নো যমুনা নদী ।
যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥ ৩২ ॥
৮। বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধান্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্ ।
গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥ ৩৩ ॥

—শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ে

- ৯। শ্রীরাধয়া পূর্ণতমস্ত সাক্ষাদ্ব্রজা ব্রজে কিং চরিতং চকার ।
তদ্ব্রজি মে দেবপুত্রে ঋষীশ, ত্রিতাপ-দুঃখাৎ পরিপাহি মাং ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

- ১০। অথ প্রভোস্তস্য পবিত্রলীলাং, সুমঙ্গলাং সংশৃণুতাং পরস্ত ।
অভূৎ সতাং যো ভুবি বন্ধনার্থং, ন কেবলং কংসবধায় কৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥
১১। অথৈব রাধা বৃষভানুপহৃত্যামাবেশ্য রূপং মহসং পরাখ্যম্ ।
কলিন্দজা-কূল-নিকুঞ্জদেশে, সুমন্দিরে সাবততার রাজন্ ॥ ৬ ॥

১২। যমাবৃতে ব্যোম্নি দিনস্ত্র মধ্যে

ভাদ্রে সিতে নাগতিথৌ চ সোমে ।

অবাকিরন্ দেবগণাঃ স্মুরন্তি-

সুমন্দিরে নন্দনজৈঃ প্রসূনৈঃ ॥

রাধাবতারেণ তদা বৃভূবুর্ন্যোহমলাভাশ্চ দিশঃ প্রসেদুঃ ।

ববুশ্চ বাতা অরবিন্দরাগৈঃ, সুশীতলাঃ সুন্দরমন্দযানৈঃ ॥ ৭-৮ ॥

১৩। সূতাং শরচ্চন্দ্রশতাভিরামাং, দৃষ্ট্বাথ কীর্ত্তিমুদমাপ গোপী +
শুভং বিধায়াশু দন্দৌ দ্বিজভ্যো, দিলক্ষমানন্দকরং গবাঞ্চ ॥ ৯ ॥

১৪। প্রেঙ্গে খচিদ্রময়ুখপূর্ণে, সুবর্ণযুক্তে কৃতচন্দনান্ধে ।
আন্দোলিতা সা বরূধে সখীজনৈর্দিনে দিনে চন্দ্রকলেব তাভিঃ ॥

যদর্শনং দেববরৈঃ সুদুল্লভং
যজ্ঞৈরবাপ্তং জনজন্মকোটিভিঃ ।
সবিগ্রহাং তাং বৃষভানুমন্দিরে
লক্ষ্যন্তি লোকা ললনাপ্রলালনৈঃ ॥ ১০-১১ ॥

১৫। শ্রীরাসবঙ্গস্য বিকাসচন্দ্রিকা
দীপাবলীভিবৃষভানু-মন্দিরে ।
গোলোকচূড়ামণি-কণ্ঠভূষণাং
রাধাং পরাং তাং সততং স্মরামি ॥ ১২ ॥

—শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ে

ফলশ্রুতিঃ —

১৬। শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্তং নিত্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
রাধামাধবয়োঃ পাদে ভক্তিং দাস্ত্যঃ লভেদ্বিবম্ ॥
কস্ম্য নিস্মূলনং কৃৎস্না জিহ্বা মৃত্যুং স্তুত্বজ্জয়ম্ ।
বিলজ্য্য সর্বলোকাংশ্চ যাতি গোলোকমুত্তমম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতের বঙ্গানুবাদ

১। গোকুলেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণ-কর্তৃক এইরূপে
প্রার্থিত হইয়া মেঘগঞ্জীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

২-৩। ভগবান্ বলিলেন,—হে চতুরানন ! হে শঙ্কর ! হে দেবগণ ! তোমরা
আমার বাক্য শ্রবণ কর,—আমার আদেশে তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত
স্ব-স্ব অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর । আমিও যদুকুলে জন্ম লইয়া অবতীর্ণ
হইব,—ভূভার-হরণপূর্বক তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিব ॥ ২৪-২৫ ॥

৪। স্বীয় পতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বলিলে রাধা প্রাণস্বরূপ পতির বিরহে বিহ্বলা হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ লতার গায় মূচ্ছিতা হইলেন, তাঁহার নেত্র অশ্রুতে আশ্রুত এবং দেহ কম্পিত ও রোমান্বিত হইল ॥ ২৮ ॥

৫। রাধা বলিলেন,—হে প্রাণনাথ ! আপনি ভূতার হরণ জন্ত ভূতলে গমন করিবেন, অতএব আমার এক অমোঘ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করুন ; আপনি চলিয়া গেলে আমি এখানে কোনরূপেই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না ॥ ২৯ ॥

৬। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধিকে ! শোক করিও না, আমি তোমার বাক্য পালন করিব,—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া ভূতার হরণ করিব ॥ ৩১ ॥

৭। রাধিকা বলিলেন,—যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা-নদী ও গোবর্দ্ধন-গিরি নাই, সেখানে আমার মনের শান্তি হইবে না ॥ ৩২ ॥

৮। তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন-গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

—শ্রীগর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ে

৯। (বহুলাংশ বলিলেন,—) পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরে রাধার সহিত অবতীর্ণ হইয়া কি লীলা করিয়াছিলেন, হে ঋষিসত্তম নারদ ! তাহা আমার নিকট কীর্তন করিয়া আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩ ॥

১০। নারদ বলিলেন,—অনন্তর পরম প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী পাবন-লীলা শ্রবণ কর ; তিনি যে কেবল কংসবধের জন্ত ধরায় অবতীর্ণ হন তাহা নহে, তিনি সাধুদিগের রক্ষণার্থও ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

১১। হে রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরম তেজ বৃষভানু-পত্নীতে রাধা-রূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকুলের নিকুঞ্জদেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূতা হন ॥ ৬ ॥

১২। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণ হন, সে-সময় আকাশ মেঘাবৃত ছিল । তখন দেবগণ সেই মন্দিরে নন্দন-বনজাত প্রফুল্ল প্রসূন বর্ষণ করিলেন, নদীসকল অমল ও দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, পদ্মপরাগসহ স্নগন্ধ সূশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল ॥ ৭-৮ ॥

১৩। শত শব্দ-শশধর-কান্তি রমণীয়া কণ্ঠা দর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত

হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমস্ত শুভবিধান করিয়া আনন্দদায়ক দ্বি লক্ষ গো
দ্বিজগণকে দান করিলেন ॥ ৯ ॥

১৪। অনন্তর রাধা, কিরণপূর্ণ রত্নখচিত চন্দনলিপ্ত সুবর্ণময় দোলায় সখীজন-
কর্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে-দিনে নিজপ্রভায় শশিকলার তায় বর্দ্ধিত হইতে
লাগিলেন। যাহার দর্শন দেবগণেরও সুদুলভ, যাহা কোটি কোটি জন্ম-
যজ্ঞাচরণেও লাভ হয় না, লোকসকল তাঁহাকে আজ বৃষভানু-মন্দিরে শরীর-
ধারিণী এবং ললনাগণ-দ্বারা লালিত দর্শন করিতেছে ॥ ১০-১১ ॥

১৫। শ্রীরাস-রঙ্গের প্রকাশকারিণী দ্বীপাবলীরূপ যে জ্যোৎস্না আজ
বৃষভানু-মন্দিরে উদিত, গোকুল-চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠভূষণ-স্বরূপা সেই
পরমা রাধিকাকে সতত স্মরণ করি ॥ ১২ ॥

—শ্রীগর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ডে অষ্টমাধ্যায়ে
ফলশ্রুতি :-

১৬। যিনি এই শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্ত নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীরাধা-
মাধবের চরণযুগলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং
তিনি কৰ্ম্মকাণ্ড উন্মূলন করত দুর্জয় মৃত্যু ভয় করিয়া সমস্ত লোক লজ্জনপূর্বক
উত্তম গোলোকধামে গমন করিবেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই
সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্বাদি, গোবিন্দ ও সর্বকারণ-
কারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি,
কাল, কৰ্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়।
তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।
তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট
হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম । তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যা স্ব অব্যক্তপ্রকৃতি মাত্র নহেন । তিনি নির্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট ; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোৎপাদক, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূল-সূক্ষ্ম-পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন । অথওকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অথওত্বের প্রতিকূল ঋণাত্মক প্রদর্শন করিয়া ঋণকালীত বস্তু । তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্বে আদি জনক-পুরুষ ।

শ্রীকৃষ্ণ—কার্য্য-কারণ-বাদের অতীত

দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে-কারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাপঞ্চিক ধারণায় যে-কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে । এই ধারা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যে-স্থলে কার্য্য-কারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণতত্ত্ব খণ্ডন

ইতিহাসজ্ঞ তাঁহাকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত । তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে তাঁহাকে ‘পরতত্ত্ব’ বলিবার পরিবর্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত । তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন । তিনি শ্রীচৈতন্যের ‘নাম-নামী অভিন্ন’-বিচারের উদ্দিষ্টবস্তু । কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্তধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু । কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্বকামদুঘ । তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিবর্তনবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে ঐহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন ; এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান ।

কৃষ্ণ—অজ ও স্বেচ্ছায় ভক্তের নিকট প্রকাশমান

তিনি—অজ ও শাস্ত । দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র । তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না । তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোম-ভূমিকায় অবস্থিত । সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎ-প্রপঞ্চের স্থূল-সূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত—বহিরন্তরের মধ্যে অনুসৃত ও পরিস্ফুট । পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য, অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা । তিনি অতি-দূর-ও নিতান্ত-অন্তিকে এবং সর্বদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত । তিনি প্রকাশিত হইবার কেবল যোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না ।

তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে ।

কৃষ্ণ—ত্রিবিধশক্তিমান্ ও অসমোদ্ধ

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্তমান । এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অণুত পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার সৰ্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোদ্ধ । তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত । খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গ-গ্রায় মানবের নৈতিকধর্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন । তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তন্মাত্রতা-ভাব গ্রায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে । মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান-লাভ ঘটে, তাহার সর্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত । আরাধ্য-বস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবত (১৩.২৮) বলেন,—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।”

কৃষ্ণ—যাবতীয় রসের অধিদেবতা

কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত । কৃষ্ণ—বাল, বাল-গোপাল এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকূলে একমাত্র উপাশ্রয় বালক । কৃষ্ণ—জগদ্বন্ধু, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রু-পুরীতে অরিগণকে ‘মিত্র’ বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয় । কৃষ্ণের বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে । তখন তাহার ভূতশুদ্ধির পরিবর্তে দুর্ক্লিপাক-বশতঃ সেব্যভিমান হওয়ায় জাদ্য আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ ও প্রস্তর-ধর্মের আসামী করিয়া তোলে । কৃষ্ণের লীলায়, নীতি-কথায়, বিচার-কথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিত-কার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায় ।

কৃষ্ণ সদানন্দময় মাত্র নহেন—আনন্দস্বরূপ

কৃষ্ণ—সদানন্দময় । মায়িক বিচারে ময়ট-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে ‘প্রচুর’ বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্বব্যাপকতাও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না । ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানব-নীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবিক হইয়া পড়ে । তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রাস্তুরিত

করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভিজ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনাপূর্বক মায়িক-বস্তুবিশেষ-রূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়।

কৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তার সুযোগ লইয়া কাল্পনিকগণের যদৃচ্ছাজ্ঞান—কখনও ‘কৃষ্ণ’ নহেন

কৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্বিশিষ্ট নামক মানব-ধারণার কারখানায় গড়া ‘পুতুল’ করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে দান্তিকতায় পরিণত করে বলিয়া, দণ্ডস্বরূপে জীব-ধারণায় ‘ব্রহ্ম’ ও ‘পরমাত্মা’-শব্দদ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। ‘কৃষ্ণ’ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থল-স্থল পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব-লাভের অধিকারী

বদ্ধজীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধার-লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দশ-ভুবন ভ্রমণ করিবার জন্ত প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে ‘ভোগী’ বা ভোগ ছাড়াইয়া ‘ত্যাগী’ করায়। ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্ত, গীতা (৭।১৬) বলেন,—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কন্ধতিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

—শ্রীম প্রভুপাদ

(২) প্রয়াস

‘প্রয়াস’ কাহাকে বলে এবং তাহা দ্বিবিধ

‘প্রয়াস’ পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। ‘প্রয়াস’-শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই ‘পরমার্থ’ বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণদ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ-ধর্ম। সহজ-ধর্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তিবৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যত-প্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম-প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবল বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহাই আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্বাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তিবিরোধী

জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী—ইহা বেদশাস্ত্রে, মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিচারিত হইয়াছে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

ষমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

(মুণ্ডক-৩।২।৩)

আত্মা—আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন; সুতরাং ভক্তিই ভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিলেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্ত্র নমন্ত এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাঃ ভবদীয়-বার্তাম্ ।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তনুবাঙ্গনোভি-

র্ষে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্তিলোক্যাম্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

হে অজিত ! যাহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক সাধুমুখ হইতে

আপনার কথা শ্রুতিগত করত কাঁয়-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ, আশ্রয় করেন, তাহাদিগের দ্বারা এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াস নিষ্ফল

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রেয়ঃ-স্বতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো।

ক্লিশস্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্ঠতে

নাগৃদ্ যথা স্থল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো ! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ ; তাহা ত্যাগ করত যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ-লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যে রূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না।

সম্বন্ধ-জ্ঞান—পবিত্র, উহা অদ্বৈত-জ্ঞান নহে

কৈবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয় ; তাহা কেবল আশুর-বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ‘চতুঃশ্লোকী’তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-হৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান্—চিন্ময় সূর্য্য-কল্প ; জীব—তাহার কিরণ-পরমাণু-কল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভগবদাস্ত্র তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের প্রয়াসশূন্য সহজ-ধর্ম্ম।

ভক্তিসাধন—কর্ম্ম-জ্ঞানের ন্যায় প্রয়াস নহে

যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রতিবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিद्या-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়।

জ্ঞান-প্রয়াসের গতি

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশে মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

অকুয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে অক্ষরমনির্দেশমবাক্তং পশ্য পাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গী: ১২।২-৫)

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত ঐহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা যুক্ততম । ঐহারা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক সর্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা জ্ঞান-প্রয়াসী । সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্বভূতে দয়া থাকে সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পান । সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব । জ্ঞান-প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি !

কর্ম-প্রয়াসের ফল

কর্ম-প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না । যথা, ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

ধর্ম্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাস্থ যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যতি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভা: ২।৮)

ধর্ম—বর্ণাশ্রমগত কর্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম । সেই স্বধর্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতिलाভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল । সুতরাং যেকোন জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম-প্রয়াসও তদ্রূপ ।

ভক্তির অনুকূল কর্ম—প্রয়াস নহে

সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর । কিন্তু জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে, কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয় । সে-সকল কর্ম আর 'কর্ম' বলিয়া উক্ত হয় না । ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ-ভক্তগণ কর্ম ও কর্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন । পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রাহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্মাচরণ করেন । নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন ।

ভক্তির অনুকূল জ্ঞান ও যোগ—প্রয়াস নহে

জ্ঞান-প্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্বাক্যমুক্তি-প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া ‘প্রয়াস-শূন্য’ আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কৰ্ম, জ্ঞান উপায়-স্বরূপে আদৃতমাত্র। উপেয়-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়—ইহা ‘নিয়মাগ্রহ’ বিচারে দেখাইব।

সাধুসঙ্গ-লালসায় তীর্থযাত্রা, ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতপালন, বৈষ্ণবসেবা, অর্চন, কীর্তনাদি প্রয়াস নহে

তীর্থ-যাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলন-লালসায় কৃষ্ণ-লীলা-স্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে—বৃথা-প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়—ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়; কেননা, স্বযুথ-সঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গ-লিপ্সারূপ দোষের বিনাশক। অর্চনাসঙ্গ-প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম। সংকীর্তনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ঘাটনপূর্বক প্রভুর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্য-প্রয়াস অনাবশ্যক

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেননা, ভক্তির উদয়ে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিয়োগঃ প্রযোজিতঃ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ (ভাঃ ৩।৩২।২৩)

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিয়োগ প্রযোজিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ব্যস্ত-বুদ্ধাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কৰ্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কৰ্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না।

ভক্তির প্রয়াস-শূন্যত্ব

অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরনৃত্ত চৈষ ত্রিক এককালঃ” (ভাঃ ১।১।৪২)—এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ’ন,

তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ জ্ঞান এবং অগ্ৰত বিবর্তিত উদয় হয় ।
 দীনভাবে যখন ভক্ত সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম-কীর্তন ও স্মরণ করেন, তখন
 সহজেই—‘আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিতাপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে
 শরণাগতিই আমার নিত্যস্বভাব ; এজগৎ আমার পান্থ-নিবাসমাত্র, ইহার কোন
 বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য স্মৃথকর নয়’,—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির
 উদয় হয় । ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে ।

বিবিধ প্রয়াস-তালিকা, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস সর্বাপেক্ষা হীন

জ্ঞান-প্রয়াস, কৰ্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-
 প্রয়াস, বহির্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব ।
 এইসকল প্রয়াস দ্বারা ভজন নষ্ট হয় । আবার, প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস, সমস্ত প্রয়াস
 অপেক্ষা হেয় । হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে । তাহাও
 সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য । অতএব শ্রীমদাতন গোস্বামী
 লিখিয়াছেন,—

সৰ্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সৰ্বানর্থভুবশ্চ তে ।

কুৰ্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমম্পর্শনে বরম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

—এই উপদেশটি অত্যন্ত গম্ভীর । ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তি-
 ধর্ম পালন করিবেন ।

গৃহী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক ভক্তি-
 সাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্তন করিবেন । এই প্রয়াসশূন্য
 ভজন-পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে—দুই প্রকার প্রবৃত্তি । গৃহী
 বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করত প্রয়াসশূন্য হইয়া
 ভক্তি সাধন করিবেন । যাহাতে কুটুম্ব-ভরণাদি অনায়াসে নির্বাহ হয়, সেরূপ
 সঞ্চয় ও উপার্জন করিবেন । হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহাই
 তিনি সর্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না । সুখে-দুঃখে,
 সম্পদে-বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায়—সর্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরে সিদ্ধ হইবে ।

ত্যাগী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

আর, গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না । প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীর-যাত্রা
 নির্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন । কোন উদ্যমে থাকিবেন না । উদ্যমে প্রবেশ

করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ । দৈন্ত ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণকৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন । যথা, ভাগবতে ব্রহ্মবাক্য—

তত্ত্বেহমুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদাগ্বেপুভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

হে কৃষ্ণ ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না । কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে ‘তোমার অমুকম্পা অবশ্য হইবে’—এই আশা করত কায়মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন ।

কৃপাদ্বারাই ভগবৎতত্ত্ব লভ্য—জ্ঞানে নহে

জ্ঞানাদি-প্রয়াসদ্বারা কিছুই হয় না ; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায় । অতএব—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্নহিমো ন চাত্ত একোহপি চিরং বিচিষন্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

দৈন্তভাবে নামাশ্রয় করিলে, ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবত্তত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে বিনা-প্রয়াসে উদিত হয় । চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রয়াসে তাহা পাওয়া যায় না ।

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা :—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩৬	২	“অর্থান্তর গ্রহণ করাই কর্তব্য”—ছত্রটি হইবে না ।	
২৩২	৪	“অভিসিত-যোগে”	স্থলে “অভিজিৎ-যোগে” হইবে ।
২৩৭	২৮	“বিচার সুসঙ্গত”	” “বিচার অসঙ্গত” হইবে ।
”	৩১	“তিথি পর্য্যন্ত”	” “পর্য্যন্ত তিথি” হইবে ।

শ্রী শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীর চরণ-কমলে দীনের ভক্ত্যৰ্থ

(১)

(আজি)—বিশ্ব তোমার পূজিছে চরণ, নিয়ে হৃদি-ভরা আকুলি-দৈন্য ।

(আমি)—কি দিয়ে পূজিব, চরণ তোমার, হৃদয় আমার ভকতি-শূন্য ॥

(তুমি)—গৌর-প্রিয়জন, পতিত-পাবন, করুণার তব নাহিক পার ।

(তব)—করুণাতে পেল, কতই কাঙাল, শচী-দুলালের করুণা-ধার ।

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-বলে ।

(যেন)—লুটাইতে পারি, চিরদিন তরে, বিশ্ব-পূজিত চরণ-তলে ॥

(২)

(আজি) করুণায় তব, এ-দীন সেবক, তোমার যুগল চরণ বন্দে ।

(আজি)—গাহিব হরষে, তব গুণ-গাথা, সাধুজন-সনে ললিত ছন্দে ॥

(কর)—প্রদীপ্ত আমার, মলিন হৃদয়, দাও হৃদে মোর বিপুল শান্তি ।

(মোর)—কলুষ-কালিমা, মুছায়ে দাও গো, হৃদয়ে বিকশি' ভকতি-কান্তি ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-বলে ।

(যেন)—লুটাইতে পারি, চিরদিন তরে, বিশ্ব-পূজিত চরণ-তলে ॥

(৩)

(মোর)—অনর্থের ঘন, কুহেলি-তিমির, বিনাশি' প্রদান' শুদ্ধ-প্রেমভক্তি ।

(তব)—চরণ পূজিতে, দাও কৃপা করি, হৃদয়ে আমার অমিত শক্তি ॥

(তব)—মহিমা-সংগীতি, গাহে বিহঙ্গম, মৃদু-কুলুনাতে তটিনী গায় ।

(পত্রে)—মর্ম্মরিয়া গাহে, ঘন-বনে শাখী, আকাশ নমিছে তোমার পায় ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব চরণ পূজিতে ।

(আজি)—কুসুম-কুন্তলা, ধরণী ব্যাকুলা, ভরিয়া কুসুম কানন-সাজিতে ॥

(৪)

(আজি)—হ'য়েছে আমার, হিতাহিত জ্ঞান, অলীক মোহের ছলনে লুপ্ত ।

(প্রভো !)—জাগাও চরণ-পরশে আমারে, আমি যে মায়ার মায়াতে-সুপ্ত ॥

(তব)—করুণা-সলিলে, মিশ্রল কর, আমার মলিন বিকল চিত্ত ।

(যেন)—গুরু-গৌরাঙ্গ-অভয়-চরণ, নিষ্কপটে পারি সেবিত্তে নিত্য ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-নিধারে—

(স্নান)—করিয়া তোমার, পূজিছে চরণ, কৃতাজ্জলিপুটে এ-দীন কাতরে ॥

(৫)

(মম)—কামনা-অনল-দগ্ধ-হৃদয়ে, ঢাল' করুণার অমৃত-বিন্দু ॥

(আমি)—গাহিব ললিতে, তব গুণ-গাথা, ওগো দীনহীন জনের বন্ধু ॥

(মোরে)—দাও সহিষ্ণুতা, দৈন্ত্য-নশ্বতা, দর্প-অভিমান করিয়া চূর ।

(তুমি)—শোধহ আমারে, কৃপা-কণা দিয়া, আলস্য-জড়তা করিয়া দূর ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব মহিমা অপার ।

(তব)—চরণ-কমলে, অগণিত নর, ঢালিছে বাসিত কুসুম-ভার ॥

(৬)

(মোর)—অসার কামনা, বিষয়-বাসনা, অকপট-চিত্তে করিয়া দূর ।

(আজি)—শরণ লইনু, তোমার চরণে, আমার আশ্রয় করগো চূর ॥

(আমি)—পুরীষের কীট, হইতে অধম, হে দয়াল ! মোরে করুণা কর ।

(তব)—অহৈতুকী কৃপা, আজি যেন মোরে, শ্রীগুরু-সেবাতে করে তৎপর ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব করুণা-নিধারে—

(স্নান)—করিয়া তোমার, পূজিছে চরণ, কৃতাজ্জলিপুটে এ-দীন কাতরে ॥

(৭)

(দেব !)—তোমার রচিত, স্মৃতি-গ্রন্থ যত, জগৎ-পাবন সকলে তা'রা ।

(জয়)—“সংক্রিয়াসার-দীপিকা” যত আর, গৌড়ীয়-গগনে দিতেছে সাড়া ॥

(তুমি)—সনাতন-মন, বুঝিয়া তখন, “হরিভক্তিবিলাস”-সার সংকলনে ।

(তব)—এ-বিশ্ব সংসার, করিতে শোধন, অপূর্ব করুণা ঘোষিত ভুবনে ॥

(জয়)—জগদ্বন্দ্য গোপালভট্ট, গোস্বামী তব মহিমা অপার ।

(আজি)—শরণ লইনু, তোমার চরণে, রূপানুগ-বর্ষ্য জানিয়া সার ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

প্রদীপ-শিখা *

‘প্রেম-প্রদীপ’-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কি দুর্দশা লাভ করিয়াছে, সাধারণ লোক তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দৈনন্দিন জীবনে যে কয়েকটি দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, তাহার প্রত্যেকটিরই অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ আহারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, তৃতীয়তঃ স্বচ্ছন্দ-বাসগৃহের অভাব—সর্বত্রই এইরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইলে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত থাকিতে হইবে জানিতে পারিলে, লোকে এইরূপ স্বাধীনতা চাহিত কি না সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। এইরূপ দুর্দিনে কেহই শান্তি খুঁজিয়া পাইতেছে না,—এমন সময়ে শান্তির সন্ধান দিবে কে ?

আমরা ‘প্রেম-প্রদীপ’-গ্রন্থের লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী হইতে জানিতে পারি, তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ও উড়িষ্যার সত্ত্ব পরাধীনতার পর, দেশের দুর্দিনের মধ্যে যে দেশ-শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনিস্বরূপ তাঁহার রচিত গ্রন্থ ‘প্রেম-প্রদীপ’ ৬৫ বৎসর পরে পুনঃ প্রজ্জ্বালিত হইল। তৎকালে ব্রাহ্মগণ আরব্য ও পারস্ত-শিক্ষা-প্রভাবে হিন্দু-হিংসা, বিগ্রহ-বিদ্বেষ, শুভকর্ম-কদন, সমাজ-সংহার প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত থাকায় দেশে ভয়ানক দুর্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। সন্ধ্যা সন্ধ্যা যোগিগণের শারীরিক ‘কসরৎ’ ও নিরীশ্বর চিন্তাশ্রোত জগৎ-ধ্বংসের সহায়তা করে। এই ‘প্রেম-প্রদীপ’-গ্রন্থখানি তদানীন্তন-কালে উহাদের প্রতিবন্ধক-স্বরূপে স্মৃতি আনয়ন করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ ও নিরীশ্বর যোগী-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারত রক্ষা পাইয়াছে; এমন কি, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ ভারত হইতে ব্রাহ্ম ও যোগিগণ বিলুপ্তপ্রায়। তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে তত্ত্বকর্মসাজী স্বল্প সংখ্যক দুই চারিজন ব্যক্তি বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি সংশোধনের জন্ত ও বর্ত্তমান দুর্দশায় বিশ্বের পরাশান্তি কামনায় এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। জীব-হৃদয়ে ‘প্রেম-প্রদীপের’ শিখা প্রদীপ্ত হইলেই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে।

* এই প্রবন্ধটি “প্রেম-প্রদীপ”-গ্রন্থের ভূমিকা। “প্রেম-প্রদীপ” গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এই ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তা এই গ্রন্থের অন্তঃপ্রস্থে (Inner title) শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদর্শ শিক্ষা-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য সমাপন করিতেছি।—

“তদেব ব্রহ্ম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্নসো মহোৎসবম্।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমশ্লোকবশোঃ স্তুগীয়তে ॥”

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, “ভগবৎ-কথাই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করে। ভগবদ্-ধর্ম-কীর্তন মানবগণের অভাবজনিত দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের মনোবৃত্তির নিত্য-মহোৎসব-সাধনে সমর্থ, ঐ কথা নব-নবায়মান হইয়া পরম-রুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণের কথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ভগবৎ-কীর্তি-কথা অভাবের পরিবর্তে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে।”

গ্রন্থ-পরিচয়

চারিশত চৈতন্যাদ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশ করিয়া তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন,—
“(ইহা) পবিত্র হরিভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকস্মাৎতা, শুদ্ধ যোগ-চেষ্টার নৈফল্য ও ব্রাহ্মাদি-ধর্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক উপন্যাস।” তাঁহার উক্ত সংস্করণে কোন ভূমিকা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ মাহামায়া বীরচন্দ্র মানিক্য মহারাজ বাহাদুরের উদ্দেশ্য যে উৎসর্গ-পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

“পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার মানসে আমি এই ‘প্রেম-প্রদীপ’ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার “সজ্জনতোষনীতে” খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। অধুনা তাঁহাদের ইচ্ছামতে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তৎপ্রচারার্থে অসীম ব্যয়শীলতা দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে ইহাকে মহারাজের নিরন্তর হরিসেবা-রত কর-কমলে অর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয়টী কোন সময় আপনার বিদ্বৎসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।” ইত্যাদি—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি-সঙ্কলিত ‘শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার জীবনী আলোচনামুখে উক্ত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যাবতীয় শাস্ত্রের সার-সকলন। 'প্রেম-প্রদীপ' গ্রন্থখানিও তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

উপন্যাসিকতা

সাধারণ উপন্যাস যে-প্রকার ভোগপর চিন্তাশ্রোত লইয়া গ্রথিত হইয়া থাকে, 'প্রেম-প্রদীপ' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র যেরূপভাবে বর্ণিত হয়, তাহাতে পাঠকবর্গের চিত্ত স্বভাবতঃই ভোগপর ধারণার ইন্ধন যোগায়। এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণন থাকিলেও তাহাতে পূজ্য ও গৌরব-ভাব-বজ্জিত কোন অসং-চিন্তার প্রশয় দেওয়া হয় নাই। তজ্জগুই ইহাকে কেবল উপন্যাস না বলিয়া ইহাকে, 'পারমার্থিক' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করত 'পারমার্থিক উপন্যাস' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আজকাল অনেকেরই উপন্যাস-পাঠে রুচি দৃষ্ট হইতেছে। তজ্জগু তাঁহাদের রুচির অনুকূলে পারমার্থিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জগু এই উপন্যাস-গ্রন্থখানি বিশেষ আবশ্যক-বোধে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বর্তমান সংস্করণে অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষেপে শিরোনামা দিয়া বক্তব্য-বিষয়ের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিবিধ সূচীপত্র দ্বারা গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰী-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রবর্তিত সন্তোগবাদ-নিরসনপর বিপ্রলভ-ভজনানুকূল-দ্বারা অবলম্বনপূর্বক ইহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাও এই গ্রন্থ সম্পাদনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিবিধ মতবাদ-নিরসনপর বিচার লিপিবদ্ধ করিলেও, পূর্ব-উল্লিখিত 'গ্রন্থ-পরিচয়'-প্রসঙ্গের চারিটি বিষয় এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য-বিষয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথমতঃ) 'হরিভক্তির উৎকর্ষ' সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১২, ১৪, ১৫, ৪১, ৬৯, ১০৩, ১১১, ১২১ প্রভৃতি পৃষ্ঠা। (দ্বিতীয়তঃ) কেবল 'যুক্তির অকর্ষণ্যতা' সম্বন্ধে ৫৯, ১১১ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (তৃতীয়তঃ) 'শুকযোগ-চেষ্টার নৈফল্য' সম্বন্ধে ১০-১২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় এবং

(চতুর্থতঃ) ‘ব্রাহ্মাদি ধর্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক’ বিচার ৭০, ৭১, ৯৪-৯৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থলে কি-কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে জানানো হইল। গ্রন্থের সর্বত্রই এই সমস্ত বিষয়ের স্মৃষ্টি আলোচনা আছে। নিয়ে যোগ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম সম্বন্ধে দুই একটা বক্তব্য নিবেদন করিয়া ‘প্রদীপ-শিখা’ নির্কাপিত করিব।

যোগ-ধিকার

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র পাতঞ্জল-যোগ-দর্শনেরই হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য সর্বতোভাবে উপেক্ষিত বলিয়া উহার কথা আলোচিত হয় নাই। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সর্বকর্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে ‘নিষ্ক্রিয়’, শব্দমাত্র ও সংখ্যা-পূরণ-জন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জগৎই সাংখ্যকার চতুর্কিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব-সংখ্যা বিচারান্তর করিয়াছেন। সাংখ্যকার বলেন—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসমূহের বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষ-লাভের সম্ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং সাংখ্য-যোগকে বেদান্ত-দর্শন ধিকার করিয়াছেন। পাতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ-যোগেও পরমব্রহ্ম-জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, অধিকন্তু অষ্টাঙ্গ-যোগ ঈশ্বর মানিলেও সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক। সুতরাং তাহাও ঐরূপ বৃথাতে হইবে।

ব্রাহ্মের নির্বাণ

নবীন ধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মাচার্য রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া তাঁহার আদরের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের নির্বাণ-সাধন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবগণকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গরুড়-পুরাণের “ভাষ্যোহয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্” এই শ্রীব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে “ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য” বলিয়া গ্রহণ করিবার মত শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি মুসলমানী আরবী ও পার্সী পড়িতে গিয়া মুসলমানের চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজ, বিদ্যা ও অবিদ্যার ন্যায় পৃথক, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের সেবা-কর্ম আর অবিজ্ঞোৎপন্ন জ্ঞান কখনই এক নহে। ব্রাহ্মাচার্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-লীলার গ্রন্থ, উহা যদি বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়,

তাহা হইলে বেদান্তের সাদ্বৈপ্লবিক শ্রুতি কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-
নামের উল্লেখ থাকিত। একপস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণনামের উল্লেখ
নাই বলিয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য নহে’—এরূপ বিচার অত্যন্ত অসমীচীন।
কোন তত্ত্ব-বিষয় উপাখ্যানের দ্বারা বুঝান হইলে সেই উপাখ্যানের সহিত তত্ত্বের
কোন সম্বন্ধ নাই—এরূপ বিচার করা অনভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আধুনিক
শিক্ষা-জগতে ইহাই রীতি—উপাখ্যান হইতে উপদেশ এবং উপদেশ হইতে
উপাখ্যান সংগ্রহ করা। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, বেদান্ত-দর্শন প্রত্যক্ষভাবে
‘কৃষ্ণ’ শব্দ উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া বেদান্তের সহিত কৃষ্ণলীলার কোন
সম্বন্ধ নাই—ইহা ভ্রান্ত বিচার। সতী-সাক্ষী স্ত্রীর নিকট তাহার স্বামীর নাম
জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই তাহা বলে না। এখন, প্রশ্নকর্তা স্বামীর নাম পাইলেন
না বলিয়া তাহার স্বামী নাই অথবা স্বামীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ
বিচার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অত্যন্ত প্রিয় ও প্রচুর গৌরবের
সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নাম অনেকেই উল্লেখ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এমন কি,
ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায়েব আচরণ ও লেখনী হইতেও ইহা স্পষ্টভাবে
লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পরম প্রিয় ও গৌরবের পাত্র আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের নাম
উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া তিনি সর্বত্রই ‘ভগবান্ ভাষ্যকার,’ ‘ভগবান্
ভাষ্যকার’—এরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গৌরব-হেতু আচার্য্য শঙ্করের
নাম উচ্চারণে যদি দ্বিধা বোধ করেন, বেদান্ত-দর্শনকার শ্রীব্যাসদেব সর্বাপেক্ষা
প্রিয়তম ও গৌরবময় পুরুষের নাম উল্লেখে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন—এইরূপ বিচার
করিলেও অসঙ্গত হইবে কি? এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা
করিতে গিয়া **জ্ঞানই** শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মই **জ্ঞান-স্বরূপ** বিচার করিয়াছেন এবং
ব্রাহ্মাচার্য্যও উহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য,
এই ‘জ্ঞান’ শব্দটি ব্রহ্মসূত্রের কোন শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে? বেদান্ত-
দর্শনের সাদ্বৈপ্লবিক শ্রুতির মধ্যে কুত্রাপি ‘জ্ঞান’-শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং
ব্রাহ্মাচার্য্যের উক্ত তর্ক স্বীকার করিয়া লইলে, ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানপর ভাষ্যও তাহার
প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজযতুল-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

পশ্চিমধ্যে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-তীর্থসমূহ
দর্শন ও পরিক্রমা

যাত্রার দিন-৩০শে আশ্বিনের পূর্বে নহে।
তৈনভাড়া-সমেত ভিক্ষা ২০০ টাকা।
যাঁহারা যাইবেন, পূজার পূর্বে ১০০ টাকা জমা দিয়া
নাম রেজিস্ট্রী করিবেন।

সকলে প্রস্তুত হউন।

নিষ্ঠাবিত্ত বিনয়গেহ জগু
নিম্নলিখিতকানাম পাত্র লিখুন ৪-

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিব্রজান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

পরলোকে শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২ই আগষ্ট, ২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকালে—শ্রীবৃন্দাবন-ধামস্থ শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আশ্রমে শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী মহোদয় চিরতরে আমাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সকলেরই অতিপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্বভাবশুলভ দৈন্ত, অমায়িকতা, উদারতা, ক্রোধশূন্যতা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবোচিত গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অত্যন্ত চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ক্রিয়াকলাপ ও বিপদাপদের মধ্যেও তাঁহার সর্বদাই হাঁসিমুখ লক্ষ্য করা যাইত। বিশেষতঃ তাঁহার সত্য-প্রিয়তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও শিষ্য হইয়াও ষাঁহার শিষ্যক্রমের জায় জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহাদের সহিত আন্তরিক কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া, অমুগত সেবকগণের মধ্যে ষাঁহার শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধভাবে সেবা-প্রচারাঙ্গি বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিতই তিনি অধিকাংশ সময় কালযাপন করিতেন।



শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সারস্বত-

শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী

ধারায় বিশুদ্ধ সেবা ও প্রচারাঙ্গি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ব্রজবাসী প্রভু উক্ত সমিতির বহু সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমিতির সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য অমুগত পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধালু জনগণ সকলের নিকটই তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। সমিতির অমুষ্ঠিত বিরাট

পরিক্রমা ও উৎসবাদি-অনুষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা দুরূহ সেবাকার্যের ভার তিনি একাই গ্রহণ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। যাহারা এইসকল পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহার সকলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। “শ্রীঅযোধ্যা ও নৈমিষরণ্য-ধাম-পরিক্রমা” (১৩৫৬), “শ্রীরামেশ্বর-কণ্ঠাকুমারী-অনন্তপদ্মনাভ-পরিক্রমা” (১৩৫৭), প্রতি বৎসর “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা,” “শ্রীরথযাত্রা-উৎসবাদি”তে তাঁহার সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বর্ষে ৮৪কোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও তথায় কার্তিক-ব্রতের অনুষ্ঠান হইবে স্থির হওয়ায়, তিনি পূর্ব হইতে উক্ত পরিক্রমার আয়োজন করিবেন—এই উৎসাহ লইয়া ব্রজধামে গমন করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবা-সন্দর্শন হইতে এবৎসর কেন, চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীশ্রীব্রজেশ্বর তাঁহাকে ইতিমধ্যেই স্বকোড়ে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধান হইতে আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন—যাহাতে আমরা তাঁহার জীবন্ত জলন্ত সেবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে পরিবেশন করিলাম :—

ব্রজবাসী প্রভুর জীবনী

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত “বাজিতপুর” গ্রামে, ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমৃদ্ধিশালী ধর্মপ্রাণ রাজকৃষ্ণ বাবুর ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহার পিতামহ হলধর বাবু বর্তমান থাকিতেই তাঁহার শৈশবাবস্থায় পিতা পরলোক-গমন করেন। তদবধি তিনি পিতামহের নিকট সাদরে লালিত-পালিত হন এবং কিছুকাল পরে পিতামহও ইহলোক ত্যাগ করায়, উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা-সত্ত্বেও, তিনি আশানুরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যাবধি তাঁহার ধর্ম-প্রাণতা, ঈশ্বরানুরাগ ও পূজাপার্বণাদিতে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যৌবনে তাঁহার উপর পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার ভার হস্ত হয়। এই সময়ে তিনি ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের অধীনে

টীকাদারের কার্য গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মপ্রাণতা গ্রামবাসী সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ ২৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কালের করাল গতি অত্মদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার ভক্তির বন্ধন ছেদন করিবেন ; সুতরাং বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটিল। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের চিন্তাশ্রোত অগুরুপ। তাই আত্মীয়স্বজন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ পুনরায় তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্ত দ্বিতীয়বার সংসারে প্রবেশ না করিয়া পারমার্থিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় হইতে তিনি সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। হৃদয়ে ধর্মপিপাসা প্রবলরূপে জাগরুক হওয়ায় তিনি তাঁহার স্বগ্রামবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমুগত তথাকথিত কয়েকজন বাবাজীর নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং পরে তাঁহাদের নানারূপ অসদাচার ও বিচার-বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁহার সাংসারিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিল। গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন ও বিষয়-সম্পত্তির মায়ামোহ হইতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল। তিনি “সংসার—অসার ও মায়া-কারাগার” জানিয়া অন্যায়সে তাহা পরিত্যাগ করত শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** শ্রীচরণ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি শ্রীগুরুপাদপদের আদেশ ও নির্দেশ-অনুসারে কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। টাণ্ডাহাটী ‘শ্রীগৌর-গদাধর মঠ’, মামগাছি ‘শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট’, বিজ্ঞানগর ‘শ্রীসার্বভৌম গোড়ীয় মঠ’, রাউতাড়া ‘শ্রীমধ্যদ্বীপ গোড়ীয় মঠ’, কৃষ্ণনগর ‘কুঞ্জকুটীর’ প্রভৃতি স্থানে তিনি সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পরিশেষে নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত উক্ত সমুদায় মঠসমূহের পরিদর্শকরূপে তিনি নিযুক্ত হন। তদবধি তাঁহার গুরুভ্রাতা সকলেই তাঁহাকে “ইন্সপেক্টর”-সংজ্ঞায় আহ্বান করিতেন। অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, জন্মভূমির অধিবাসী আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি বাজিতপুরে সপ্তাহকাল প্রচুরভাবে হরিকথা প্রচার করত পুনরায় শ্রীমঠসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কিছুকাল নিলিপ্তভাবে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে অবস্থানকালে শ্রীগোড়ীয়

বেদান্ত সমিতির সেবা-প্রচারাদিতে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। অতঃপর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুষ্টিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, ব্রজবাসী প্রভুর বিশেষ আগ্রহে বাজিতপুর গ্রামে প্রচারোপলক্ষে শুভবিজয় করিলে, তিনিও আচার্য্য-মহারাজের সহিত গমন করিয়া বাজিতপুরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের স্মৃতি-সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইং ১৮৯২ সালে বসিরহাটের সন্নিকট এই ‘বাজিতপুর’ গ্রামে শ্রীমন্নহাপ্রভু-উপদিষ্ট শ্রীনামপ্রেম-প্রচারার্থে শুভপদার্পণ করেন। তিনি “স্বলিখিত জীবনী”-গ্রন্থে এসম্বন্ধে যে রূপ লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

“১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে আমি, ভক্তিভূজ, তারকব্রজ গোস্বামী বসিরহাটে নাম-প্রচারার্থে গমন করি। ১৬ই বাজিতপুরে শ্রীনামহট্টের কার্য্য হয়। ১৭ই বসিরহাটে বক্তৃতা হয়। ১৯শে তারিখে দণ্ডিরহাটে বক্তৃতা ও প্রচার হয়।” (স্বলিখিত জীবনী—১৯২ পৃঃ)

কে বলিতে পারে, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাগমন-ফলেই উক্ত গ্রাম হইতে আমরা শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুকে তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণ-কল্পে পাইয়াছিলাম কিনা। তাই ব্রজবাসী প্রভুর হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছিল—নিজ জন্মস্থান বাজিতপুরে শ্রীল ঠাকুরের স্মৃতি-সংরক্ষণ করিয়া তাঁহার যাবতীক, সম্পত্তি উক্ত স্মৃতি-সেবায় সমর্পণ করা।

শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ। তথাপি শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবুর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি আকর্ষণ দর্শন করিয়া ব্রজবাসী প্রভু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সকলেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই বৈষ্ণববর্গের বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়।

দীনদয়াল প্রভুর আদর্শ-শিক্ষা

পূজ্যপাদ দীনদয়াল প্রভুর পরিচয় আমরা তাঁহার লেখনী হইতেই স্পষ্টভাবে পাইয়া থাকি। তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায়, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় “বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা”—শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাব, ভাষা ও শিক্ষা অতীব গভীর ও জগন্মঙ্গলকর। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার স্বহস্তলিখিত আরও ২টি প্রবন্ধ আমাদের শ্রীপত্রিকায় নিয়ামক-মহারাজের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধদ্বয়ই তাঁহার শেষ শিক্ষা। আমরা সময়ান্তরে ইহা প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?

কোনদিকে সাগর, কোনদিকে গিরি-উপত্যাকা, কোনদিকে শ্যামল তৃণ-শস্যের আচ্ছন্ন ; কোনদিকে মন্দ মন্দ সমীরণ এবং বর্ষার ঝর ঝর বরিষণ ; আবার-কোনদিকে নির্ঝর স্রোতের জল, কোনদিকে বজ্র-মেঘে বিদ্যুৎমালা ; আবার নির্মল আকাশ কোন দিকে তারকাবেষ্টিত, কোথাও পূর্ণিমার চাঁদের স্নিগ্ধ আলোক । স্থানে স্থানে লোকালয়, বিহঙ্গকুলের কুজন ও সঙ্গীতলহরী—আহা কি মধুর ! কি মনোভিরাম !!—এইপ্রকার জগতে আমরা যে-সকল বস্তুর প্রতি প্রণয়াবদ্ধ হই, সেই সমূহ বস্তুই আকর্ষণ ও আনন্দ-সদৃশ্যবিশিষ্ট । কোন বস্তু আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ না করিলে ও আনন্দ-প্রদান না করিতে পারিলে তাহাকে আমরা ভালবাসি না । এইজন্য বেদ-উপনিষদ্ ও বিভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই, জীবের সর্বারাধ্য-শিরোমণির নাম—শ্রীকৃষ্ণ ।

কৃষিভূ'বাচকঃ শব্দো নষ্ট নিবৃ'তিবাচকঃ ।

তয়ো'রেক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ (মঃ ভঃ উঃ পঃ ৭।১।৪)

শ্রীকৃষ্ণ সর্বাাকর্ষক ও সর্দানন্দবর্ধক, নিখিল বৈদৈক্যবেগ, অখিল ব্রহ্মাণ্ডৈকপূজ্য, নিত্যসুখবোধতম, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর । তাঁহারই ব্যতিরেকাত্মক মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট । তন্নিমিত্ত জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক আকর্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট । এ-জগতের প্রত্যেক বস্তুই জলজ, অগ্নিজ, স্নেহজ ও জরাযুজ প্রাণীসমূহের চিত্ত-বিনোদী ও প্রাণাকর্ষী । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভূচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য । ভগবানের অণুচিৎ সত্ত্বা জীবের স্বরূপ । এইজন্য ভগবৎ-দাস্যই জীবের স্বরূপগত শাস্ত বৃত্তি । ভগবান্ তদ্বস্তু, জীব ও মায়া তদীয়বস্তু । সূত্রাত্তং ও তদীয় বস্তু-সমূহের মধ্যেই আকর্ষণ-সত্ত্বা বিদ্যমান । এখন একটি উদাহরণ দিয়া দেখা যাক—চুম্বক আকর্ষক বস্তু । তাহা হইতে বিখণ্ড এক অণুচুম্বক, অণু অণুচুম্বকের আকর্ষক ও আকর্ষণ—উভয় স্বভাববিশিষ্ট । আবার যেকোন সমূহ অণুচুম্বকগুলি বৃহৎ চুম্বকের নিকটে সম্পূর্ণ আকর্ষণযোগ্য, সেইরূপ জীবসমূহ পরস্পর আকর্ষক ও আকর্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট হইলেও বিভূচিৎ কৃষ্ণের নিকটে আকর্ষণযোগ্য ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ (গীঃ ৯।১০)

বিভূচিৎ ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের চলচ্চিত্র-স্বরূপ একটি ছায়াশক্তিই এই মহামায়া । ‘ফিল্ম ওপারেটর’ যেরূপ খণ্ড খণ্ড অভিনয় ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-

গুলিকে ছায়াশক্তি-সংরক্ষণ-যন্ত্রে আকর্ষণ ও সংবদ্ধ করিয়া চলচ্চিত্রে পরিবেশন করেন, সেইরূপ কৃষ্ণও নিজাংশ বিষ্ণু-স্বরূপের ছায়াশক্তি দ্বারা জীবসমূহের দেহ ও মনকে কেন্দ্রীকরিয়া নিরন্তর বিভিন্ন আকর্ষণ-ধর্মের এই ছায়া-চলচ্চিত্র চালাইতেছেন। চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহে উন্মাদ পাগলের ব্যবহারগুলিকে মেধাবান জনগণ যেরূপ আদর করেন না, সেইরূপ ভগবৎপ্রণর আত্মস্থ ব্যক্তিগণ এই জগতের আগমাপায়ী শোক-দুঃখ-ভয়-সন্তপ্ত দেহাত্মবাদিগণের কোনও বুদ্ধির প্রশংসা করেন না। তাই তাঁহারা জলে-স্থলে, আকাশে-কাননে, প্রতি গৃহে-গৃহে সর্বত্র খণ্ড খণ্ড ছায়াচিত্র দর্শন করিয়াও তাহাতে মুগ্ধ হন না।

ব্যতিরেক শক্তি-সম্ভূত বস্তুগুলিতে আকর্ষণ-ধর্ম থাকিলেও ঐগুলিকে জীবের নিত্যাকর্ষক উপাশ্রয় বস্তু বলিয়া ধারণা করা উচিত নহে। কারণ, যে-আকর্ষণের পশ্চাতে শোক-দুঃখ-ভয়মুক্ত নিত্য-আনন্দের অভাব, সেই আকর্ষণে ক্ষতি স্বীকার ভিন্ন অণ্ড কোন উপায় নাই। তাই তাহা আত্যন্তিক মঙ্গল-আকাজক্ষীর নিকট স্বতঃই বর্জনীয়। অম্বয়-শক্তির পরিপূর্ণাধার পরমোপাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সকল বিচারই ভক্তগণের নিকট নিত্য-আনন্দপ্রদ।

এই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে গিয়া কোন কোন ঋষি নিজেদের যোগ্যতায় কোথাও কোথাও তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতির আবাহন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—ক্ষিতি, চন্দ্র, ভাস্কর, গ্রহ, তারকাদি পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ইহার অতীত যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তের মূল যিনি তাঁহার স্বরূপ ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত। কিন্তু ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি তাঁহার স্বরূপ-বাচক, ইহার অর্থ—বৃহত্তম বস্তু ; ‘বৃন্হ’ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিস্পন্ন—“বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম”। (বৃংহতি) যিনি বড় হন, এবং (বৃংহয়তি) যিনি বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে যিনি ব্রহ্ম শব্দবাচ্য, তিনি নিজে বড় হইয়া অপরকে বড় করেন। সুতরাং তিনি নিঃশক্তিক কিরূপে? ‘বৃংহয়তি’ অর্থে—ব্রহ্মের যে বড় করার শক্তি আছে তাহার সমর্থনে শ্রুতি বলেন,—“পরাস্ত্র শক্তিকির্বিধৈব শ্রয়তে” (শ্বেতাস্বতর ৬।৮)। তাঁহার অনন্ত শক্তি এই বিচারে, তিনি স্বরূপে ও শক্তিতে সকল বিষয়েই বড়। অতএব শ্রুতি বলিয়াছেন,—“অনন্তং ব্রহ্ম” ; যে-ব্রহ্ম স্বরূপে ও শক্তিতে এবং শক্তির বিকাশে পূর্ণতম, তাঁহাকেই ‘পরব্রহ্ম’ বলা যায়—

বৃহত্ত্বাদ্বংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। (বিষ্ণু পুঃ ১।১২।৩৫)

যে-স্বরূপের ন্যূনতম বিকাশ অর্থাৎ অসম্যক্ প্রতীতি, সাধারণতঃ তাঁহাকেই ‘ব্রহ্ম’ বলা যায়। ইনি স্বরূপে ব্রহ্ম হইলেও শক্তিতে ব্রহ্ম নহেন। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-

বাচক শব্দের ‘বৃংহতি’ অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘বৃংহতি’ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শৈবোক্ত স্বরূপ যে নিরাকার, তাহা সত্য; কারণ এই স্বরূপকে সম্পূর্ণ নিঃশক্তিকও বলা চলে না। কারণ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে অস্তিত্বময় ও আনন্দময় বলিয়াছেন। সুতরাং আনন্দ অনুভব করাইবার শক্তিও তাঁহার আছে। শক্তি আছে, তবে শক্তির বিকাশ নাই; তাই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক না বলিয়া অব্যক্ত-শক্তিক বলাই সম্ভব। যে-যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মই সেই সেই শ্রুতির লক্ষিতব্য বিষয়।

ব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মই আনন্দ বা রসস্বরূপ; “রসো বৈ সঃ” (তৈত্তিরীয়-২।৭)। বিষয় ও আশ্রয়-তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধহেতু বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই সামগ্রী-চতুষ্টয়ের মিলনে ‘রস’ হয় (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। রস শব্দের দুই প্রকার অর্থ—“রস্মতে ইতি রসঃ” ও “রসয়তি ইতি রসঃ”। অতএব রস-অর্থে আশ্বাদ্য এবং আশ্বাদক (রসিক) দুই-ই হয়। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম ব্যতীত, ব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের সকল স্বরূপই আনন্দরূপে আশ্বাদ্য। যে-সমস্ত স্বরূপে শক্তির বিকাশ আছে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য (নিখিল স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্বাবস্থায় চাক্রতা), রূপা (অহৈতুক-ভাবে পরদুঃখ দূরীকরণেচ্ছা), তেজঃ (কাল, মায়া প্রভৃতিরও অভিভবকারী প্রভাব), সর্বজ্ঞতা, ভক্ত-বাৎসল্য, ভক্তবশ্যতা প্রভৃতি গুণের বা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপকেই পূর্ণতম ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়। এই নিমিত্ত পরব্রহ্মই স্বয়ং ভগবান্ বা পূর্ণতম ভগবান্। তাঁহাতেই রস-স্বরূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি আছে; তাঁহাতেই পরিণত প্রণয়ের অশ্বাদন-চমৎকারিতার চরম পরিণতি। তিনিই আশ্বাদকরূপে নিত্যকাল রসিককেন্দ্র-চূড়ামণি।

আশ্রিত জনগণের প্রতি ষাঁহার প্রণয় পরিপূর্ণ, যিনি শোভাসমূহের পরম আশ্রয়-স্বরূপ, ষাঁহার প্রতি-অঙ্গের পরিচালনা ও শ্রীঅঙ্গ-বিজ্ঞাস লালিত্যপূর্ণ, যিনি প্রতি-মুহূর্ত্তেই নবনবায়মানভাবে রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য প্রভৃতি চতুষ্টয় অপ্রাকৃত গুণের স্বয়ং অখণ্ড রস-স্বরূপ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাতে মাধুর্য্যাসুধির আনন্দ-রূপ তরঙ্গমালা নিত্য-নবীনরূপে বিজগমান, তিনি শৃঙ্গাররসের অধিদেবতা ও নব-কিশোর, তাঁহার বদন—বংশী-গানের অমৃতধাম ও অমৃত-লাবণ্যের জন্মস্থান। কোটি কোটি সুধাংশু নিবাসী ষাঁহার বদন-চন্দ্র হইতে নিত্য প্রবাহিত, যিনি ভক্ত-হৃদয়-হ্রদে বিহারশীল নিত্য আনন্দ-সংপ্রব, যিনি সর্বৈশ্বরেশ্বর, সর্ব-শক্তিমান্ ও সর্বরসময় ভক্ত, তিনিই সর্বারাধ্য-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত (১৩।২) বলেন,—“কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্”—সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ । শ্রুতি বলেন,—

“স্বরূপং দ্বিবিধকৈব সগুণং নিগুণাত্মকম্” (গোপাল-তাপনী-৫) । অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম—নিগুণ, অগ্ন্যাগ্ন স্বরূপ—সগুণ । সগুণ হইলেও কোন প্রাকৃত গুণ ভগবৎ-স্বরূপে নাই । ভগবৎ-স্বরূপ দিব্য ও চিন্ময় গুণ-ভূষিত । শক্তি বা গুণের তারতম্যেই তাঁহার অংশ ও অংশীতে ভেদ । বাঁহাতে অল্প শক্তির বিকাশ তাঁহাকে বলে অংশ, আর বাঁহাতে সর্বশক্তির বিকাশ তাঁহাকে অংশী বলে । তাই শ্রীকৃষ্ণই অগ্ন্যাগ্ন স্বরূপের মূল-অংশী ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ।

পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ । (চঃ চঃ অঃ ২।৮, ৬৫)

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম ।

ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।২)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব । “অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে” (লঘু ভাগবতামৃত) । বাঁহার রূপ অণুর নিকট ধার করা নহে, তিনিই স্বয়ং-সিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ । তিনি এমন একটি বস্তু যে, তাঁহার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ আর কোনও বস্তু নাই । তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের দেহ-দেহী-ভেদও নাই । জীবের দেহ—জড় বস্তু, আর দেহী বা আত্মা—চিদ্বস্তু । এইজন্ত জীবের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে । দেহের ইন্দ্রিয়াদি জড় অচেতন, সুতরাং দর্শনাদি-শক্তিশূন্য । চেতন দেহীর শক্তিই জড় ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল হয় । ইন্দ্রিয়াদির গঠনে পঞ্চ-মহাভূতের মিশ্রণ-তারতম্য থাকায় দেহীর শক্তিসমূহ ইন্দ্রিয়ে সমানভাবে ক্রিয়া করে না । তাই জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না । চক্ষু কেবল দেখে কিন্তু শুনে না । কিন্তু ভগবান্ বিগ্রহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ না থাকায়, তাঁহার সমস্তই সচ্চিদানন্দ বলিয়া ঐরূপ পার্থক্য হয় না । ভগবানের যে-কোনও অঙ্গ, যে-কোন ইন্দ্রিয়েরই কাণ্ড করিতে পারে—“অঙ্গানি যশ্চ সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তীতি” (ব্রহ্ম-সংহিতা) ।

পুলিন-ভোজন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রমাণ দিয়াছেন । বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আছেন তাঁহারাও সকলে মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দিকেই চাহিয়া আছেন । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি রূপের

পূর্ণতম আধার হইলেও, মাধুর্য্য-রসেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যেরই অনুরাগ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি অণু-পরমাণু যেন মাধুর্য্য-রসে নিরন্তর স্নাত ; তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও অতি মধুর। তাহা অন্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভীতিপ্রদ বা গোরব-বুদ্ধিকারক নহে। এই অনির্কচনীয় মাধুর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি এত প্রবল যে, অণুর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার আশ্বাদন-লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।

কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৪৭)

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪৭)

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবই সর্বপ্রথম জন-সমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্বে ধর্ম্ম-প্রবর্তকগণ পরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যের দিকেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাই ভগবত্তার কথা শুনিলেই স্বভাবতঃ লোকের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মৃদু-মধুরহাস্যে জলদ-গম্ভীর-স্বরে বিশ্বাসীকে জানাইলেন,—ঐশ্বর্য্যই ভগবত্তার সার নহে, “মাধুর্য্যই” ভগবত্তার সার (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাই তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবগণের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপে লইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ-কীর্তন ও অনুশীলন করিলে আগাদের বুঝিবার সুযোগ হয়—“শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?”
—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী.

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

এবংসরও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি বিশেষ সমারোহের সহিত পালিত ও উদ্ঘাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, এমন কি, স্বদূর পাকিস্থান হইতে পথের নানারূপ ক্লেশ সহ করিয়াও ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভক্তগণ ও শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণ উৎসবে যোগদান করত ইহাকে সর্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি-আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত ১৯শে আষাঢ়, বুধবার—প্রহ্লাদ-মঙ্গলারাত্রিকান্তে ‘গুরুপরম্পরা’, ‘পঞ্চতত্ত্ব’ ও শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত ‘জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে’, ‘উদিল অরুণ পূরব ভাগে’ প্রভৃতি উষঃকীর্তন করা হয়। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠান্তে ‘হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ’ ও মহামন্ত্র কীর্তনমুখে তুলসী পরিক্রমা হয়। শ্রীমঠের দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী অনুযায়ী ইহা প্রাত্যহিক কৃত্য হইলেও, শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে অতঃ ইহা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে, মঠবাসী ও সমাগত ভক্তমণ্ডলী প্রসাদ সেবান্তে স্ব-স্ব সেবাকার্যে নিযুক্ত হন।

অপরাত্নে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বৈকালে ৫টার সময় সভার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, শ্রীল ঠাকুর স্নগন্ধি মাল্য-চন্দন-ভূষিত সুরহং অর্চ্চ্যালেখ্য-মূর্তিতে স্তম্ভজিত স্তূপে মণ্ডপোপরি বিরাজিত হন, এবং তখন সভার কাব্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে “গুরুপরম্পরা”, “শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্”, পঞ্চতত্ত্ব, “শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ”, “কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর”, “যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর” প্রভৃতি স্তব-স্তোত্র ও বিরহসূচক গীতি কীর্তিত হয়। পরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু দাসাধিকারী (শ্রীযুত কুমুদকান্ত ভৌমিক) মহোদয় অতি আবেগভরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্য জীবনী ও উপদেশাবলী বক্তৃতামুখে বর্ণন করেন। অতঃপর সভাপতি-মহারাজের আদেশে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব, শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও অন্ত্যতম সহঃ সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীপত্রিকার প্রকাশক মহোদয় পরপর বক্তৃতা প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম—“বিরহ-বাসরে বক্তৃতা”—শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল)। অতঃপর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজ, উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর প্রার্থনানুসারে কৃপাপূর্বক বক্তৃতামুখে বহু মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম—“সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা” শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্তনের পর সভা ভঙ্গ হয় এবং সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে সমাগত ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় চুঁচুড়া-সহরস্ব বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

বিরহ-বাসরে বক্তৃতা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে তদীয় কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ কল্যাণ-কল্পতরু দাসাধিকারী মহোদয় বক্তৃতামুখে বলেন—বর্তমান গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীল ঠাকুরের নিকট সর্বতোভাবে ঋণী। এযুগে যদি তিনি না আসিতেন, তবে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম যে কি বস্তু, তাহা বর্তমান শিক্ষিত-সমাজের কখনই অনুধাবনের বিষয় হইত না। কে গোস্বামীবর্গের সংস্কৃতভাষায় লিখিত ষট্‌সন্দর্ভের তাৎপর্য্য সহজ-সরলভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া আমাদেরকে জানাইতেন, কে স্মার্ত্ত-সহজিয়া-বান্ধ প্রভৃতি অপসিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়া বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেন, কেই বা বিশুদ্ধ নাম-প্রেম-প্রচার দ্বারা আমাদের ন্যায় বিষয়াক্রম মানবগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতেন? দুর্জ্ঞান-পরিকল্পিত ছন্দোবন্দ, সুসিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিরোধপূর্ণ রসাভাসদুষ্ট অগ্ন্যাগ্ন কল্পিত পদ বা ছড়া-গান পরিত্যাগ করিয়া “গোর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও”-বাক্যানুসারে উচ্চৈঃস্বরে একমাত্র ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাযুক্ত তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র কীর্ত্তনেই যে কলিজীব কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারে, তাহা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া তাঁহার লিখিত “শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি” ইত্যাদি গ্রন্থে ও “শ্রীনামহট্ট” প্রভৃতি বহুতর প্রবন্ধে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক ও তেজস্বী আচার্য্য জগতে অতি বিরল।

অতঃপর শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব মহোদয় বলেন—বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা অপ্রাকৃত বিধায় একই তৎপর্য্যপর। ইহা বন্ধজীবের বোধগম্য নহে। অপ্রাকৃত শব্দই—শব্দব্রহ্ম। তিনি মূর্ত্তিমান্, নির্বিশেষ নহেন। শব্দব্রহ্ম, মায়িক শব্দ ও শব্দীর ‘ন্যায় পৃথক্ বস্তু নন। অপ্রাকৃত নাম ও নামী একই বস্তু। সেই শ্রীনাম ও শ্রীনামীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, গৌরশক্তি-স্বরূপ ভক্তিবিনোদ-প্রকৃতি শ্রীগৌর-ধাম ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীগুরু-বর্গের আদেশ ও নির্দেশ।

শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃসম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় বলেন—জাগতিক বিচ্ছেদ দুঃখজনক, কিন্তু বৈষ্ণবগণের অপ্রকট-লীলা সেইরূপ দুঃখজনক নহে। তাঁহারা অপ্রকট-লীলা দ্বারাও জীবকে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে গমনের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুরকে জানিতে হইলে আরোহ-পন্থায় বা আধ্যাত্মিক বিচারে জানা যাইবে না। অবরোহ-পন্থায় শ্রীগুরুকৃপায় যাহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীল ঠাকুরকে অবগত

হইতে পারেন। সংসঙ্গশূন্য জড়বিজ্ঞা জীবের অধিকতর বন্ধনের কারণ। শ্রীল ঠাকুর এসম্বন্ধে বলিয়াছেন—“জড়বিজ্ঞা যত মায়াব বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা ॥” সুতরাং সংসঙ্গ অর্থাৎ শ্রীগুরুপদাশ্রয় ব্যতীত জীব কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞান-লাভে অসমর্থ।

অতঃপর শ্রীপত্রিকার প্রকাশক মহোদয় বলেন—ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান— এই তিনের সহিত পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায়, পরম-মুক্ত-পুরুষ ভগবন্নিজজন-গণের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহাদের সাক্ষাদ্ শ্রীমুখবাণী বা পুত জীবনী আলোচনায় জীবের জীবন ধন্য হয় এবং পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়—ইহা শাস্ত্র বহুস্থলে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৯।১০) “যা নিবৃত্তিতমুভূতাং তব পাদপদ্ম”—শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিরহ-মহোৎসব-পালনে কোন বাধা নাই; উক্ত উভয় তিথিতেই তাঁহাদের পুত চরিতাবলী আলোচনা—সাধকজীবের ভজনের সহায়, স্মারক, সৌভাগ্য-উদ্দীপক ও অঙ্গস্বরূপ।

অধম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ভগবান্ কখনও জীবে শক্তিসঞ্চারণ করিয়া, কখনও পার্শ্বদিশেষকে প্রেরণ করিয়া, কখনও নিজে অংশাবতার-রূপে, কদাচিত্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অধম্ম প্রশমন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পাদন করেন। স্বয়ং ভগবান্ সর্কারতারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, বহিরঙ্গ প্রয়োজন—নাম-প্রেম-প্রচারোদ্দেশ্যে কুতর্ক নিরাস, বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন, নিজে শাস্ত্রের যথাং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, শক্তিসঞ্চারে স্বীয় পার্শ্বদ রূপ-সনাতনাদি মহাজনগণে দ্বারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করাইয়া, গ্রন্থ লেখাইয়া, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া, নিজে আচার-প্রচার করিয়া অতুগত জনগণের দ্বারা আচার-প্রচার করাইয়া, বৈদিক নির্মল সর্বশাস্ত্রসম্মত অচিন্তা-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংস্থাপন করত জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর গৌড়ীয়-জগতে তিনটি অন্ধকারযুগ লক্ষ্য করা যায়। ষড়্গোশ্বামীর পর প্রথম অন্ধকারযুগে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি, দ্বিতীয় অন্ধকারযুগে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভু প্রভৃতি এবং অবশেষে তৃতীয় অন্ধকারযুগে বৈষ্ণবসার্কভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধা! সরস্বতী গোশ্বামীকে প্রেরণ করিয়া ভগবান্ বিগুহ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচা করাইলেন।

শ্রীল ঠাকুর যে-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি কত অপসম্প্রদায়, অশাস্ত্রীয় অতি ঘৃণিত যুক্তিবিরুদ্ধ আচরণকে ধর্ম বলিয়া প্রকাশ ও আদর করিতেছিল। অতীতকালে কর্মজড়-স্মার্ত গণ্ডিতগণ তুচ্ছ কর্মকাণ্ডকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া সমাজের নিরীহ সরল-বিশ্বাসী জনসাধারণকে বিপথে চালিত করিতেছিলেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা, অজ্ঞ কুলগুরুগণ, তথাকথিত আচার্যগণ, স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় অতিপ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতেছিলেন। কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ সত্যসন্মত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাসন-বিভাগীয় অতি জটিল দায়িত্বশীল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নানা যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্যসহ প্রবন্ধাদি লিখিয়া পূর্বোক্ত সকল মতবাদসমূহই খণ্ডন করেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম যে নেড়ানেড়ীর ধর্ম নহে, উহা যে জগতে সকল ধর্মের সার শ্রেষ্ঠতম নির্দোষ একমাত্র সনাতন ধর্ম, তাহা অনুধাবন ও নিজের জীবনে আচরণ করিয়া প্রচার করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সহজ-সরলভাবে সকলের বোধগম্য করিয়া সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া পারমার্থিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে বৈকুণ্ঠর কোমল-মণি অবিস্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে তিনিই সর্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত করিয়া পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবাচার্যের কার্য্য করিয়াছেন। অতীত বরহ-দিবসে তাঁহার ও তন্নিজজনগণের কৃপাকণাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

—প্রকাশক

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তৃপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-সভায় সমাগত শুশ্রূষু শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষভাবে অমুরুদ্ধ হইয়া অনুগ্রহপূর্বক জীব-মঙ্গলকর বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর রায় শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর এম্. এ, বি, এলু* মহোদয়ের, বিরহ-উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া,

*মাননীয় রায়বাহাদুর কমলাপ্রসাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তৃতীয় পুত্র এবং জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্তৃসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি বর্তমানে অবসর গ্রহণান্তে কলিকাতায় মাণিকতলা “ভক্তি-ভবনে” অবস্থান করিতেছেন।

প্রেরিত একখানি পত্র সভাস্থলে পাঠ করেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীগোজ্জ্বলচন্দ্রায় নমঃ

১৮১ নং, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট

পোঃ বিডন ষ্ট্রীট,

(কলিকাতা—৬)

সোমবার, ২রা জুলাই, ১৯৫১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণতি পুরসংর নিবেদনমেতং,—

আপনাদের কৃপা-আমন্ত্রণ-পত্র যথাকালে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং তজ্জগৎ বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ইং ৪ঠা জুলাই, ১৯৫১ হইতে একাদশ দিবস-ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং উহাতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করুন—শ্রীশ্রীভগবৎ-সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি।

বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত নানা ব্যাধিতে শরীর ও মন সুস্থ না থাকায় সময়ে যোগদান করিতে না পারিয়া, ত্রুটি মার্জনার জগৎ কৃপাভিক্ষা করিতেছি। শ্রীশ্রীভগবান্ এই উৎসব সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিয়া বিগুরু আনন্দ প্রদান করিবেন, আশা করি। ঐসব উৎসব সম্বন্ধে বিবরণ আপনাদের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এবং বিশদভাবে জানিতে পারিব।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের এই শুভ আয়োজন সকলকে বিপুল আনন্দ প্রদান করিয়াছে এবং এই কার্যের জগৎ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই অনুষ্ঠানসমূহ দ্বারা সকলেই ভক্তিলাভ করিবেন, সকলেই এই অভিলাষ করেন। এই সকল কার্য দ্বারা শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশ্রয়-পালনে প্রভূত কল্যাণ লাভ হইবে। লিপিদোষ মার্জনা করিতে প্রার্থনা। ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী বৈষ্ণব-দাসানুদাসাধম

শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত

অতঃপর দৈন্য-জ্ঞাপনমুখে স্বামিজী-মহারাজ বলেন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে মাননীয় শ্রীযুত কমলা বাবুর পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া ও শ্রীল ঠাকুরের অনুগৃহীত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ করিয়া আমরা অগ্নি নিজদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। শ্রীল ঠাকুরের

নিজজনগণের সেবা ও তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ লাভ করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই তাঁহার রূপা লাভে সমর্থ হইব। পরে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলন—প্রতিবৎসরই শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথি পালিত হয় এবং আপনাদিগকে ইহাতে যোগদানের জন্ত আহ্বান করিয়া থাকি। বিরহ-তিথি বা তিরোভাব-তিথি কাহাকে বলে, ইহার তাৎপর্য্য কি, কেন এইসকল তিথিগুলি পালিত হয়—এবিষয়ে আমরা পূর্ব পূর্ব বৎসরে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মহাপুরুষগণের জীবনীই এক একখানি ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ। কারণ সাধু-শাস্ত্র গুরুবাক্যের অনুবর্তন করিয়াই তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সেজন্ত মহাপুরুষগণের পুত চরিতাবলী ও জীবনী আলোচনার ম্য দিয়াই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় এবং ইহা দ্বারাই আমাদের কল্যাণ অবশ্যস্তাবী। কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ বা ভাগবত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে তাহা মায়িক হইয়া যাইবে। “অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর।” এজন্ত ভজনবিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ভগবন্নিজজনগণের আনুগত্য ব্যতিরেক বেদ-বেদান্ত ধর্মশাস্ত্রাদি ও মহাপুরুষ-চরিতাদি আলোচনা করিতে গেলে তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া অনেকে বিপথগামী হন। মাননীয় রাজেন-বাবুর লিখিত “শঙ্কর ও রামানুজ-চরিত”কে প্রকৃত জীবনী বলা যায় না। কারণ আনুগত্যশূন্য অকজ-বিচারের বহুমানন করিয়া, আচার্য্য রামানুজ ও শঙ্করের তত্ত্ব সমাক্রূপে অবগত না হইয়া ও নিরপেক্ষ বিচার অবলম্বন না করিয়াই সরলতা-বিবজ্জিত বিবেচনায় তিহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শঙ্করই শঙ্কর, রামানুজই রামানুজ।

সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণের স্বরূপের পরিচয় রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠ-পুরুষের স্বরূপের পরিচয়—“মঞ্জরী” ইত্যাদি মায়িক স্ত্রী-পুরুষের কাম্য নহে। ভজনের অপকাবেস্থায় ঐরূপ ভাণ করিতে গেলেই পতন অবশ্যস্তাবী। প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ-বস্তু—অন্ধকার ও আলোর ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ-বস্তু এক হইত, তবে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব লইয়া আসিতে পারিতেন না। বৈকুণ্ঠ-বিচার—একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী-ভাব যুগপৎ সত্য। একই শ্রীল রূপগোষ্ঠামী, কৃষ্ণলীলায় স্ত্রী ও পুরুষরূপে অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের বাহ্যে পুরুষ-বেশ লক্ষ্য করা গেলেও, স্বরূপতঃ তাঁহার স্ত্রী-বেশ। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব, মায়িক-তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ।

প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী ব্রাহ্মের পৌত্তলিকতাবাদ ও তাঁহাদের কথিত বিগ্রহ-বিচার খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে অনেক বিচার প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, আধ্যাত্মজী ও কালাপাহাড়েয় সৃষ্ট দ্রব্য কখনও শ্রীবিগ্রহ নহেন—শ্রীবিগ্রহ তথা হইতে অন্তর্হিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবৎতত্ত্ব—মায়াবাদী বা আধ্যাত্মিকগণের কখনই অনুভবের বিষয় নহেন। শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব-আলোচনায় সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গই আমাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তিকে আমরা প্রাকৃত বুদ্ধি না করি, তন্নিরাস-কল্পে স্বয়ং ভগবানই তাঁহার ভক্ত ছোটবিগ্রহকে দিয়া নিজ-তত্ত্ব বলাইয়াছেন—“প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী।” “প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন”। সুতরাং পৌত্তলিকতা ও শ্রীমূর্তিবাদ বা বিগ্রহতত্ত্ব এক নহে। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য তাঁহার প্রকটকালেই তদীয়ৈকপ্রাণ একান্ত বিশ্রান্ত সেবকের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে যে নিজ শ্রীমূর্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই শ্রীমূর্তিই উক্ত শিষ্যের সহিত আলাপ-আলোচনাদ্বারা তাহার সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা ও সংশয় ছেদন করিয়া দিতেন। এখানে দেখা যাইতেছে, উক্ত শ্রীমূর্তি রামানুজাচার্য্য হইতে কোনমতে ভিন্ন নহে। নবদ্বীপ-মণ্ডলের স্বরূপগঞ্জস্থিত “স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ” শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনাদের যে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাঁহার নিত্যদেহ ও তাঁহা হইতে অভিন্ন। বৈষ্ণবগণ অনিত্য ধ্বংসশীল কোন বস্তুর পূজা করেন না। সুতরাং শ্রীল ঠাকুরের যে-শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন তাহা সাধকগণের পক্ষে পুরুষ-দেহরূপে দৃষ্ট হইলেও, সাক্ষীগণের পক্ষে—স্ত্রী-দেহে তিনি “কমল-মঞ্জরী”। অতএব শ্রীভক্তিবিনাদ ও কমল-মঞ্জরী একই বস্তু।

মহাপুরুষগণের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বা জীবনী আলোচনাতেই তাঁহাদের সৃষ্ট পরিচয় লাভ হয় না। সৃষ্ট দর্শন করিতে হইলে তাঁহাদের স্বরূপের পরিচয় জানা আবশ্যক। সুতরাং অণু আমরা ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কোন্ জীবনী আলোচনা করিব, চিন্তার বিষয় হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর সিদ্ধ-পরিচয়ে তাঁহার যে নাম, ধাম, সেবা ও ক্রিয়াকলাপাদির কথা জানাইয়াছেন, তাহাই একপক্ষ তাঁহার প্রকৃত জীবনী। ইহাই কি আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে না? অপরপক্ষে যাহা জীবনী, তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি এবং আপনারাও তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। বর্তমানে সেই জীবনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার উভয় জীবনীই আমাদের আদর্শ হউক।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের আয় এবারও শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২০শে আষাঢ় হইতে ২৯শে আষাঢ় পর্যন্ত দশদিবস-ব্যাপী এই মহদুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ভক্ত নরনারী যোগদান করিয়া পারমার্থিক কল্যাণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। দেশের সর্বত্রই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্মূল্য ও দুপ্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও, মঠের কর্তৃপক্ষগণ সর্বসাধারণকে ধর্মজীবন-যাপনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত এই দুবৎসরেও উৎসবে যোগদানকারী যাত্রিগণের দুইবেলা প্রসাদ ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে পূর্বপ্রকাশিত “দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা” অনুযায়ী প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, নগর-সঙ্কীর্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও মহোৎসবাদি বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবকালে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য ও সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রদান কেশব মহারাজের দার্শনিক বিচারসম্বলিত সুযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা ও শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ, সহঃসম্পাদক—শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয়-প্রদত্ত ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাাদি শ্রবণে যাত্রিগণ পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ আনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সুললিত কীর্তনাদিতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। মহরের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উৎসবকালীন পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতাাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া সমিতির প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

২০শ আষাঢ়—গুণ্ডিচা মার্জ্জন-উপলক্ষে ভক্তগণ নগর-সঙ্কীর্তনযোগে গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমনপূর্বক শ্রীমন্দিরাদি মার্জ্জন করেন। এখানে সভাপতি-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসন্ন্যাসপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া যাত্রিগণকে বহু উপদেশ প্রদান করেন।

২১শ আষাঢ়—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-দিবসে অর্চাবতার শ্রীজগবন্ধু সুজজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়িতে শুভগমন-কালে অগণিত নরনারী অকাতরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করেন। সমিতির সন্ন্যাসী,

ব্রহ্মচারিগণ মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি করিতে থাকেন। দর্শক জনসাধারণ সঙ্কীর্ণনের রোলে মুগ্ধ হইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত রথরজ্জু আকর্ষণ করত “জয় জগন্নাথ” শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন। শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচাবাড়ীতে পৌঁছিলে তাঁহার ভোগরাগ ও আরাট্রিক সম্পন্ন হয়।

২৫শে আষাঢ়—হেরাপঞ্চমী-দিবসে ভক্তগণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর বিজয়-উৎসব দর্শন করেন। অতঃ গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে হেরাপঞ্চমী-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্তনাদি হয়।

২৯শে আষাঢ়—পুনর্ষাত্রা-দিবসে অপরাহ্নে গুণ্ডিচামন্দির হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করেন। পথিমধ্যে তিনি ভক্তগণের প্রদত্ত বিবিধ ভোগসামগ্রী ও পুষ্প-মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেবা-স্বযোগ প্রদান করেন। অতঃ সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পাঠ-কীর্তনাদি সমাপ্ত হইলে, আহুত, অনাহুত জনসাধারণকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; আশ্বিন—১৩৫৮

১২ পদ্বিনাভ, ১০ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী অহোরাত্র। ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

১৩ পদ্বিনাভ, ১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৫।৪৬। দি ৫।৪৬ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।

২২ পদ্বিনাভ, ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, রবিবার—গৌর-সপ্তমী রা ৭।৪১। শ্রীদুর্গাপূজা।

২৫ পদ্বিনাভ, ২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর, বুধবার—গৌর-দশমী (বিজয়া-দশমী) দি ১২।৩৯। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীল মধ্বাচার্য্য-পাদের আবির্ভাব।

২৬ পদ্বিনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৩৫। পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।

২৭ পদ্বিনাভ, ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৪৭। দি ৮।৪৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে উর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

৩০ পদ্বিনাভ, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর, সোমবার—পূর্ণিমা দি ৫।৪০। শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা। শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব। পৌর্ণ-মাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপৌরানো ভরতঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূত্বেকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ } কারগোদশায়ী, ৩ দামোদর, ৪৬৫ গৌরাক্ষ
বৃহস্পতিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৫৮; ইং ১৮।২০।৫১ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাক্ষকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ-ফুল-হৃদয়বী-

কদম্বক-করশ্চিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জাসুরা ।

কলিন্দগিরিনন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা

সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥

বিকুণ্ঠপুর-সংশয়াদিপিনতোহপি নিঃশ্রেয়সাৎ

সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী বস-শ্রেয়সীম্ ।

চতুর্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তর্গ-দেহোদ্ভবা
জগদগুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

অনারত-বিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জ-পুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদগম-রমা-চমৎকারিণী ।
অমন্দ-মকরন্দভূষিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতি-ঘন শ্রিয়োব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্লভিরলঙ্কতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী-শিখর-কেলিচর্যোচিঁতৈ-
বৃতা-কিশলয়াকুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী-শুভতরাধিকার-ত্রিস্যা-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্মুরিত-জঙ্গম-স্বাবরা ।
প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিত-বংশিকা-কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

অমন্দ-মুদিরাববুদাত্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্রহৃত-বীক্ষণোন্নতি-নীলকণ্ঠোৎকরা ।
দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণ-নাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্বিকা-
মনোজ-রূপ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জপুষ্পোজ্জ্বলা ।
জপত্রয়-কলাগুরোল্ললিতলাস্য-বল্লৎপদ-
প্রয়োগবিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥

বসিষ্ঠ-হরিদাসত্ন-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনো
মধুদ্রহবধু-চমৎকৃতিনিবাস-রাসস্থলা ।
অগুঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-নিষ্কটাবলিবরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
 গুণস্বরণকারি যঃ পঠতি সৃষ্ট পদ্যষ্টকম্ ।
 বসন্ ব্যসন-মুক্তধীরনিশমত্র সদাসনঃ
 স পীতবসনে বশীরতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচর্চকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রব-শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-কর্তৃক যাহার কদম্বাদি
 কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দ-
 সঞ্চালক-সমীরণদ্বারা যাহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ
 বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

বৈকুণ্ঠপুর হইতেও অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নিঃশ্রেয়স হইতেও সহস্রগুণিত শ্রেয়
 (দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রস-সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, জগদ্গুরু
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণ-গুল্ম-লতাদিরূপ (হীন) জন্ম প্রার্থনা করেন,
 সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥

যিনি নিয়ত-পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিশ্বাস
 সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণে ভ্রমণকারী
 সমস্ত ভ্রমরবৃন্দও যাহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা
 হউন ॥ ৩ ॥

যাহার সমূহ অবয়ব—সৌদামিনী ও ওলধরের আশ্রয় সম্বলিত বৃন্দাবনের
 নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাকুণাদি-চিহ্নিত পদ-
 পঙ্ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখরশ্রেণীর অনুকারী
 কিশলয় ও অক্ষুরদ্বারাও যিনি পরিবৃত্তা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া
 হউন ॥ ৪ ॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজ-দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ
 আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্ত বৃন্দা-সখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম (বৃক্ষ-মনুষ্যাदि)
 উভয়বিধ প্রাণিদ্বিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি ঈশদেবের
 অমৃত শ্রীকৃষ্ণ-বাদিত বংশীকাকলী-রসে মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে,
 সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৫ ॥

ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের গ্রাম কান্তি দর্শনপূর্বক যে-স্থানে
কৌতূহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্যাসুহৃদ্ বৃষভানুরাজ-নন্দিনী
শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ “এই বৃন্দাটবী আমার”—এই প্রীতিসূচক বাক্যে
লভা, এবং মৃগ, পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী
আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণগ্রাম-সম্পন্না শ্রীরাধিকার মনোজ-রগ-চাতুরীকে বাহার কুণ্ডসকল
সুচিত করিতেছে এবং যিনি ত্রিভুবনের প্রধান কলা-কৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের
নৃত্য-কার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা
হউন ॥ ৭ ॥

জনহুলভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস
করিতেছেন, এবং মধুসূদন-বধু গোপাঙ্গনাদিগের চমৎকারকারী রাসমণ্ডল
যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে, সেই অপ্রকট-কাননশোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের
মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জলকান্তি বৃন্দাটবী স্বাভাবতঃ আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৮ ॥

নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাটবী-গুণ-স্বরণকারী এই পঢ়াঅক মনোহর অষ্টক যিনি
সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, তিনি সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্বশুভ-কামনা
সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ লঙ্কানুরাগপূর্বক স্তব্ধ বিহার করেন ॥ ৯ ॥

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পুরাকালে শুভ ও নিশুভ-নামক অসুর-যুগল ত্রিভুবন এবং দেবগণের
যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া নগরাজ
হিমালয়ে গমনপূর্বক বিষ্ণুমায়া দুর্গার স্তব করেন।—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।

খ্যাতৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শক্তিভা ।

নমস্তুৈ নমস্তুৈ নমস্তুৈ নমো নমঃ ॥

এই কথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সপ্তশতীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দেবগণের
যে স্তবে অধিকার, অপেক্ষাকৃত হীনবীৰ্য্য মানবের সেই পূজার স্তবাদিতেও

অধিকার। আৰ্য্যাবৰ্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে উভয় স্থানেই বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল পৰ্ব্বাপেক্ষা বড় পৰ্ব্ব।

বদ্ধাবস্থায় জীব কামনানুরূপ ফলভোগী ; কিন্তু জীবাত্মা

তাদৃশ ফলভোগী নহেন

ভগবদ্বিমুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কামনার আবাহন করেন। লৌকিক কামনা করিয়া দেবীর নিকট হইতে যে ফল লাভ করেন, তাহাই বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিद्वয়ে ভোগ করেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা তাদৃশ কোন ফলভোগী হন না।

বিবিধ উপাসকের বিবিধ ফল, এবং মায়ার হাত
হইতে উদ্ধারের পথ

সপ্তশতী ভগবদ্গীতা বলেন :—

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ (গী: ৯।২৫)

বিষ্ণুসেবা পরিহারপূর্ব্বক ষাঁহারা বিষ্ণুমায়ী-সেবা-নিরত জন, তাঁহারা কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অসমর্থ। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, বিষ্ণুমায়ী-গঠিত দেবাদির পূজা করিয়া দেবলোক, পূর্ব্ব-পুরুষের পূজার পিতৃলোক এবং ভূতপূজা-প্রভাবে ভূতলোক লাভ করেন। গীতা আরও বলেন :—

দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়ী দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গী: ৭।১৪)

বিষ্ণুমায়ী বদ্ধজীবের পক্ষে দুস্পারা। বদ্ধজীবের গুণাত্মক অভিমান প্রবল হইলে তিনি আর তখন আপনাকে বৈষ্ণব জানিতে সমর্থ হন না ; আবার ভগবানে প্রপত্তি-বিশিষ্ট হইলেই মায়ী হইতে উত্তীর্ণ হন।

কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা অবৈধ

গীতা বলেন :—

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ (গী: ৯।২৩)

অন্য দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত অভেদ-বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিলেও তাদৃশ বিষ্ণুপূজা অবৈধ মাত্র ।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী ও অন্যান্য দেবীর তত্ত্ব-নিরূপণ

গৌতমীয় কল্পে ভগবানের সহিত দুর্গার এবম্বিধ অভেদোক্তি দেখা যায় :—

“যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা শ্রাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ । সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেহস্মিন্ লোকে মন্তরক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাশ্রক-দুর্গায়া দাসী তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী ।”

মায়াংশরূপা দুর্গা প্রাকৃত-রাজ্যে চিচ্ছক্ত্যাশ্রক-দুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া মন্তরক্ষা-লক্ষণ-সেবোদ্দেশে দাসীস্বরূপে নিযুক্তা ।

ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিশ্বকসেনাদির দ্বারা ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক । সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়া-শক্ত্যাশ্রক গণেশ-দুর্গাদির দ্বারা নহেন । তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাশ্রক ।

বিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা দেবদেবীর পূজা ও পিতৃতর্পণ বিধেয়
বিষ্ণুযামলে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুপাদোদকে নৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতাস্তরম্ ॥

বিষ্ণুকে পূর্বে অন্ন নিবেদন করিয়া, পরিশেষে সেই নিবেদিতান্নের দ্বারাই বিষ্ণুভক্তজ্ঞানে দুর্গ-গণেশাদির পূজা বিহিত ।

অনন্তশরণ বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারাই অপরাপর দেবতার পূজা করিবেন ;
বিষ্ণুর চরণামৃত দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণাদি বৈষ্ণবের বিহিত ।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে ।

হরিসেব.মুকুলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই হরিসেবার প্রতিকূলে কোন লৌকিক বা বৈদিক
অমুষ্ঠান করেন না ; যাহা কিছু করেন, তদ্বারাই হরিসেবা করিয়া থাকেন ।

বিষ্ণুপূজায় সর্বদেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা হয়

ভগবানের সেবা হইলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়, সকল পিতৃলোকের
তর্পণ হয় ।—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বকুজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(ভাঃ ৪।৩।১৪)

যে রূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের স্বক, ভুজ ও উপশাখা, ডালগালা, ফুল, ফল সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং যে রূপ প্রাণোপহার হইতেই সর্বেশ্বরের পরিতৃপ্তি, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা করিলেই সর্বদেবতার পূজা সিদ্ধ হয়। যিনি স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিষ্ণুর অবশেষ দ্বারা পূজা করিতে পারেন। তব সেখানেও ভোগাদির কামনা বর্জনীয়। ভগবানের অর্চন করিয়া যিনি ভগবন্তের পূজা করেন না, তিনি ভক্তির অভাবে দাস্তিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

বৈকুণ্ঠের দুর্গা-গণেশাদি বিষ্ণুর আবরণ-দেবতাগণ এবং তাঁহাদের পূজা-বিধি

পদ্মপুরাণে মায়ায় অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে :—

সত্য্যচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিশ্বক্সেন-গজাননাঃ ।

শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥

ঐশ্রপাবক যাম্যানি নৈঋতং বারুণং তথা ।

বায়বাং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥

সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব বিশ্বৈ দেবাস্তথৈব চ ।

নিত্যাঃ সর্বে পরে ধ্যানি যে চাত্তে চ দিবৌকসঃ ।

তে বৈ প্রাকৃতলোকেহস্মিন্ ন নিত্যাস্তিদশেশ্বরঃ ॥

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিশ্বক্সেনং গুরুন্ শূরান্ ।

স্বৈ স্বৈ স্থানে স্থভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥

[সত্য, অচ্যুত, দুর্গা, বিশ্বক্সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি,— এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুনিগণ পূর্কদিক্ অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ নৈঋতকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ এবং উত্তরদিক্ ঈশানকোণকে সপ্তম আবরণ বলিয়াছেন। সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরম-ধামে অগ্ৰাণ্ড যে-সকল নিত্য দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মায়িক স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিশ্বক্সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে ভগবৎসেবক-জ্ঞানে নিজ নিজস্থানে অভিষেকাদি দ্বারা পূজা করিবে।]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করিবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণু-নির্মাল্যদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে :—

অর্চয়িত্ব জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্ ।

তদাবরণসংস্থানং দেবশ্চ পরিতোষ্ঠয়েৎ ॥

হরেভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিষ্কিপেৎ ।

হোমকৈব প্রকুবীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥

ভগবৎপীঠাবরণ-দেবতা-মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, স্তবরাং ভূতাদির পূজা করিবে না । মদ্য-মাংস দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ :—

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা ।

দিবৌকসাং পূজনন্তু সুরাপান-সমং শ্বতম্ ॥ (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৩) প্রজন্ম

‘প্রজন্ম’ কাহাকে বলে, এবং তাহা ভক্তিবিরোধী

পরম্পর কথোপকথনের নাম জন্ম বা ‘প্রজন্ম’ । জগতে সম্প্রতি বহিমুখতা এত প্রবল যে, অগ্নোর সহিত জন্ম করিতে গেলেই প্রায় বহিমুখ-জন্ম হইয়া পড়ে । স্তবরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জন্ম শ্রেয়স্কর নয় ।

ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জন্ম হইতে পারে । সে-সমুদয় ভক্ত-দিগের পক্ষে মঙ্গলজনক । শ্রীরূপ স্বয়ং স্বীয় ‘কার্পণ্য-পঞ্জিকা’-স্তোত্রে লিখিয়াছেন—

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশো নাম-জন্মিনি ।

অবদ্যবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্ ॥ (কাঃ পঃ ১৬)

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পট্টা পাঠ করিয়া থাকেন—

তথাপি এ দীন-জনে,

যদি নাম-উচ্চারণে,

নামাভাস করিল জীবনে ।

সর্বদোষ-নিবারণ,

দুহঁ-নাম-সংজ্ঞন,

প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥

কীর্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ—এ সমস্তই জন্ম ; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবে সহিত অন্ত-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে ।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজ্ঞাই ভক্তি-বিরোধী । সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ করিবেন ।

মহাজনানুগত প্রজ্ঞা আদরণীয়

মহাজনের কাণ্ডে দোষ নাই । মহাজনগণ যে-সমস্ত প্রজ্ঞা আদরপূর্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আমাদের কর্তব্য । কোন কোন অতিভক্ত পুরুষ সর্বপ্রকার প্রজ্ঞা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন । কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণানুগ, রূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুগণের পথানুগমনে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিব । যথা—

স যুগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতাঃ ।

অনবাপ্তশ্রমঃ পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

(ভ : র : সি : ধৃত স্বানন্দ-বচন)

যে-পথে পূর্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপবর্জিত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্বদা আমাদের অবশ্যগত ।

ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্শ্বদবর্গ যে-পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা । সে-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই । সমস্ত মহাজনগণ হরিভক্তি-সাধক প্রজ্ঞাকে আদর করিয়াছেন । তাহা আমরা স্থলবিশেষে বিচার করিব ।

প্রজ্ঞার প্রকার-ভেদ ও তন্মধ্যে (১) বৃথাগম

বহিষ্কৃত প্রজ্ঞাই ভক্তি-বাধক । তাহা বহুবিধ । (১) বৃথাগম, (২) বিতর্ক, (৩) পরচর্চা, (৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জ্ঞানা, (৭) সাধু-নিন্দা, (৮) গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই ‘প্রজ্ঞা’ ।

(১) বৃথা-গম অতীব অহিতকর । ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন । গীতা বলিয়াছেন—

অহং সর্বশু প্রভবো মন্তঃ সর্বঃ প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তুচ মাং নিত্যং তুষষ্টি চ রমাস্তু চ ॥ (গী. ১০।৮-৯)

অন্যত্র :—

সততঃ কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গীঃ ৯।১৪)

এইরূপভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্ত-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহিষ্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্বদা আমার নাম কীর্তন করিবে'—এই উপদেশ পালন করা হয় না। সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য। তবে কোন বিশুদ্ধভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য-লোকেরা আহা-রাদি করিয়া প্রায়ই ধূমপান করিতে করিতে অথ বহিষ্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপান্তর হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরাণনোপাখ্যানের দ্বারা উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

(২) বিতর্ক প্রজন্মের অন্তর্গত

(২) বিতর্ক একটি ভক্তিবাধক প্রজন্ম। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তাত্ত্বিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহিষ্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্য-বুদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ (কঠ—১।২।৯) বলিয়াছেন যে—“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”। জীবের স্মৃতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎ-পাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয় ; কিন্তু দিক, দেশ, ভ্রম, প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কক্শ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে দশমূল উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করত তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এইরূপ বিতর্ক বোদ্ধানুগত হইলে তাহা আর প্রজন্ম হয় না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—“অতএব ভাগবত করহ বিচার” (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)।

সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজন্ম নয়। বৃথা-তর্ক করিয়া যাহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না ; সুতরাং তাত্ত্বিকের সঙ্গত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন—

তাত্ত্বিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।

সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ’, ‘হরি’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩)

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারানসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটি স্মরণ করেন—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ ।

কাঁহা মুঞি পা'ব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২)

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ ; হয় দোষ, নয় বিষয়াত্মরাগ ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে । কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন । ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক হইয়া না পড়ে—এ-বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিবেন ।

(৩) পরচর্চা—প্রজ্ঞার অন্যতম

(৩) অকারণ পরচর্চা অতীব ভক্তি-বিরোধী । অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্ত পরচর্চা করিয়া থাকেন । কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অতের প্রতি বিদ্রোহপূর্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চা করেন । এইসকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না । পরচর্চা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্তব্য । কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে ; তাহা পরচর্চা হইলেও দোষের হয় না । সম্পূর্ণরূপে পরচর্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বন-বাসই প্রয়োজন । ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বিবিধ । গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদগম না থাকায় তিনি পরচর্চা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন । কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্ব-ভরণ-নশ্বক্কে পরচর্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না । তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতিই একমাত্র সত্বপায় । বিষয়-কার্য্যসমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধী হইলে, তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয় । পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এইরূপ পরচর্চা তিনি করিবেন না । তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন । অকারণ পরচর্চা করিবেন না । আবার শুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্ত উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চা না করিলে উপদেশ ফুট হয় না । পূর্ব মহাজনগণ যখন যেরূপ পরচর্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই । যথা, শ্রীশুকদেব-বচন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্ৰং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।

দিবা চার্ধেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

দেহাপত্য-কলত্রাদিষা অসৈন্তোষসংস্রপি ।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশুমপি ন পশ্যতি ॥ (ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্ ! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিকাল যাপন করে । দিবসে তাহারা অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুম্ব-ভরণে কাল নষ্ট করে । দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজজন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না । শুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়াদিগের চর্চা করিয়াও প্রজন্মী হন নাই । সুতরাং এরূপ কার্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য শ্রী শিষ্যদিগকে অসদ্বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—“বৈরাগী করে ‘প্রকৃতি’-সন্তোষণ ।

দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।

ইন্দ্রিয় চরাঞা বলে প্রকৃতি সন্তোষিয়া ॥”

প্রভু কহে,—“মোর বশ নহে মোর মন ।

‘প্রকৃতি’-সন্তোষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥”

(চঃ চঃ অ ২।১১৭, ১২০, ১২৪)

উপদেশ-স্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিভের মঙ্গল হয় না । সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের বিরূপে মঙ্গল হইবে ? কোন সম্প্রদায় বা সাধারণে প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তি-বিরোধী প্রজন্ম বলা যায় না । কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না । ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণরাজা-সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন—

ইখং বিপর্যয়মতিঃ পাপীয়া নুৎপথং গতঃ ।

অমুনীয়মানস্তদ্যাক্ষাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥ (ভাঃ ৪।১৪।২৯)

বিপর্যয়-মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অমুনয়েও তাহাদের যাক্ষা পরিপূরণ করিল না, যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল । শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চার আবশ্যক হইয়াছিল । অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন ; ইহাতে প্রসঙ্গ হয়—না । ভক্তি-সাধকদিগের ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সহজে আলোচিত হয় । তাহাতে অসাধু-দিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে-স্থানে দেখা যাইতেছে । তাহা সর্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির সমুদায় । ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ব অথবা প্রতিহিংসা ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তি দ্বারা

পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তি-দেবীর নিকট অপরাধী ।

(৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা,

(৮) গ্রাম্যকথা—প্রজ্ঞার মধ্যে পরিগণিত

(৪) বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে-উৎপন্ন হয় । তাহা নিতান্ত হেয় ।

(৫) পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কু প্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে । তাহা

সর্বতোভাবে ত্যাজ্য । (৬) মিথ্যা-জল্পনা কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর ।

(৮) গ্রাম্যকথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, গৃহী

বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য । পুরাবৃত্ত, পশু-বিবরণ

জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহিস্মৃৎ-হইলে দূরে পরিহার্য্য । শ্রীশুকদেব

বলিয়াছেন—

মৃষা গিরস্তা হৃসতীরসং-কথা, ন কথ্যতে যন্তুগবানধোক্ষজঃ ।

তদের সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমঃশ্লোক-যশোহনুগীযতে ॥

(ভাঃ ১২।১২।৪২-৫০)

হে রাজন্ ! যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই

কথা মিথ্যা ও অসতী । যাহাতে ভগবদ্-গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য ;

তাহাই মঙ্গল-স্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র । যে-কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশঃ

অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব । তাহাই মানবগণের

শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ ।

সাধুনিন্দা—অমঙ্গলজনক প্রজ্ঞা

৭) সাধুনিন্দা-রূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক । যদি কেহ হরিভক্তি

পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে,—“আমি এ

জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না ।” ভগবদ্রক্তগণই সাধু । তাঁহাদের

নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয় । পরম-পাণ্ডব শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া

তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটয়াছিল । যথা, দশমে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্যং লোকমাশিষ এব চ ।

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

(ভাঃ ১০।৪।৪৬)

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্যাদ-বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম, পরকাল-গতি শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

প্রবন্ধের নির্যাস বা উপদেশ-সার

এই প্রবন্ধের নির্যাস এই যে,—ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত প্রজন্মই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহুযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে ‘বাচো বেগং’ অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগমাত্র। প্রজন্ম-পরিত্যাগ-দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন-নিরূপে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য-ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেইসমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ উক্তবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন—

পর-স্বভাব-কথ্যানি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।

স আশু ব্রশতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৮ ২)

যিনি পরের স্বভাব ও কর্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ব্রষ্ট হন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সঙ্কনতোষণী ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬০ পৃষ্ঠায় ১৮শ পঙ্ক্তিতে “সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক” স্থলে “সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক” হইবে এবং ২৭৭ পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্ক্তিতে “অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর।” স্থলে “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।” হইবে।

শ্রী শ্রীমদ্ দীনদয়াল প্রভুর অপ্রকটে

অনুতাপ-গীতি

হে দীনদয়াল প্রভো, গোকুল-গোয়াল !

সেবা-রঘুলাল, ওহে শ্রীগুরু-দুলাল !

নিদারুণ শ্রাবণের, বরষণ শ্রাবণের,

হায় হায় ! কি শ্রবণ শুনিবু হে কাল !

ছাড়িয়া যাইলে তুমি এ ভুবন-জাল ॥ ১ ॥

শুন শুন হে দয়াল, সেবা-মতিলাল !

ভুলি' মোরে থেকো নাহে আর ক্ষণকাল ।

একসাথে এসেছিঁ, একসাথে পেয়েছিঁ,

ভকতি-সিদ্ধান্ত-সার শ্রীগুরু বিশাল ।

প্রভুপাদ সরস্বতী মোদের ভূপাল ॥ ২ ॥

হে দীনদয়াল প্রভো ! আমি ত' কাঙ্গাল ।

নিজ-দোষে বাঁধা সদা খাইয়া মাকাল ।

জানিয়াও ছেড়ে তবে, কেন প্রভু-জিত এবে,

টেনে নাও হে রাখাল, করুণা-কয়াল !

আর নাহি সহে দুঃখ যাতনা করাল ॥ ৩ ॥

হে দীনদয়াল প্রভো, প্রেম-মাতোয়াল !

কেন চলে গেলে দূরে ছাড়ি' এ বেতাল ?

প্রভুপাদ-তিরোভাবে, যে আঁধার দেখি তবে,

এইমত সকলে হে হইলে আড়াল !

গোড়ীয়-সাধন-তরী' কে রাখিবে হাল ?? ৪ ॥

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

কালদৃষ্ট এইপ্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্মের স্মৃষ্টি-পালন আদৌ সম্ভবপর নহে। বাহ্য কিছু বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামে চলিতেছে, তাহাও আত্মরিক ধর্মের আর একটি সংস্করণ মাত্র। সেইপ্রকার আত্মরিক বর্ণাশ্রম যাজন করত তথাকথিত স্মৃতি-সংস্কারে উপবীত ধারণ করিয়া কোনই লাভ নাই বা স্মৃতির সন্তাবনা নাই। সকল সংস্কার পরিত্যাগ করত সমাজে ‘হাম্ বড়া’ হইবার জন্য কলিহত জীবের “বিপ্রত্বম্ স্মৃত্যেব হি” ভবিষ্যৎপালন করিয়া কোনপ্রকার স্মৃতি অর্জন করিবার সুবিধা নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এইপ্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্মকেই বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেজন্ত গীতায় বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিশেষ আলোচনা না করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্মের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। স্মৃতরাং যজ্ঞার্থে কর্ম করিলেই বিষ্ণুপ্ৰীতি হইবে এবং তাহাতেই সমস্ত ক্লেশের শুভদ ফল নিহিত আছে, জানিতে হইবে।

যাহারা রোগ-শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত, তাঁহারা এই আর্ত বলিয়া পরিচিত। সাধারণভাবে সকল লোকই ঔষধ-বৈদ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ-শোকাদি প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলেন—রোগ-শোকাদি যত প্রকার ক্লেশ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব পূর্ব পাপাচরণেরই ফল। সেই-সকল পাপ প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কুটস্থ, অবিদ্যা দ্বারাই কৃত হয়—সাধারণ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে না। ঔষধাদি গ্রহণে তাৎকালিক কিছু সুবিধা হইলেও, তাহা দ্বারা ক্লেশের যে আদি-কারণ তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। ভগবানের শরণাগতি দ্বারাই অত্যন্তিক উপকার হয়। ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ আলোচনা করিলে এইপ্রকার পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা, ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে, কিরূপে নষ্ট হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেইজন্য স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই দুঃখের সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। তাৎকালিক রোগ-শোকাদি প্রশমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্তব্য নহে, পরন্তু জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিরূপ শত শত প্রকারের ক্লেশ হইতে অর্থাৎ এককথায় ভবরোগ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যে ‘ভবৌষধি’, তাহারই অনুসন্ধান করা কর্তব্য। সেইজন্য স্মৃতিবান্ ব্যক্তি সাধুশাস্ত্ররূপ সর্বদেহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টা করেন। সাধু-

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলেই ভগবদ্ভজন-রূপ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই সকল অনর্থ বা ভবরোগের কারণ নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ ভগবানে প্রাপ্তি লাভ করা যায়।

নিষ্কপটে শিক্ষার্থীগণকে জিজ্ঞাসু বলা যাইতে পারে। নিষ্কপট শিক্ষার্থীগণই সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল। ধীশক্তি-সম্পন্ন স্কুমারমতি বালকগণ প্রায়ই জিজ্ঞাসু হয়। তাহারা পিতামাতার নিকট প্রত্যেকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লয়। সেইপ্রকার ধীশক্তি-সম্পন্ন বালক-বালিকাগণকে তাহাদের উপযুক্ত পিতামাতা বা গুরুজন সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে, তাহারা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং উত্তরোত্তর বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দূরদর্শী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার মেধাবী সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা স্কৃতিশালী বা (পুণ্যবান্) তাহারাই ভগবদ্বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত বা উৎসুক হন। তাহারা কেবলমাত্র ইতর-জ্ঞান অর্জন করিয়াই সন্তুষ্ট হন না, পরন্তু আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। ভগবজ্জ্ঞান বাদ দিয়া যাহারা কেবলমাত্র ইতর-জ্ঞান অর্জন করিবারই চেষ্টা করেন, তাহাদের জীবনে কোনপ্রকার সুফল-লাভ না হইয়া স্থূল-তুষাবঘাতন-স্বরূপ কেবল ক্লেশই লাভ হয়। যাহারা ইতর-জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, তাহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার দাসানুদাসগণের নিকট প্রপন্ন হন। ইহা তাহাদের পূর্ব পূর্বজন্ম-সঞ্চিত পুণ্যকার্যের পরিচয়। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ উন্নত স্তরে পৌঁছিয়া, “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” (গীঃ ১৪।২৭) — ব্রহ্মের যে প্রতিষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে বুঝিতে পারেন এবং পরিশেষে তাঁহারই ভজনা করেন। সুতরাং স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজ্ঞন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥”

সাধারণ গৃহস্থ সকলেই প্রায় অর্থার্থী। বিশেষ করিয়া আজকাল সকলেই অর্থের টানাটানিতে ক্লিষ্ট। সাধারণ ব্যক্তির যে অর্থের পিপাসা, তাহা কেবলমাত্র ভোগের নিমিত্ত। ভোগী-সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া যাহার অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার অর্থ জগতে কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং তদানুযঙ্গিক বাড়ী, গাড়ী, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি লাভ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-পরিভূষ্টি ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যে-সকল ব্যক্তিগণের কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য, তাহারাই পূর্বকথিত মুঢ়

কর্ষি-সম্প্রদায়। কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ যদি স্বকৃতিবান হন, তাহা হইলে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের সেবার জন্ত যত্ন করেন। এইসকল কর্ম্মী শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গে না করিয়াও ‘পারমার্থিক’ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কারণ তাহাদের ভগবদ্ভক্তির মূল উদ্দেশ্যই থাকে—নিজ-ইন্দ্রিয়-তোষণ। “ঋষীকেন হৃষীকেশ-সেবনম্”—এই কথা তাহারা বুঝিতে পারেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানী, যোগীও দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের সকলের নিজেই-তৃপ্তিই একমাত্র কাব্য। শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত পারমার্থিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ই এই প্রকার মিশ্র ভক্তগণকে শুদ্ধভক্তে পরিণত করিতে একমাত্র সমর্থ।

জ্ঞানী-অর্থে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ, তাহারা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সকল বিষয়ই অবগত আছেন। জ্ঞানিগণ অমানী, অদাস্তিক, শৌচ, আর্জব, আচার্য্য, উপাসনা প্রভৃতি বহু গুণে বিভূষিত হইয়া প্রায়ই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বিশুদ্ধাত্তঃকরণ হইয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে ‘অহংগ্রহ’-উপাসনাদি বা ‘আমিই ভগবান্’—এইরূপ একটা দোষ বা কষায় থাকিয়া যায়। তাহারা ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এই বেদ-বাক্যের বিকৃত অর্থ করত শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া অতঃ-নিরসন মাত্র কেবল-জ্ঞান লাভমূলে ক্রেশকর আলোচনাকে বহুমানন করেন। এইরূপ কেবল-জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান বা ভগবজ্জ্ঞান আশ্রয় করিতে গিয়া মায়াদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। মায়াদেবী ‘মুক্তি’-নামক শেষ জাল বিস্তার করিয়া এইসকল মায়াবাদী জ্ঞানিগণকে ভবসমুদ্রে আটকাইয়া রাখেন। তাহারা মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া ‘আমিই সেই’, ‘আমিই সেই’ নামক মনকলা খাইয়া তাহাতেই বিভোব হইয়া থাকেন।

এইসকল মায়াবাদী কোনপ্রকারে স্বকৃতি-লাভ করিলে এবং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্ত হইলে (যেমন কাশীর মায়াবাদিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তাহাদের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্ম-জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই অবস্থায়ই তাহারা ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিমা কুতার্থ হইয়া যান। সনকাদি মুনিগণ, শুকদেব গোস্বামীর গ্রন্থ বহু জ্ঞানি-সম্প্রদায় পরে এই ভগবজ্জ্ঞানের আশ্বাদন পাইয়া, ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলাকথাই কীর্তন করত জীবন ধন্যত্ব করিয়াছিলেন।

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃ শ্রীকলীলয়া ।

গুহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ (ভাঃ ২।১।৯)

নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও শুকদেব গোস্বামী স্বীয় পিতা শ্রীব্যাস-দেবের নিকট ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । এবং তিনিই মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে সর্বপ্রথম পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন ।

উপরিউক্ত স্মৃতিবান্ আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানিগণের বিষয়ে গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

“তত্র প্রধানীভূতাসু ভক্তিবু মধ্যো আৰ্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কৰ্ম্মমিশ্রাদ্বিশ্রঃ সকামাঃ ভক্তাঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকাম-প্রাপ্তিঃ । বিষয়াদ্-গুণ্যাং তদন্তে স্নৈশ্বৰ্য্য-প্রধান-সালোক্য-মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ; ন তু কৰ্ম্মফল-স্বৰ্গভোগান্ত ইব পাতঃ ; যদক্ষ্যতে,—“যান্তি মদ্যাজিনো মাম্” ইতি চতুর্থ্যা জ্ঞানমিশ্রায়ান্তত উৎকৃষ্টায়ান্ত ফলং শান্তুরতিঃ সনকাদিষিব । ভক্তভগবৎকারুণ্যাদিক্যবশাৎ কশ্চাচ্চিৎ তস্তাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষিব । কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তিৰ্যদি নিকামা স্তাং, তদা তস্তাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ, তস্তাঃ ফলমুক্তমেব । কচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদি-ভক্তসঙ্কোথ-বাসনাবশাদ্ জ্ঞানকৰ্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিমতামপি দাসাদি-প্রমা স্তাং, কিন্তু ঐশ্বৰ্য্যপ্রধানমেবেতি । অথ জ্ঞানকৰ্ম্মাদিমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্তা-কিঞ্চন-উত্তমাদিপৰ্য্যায়ান্ ভক্তেৰ্বহুপ্রভেদায়া দাস্ত-সখ্যা-দি-প্রেমবৎ পার্শ্বদৃষ্ট্যেব ফলম্ ইত্যাদিকং শ্রীভাগবত-টীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্ । অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যো ভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ ॥”

অর্থাৎ—“আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী প্রভৃতি তিন প্রকার যে ভক্ত, তাঁহারা সকামভক্ত এবং তাঁহাদের ভক্তি প্রধানীভূত বা মিশ্রভক্তি । সেই সেই ভক্তের প্রাপ্তিফল—সেই সেই কামনায় সিদ্ধিলাভ । তাহার পর সেইসকল ভক্তের স্নৈশ্বৰ্য্যপ্রধান সালোক্য-মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি । কিন্তু তাঁহাদের কৰ্ম্ম-দিগের দ্বারা অন্তবৎ স্বর্গাদি-প্রাপ্তি নহে । যথা, কথিত হইয়াছে—“আমাকে যে যজনা করে, সে আমার নিকটই যায় ।” আর চতুর্থ ভক্ত যে জ্ঞানী, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন, যেহেতু তিনি জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত । সনকাদির দ্বারা তাঁহার শান্তুরতি লাভ হয় ; পরন্তু, ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাদিক্যবশতঃ ঐসকল জ্ঞানি-ভক্তগণ ভগবৎপ্রেমাও লাভ করিয়া থাকেন—যেমন শুকদেব গোস্বামী । কৰ্ম্মমিশ্র-ভক্তি নিকাম হইলে তখন তাহা জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিতে পরিণত হয় । সেই জ্ঞানমিশ্র-ভক্তির ফল উপরে কথিত হইয়াছে । কখনও

কখনও জ্ঞান-কর্মাদিমিশ্র ভক্তগণের স্বভাব-প্রভাবে দাস্ত-ভাবাদি সঙ্গলাভের ইচ্ছা হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রধান দাস্ত-ভক্তিও লাভ হয়। কর্ম-জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিদিগের আরও বিশুদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিলে তাঁহাদের দাস্ত-সখ্যাদি প্রেমবশতঃ ভগবানের পার্শদত্ব লাভ হইয়া থাকে—শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। এখানে প্রসঙ্গ-বশতঃ কিছু কথিত হইল মাত্র।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

ভজন-ক্রিয়া

ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন-ক্রিয়া অর্থাৎ সদ্গুরু হইতে লব্ধ নাম ও মন্ত্রের ক্রমপস্থানুযায়ী সাধনই ভজন। উপাসনা, সেবা, সাধনা, আরাধনা ও অভ্যাস প্রভৃতি শব্দগুলি ভজনের পর্য্যায়-বাচক। “ভজ্ ধাতু সেবায়াম্”। ভজ্ ধাতু ভাবে-অনট্ প্রত্যয় করিয়া ‘ভজন’ শব্দ নিষ্পন্ন। প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ দ্বারা সেবার ভাবেই ভজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যবহারিক জগতে ‘সেবা’ শব্দের প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পিতৃমাতৃ-সেবা, জীব-সেবা, আর্ন্ত-সেবা ও পীড়িতের সেবা প্রভৃতি স্থলে সেবা-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উক্ত সেবাসমূহ দ্বারা জীবকুলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যাজ্জ’ন হয় মাত্র। গীতা বলেন—পুণ্যক্ষয় হইলে জীবগণ স্ব-স্ব কর্মময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহজগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইদৃশী সেবাদ্বারা জীবগণের আত্যন্তিক মঙ্গল সাধিত হয় না; পরন্তু যিনি যেভাবে ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হন, তিনি তদন্তচিত্ত-হেতু পরজন্মে তদ্ব্যবোচিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যান্তি দেবত্বতা দেবান্ পিতৃন্থ যান্তি পিতৃত্বতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ (গীঃ ৯।২৫)

দেব, পিতৃ, ভূত ও ভগবান্—ইহাদের মধ্যে যিনি ঈশ্বরের ভজন করেন, তিনি ততলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রান্তরে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিশীযত্বে ॥ (ভাঃ ১১ ১৪।২৭)

[বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষেব চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে ; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই (ভগবানেই) নিমগ্ন হইয়া থাকে ।]

ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহার ভজনদ্বারাই জীবকুলের আত্যন্তিক মঙ্গল হওয়া সম্ভব । তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ জানাইয়াছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়সুহৃদাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গণ যা কল্লিতা ।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমঙ্গলং প্রেমা পুমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোম তমিদং তদ্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যবস্তু । ব্রজগোপীগণ এই সেবা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবত ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত ।

সনাতন-ধর্মে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি পঞ্চপ্রকারের ভজন পরিদৃষ্ট হইলেও, তর-তম-বিচারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । কারণ শৈবগণ শ্রীশিবের উপাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন ; কিন্তু শ্রীশিব স্বয়ং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী গিরিজা-দেবীকে উপদেশ দিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—জগতে যত প্রকার ভজন আছে, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণু-ভজনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-সেবনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন ।

আমার ভক্তের পূজা আগা হইতে বড় ।

সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈল দঢ় ॥ (চৈঃ ভাঃ)

উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য আলোচনা দ্বারা ভজন কি, ভজনীয় বস্তু কি, কাহার ভজন জীবমাত্রেরই একান্ত করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনাকারীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেও, প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ ও তৎসঙ্গ-প্রভাবে

কি-প্রকারে মানবগণের হৃদয়ে ‘ভজনক্রিয়া’ আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। ‘ক্রিয়া’র পর্যায়-বাচক-শব্দে—কার্য্য, অনুষ্ঠান, প্রয়োগ, শিক্ষা, পূজা ও চেষ্টা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্র + শ—ভাববাচ্যো + জীয়াং আপ্ প্রত্যয় করিয়া ‘ক্রিয়া’ শব্দ নিষ্পন্ন। যে-কোনও বিষয়ের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারকে সাধারণতঃ ‘ক্রিয়া’ আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ভজনরূপ কার্য্যের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারকেই ‘ভজন-ক্রিয়া’ বলা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণ-সঙ্গ বনে যাজ্ঞিক-পত্নীগণের পাচিতান্ন ভোজন করিতেছেন। এস্থলে যেমন ‘ভোজন’-রূপ বিষয়ের সম্পাদনার নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাই ‘ভোজন-ক্রিয়া,’ তদ্রূপ ‘ভজন’রূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-হেতু ‘ক্রিয়া’শব্দ প্রযুক্ত হইয়া—‘ভজনক্রিয়া’ হইয়াছে। ভজনক্রিয়া-শব্দে—ভজন কার্য্য, ভজন-চেষ্টা, ভজন-অনুষ্ঠান ও ভজন-শিক্ষা বুঝায়। অনন্তপ্রকার সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহু প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। ভক্তি-সাধনে প্রধানতঃ চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গ, বৈধ ও রাগানুগা-ভেদে কথিত হইয়াছে। এই চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নববিধ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)

চতুঃষষ্ঠী প্রকার ভজনাস্ত্রের মধ্যে শ্রবণাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গই শ্রেষ্ঠ। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ৯ প্রকার ভজনাস্ত্রের মধ্যে নাম-ভজন বা নাম-‘কীর্ত্তন’ই শ্রেষ্ঠতম ভজন। কারণ সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরান্বক মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে লক্ষোপদিষ্ট ব্যক্তিমান্বেরই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ বর্ণকানি হি।

কলৌষুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ॥ (অনন্ত-সংহিতা)

অনাদি-বহিষ্মুখ জীবনিচয়ের চিত্তদর্পণে বহুজন্ম-সঞ্চিত অত্যাভিলাষ, জ্ঞান,

ও কর্মাদির আবিলতা, নাম-কীর্তন-প্রভাবে বিধৌত হইয়া ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত ভজনক্রিয়ার বিকাশ হইয়া থাকে । গুরুমন্ত্রে সংসার-দাবাগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়—স্বর্ঘ্যোদয়ে তমোনাশের গায় যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া নিখিল কল্যাণরাশির উদয় হয় । তখন সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং প্রতিপদে পূর্ণামৃত আশ্বাদনের বিষয় হয় ।

ক্রমপন্থাছুযায়ী এইরূপ ভজন করিতে করিতে ভজনকারী সর্বানর্থ-মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভে সমর্থ হন । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত নিম্নোক্ত শ্লোকই ভজন-পিপাসুগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ,—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধু-জীবনম্ ।

আনন্দাশুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং ।

সর্বাশ্ব-স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনম্ ॥ (শিক্ষাষ্টক—১)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বৈষ্ণব-ঠাকুর — “কৃপাসিন্ধু”

ব্যাপারটা কি মহাশয় ? ওখানে অত গোলমাল হ’চ্ছে কেন ? তদুত্তরে একটা ভদ্রলোক বলেন “মহাশয়, বড় গুরুতর ব্যাপার ! ভয়ানক লোমহর্ষণ কাণ্ড !! একদিনেই এক ঘরের বারটা মানুষ মারা গ্যাছে । তা’দের চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই, তিন ভাইয়ের তিন পত্নী ও প্রত্যেকের দুটি ক’রে ছয়টা পুত্র—মোট বার জন মারা গ্যাছে ; মাত্র একটা ভাই বেঁচে আছে । তা’দের পিতা খুব ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছেলেদের বিশ্বাস করতেন না বলে গুপ্ত-স্থানে সমস্ত অর্থ পুঁতে রাখতেন ।

“কিছুদিন পরে পিতা তীর্থ-ভ্রমণ করবার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন, পুত্রদের মধ্যে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে । তারপর তাঁকে আর বাড়ী ফিরে আসতে হয় নি, তিনি সেই তীর্থস্থানেই দেহ রেখেছিলেন ; তিনি পুত্রদের বিশ্বাস না করার জন্য তীর্থে যাওয়ার পূর্বে গুপ্ত-স্থানে রক্ষিত সঞ্চিত সমূহ অর্থের কথা পুত্রদের না বলায়, তাঁর মৃত্যুর পর অর্থাভাবে পুত্রদের

সংসারযাত্রা-নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। এমন কি, তারা তা'দের মৃত পিতার শ্রাদ্ধ করা দূরে থাকুক, নিজেদের ও স্ত্রী-পুত্রগণের ভরণ-পোষণের কি ব্যবস্থা করবে তাই ভেবে অস্থির হ'চ্ছিল। স্বাভাবিক উপায়ে এক মুষ্টি অন্ন যোগাড় করবারও তা'দের ক্ষমতা ছিল না। তাই অনাহারে, একাহারে, স্বপ্নাহারে, ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা যা হোক ক'রে পরিজনবর্গের জীবনগুলি ও নিজ নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছিল মাত্র।

“কিছুকাল এইরূপে কাটানোর পর একদিন একজন দৈবজ্ঞ এসে বলেন— ‘তাই সব, তোমরা এত দুঃখ পাচ্ছ কেন? তোমাদের স্বর্গগত পিতা তোমাদের জ্ঞাত অতি গোপনীয় স্থানে বহু অর্থ পুঁতে রেখে গ্যাছেন, কিন্তু খুব সাবধানে বের করতে হ'বে। যদি দক্ষিণ দিকে মাটি খুঁড়তে যাও, তবে লক্ষ লক্ষ ‘ভীমরুল-বরুলী’ উঠে প্রাণ নষ্ট করবে। পশ্চিমের মাটি খুঁড়লে ‘যক্ষের’ হাতে প্রাণ হারাবে। উত্তর দিকে খুঁড়লে ‘কৃষ্ণবর্ণের ভীম-দরশন অজগর’ বেরিয়ে এসে খেয়ে ফেলবে। তবে পূর্বদিকে অল্প-খুঁড়লেই ধনের পাত্র পাবে।’ এই ব'লে সর্বজ্ঞ চলে গেলে তিন ভাইয়ের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেধে গেল। ছোট ভাইটি খুব ঠাণ্ডা ছেলে, সে চুপ ক'রে থাকল। এইরূপে ঝগড়া করতে করতে তা'রা সর্বজ্ঞের কথা ভুলে গিয়ে তিন জনে তিন দিকে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিল এবং মাটি সরাবার জ্ঞাত ও ধনের পাত্র তুলবার জ্ঞাত প্রত্যেকেই আপন আপন গৃহিণীকে ও ছেলে দুটীকে সঙ্গে রেখে দিল।

অল্প মাটি খুঁড়তেই দক্ষিণ-দিক থেকে লক্ষ লক্ষ ভীমরুল-বরুলী উঠ' বড় ভাই, তা'র পত্নী ও ছেলে দুটীর সর্বাসঙ্গে বিবাক্ত হ'ল দিয়ে ক্রোধের সঙ্গে এমন বিব'ধে লাগলো যে, বড়বাই, পত্নী ও পুত্র দুইটি দারুণ যাতনায় অস্থির হ'য়ে তন্মূহূর্তেই প্রাণত্যাগ করল। পশ্চিম দিকের মাটি খুঁড়ার ফলে এক যক্ষ উঠে' মেজো ভাই, তা'র স্ত্রী ও দুটী ছেলেকে খেয়ে ফেলল এবং উত্তরে মাটি খুঁড়ার ফলে একটি অতিকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের অজগর সর্প উঠে' সেজো ভাই, তা'র স্ত্রী ও দুটী ছেলেকেও চিরদিনের জ্ঞাত ঘুম পাড়িয়ে দিল। এইজ্ঞাত এখানে এত গোলমাল হ'চ্ছে।”

উপরিউক্ত ঘটনায় দেখা যায় যে, পিতৃধন পাবার তিনটি পথে তিন রকমের বাধা-বিপত্তি ছিল। কেবল পূর্বদিকে কোন ভয় ছিল না। আমাদেরও সেইপ্রকার কৃষ্ণ ভক্তি-রূপ পিতৃধন পাবার তিনটি পথে তিন রকমের বাধা ও বিপদ আছে। তাহা সর্বজ্ঞ বা বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপা ক'রে ব'লে দেন। তা'রা বলেন—

(১) দক্ষিণা-মার্গ বা কৰ্ম-পথে কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না, যে-দিকে লক্ষ লক্ষ স্মার্তের বিষয়-বাসনারূপ ভীমরুল-বরুলী দংশন ক’রে বাধা ও যন্ত্রণা দেয় ।
 (২) পশ্চিম-পথ বা জ্ঞানকাণ্ডে মূষা-মোক্ষ ও সিদ্ধিকাণ্ডে প্রভৃতি ঈশ্বর-সামুজ্যাদি-রূপ যক্ষ আছে, সেই যক্ষ জীব-সত্তার বিনাশ করে । (৩) উত্তর-মার্গ বা যোগ-পথে অষ্টসিদ্ধি-রূপ কৃষ্ণসর্প ও মায়াবাদীর নরকতুল্য কৈবল্য জীবকে সংহার করে । (৪) তবে পূর্বদিকে বা ভক্তিপথে কোন ভয়, বাধা, বিঘ্ন ও বিপদ নাই । সে-দিকে সৰ্বজ্ঞ বা বৈষ্ণব-ঠাকুর নিজেই কৃষ্ণভক্তি-রূপ পিতৃধনের ভাণ্ডারী হ’য়ে উহা বিতরণ করছেন । আর তিনি—আয়, তোরা কে নিবি, কে নিবি ব’লে ডেকে ডেকে, যেচে যেচে, হাতে পায়ে ধ’রে পিতৃধন বিলিয়ে দিচ্ছেন । আরও বলছেন—“যে এই ধন নিবি, আমি তা’র কেনা দাস হ’ব ।” আবার তাঁ’র হাতের এমনি গুণ যে, যত দিচ্ছেন ঐ ধন অফুরন্ত হ’য়ে আছে—কিছুই কম্ছে না, বরং বেড়েই যাচ্ছে ! আহা ! বৈষ্ণব-ঠাকুরের মত এমন দয়াল আর কে আছেন ? তাঁ’র দয়ার শেষ নাই । সমুদ্রের জল বরং ক’মে যে’তে পারে বা কোনদিন শুষ্ক হ’তে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুরের দয়ার ভাণ্ডার কম্বার নয়, শুষ্ক হ’বার নয়, তাই তিনি “কৃপাসিন্ধু” । তিনি বলেন—

ওরে ভাই ! ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর ।

ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি স্থখ লেশ,

নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥

ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর স্থখ কই,

সেও স্থখ অভাব-পূরণ ।

সে-সুখেতে আছে ভয়, তাকে ‘স্থখ’ বলা নয়,

তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন ॥

শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে শত শত

মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায় ।

সে-সব কৈতব জানি’, ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী,

মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায় ॥

মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্ট-মতি,

মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান ।

তাহা যে চাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তারে,

তার যত্ন নহে ফলবান্ ॥

অতএব স্পৃহাদয়, ছাড়ি’ শোধ এ হৃদয়,

নাহি রাখ কামের বাসনা ।

ভোগ-মোক্ষ নাহি চায়, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পায়,

সেবকের এই ত সাধনা ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়), পুরাণরত্ন

নারায়ণ (মদিনীপুর)

চৌরাসী-ক্ৰোশ শ্ৰীবজ্জমণ্ডল-পৰিক্ৰমার নিমন্ত্ৰণ-পত্ৰ

শ্ৰীশ্ৰীগুরুগোৱান্দো জয়তঃ

শ্ৰীউদ্ধাৰণ গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (ভূগলী)

২১/১২/৫১

সাদৰ সন্তোষপূৰ্বক নিবেদন—

শ্ৰীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসৰ উৰ্জ্জ্বত-পালনমুখে ৮৪ক্ৰোশ শ্ৰীবজ্জমণ্ডল পৰিক্ৰমাৰ বিৰাট আয়োজন কৰিয়াছেন এবং পশ্চিমমধ্যে গয়া, কানী, প্ৰয়াগ-তীৰ্থও দৰ্শনেৰ ব্যৱস্থা হইয়াছে। সমিতি আগামী ৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮, ইং ১৭ই অক্টোবৰ ১৯৫১, বুধবাৰ—হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৰাত্ৰ ৮টা ১০ মিনিটে ডুন এক্সপ্ৰেসে যাত্ৰা কৰিবেন। আমৰা ধৰ্ম্মপ্ৰাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান কৰিয়া এই অপূৰ্ব সন্যোগ গ্ৰহণ কৰিতে অনুৰোধ কৰি। ইতি—

নিবেদক—সভ্যবৃন্দ,
শ্ৰীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী :—

- (১) উৰ্জ্জ্বত, পৰিক্ৰমা ও তীৰ্থাদি-দৰ্শনে ন্যূনাধিক ৩০ দিন সময় লাগিব।
- (২) প্ৰত্যেক যাত্ৰীকে দুইবেলা প্ৰসাদ ও হাওড়া হইতে যাতায়াত ট্ৰেনভাড়া প্ৰভৃতি খৰচৰ জন্ত ২০০ টাকা ভিক্ষাস্বৰূপ দিতে হইবে।
- (৩) বাঁহাৰা পদব্ৰজে পৰিক্ৰমা কৰিতে অশক্ত, তাঁহাৰা ঘোড়াগাড়ী বা গৰুৰ গাড়ীতে পৰিক্ৰমা কৰিতে পাৰিবেন। তজ্জন্ত পৃথক খৰচ পড়িব।
- (৪) যাত্ৰিগণ সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা, জামা ও চাদৰ সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যকবোধে ১টা ঘটি ও ১টা ৰাটী লইতে পাৰেন।
- (৫) যাত্ৰিগণকে ১৮ই আশ্বিনেৰ পূৰ্বেই দেয় ভিক্ষাৰ টাকাৰ মধ্যে ১০০ টাকা, শ্ৰীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশৱ মহাৰাজেৰ নিকট উক্ত ঠিকানাৰ পাঠাইতে বা জমা দিয়া ৰসিদ লইতে হইবে।
- (৬) অগ্ৰিম ১০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবৰ, বুধবাৰ—বেলা ৩টা হইতে ৬টাৰ মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনেৰ এনং প্লাটফৰ্মে কৰ্ত্তৃপক্ষৰ নিকট জমা দিতে হইবে।

কালের গতি

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিমে ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥”

সুখের সংসার-মাঝে

দেখি দুঃখ-নিকেতন ।

সুখ-স্বপনের পাশে

শান্তিহীন জাগরণ ॥

মধুর মিলন-মাঝে

বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ-বাণ ।

প্রফুল্ল কুসুম-রাশি

নিমেষেতে হয় স্নান ॥

সুখ-শান্তি-ভালবাসা

আশা-স্নেহ ছিনাইয়া ।

সরল কোমল বুকে

পড়ে বজ্র নির্ঘোষিয়া ॥

বুঝিতে না পারি হয় !

কালের রহস্য কিছু ।

সুখ-সাধ না পূরিতে

দুঃখ আসে পিছু-পিছু ॥

কালের করাল শ্রোতে

ভাসিতেছে এ-সংসার ।

ফিরায় কালের গতি

হেন শক্তি আছে কা'র ॥

কালচক্র সমভাবে

ঘুরিতেছে নিরবধি ।

আবর্তনশীল ধরা—

এই ত' বিধির বিধি ॥

সে-বিধিরে বাধা দিতে

তব সাধ থাকে যদি ।

কৃষ্ণনাম, হে রসনে !

গান কর নিরবধি ॥

সব বিধি হ'বে বাধ্য

কৃষ্ণসেবা-সাধনায় ।

বিধির বিধাতা সব

অবস্থিত কৃষ্ণ-পায় ॥

বিধি ও অবিধি ব'লে

রবে নাকো কিছু আর ।

বহিবে অমৃত উৎস

কৈলে কৃষ্ণনাম সার ॥

বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে গুরু-কৃপা হয় ।

গুরু-কৃপা হ'লে পাবে কৃষ্ণ প্রেমময় ॥

শ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণুপ্রার্থী

—শ্রীহরিদাস রায়

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন । মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন । একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর জন্ত ধন-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন ।

ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্ ! এই ধনধান্য-পূর্ণা বস্তুক্ষরা যদি আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব ?”

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“না, ইহার দ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ লৌকিক সুখভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে ; কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব-লাভের কোন আশা নাই জানিবে।”

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—“যে ধন বা ধনসাধ্য কর্মের দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? অতএব হে ভগবন্। আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।”

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—“হে মৈত্রেয়ি ! তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, বর্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট আত্মতত্ত্বের কথা কীর্তন করিতেছি ; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও। মৈত্রেয়ি ! পতির প্রীতির জন্ত কোন পত্নী পতির প্রিয়-কার্য করেন না ; কিন্তু নিজের সুখের জন্তই পতির প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্তও পতি কখনও পত্নীর প্রিয় হন না। কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্তই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্ত নহে, আত্ম-সুখের জন্তই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এইরূপ ধনের প্রয়োজন সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্ত লোকে ধনকে ভালবাসে না ; কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্তই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্ত লোকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্তই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না ; কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্তই রাজা প্রজার প্রিয় হন। স্বর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ত লোকে স্বর্গের আকাজক্ষা করেন না ; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্তই স্বর্গের আকাজক্ষা করিয়া থাকেন। দেবতাগণের প্রীতির জন্ত লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না ; স্বার্থসিদ্ধির জন্তই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করেন। প্রাণিগণের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হন না ; কিন্তু স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্তই প্রাণী লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দুগ্ধ-লাভের জন্ত গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রমাণিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্তই প্রমাণিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহভরে সন্তানকে যখন চুষন করেন, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও তিনি তাহা হইতে বিরত হন না ; কেন না, মাতা নিজের সুখের জন্তই ঐরূপ করিয়া থাকেন, সন্তানের সুখের জন্ত নহে। হে মৈত্রেয়ি !

অধিক কি বলিব ? লোকে স্ব-স্ব প্রয়োজন-নিষ্কির জগত্ই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল কপটতা। সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিত্য প্রিয়বস্তু, একমাত্র সেই ভগবানের প্রীতির জগত্ তাহার আরাধনা কর, তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, তাঁহার কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইবে, তাঁহাকেই ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসা হইবে এই ভগবৎ-সেবাদ্বারাই তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে।”

—ত্রিদিগ্ভিশ্বামী শ্রীভক্তিময়ুখ ভাণ্ডবত মহারাজ—

“ভূতানুদ্বেষ্টদায়িতা”

শ্রীল রূপগোষ্মামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামুতসিন্ধুর সাধনভক্তি-লহরীতে ৬৪ প্রকার সাধন-ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে “ভূতানুদ্বেষ্টদায়িতা”কে অন্ততম অঙ্গমধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“প্রাণিমাতে মনোবাক্যে উদ্বেষ্ট না দিবে।” প্রাণি-সমূহকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেষ্ট-দান-বর্জন ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের অন্ততম দ্বার-স্বরূপ। সুতরাং যাহারা অপর প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেষ্ট প্রদানরূপ প্রভুত্ব ও দাস্তিকতাপ্রসূত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব স্বদূর-পর্যন্ত। প্রাণিমাতে উদ্বেষ্ট প্রদানকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোষ্মামিগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দার সহিত সমপর্য্যয়ে গণনা করিয়াছেন। প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা, নিন্দা, সেবাপরাধ, অসংসঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা প্রভৃতি যেকোন ভক্তিপথের প্রবল বিঘ্নকারক, প্রাণিমাতে কায়মনোবাক্যে উদ্বেষ্ট-প্রদানও সেইরূপ ভক্তি-বিরুদ্ধ অমঙ্গলকর। যাহারা সাধারণ প্রাণীকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা করে, তাহাদিগকে উদ্বেষ্ট প্রদান করে, সর্বভূতান্ত্যামী শ্রীহরি সেইসকল ব্যক্তির পূজা ও বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিয়াছেন,—

“আমি অন্তর্বাগিরূপে সর্বদাই সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল ব্যক্তি প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আমার অর্চামূর্তির পূজা করে, তাহাদের ঐ অর্চনা দি বিড়ম্বনামাত্র।”

তৃণ-গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্যন্ত কাহাকেও উদ্বেগ দিতে হইবে না। যাহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চন করেন, তাহারা সর্বভূতে আদর করিতে অবশ্যই শিক্ষা করিবেন। ইহা তাহাদের পক্ষে বিধি। তাই শাস্ত্র বলেন,—

“হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যাঃ পরতাপিনঃ।”

যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্তি মাত্র লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ “প্রবর্ত্ত” বা কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান্, তাহাদের পক্ষে প্রথম পরিহার্য—‘অপরকে তাপ’ বা ‘উদ্বেগ-প্রদান’। আর যাহারা ভক্তি-রাজ্যে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাহাদের ভগবান্ বিষ্ণুর বৈভব দর্শন হয় বলিয়া তাহারা স্বাভাবিকভাবেই সর্বভূতের প্রতি আদর করিয়া থাকেন। তাহারা—“জীবে সম্মান দিবে জানি’ কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।”—এই শাস্ত্র-বাক্য সহজভাবে সর্বদাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা উন্নত ভক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—“সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্মৃতি।” অর্থাৎ তাহারা সর্বত্রই নিজের হৃদয়স্থিত আরাধ্য-বস্তু-ক-দর্শন করিয়া মনে করেন—“সকলেই আমার ইষ্টদেবকে সেবা করিতেছে, স্তুতি করিতেছে; দেখিতেছি, কেবল আমিই হতভাগ্য অযোগ্য।” যিনি ভক্তিরাজ্যে যত উন্নত, তিনি নিজেকে ততোধিক অযোগ্য বলিয়া মনে করেন—“সর্বোত্তম আপনারে হীন করি’ মানে ॥” তাহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর “তৃণাদপি স্তনীচেন” শ্লোকের মূর্ত-আদর্শ। এই স্তনীচতা ও দৈন্ত্যের মধ্যে কপট “আকুপাকু”-ভাব বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের কপট ব্যবহার নাই; ইহা হৃদয়ের সহজ সরল অভিব্যক্তি। সকল প্রাণীতে কৃষ্ণ-সম্পর্ক ও কৃষ্ণাধিষ্ঠান দর্শন করিয়া কৃষ্ণাজ্ঞা-পালন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই ভূতাদরের মুখ্য তাৎপর্য।

স্বস্বজ্ঞান, স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইতেই জীবমাত্রকেই উদ্বেগ-প্রদান বা পর-পীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যেখানে “আমি কৃষ্ণের ভৃত্য এবং আমার আত্মীয় বা অনাত্মীয়, বন্ধু বা শত্রু সকলেই ভগবানের দাস” এই জ্ঞানের পরিবর্তে অগ্ন্যাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান—আমি প্রভু, আমি শাসক, আমি স্বামী, আমি পিতা—এইরূপ জড় দৃষ্টাদিপ্রসূত অভিমান ও নিজের কাম, ক্রোধ, মৎসরতা, হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অজ্ঞাত মোহ, সেইখানেই পরপীড়ন-রূপ দুঃপ্রবৃত্তির উদয় হয়। যাহারা প্রাণীসমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়া প্রদান করিয়া সুখ অনুভব করে ও নিজের কার্য সমর্থনের জন্ত নানাভাবে উদ্যোগী হয়, তাহাদের হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির আভাসও উদিত হয় নাই। শুদ্ধ-ভক্তের চিত্ত বদ্ধ

কোমল, কত স্নিগ্ধ, কত মধুর, তাহার অন্তর দেখিলেই জীবের চিত্ত-কাঠিন্য, বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তি সবই চলিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্ব-চরিতে ও তদীয় ভক্তগণের চরিতে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্রোহবিশিষ্ট প্রধান প্রধান শত্রুগণও যে-মুহূর্তে তাঁহাদের স্বল্পমাত্র অথবা পরস্পর-সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের চিত্তের পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; তাঁহারা সেই সর্বভূতপ্রিয় মহাজনগণের শ্রীচরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন।

প্রাণীমাত্র উদ্বেগ দিতে হইবে না—একথা নিজের স্বপক্ষ, বিপক্ষ, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। এবং যাহারা নিজ-অপেক্ষা কনিষ্ঠ, নিজের বশু, পাল্য, অধীনস্থ, আশ্রিত, এমন কি বাহ্যতঃ শত্রু—ইহাদের সকলের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ এইরূপ ব্যক্তির প্রতিই জীবের কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দেওয়ার অবকাশ থাকে। এবং যাহারা নিজ-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিজের পাল্য বা বশু নহে, স্বাধীনভাবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাহাদিগকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-দানের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। অতরাং নিজ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও নিজের বশু বা পাল্য ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহারই জীবের ‘ভূতানুদ্বেগদায়িতা’র কষ্টি-পাথর। ইংরাজীতে বলে, “Charity begins at home”. অর্থাৎ নিজ মিকটস্থ প্রাণীগণের প্রতি দয়া প্রথমে হওয়া আবশ্যিক। নিজের আশ্রিত বা শরণাগত ব্যক্তিগণকে অনাহারে অথবা রাখিয়া—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া পরের উপকারের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। নিজ আত্মীয়-স্বজন বা আশ্রিত-গণের প্রতি আসক্তি যেরূপ গর্হণীয় ও ভক্তির বাধা, তাহাদের প্রতি অবিচার, মর্যাদালঙ্ঘন, নিষ্ঠুরতা ও পীড়াদানও সেরূপ নিন্দনীয়। যাহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া ঘটনা-চক্রে উপস্থিত নিজ পিতামাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি জাগতিক গুরুজনের প্রতি যথোচিত মর্যাদা-দান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া, বরং ‘স্বজনাখ্য দক্ষ্য-জ্ঞানে’ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ ও মর্যাদালঙ্ঘনকে ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিয়া গর্ববোধ করে, গুরুজনের পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি সামান্য ভক্তিসম্মত কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাহারা দুইদিন পরে গুরুবৈষ্ণবগণের বর্তমান উপকার ভুলিয়া সুযোগ পাইলে তাঁহাদের প্রতিও ঐরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে কিনা তাহা বিচার্য।

এইসকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভক্তির বিরুদ্ধ কোন কার্য, সেবা-শৈথিল্য অথবা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয়কারী কাহাকেও কোন নীতিবিরুদ্ধ দুরাচার করিতে দেখা যায়, তখন সে-স্থলে সেরূপ দুষ্ট ব্যক্তিকে

শাসন করাও কি অভক্তি ? তদুত্তর এই যে, উহা অভক্তি না হইলেও ঐরূপ বিচারও সংযত ও শাস্ত্রশাসিত হওয়া আবশ্যক ; নতুবা হিতের বিপরীত হইবে । বন্ধুজ্ঞানে কাহারও মঙ্গলাকাজক্ষা ব্যতীত কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া প্রভু-আকাজক্ষায় কাহাকে শাসন করিতে গেলে তাহা অভক্তিই হইবে । সাধুগণ বাক্যের দ্বারাই বহিস্মুখ জীবকে শাসন করিয়া থাকেন । ইহা জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার রূপার নিদর্শন । আচার্য্য অতি কঠোর-ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও আত্মমঙ্গলাকাজক্ষিগণ তাহা সাদরে মাথা পাতিয়া লইয়া থাকেন । আর আমার একটা সামান্য কথাও লোকে শুনিতে চাহে না ; ইহার কারণ—সাধুর সেবাময় আদর্শ আচরণ ও মধুর ব্যক্তিত্ব, সকলকে তাঁহার চরণে প্রণত করায় । সাধু অন্তর-বাহিরে পরদুঃখকাতর ; আর আমার অন্তর কপটতাপূর্ণ । সাধুর হৃদয় স্নেহে পূর্ণ ; আর আমার হৃদয়ে কাহারও প্রতি অকপট নিঃস্বার্থ স্নেহের লেশও নাই । সাধু সকলকেই আপন-জ্ঞান করেন, কিন্তু আমি তাহা করি কি ? সাধু পরদুঃখ-দুঃখী, আর আমি পরসুখে দুঃখী । সাধুর প্রত্যেকটা কার্য্য ভগবানের স্তূথের জন্ত ; কিন্তু আমার ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবার জন্ত ব্যয়িত হয় কি ? সাধুর শাসন—জীবের প্রতি অপার রূপা ও আপন-জ্ঞানের পরিচয় । আর আমি আমার অপূর্ণ প্রতিহিংসা বা কাম-চরিতার্থ করিবার জন্ত অথবা অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হইয়া অবৈধ অনুকরণ-বৃত্তি দ্বারা অপরকে যে শাসন করি, তাহা কি করিয়া ভক্তির কার্য্য হইবে ? তাহা আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার চেষ্টা মাত্র—তাহা অসহিষ্ণুতা, অসংযম ও ক্রোধ-রিপুর তাণ্ডবমাত্র । উহা আদৌ ভক্তিরাজ্যের কথা নহে । যদি আমার মন এত শুনিয়াও অনুতপ্ত না হইয়া যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বলে যে, “আমি ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্ত এইরূপ করিতেছি ।” তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—“অভক্তির দ্বারা কি করিয়া ভক্তি-শিক্ষা দেওয়া যায় ?” যে-কার্য্য শাস্ত্রে সর্বত্র জীবের বিবেক-বুদ্ধিতেও অভক্তি বলিয়া নিন্দিত, সেই কার্য্য দ্বারা আমি কি করিয়া ভক্তি শিক্ষা দিব ? অভক্তি কি ভক্তির জননী, না ভক্তিই ভক্তির জননী ? ভগবানের শ্রীমন্দির মুছিবার জন্ত যেরূপ শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়খানা ঐ সেবায় লাগান অভক্তি, সেইরূপ ভক্তি-শিক্ষা দেওয়ার জন্ত অভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার যে বিচার, তাহাও আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নহে । দ্বিতীয় কথা, আমার ঐরূপ বিচার যদি ভক্তি হইবে, তবে তাহাতে শ্রীগুরুগোরাঙ্গ নিশ্চয়ই সুখী হইবেন এবং আমিও প্রসন্নতা লাভ করিব । শ্রীবাস-কর্তৃক কীর্ত্তনবিরোধী-শাওড়ীর কেশাকর্ষণ ও শ্রীসার্কভোমের ‘ঘাঠী রাণী হউক’—এই অভিশাপ শ্রীগৌরসুন্দরের

সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু আমার ঐরূপ অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টায় কৃষ্ণের সন্তোষ হয় কি ?

রাজা যদি দণ্ড ধারণ করেন, তবে তাহা শোভা পায়। কিন্তু একজন কয়েদী যদি কৃত্রিমভাবে রাজদণ্ড ধারণ করে, তবে সে নিন্দিত ও দণ্ডিতই হইয়া থাকে। তাহার কথা কেহই শোনে না। অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভানুধ্যান হইতে যে শাসন, তাহাতে সীমা লঙ্ঘন হইবার কারণ থাকে না ; সে-শাসনে ক্রোধের বা অসহিষ্ণুতার ভাণ্ড নৃত্য নাই। স্নেহহীন, আচরণহীন, দয়াহীন, সর্বোদ্রিগে সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তির অসহিষ্ণুতা-জনিত যে শাসন (?) তাহা উৎপীড়নই। তাহাতে শাসক (?) ও শাসিত উভয়েই অসুবিধায় পড়িবেন।

সাধুগণ জীবের যক্ষ্মের জন্ত অপ্রিয় শ্রেয়োবাক্য বলিয়া জীবের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদন করেন, ইহা জীবের প্রতি কুপারই আদর্শ। সদবৈজ্ঞ রোগীকে যে আপাত-ক্লেশ দিয়া—উদ্বেগ প্রদান করিয়া পরিণামে নিত্য শান্তি প্রদান করেন, সেই আপাত-উদ্বেগ, ‘উদ্বেগ’-পদবাচ্য নহে ; তাহা নিত্য শান্তিরই সোপান। তাই বলিয়া সাধুর ঐরূপ কর্কশ-শাসনবাক্যে কোনপ্রকার অশ্লীলতা বা সংযমহীনতা প্রকাশ পায় না—সাধুর ঐ শাসনে কাঞ্চিক কোন দণ্ড নাই—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সাধুর পক্ষে যে শাসন করার অধিকার দেওয়ার কথা আছে তাহাতে বাচক ও মানাসিক কাহারও শরীরে আঘাত করার ব্যবস্থা সমর্থন করা হয় নাই। তবে বৈষ্ণব ও ভগবদ্বিদেষীর জিহ্বা-ছেদনের যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে, তাহা জিহ্বারূপ অঙ্গের ছেদন নহে, পরন্তু শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জিহ্বা-স্তম্ভন বুঝায়—অসন্তুপক্ষে মোন, অথবা স্থান-ত্যাগই বিধি। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ‘শ্রীভক্তিসন্দর্ভে’ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ‘জৈবধর্ম’ ও অন্যান্য গ্রন্থে ‘জিহ্বা-ছেদনের’ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতেও এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরিত্র

সর্বদা পবিত্র,

যেই নিন্দে হিংসা করি’।

ভক্তিবিনোদ

না সন্তোষে তারে,

থাকে সদা মোন ধরি ॥

ভক্ত ও ভগবদ্-বিদেষীর প্রতি সাধকের এইরূপ শাসন ব্যতীত অন্য প্রকার শাসন শ্রীল ঠাকুর অনুমোদন করেন নাই।

অনর্থযুক্ত দুর্বল ব্যক্তি কুপার পাত্র। তাহাদিগকে সংযত বাক্যের দ্বারা শাসনই বিধি। হরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তিই একমাত্র হরিসেবা-তাৎপর্যে অপরের

সংশোধনের জন্ত বাক্যদ্বারা শাসন করিতে পারেন ; তাঁহার সেই বাক্যও সংযত হওয়া দরকার, তাহা যাহাতে রিপু-তাড়িত, নীচ, ক্রোধী ব্যক্তিগণের গায় শ্রীলতা ও শিষ্টতার সীমা অতিক্রম না করে, গ্রাম্যবাহীর অগ্রতম না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে তাঁর সতর্কদৃষ্টি রাখিতেই হইবে। যাহারা হরিভজন-পরায়ণ, অবশেষে তাঁহাদের বেতালে পা পড়ে না।

যদি পুনঃ পুনঃ হিতোপদেশ দেওয়া-সত্ত্বেও কেহ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করাই হরিভজনকারীর কর্তব্য। হরিভজনকারী নিজে ঐরূপ অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদিগকে ঐরূপ অসত্যের সঙ্গ পরিত্যাগে অনুরোধ করিতে পারেন এইমাত্র। এতদ্ব্যতীত অগ্র কোন ইতর নীচ পন্থা হরিভজনকারীগণের অবলম্বনীয় নহে। মঙ্গলাকাজক্ষী ভক্তিপথের পথিকগণ কায়মনোবাক্যে অপরকে উদ্বৈগ-প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন এবং সর্বদা গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিবেন। অপরের প্রতি ভোগবুদ্ধি ও তদুপরি বিচরেই মনের দ্বারা পর-পীড়ন হইয়া থাকে এবং তাহাই ক্রমে ক্রমে বাক্য ও কাণের দ্বারা পীড়নের আকার ধারণ করে। সুতরাং হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তি সর্বদাই ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগের যত্ন করিবেন। হরিভজনেচ্ছু সাধকের ইহা সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, কেহ ভক্তের হিংসা করিলেও ভক্ত কখনও হিংসা করেন না ; এমন কি, মনে মনেও তাঁহার ঐ ব্যক্তিকে পীড়ন করার প্রবৃত্তি উদিত হয় না। নিজের প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিলে ভক্তগণ তাহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত না হইয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকেন ; বিদ্বেষকারী অঙ্গ বলিয়া তাহার প্রতি সাধুর কুপারই সম্ভাব দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গলাকাজক্ষী ব্যক্তিগাত্রেই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। শ্রীর ভূষণ—সতীহু, আর সাধুর ভূষণ—‘ক্ষমা’। ভগবান্ হরিভজনেচ্ছুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু পর-পীড়ন ক্ষমা করেন না। এমন কি, কোন উন্নত সাধকও যদি অগ্নায়ভাবে তাঁহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে পীড়া-প্রদান করেন, তবে তাঁহাকেও ঐ অগ্নায় কার্যের জন্ত ভগবানের নিকট হইতে দণ্ড ভোগ করিতে হয়।) ইহার উদাহরণ শাস্ত্রে বিরল নহে। কেবল কনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠের নিকট অপরাধ হয়, আর শ্রেষ্ঠের কনিষ্ঠের নিকট অপরাধ হয় না—এরূপ নহে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও কনিষ্ঠের নিকট অপরাধী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা যাহাতে ভুলক্রমেও কাহারও মনে অগ্নায়ভাবে ব্যথা প্রদান না করি—(অনধিকার-চর্চা না করি, তদ্বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—পণ্ডিত শ্রীদোলগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

(পূর্বে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২৪ পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার বসিরহাটে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ-পত্রের উত্তর শেষ হইতে না হইতেই, পুনরায় আর একটি বিস্তৃত প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। আমার প্রদত্ত উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৩৫৭ সালের ২য় বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্তিক হইতে মাঘ সংখ্যা অর্থাৎ ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ পর্যন্ত চারিটি সংখ্যায় “শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা”-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অযৌক্তিকতা ও অসারতা স্পষ্টভাবে ও সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্বৈতবাদের বিপদ গণনা করিয়াছেন বুঝিলাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পূর্বে আমি প্রচুর মায়াবাদী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তিনি প্রকাশ্য এবং গোড়া মায়াবাদী। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনোগত ভাব যেরূপ প্রফুটিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ সমালোচকগণের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করি। তাঁহার বর্তমান প্রবন্ধটি মূলতঃ “শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা”-প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রকৃত-প্রস্তাবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চটিয়া যাওয়ায় আমার ঐ প্রবন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমি সজ্জদয় পাঠকবর্গকে উক্ত চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে কোন ভাষার জটিলতা নাই, সিদ্ধান্তের কূট বিচারসমূহ স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি আমাকে অযথা ‘অসৎ-কারণবাদী’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমি সর্বতোভাবে ‘অসৎ-কারণবাদ’কে অস্বীকার করিয়া থাকি। প্রসঙ্গক্রমে আমি শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের ‘শারীরক-ভাষ্য’ হইতে প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়া দিব যে, তিনি ‘অসৎ-কারণবাদে’র কি-প্রকার প্রপ্রয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সর্বতোভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রায়-দর্শনকে অসৎ-কারণবাদী বলিয়া অস্পৃশ্য-বোধ থাকিলে অদ্বৈতবাদিগণ কখনই শ্রায়ের যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্বমত-স্থাপনে ‘উঠিয়া-পড়িয়া’ লাগিতেন না। যদি শ্রায়ের সাহায্যে ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’র শ্রায় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রায়ের সাহায্যে উহা খণ্ডনও করা যাইবে না কেন? স্বার্থপরতাই যুক্তিহীনতার লক্ষণ।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার মনোগত ভাবের দুই একটি নিদর্শন এস্থলে উদ্ধার করিতেছি,—

(১) “শ্রীমদ্ মহারাজের নিকট প্রেরিত আমার প্রথম পত্রে আমার প্রতিবাদ পত্রটি ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করি নাই ; কারণ এই যে—বাদ-প্রতিবাদ উঠিলেই অনেক সময় অপ্রিয় মন্তব্য আসিয়া পড়ে । ঐরূপ অবস্থার মধ্যে নিজেকে মগ্ন করিবার ইচ্ছা ছিল না ।”

(২) “অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাভ্য করিতে গিয়া শ্রীমন্মহারাজ আত্মবিস্মৃত হইবার মত অবস্থায় পতিত হইয়াছেন বুঝিলাম ।”

এস্থলে পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি কথার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । প্রতিবাদী প্রথম পত্রের শেষ অংশে (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) লিখিয়াছেন—“শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে বৈষ্ণবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করত আমাদের * * চিরকৃতজ্ঞ করুন ।”

এই উক্তি হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শঙ্করাচার্যকে বৈষ্ণব সাব্যস্ত করা হউক । কিন্তু দার্শনিক সমাজ আচার্য্য শঙ্করকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন নাই । বিশেষতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোকসকল অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদিগণ ইহা কখনই অঙ্গীকার করেন না ।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরমব্রহ্ম ভগবানকে যেরূপ সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও সনাতন বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন, তদ্রূপ অণুচৈতন্য ভগবদ্ভক্ত জীবসকলও নিত্য ও সনাতন । এতদ্ব্যতীত জীব ও ভগবানের মধ্যবর্তী ভক্তি-বৃত্তিও নিত্যা ও সনাতনী । সেবা, সেবক ও সেবার নিত্যত্বই ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রীবাস-রচিত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত ।

আচার্য্য শঙ্কর এই তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব কোথাও স্বীকার করেন নাই । দুঃখের বিষয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘শঙ্কর-ভাণ্ডে’র আলোচনা নাই । থাকিলে তিনি এই সত্য অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতেন । আচার্য্য শঙ্করের কষ্ট-কল্পনায়, তর্কে ও বিচারে একবস্তু ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই । যাহা কিছু ভেদ বা দ্বৈত এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ সমস্তই তিনি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও ইহা আদৌ প্রতিপন্ন হয় নাই । আচার্য্য শঙ্কর নিগূণ-শ্রুতির বহুমানন করিয়া অগ্ন্যাগ্ন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি বহু গ্রন্থাদিই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন । এমন কি, বেদকেও তিনি মিথ্যা বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন নাই । বেদের প্রামাণ্য স্থির করিতে হইলেও

তাহাতে স্বকপোল-কল্পিত তর্কের আবশ্যকতা আছে বলিয়া বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ “তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই”—ইহা বেদ ও বেদান্তের স্থিতির সিদ্ধান্ত।

অবশ্য একথা সত্য, ‘শারীরক-ভাষ্যে’ আচার্য্য শঙ্কর বহু ভাল কথা লিখিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেই যুক্তিসঙ্গতরূপে বহু ভাল কথা লিপিবদ্ধ থাকে। নচেৎ তাহা সাধারণ লোকের গ্রহণে উৎসাহ হয় না। যিশুখৃষ্টের বাইবেল অর্থাৎ ‘ওল্ড টেষ্টামেন্ট’ (Old Testament) ও নিউ টেষ্টামেন্টের (New Testament) জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বহু ভাল কথা শঙ্কর-ভাষ্যে ও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি; বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক, কন্নী ও মুসলমানদেরও বহু ভাল কথা আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ম শ্রীশঙ্করকে খৃষ্টিয়ান্, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি বলা চলিবে কি? পরস্পর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সাধারণ বহু কথাই সমভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্ম সমস্ত ধর্মমতগুলিকে এক বলা চলে না। কারণ, সমস্তই এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে মনীষীগণের মধ্যে এইরূপ তারতম্যমূলক সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না। প্রত্যেক ধর্মমতের মূল তত্ত্ব-বিচারের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা লইয়াই দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার হইয়া থাকে। তাহা না হইলে আচার্য্য শঙ্করই বা কেন সাংখ্য, পাতঞ্জল, জ্ঞান, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবেন?

দ্বিতীয়তঃ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন,—আমি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দোরায়া করিয়াছি। কিন্তু আমি ইহা সর্বতোভাবে অস্বীকার করি। আমার বক্তব্য,—অদ্বৈতবাদ অসার ও অযৌক্তিক। ইহা আমি “শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা”-প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাই কি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দোরায়া হইল? যদি বিচার-যুক্তিতে ও শাস্ত্রাদি প্রমাণমূলে মার্যবাদ ও অদ্বৈতবাদ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্তই যদি সার বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট হইবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে ‘দোরায়া’ মনে করায় তাঁহার প্রকৃত মুখোমুখি লিখিয়া পড়িয়াছে। তিনি যতই “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (১) জয়তি” এবং “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক”—এইরূপ লিখুন না কেন, তিনি যে শ্রীচৈতন্য-বিরোধী, ইহা তাঁহার লেখনীর প্রত্যেক ছত্রই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। “একে নিন্দে, আরে বন্দে এই মত ভণ্ড”—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মানেন,

শ্রীজীব গোস্বামীকে মানেন না ; আবার জীব গোস্বামীকে মানেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে মানেন না ; কবিরাজ গোস্বামীকে মানেন, কিন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণকে মানেন না ; কেহ আবার কবিরাজ গোস্বামীর সহিত শ্রীযুন্দাবনদাস ঠাকুরের মিল খুঁজিয়া না পাইয়া শ্রীচৈতন্য-বিদ্যেশ্বরী হইয়া পড়েন ; কেহ বা ‘বিমানবিহারী’ হইয়া নিরাকার-নির্কিংশে আকাশে উড়িতে গিয়া ডানা ভাঙ্গিয়া মোহান্ন-কূপে পতিত হন । ইহারা সকলেই “অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব”র ছদ্মবেশী দোরাআকারী ।

চ.টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বুঝিয়াছেন যে, আমি “আত্মবিস্মৃত হইবার মত অবস্থায় পতিত” হইয়াছি । তিনি এই বাক্যের দ্বারা আমার কোন্ যুক্তিকে খণ্ডন করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না । তবে শঙ্করের গ্রন্থ অদ্বৈতবাদিগণের স্বভাবে এইরূপ অসংযত লেখনীর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । সে যাহা হউক, প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধ যত বড়ই হউক না কেন, আমি তাহার প্রত্যেকটি বিচারের প্রতিবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব এবং “তদ্বারা মহারাজের অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য” সাধিত হইবার বাক্যের সফলতা হইবে এবং অদ্বৈতবাদীর প্রকৃত স্বরূপ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২।১টী মন্তব্য এহলে লিখিত হইল মাত্র । প্রথম প্রবন্ধের প্রতিবাদ আমরা আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় প্রকাশ করিতে থাকিব । (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিষ্মু শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব

৩ বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; কার্তিক—১৩৫৮

৫ দামোদর, ২ কার্তিক, ২০ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১০।২ । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ।

৮ দামোদর, ১০ কার্তিক, ২৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-অষ্টমী দি ৪।১২ । বহুলাষ্টমী শ্রীরাধাকৃষ্ণে শ্রীমান-দানাদি মহোৎসব । মতান্তরে শ্রীল গদাধর গোস্বামীর তিরোভাব ।

৯ দামোদর, ৬ কার্তিক ২৪ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-নবমী রা ৬।০ । শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ।

১১ দামোদর, ৮ কার্তিক, ২৬ অক্টোবর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ৮।২৭।
শ্রীরমা একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর, ৯ কার্তিক, ২৭ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ৮।৫৬।
দিবা ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীশ্রীগৌরানন্দ
মহাপ্রভুর শুভবিজয়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৬ দামোদর, ১৩ কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর, বুধবার—গৌর-প্রতিপদ রা
৫।৫৮। পূর্বাঙ্কে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকুট-মহোৎসব। শ্রীল
বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল বসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

১৭ দামোদর, ১৪ কার্তিক, ১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বিতীয়া দি
৪।১৩। শ্রীল বামুদেব ঘোষের তিরোভাব।

২২ দামোদর, ১৯ কার্তিক, ৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার—গৌরাষ্টমী রা ২।৪০।
শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীধননন্দ পণ্ডিতের
তিরোভাব।

২৫ দামোদর, ২২ কার্তিক, ৯ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌরৈকাদশী রা ৯।২৯।
শ্রীউখানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী
মহারাজের তিরোভাব।

২৬ দামোদর, ২৩ কার্তিক, ১০ নভেম্বর, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৮।২৮।
পূর্বাঙ্কে ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। দ্বাদশারস্তপক্ষে চাতুর্মাস্ত্র ও
উর্জ্জ্বত সমাপ্ত। শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে ও শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীল
গৌরকিশোর দাস-গোশ্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।

২৯ দামোদর, ২৬ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ৮।২১।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা। পৌর্ণমাস্যারস্তপক্ষে চাতুর্মাস্ত্র-ব্রত ও
উর্জ্জ্বত সমাপ্ত। শ্রীল ভূগর্ভ গোশ্বামী ও শ্রীল কানীশ্বর পণ্ডিত গোশ্বামীর
তিরোভাব।

গৌরাদ ৪৬৫; অগ্রহায়ণ—১৩৫৮

১২ কেশব, ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণেকাদশী দি ১১।৩৭।
উৎপন্ন একাদশীর উপবাস।

১৩ কেশব, ১০ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১১।৫।
দিবা ৯।৩৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব
মহোৎসব।

২৬ কেশব, ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর, রবিবার—গৌরৈকাদশী দি ১১।৪।
মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১২।৫।
দি ৯।৪২ মধ্যে একাদশীর পারণ।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৯৩৫ বর্ষ } গর্ভোদশায়ী, ৩ কেশব, ৪৬৫ গোবিন্দ
শুক্রবার, ২৯ কার্তিক, ১৩৫৮; ইং ১৬।১১।৫১ { ৯ম সংখ্যা

শ্রী শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী ।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্বাণবল্লী
সুপয়তি নিজ-দাস্ত্রে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥

সুহৃদরুণ-দুর্কল-দ্যোতিতোদ্যমিতম্ব-
শূলমভি বরকাঞ্চী-লাশ্রমূল্যসয়ন্তী ।
কুচকলস-বিলাস-স্বীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
সুপয়তি নিজ-দাস্ত্রে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

সরসিজবর-গভীখর্ব-কাঙ্ক্ষিঃ সমুচ্চ
 তরুণিম-ঘনসারাস্লিষ্ট-কৈশোর-সৌধুঃ ।
 দর-বিকশিত-হাস-সুন্দি-বিস্বাধরাগ্রা
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অতি-চটুলতরং তং কাননাস্তম্বিলন্তং
 ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।
 মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
 পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপ্রাত্নম্ ।
 সুললিত-ললিতাস্তঃস্নেহ-ফুলান্তুরাত্মা
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিবৃথ-প্রসূনৈঃ
 অজগিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনাস্থে ।
 অঘবিজয়-বরোরঃ প্রেমসী শ্রেয়সী সা
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেগু-প্রণাদৈ-
 দ্রুতগতি হরিমারাং প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।
 শ্রবণকুহর-কণ্ঠং তন্নতী নম্র-বক্ত্রা
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
 নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীষম্ ।
 পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
 নুপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
 পারিত্রিক-নিখিলাশা-সন্তুতিঃ কাতরঃ সন ।
 পশুপপতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
 নিজ-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়ান্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি সুরমিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীযুগভানু-রাজের পবিত্র কল্ললতা-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১ ॥

রক্তবর্ণ পটুবস্ত্র-সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোহল্যমান ক্ষুদ্র-ঘটিকা দ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ-কুন্তোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তা-মালার দ্বারা যাহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমার নিজ-দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২ ॥

যাহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার দ্বারা অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট, যাহার কৈশোরামৃত সমুজ্জল তারুণ্য-রূপ কপূর দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং যাহার বিষাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-রস বিস্তার করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥

কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মুহূর্বাক্য দ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমার নিজ-দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৪ ॥

যিনি নিখিল ব্রজ-মহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্নী, যাহার অন্তরাত্মা ললিতা-সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥

এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেমসীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমার নিজ-দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥

যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্বক কুঞ্জমধ্যে কুতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হইয়া কর্ণকুহরে কণ্ঠ্যগণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

নির্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বকাস্বর-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥

যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর-স্বভাবে নির্মল-চিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

অপ্রকট-তিথি *

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-কাল ও স্থান

আট বৎসর পূর্বে শ্রীউত্থান-একাদশী-তিথির ব্রাহ্মমূর্ত্তে শ্রীজাহ্নবী-বক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপে এক মহাত্মা প্রকটলীলা-সমাপ্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সূচক-স্মৃতিদিবস বর্ত্তমান বর্ষে সন্নিবর্ত্তিত। ঢাকাস্থিত শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে আগামী বুধবার, ১৫ই কার্তিক সেই জগদারাধ্য মহাস্হোদয়ের স্মৃতি মহোৎসব-হইবে।

অক্ষজ-দৃষ্টিতেও শ্রীগৌরকিশোরের মহত্ব

এই বৈষ্ণব-শিরোভূষণের কথা অনেকে জানেন না—অনেকে অক্ষজ-জ্ঞানে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ তাঁহার আদর্শ লীলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে কৃতবৃত্ত হইতেছেন। অক্ষজ-জ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলেও আমরা তাঁহার অলৌকিক ও অল্পপম বিষয়-বিরাগ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। তাঁহার সদৃশ বিরক্ত পুরুষের ইতিহাস, ভারতীয় হরিজন-গগনে বহুদিন পরিলক্ষিত হয় নাই।

অধোক্ষজ-দর্শনে শ্রীল ঠাকুরের ভজনের সর্বোত্তমতা

সদাচার-রত আচার্য্য-জগতে অক্ষজজ্ঞানে তাঁহার সর্বোপরি আদর বিচারিত না হইলেও অধোক্ষজ সেবাপর শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজ-ভক্তি-তৎপর

* এই প্রবন্ধ শ্রীল ঠাকুর গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে ১২ই কার্তিক, ১৩২৯ সালে লিখিত এবং ইহা ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' হইতে উদ্ধৃত।

ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু বলিয়াই লক্ষ্য করেন। আমাদের গ্রাম মর্ত্য-মানব, কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানু-কুমারীর সুদলভ নিত্যসেবা লাভ করিবেন সেই অপ্রাকৃত স্বরণ-চিত্র যে জীবনে স্মৃষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই চরিত্রের স্বরণী-সেবা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত-জগতের কিরূপ আদরণীয়, তাহা ভাষায় পরিস্ফুট করিতে অসমর্থ।

শ্রীল গৌরকিশোরের গুরু-পরম্পরা

এই মহাজন এই প্রপঞ্চে শ্রীগৌরকিশোর-দাস গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লৌকিক ভাগবত-পরম্পরা যাহাদের আলোচ্য তাঁহাদের পাঠ্য-বিষয়রূপে আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারি যে, তিনি শ্রীমাথুর-মণ্ডলের শ্রীসূর্য্যকুণ্ড-বাস্তব্য শ্রীভাগবত-দাসের অমুগ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া ছিলেন। বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধনামা শ্রীজগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-দাসের আরাধ্যবস্তু। শ্রীজগন্নাথ-দাস মহারাজ, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীউদ্ধরদাস, শ্রীগোবিন্দ-দাস (বলদেব), শ্রীশ্যামসুন্দর দাস (রাধা-দামোদর), শ্রীবিষ্ণুনাথ প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণকে উত্তরোত্তর ভাগবত-বর্ষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

চ্যুত ও অচ্যুত-বংশ কাহাকে বলে ?

শ্রীগৌর-বংশ-বর্ণনে শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি —

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ ।

সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

—বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কোন শৌক-বংশ বা চ্যুতগোত্রীয় শাখা নাই। তাঁহার অচ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহে আজ ভারতের নানাস্থান তীর্থীভূত হইয়াছে। চ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহ যাহাদিগকে ঋষিকুল বা ব্রাহ্মণকুল বলা হয়, তাহারা নিজ নিজ অক্ষজ-ধারণায় অচ্যুতের প্রকৃত বংশ হইতে আপনাদিগকে দূরে অক্ষজ-জ্ঞান দ্বারা বিক্ষিপ্ত করেন মাত্র। অচ্যুতগোত্রীয়গণ কোনদিনই শ্রীগৌর-ভগবান হইতে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যাধানে চ্যুত হন না।

ভাগবত-পরম্পরা কাহাকে বলে ও তাহার উৎকর্ষ

অক্ষজ-জ্ঞানে পরিদৃষ্ট ব্যবহারিক পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরাকেও তাঁহারা সকল সময় ভাগবত-পরম্পরা বলেন না। চ্যুত-গোত্রের পরিচয় চ্যুত-ধারার গুরু-

পারম্পর্য্য তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, অচ্যুত পারম্পর্য্যই অধোক্ষজ-সেবার একমাত্র উপযোগী। অনেক স্থলে অধোক্ষজ-পারম্পর্য্য অক্ষজ-দ্রষ্টার হস্তগত হইবে জানিয়া এবং তাহার অপব্যবহার হইবে জানিয়া তাহা অপ্রকাশিত আছে। লৌকিক পারম্পর্য্য ব্যতীত শ্রদ্ধা-নদী যে পারম্পর্য্য সম্বন্ধ-জ্ঞানে স্বীকার করেন, তাহাই প্রকৃত ভাগবত-পারম্পর্য্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের অচ্যুত-বংশাবলী

সেই পারম্পর্য্যে অচ্যুত-গোত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাব। শ্রীনরোত্তম হইতেই শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর গুরুভক্তি বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়গণের আদি-পুরুষ। তাঁহার পুত্রের পাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আচার্য্য 'দামোদর'-স্বরূপের অপ্রাকৃত রূপাদি ছয় গোস্বামীর মূলপুরুষ শ্রীসনাতন। সেই সনাতনের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের রঘুনাথ ও শ্রীজীব। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোপাল-ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট। শ্রীসনাতনের প্রচার্য্য বিষয় ভক্তিসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবাচার শ্রীগোপাল-ভট্টে শ্রুত। শ্রীগোপাল-ভট্ট, তুঙ্গবিজা-দেবীর প্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীত্রিদণ্ডী প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর প্রচার্য্য সম্পত্তির মালিক। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যে পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পারমহংস্‌আচার শ্রীসনাতন প্রমুখ গোস্বামিষট্কে প্রকটিত।

শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা, ও তাহাই শ্রীগৌরকিশোরের আচরিত ধর্ম্ম এবং গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর-দাস প্রভুর সেই ত্রিদণ্ডিপাদের সহায়তার জন্ত যে আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয় কীর্ত্তনকারী মাধব-গৌড়ীয়-গণের প্রচারের বিষয় হউক। তাহা এই—

দন্তে নিদাম তৃণকং পদয়োনিপত্য

কৃদ্ধা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহার দূরাৎ

চৈতন্তচন্দ্রচরণে কুরুতামুরাগম্ ॥

(শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃতম্—২০)

শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-শিক্ষা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক—১)

শ্রীত্রিদিগুপাদকে উপরি লিখিত শ্লোকের প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর সেই প্রচারিত বিষয় শ্রীশ্রীমন্তুজিবিনোদ মহোদয়ের অভিন্ন-হৃদয়-সুহৃৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদবর নিজ চরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের সেই গুরুসেবা-দিবসে আমরাও তাহা কীৰ্ত্তন করিয়া গুরুকুলের সেবা করি।

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৪) নিয়মাগ্রহ

Published in

‘নিয়মাগ্রহ’ দুই প্রকার—‘বিধি’ ও ‘নিষেধ’

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ ‘বিধি’-লক্ষণ ও ‘নিষেধ’-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ-নিয়ম। উভয় লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গলজনক।

জীবের উপাদেয়তা-লাভের প্রত্যেক ক্রম-সোপানেরই
বিধি এবং নিষেধ বর্তমান

বহুজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা-প্রাপ্তির যোগ্য। ভূত্বক অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই একটি ‘ক্রম’-সোপান। প্রত্যেক ‘ক্রম’-সোপানই জীবের এক একটি বিশ্রাম-স্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক পৃথক বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নিষ্কারিত আছে; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ-পালনে তিনি বাধ্য।) সেই নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্ন সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ-সোপান-প্রাপ্তির নাম সদগতি।

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই ‘গুণ’ ও তাহা ত্যাগের নাম ‘দোষ’

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম ‘স্বধর্ম’ বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই ‘গুণ’ এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগের নাম

‘দোষ’। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন—

স্বৈ স্বধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্তিতঃ ।

বিপর্যয়ন্তু দোষঃ শ্রাদ্ধভয়োরেব নিশ্চয়ঃ ॥

দেশকালাদিভাবানাং বস্তুনাং মম সত্তম ।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থঃ হি কৰ্মণাম্ ॥

(ভাঃ ১১।২১।২, ৭)

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই ‘গুণ’ এবং তদ্বিপর্যয়ই ‘দোষ’—ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। দেশ কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধের মধ্যে ‘নিত্য’, যথা :—

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিত্তস্ত।

তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি-কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা নিত্য নিয়ম। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া-দত্তোপাধি দ্বারা স্বীয় সিন্ধু অবস্থা হইতে যে পৃথক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য-অবস্থায় জীবের প্রেমই—বিধি ও মৎসরতাই—নিষেধ।) সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বভাবের অনুগত। মৎসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়।) রস গন্ধবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব।) সে-অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্য-স্থিতি।)

নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধ, যথা :—

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়মসকল বহুবিধ হইলেও স্থূল-লক্ষণ বিচারপূর্বক সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটি সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ, গীতা, শ্রুতিসকলের মতেই কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটি স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দিষ্ট আছে। কৰ্ম্ম-বিভাগে বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আহিক কৰ্ম্মগুলি—বিধি। পাতক, উপপাতকাদি—নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে

অর্থাৎ জ্ঞান-বিভাগে সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ-আলোচনা—বিধি। কাম্যকর্ম, নিষিদ্ধকর্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। ভক্তি-বিভাগে ঔদাসীনা ও ভক্তির অমুকুলতার সহিত কর্ম ও জ্ঞান-বিভাগের বিধি-নিষেধ-পালন এবং তদ্বারা দেহযাত্রা-নির্বাহপূর্বক ভগবদনুশীলনই—বিধি। ভগবদ্বিষ্মুখ সমস্ত কর্ম-জ্ঞান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি ও অত্যাগ ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া পরিত্যাগই—এ পর্বের নিষেধ।

বদ্ধজীবের প্রথম সোপান—কর্মকাণ্ড

বদ্ধজীব অবৈধ-জীবন অর্থাৎ অন্ত্যজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হন, তখন প্রথমে তিনি কর্মকাণ্ড-রূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হন। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্থাপিকবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্যন্ত চিদচিদ-আলোচনা ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিবেক-ক্রমে জড়ময় কর্মে তাঁহার নির্বেদ না হয়, সে-পর্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্বেদ উৎপত্তি হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম-নিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্মাধিকারগত নিয়ম-সকলে আগ্রহ করিলে তাঁহার আর উন্নতি সাধন হয় না।

দ্বিতীয় সোপান—জ্ঞান-বিভাগীয় কাণ্ড

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে-পর্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই (জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ) করিতে হইবে; নতুবা তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দুষিত হইয়া উন্নতি-লাভ করিতে পারিবেন না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাবৎ কর্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবত।।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্যন্ত বিবেক-জাত বৈরাগ্য না হয়, সে-পর্যন্ত কর্মসকল করিবে। সেই নির্বেদ ততদিন কার্যকর হইবে, যতদিন কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা—

তস্মান্নভুক্তিযুক্তশ্চ যোগিনো বৈ যদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)

আমার ভক্তিয়ুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়োজনক হয় না । অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তির ক্রিয়া ভালরূপ হইতে থাকে ।

কর্ম-জ্ঞানের সোপান ত্যাগ করিয়া ভক্তির সোপানে নিষ্ঠাই কর্তব্য

কর্ম-প্রেমের মন্দির, শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত । তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দ-লোকময় প্রাকৃত কর্ম-কাণ্ডীয় জগৎ-রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞান-কাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয় ।) কর্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয় ।) ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয় ।

তৃতীয় সোপান—ভক্তি, এবং তাহার ক্রমোন্নতিতে—‘প্রেম’

ভক্তি-সোপানে সমাক্রান্ত পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম । সেই শ্রদ্ধা সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগত-অনর্থ হইলে ভক্তি—নিষ্ঠা-রূপে প্রকাশ পায় । যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতি-সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা-রুচি-রূপে এবং রুচি আসক্তি-রূপে এবং আসক্তি ভাব-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । ভাব রতি-রূপে সামগ্রী-যোগে রস হয় । যথা, একাদশে—

যথা যথায়া পরিমুজ্যতেহসৌ মৎপুণ্যাগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ ।

তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্থেবাঙ্গন-সম্প্রযুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ-কীর্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিষ্কৃত হন, তত তত তিনি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পান । অঙ্গন-সংযুক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ ।

শ্রীল রূপগোস্বামী ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে এই ক্রমটী স্পষ্ট কহিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়কৃতি ।

সাধকানাময়ং প্রেমং প্রাপ্ত্বর্তাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটি সোপান । এই চারিটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত

হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটি সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্তী সোপানের নিয়মগুলিতে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐসকল নিয়ম, শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে; অগ্রবর্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গের ক্রম-সোপানের যাবতীয় বিধি-নিষেধই একটি প্রধান নিয়মের অন্তর্গত

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে সমুদায়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম, যথা—

স্বর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিং ।

সর্বৈ বিধিনিষেধাঃ স্ম্যরেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়)

‘কৃষ্ণ-স্মরণ নিরন্তর কর্তব্য’—এই মূল-বিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদ্ভব হইয়াছে। ‘কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্তব্য নয়’—এই মূল-নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি-কালে পূর্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর-পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উর্দ্ধগতি-লাভে অশক্তি হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ-বিষয়টি সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য।

‘শ্রীহরিভক্তিবিলাসে’ এবিষয়ের বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

কৃত্যগ্ৰেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্ ।

লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় গৃহী, ধনী সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্বাণি তেষাং তাদৃক্ত্বসিক্ষয়ে ।

প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তির্হি সদাচারৈকসাধনা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্ত নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সাধকদিগের ত্যক্তপরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্ত সেইসকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা কর্তব্য। ত্যক্তপরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে শরণাগতি দ্বিবিধ

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বি-প্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহীদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহ্য ত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রত-সকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়।

অনন্ত-শরণাগতের লক্ষণ

গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্ত-শরণাগত হন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক হইয়া পড়ে। সে-অবস্থায় সাধনোন্নতি-ক্রমে একান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা, একাদশে—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদন্তো বানপেক্ষকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংশ্যক্তো চরেদবিধিগোচরঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

একান্তিতাং গতানান্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাজয়োঃ ।

ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্তেত তদ্বৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস)

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।

সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমপেয়ুষাম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন বা নিরপেক্ষই হউন—
তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করত অবিধি-গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ষাঁহার। একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবর্তমান। অর্থাৎ ব্রত-নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়। আমার একান্ত ভক্ত-দিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণসকল স্থান পায় না, কেন না, তাঁহার। সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ ।

কুর্কতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্ত্রম্ রোচতে ॥

বিহিতেষু নিত্যৈশু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে ।

ইত্যাখ্যোক্তানাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ২০ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম-প্রীতির সহিত সাধিত হয় ; সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্ত আর যে-সকল কৃত্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না । সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্বক নিত্য-বিধিসকলে প্রবৃত্ত হন । তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না । এই ‘উপদেশামৃতের’ অষ্টম শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে । ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অগ্ৰাণু কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না ।

**ভক্ত জ্ঞানীর নিয়ম, জ্ঞানী কৰ্ম্মীর নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করেন—
ইহা বাধ্যতামূলক নহে**

তাৎপর্য্য এই যে,—উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছাবিলাস মাত্র । জ্ঞানাধিকারী কৰ্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি-বাধ্যতার সহিত পালন করেন না । ভক্ত্যাধিকারীও তদ্রূপ কৰ্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণবশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন । অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্বক পালন করিয়া থাকেন । সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্তাধিকারী একান্ত ভক্ত ও কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়মসকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হন না ; স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত ভজনে প্রবৃত্ত হন । সাধন-ভক্ত্যমাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক ।

নিয়মাগ্রহ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

উপদেশ এই যে,—স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চ সোপান লাভ হয় । তখন পূর্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না । সাধক এই উপদেশ সৰ্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

শ্রীহর-পার্বতী-সংবাদে

শ্রীসারস্বত লীলা

কৈলাস-শিখরে বসি' শঙ্কর শঙ্করী
 স্নিগ্ধমনে সদানন্দে স্মরে রাম নাম ।
 প্রস্ফুটিত সমস্তাং কিশলয়-রাজি,
 শীতঋতু-সহ সদা বিরাজে বসন্ত ।
 যোগী-ঋষিবৃন্দ-দেব-গন্ধর্ব্ব-মণ্ডলী
 স্তবধারে তোষে সদা দেব আশুতোষে ॥

শোভে মনোহর উপবন । যুগান্তের
 তপোরাশি মূর্ত্তিমান্ যেন স্তরে স্তরে ।
 প্রবাহিতা বিষুপদী নির্মলা জাহ্নবী
 ধূজ্জটির জটরাশি চুমি' ; দীন-জনে
 অহৈতুকী কৃষ্ণকৃপা-সমা, সুশোভিতা ।
 তপন-কিরণ তাহে তৈল-ধারা-সম
 নিপতিত । যেন ভানু মানিয়া মুকুর
 হেরে অকলঙ্ক-রূপে । কিবা রবি, রাহু-
 ভয় করিয়া কল্পনা রাখি'ছে জাহ্নবী-
 পাশে সমস্তক-মণি করদ্বারে ॥

প্রাণীকুল (তথা) অহিংসা-প্রতীক । সবৎসা হরিণী-
 বসি' কহে ঈশ-গাথা, মৃগেন্দ্র কেশরী-
 পাশে । সখা-সখী ভাব । সানন্দে শায়িত
 শিখি-ক্রোড়ে ভুজঙ্গিনী । সুখময় ধাম ॥

প্রশান্ত কৈলাস-গিরি, নন্দী দ্বারপাল ।
 তথা কহিলা পার্বতী, পতি-পদে নমি'—
 “দাসী-নিবেদন—দেব ! কর অবধান ।

শুনেছিনু সন্মোপনে, তব শ্রীবদনে,
 হ'বে ধরাধামে দিব্যসূরি-আবির্ভাব ?
 বড় কোতুহলা আজি, কহ হে শঙ্কর !
 কবে, কোথা, অবতরি' নাশি' মায়ারাশি
 বিস্তারিবে কৃষ্ণগুণ-লীলা সে মহান ?
 অমায়ায় কহ পতি ! শান্তি লভি চিতে ॥”

উত্তরিল দিগম্বর, সুগম্ভীর স্বরে—
 “ধন্য আমি মহেশ্বর ! তব জিজ্ঞাসনে,
 মহানন্দে উদ্বেলিত স্মৃতির সাগর ।
 শুন প্রিয়ে ! অখিল-কল্যাণ-গুণখনি
 শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ-আবির্ভাব-সমাচার ।
 সম্প্রতি প্রেরণা কিগো ! লভিয়াছ চিতে ?—”
 কহিল গিরিজা—“দেব ! দেখি ধরণীতে
 তমোন্ন অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষণজন্মা নর
 বিতরিছে নাম-রস—সুধার ভাণ্ডার ।
 অজানুলম্বিত বাহু সুখেন্দু-সমান,
 কনক-বরণ বহির্বাস পরিধান,
 সে সন্ন্যাসী দেখি' মন উল্লাসে উছলে ।
 তাই এ'-বারতা পুছি তব বিদ্যমানে ॥”

সোল্লাসে ভাষিলা শুনি' দেব উমাপতি—
 “যাঁর কথা পুছিলে, কল্যাণি ! হেরিয়াছ
 সে সৌম্য মুরতি ? আহা ! কি কব মহিমা ;
 জীব-দুঃখে দুঃখী সদা কৃষ্ণগত প্রাণ,
 তেঁই আজি ভোম-লীলা করি'ছে সাধন ।
 শুন দেবি ! ভক্ত-লীলা গুণ-পরিচয়—
 উৎকলে পুরী-ধামে হইয়া উদয়,
 দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্য করিবে স্থাপন,
 ভকতি-সিদ্ধান্তে তেঁহ সরস্বতী-সম ।

এই মহাধনী বিতরিবে বহুরূপে,

এ'-মর-জগতে রাধাপ্রেম-সুধনিধি ।

আচণ্ডালে পিবে, প্রাণ ভরি' । নাম-রসে

ভাসিবে ভুবন । নিন্দুক, পাষণ্ডী, ভণ্ড,

নারকী ব্রাহ্মণ, দুরাচার-ভাগ্যরেখা

যাবে মুছি' ; সর্বজীব হ'বে মাতোয়ারা

ভক্তিভাবে ; লুপ্ত-তীর্থ হইবে উদ্ধার ;

ইহ গৌরলীলা-ব্যাস-বাণীর মুরতি

পৃথিবীতে বিতরিবে শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি ॥”

—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুচরণ

শ্রীজয় ও বিজয়

একদা সনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শনের জন্ত বৈকুণ্ঠ-ধামে উপনীত হইয়াছিলেন । সেখানে তাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের প্রাসাদের ছয়টি প্রাকার-দ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তম প্রাকার-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সমানবয়স্ক, গদাধারী, কেশুর-কুণ্ডল ও কিরীটাদি-শোভিত দুইজন দ্বারপালকে দ্বাররক্ষা-কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন । তাঁহারা ই জয় ও বিজয় । সেই দ্বারপালদ্বয় বনমালা-অলঙ্কৃত, তাঁহাদের কুটিল ক্রভঙ্গী, উৎফুল্ল নাসাপুট এবং আরক্ত লোচনের দ্বারা দুই জনেরই বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বলিয়া মুনিগণ দেখিতে পাইলেন । সেই মুনিগণের গতি সর্বত্র অব্যাহত ছিল । তাঁহারা আপন ও পর—এইরূপ বৈষম্য-জ্ঞানরহিত বুদ্ধিদ্বারা সর্বত্র নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন । তাঁহারা পূর্ব পূর্ব ছয়টি দ্বারই দ্বারপালদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্বৈচ্ছায় অতিক্রম করিয়াছিলেন । এবারও তাঁহারা সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিলেন । তখন জয়-বিজয় নামধারী উক্ত দ্বারপালদ্বয় সেই মুনিগণকে পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের আকৃতিবিশিষ্ট ও নগ্ন দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব অনাদরপূর্বক তাঁহাদিগকে বেত্রদ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন । তখন মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অমর-যোনি প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করিলেন । পরে শ্রীনারায়ণ হঠাৎ সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়া মুনিগণকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন ।

এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিক্রমে সম্ভব হইতে পারে ? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি-প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল ?—এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব ও পর মহাজনগণ যেরূপ অসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল :—

(ক) শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রতিকূলাচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টাদি সম্পাদনের ইচ্ছার জ্বালায় কোনসময় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তুল্য-বলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্য জীবের বল অল্প, আবার পার্শদগণের বল সমান হইলেও তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহরূপ প্রতিকূল্যাচরণ করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবানের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কিক্রমে সফল হইবে—ইহা বিবেচনা করিয়া ভগবান্ নিজেই আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয় ও বিজয়কে অসুর-যোনিতে প্রতিকূল-ভাবাবিষ্ট করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জগুই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে ভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐরূপ অসুর-দেহে আবিভূত করাইয়াছিলেন।

(খ) শ্রীরামানুজাচার্যের অধস্তন শ্রীবীররাঘবাচার্য লিখিয়াছেন—এই দুইজন দ্বারপাল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ স্ক্রুতি-ফলেই দ্বারপালাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ পরিকর নহেন। স্ক্রুতিবশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও সাধারণ বৈকুণ্ঠবাসী অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎ-পরিজনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে পূর্বকথিত (ভাঃ ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) “যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন এবং যাহারা ফলাকাজ্জ্বল-রহিত নিকাম ধর্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন”—এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে “সুমহতী পরিচর্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুগণের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন ?”—এই বাক্যেও জয়-বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ নহেন, সাধনসিদ্ধ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

(গ) শ্রীল সনাতন গোস্বামীও বৃহত্তাগবতামৃতে ২।৪।১২৪ শ্লোকের টীকায়— ইহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আর অষ্টম

স্বক্কে (৮২১।১৬) নন্দ, সুন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিশ্বকসেন, গরুড় প্রভৃতি পার্শদগণের মধ্যে যে জয়-বিজয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা বামন-দেবের পার্শদ এবং শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় হইতে পৃথক্ । কারণ শাপগ্রস্ত জয়-বিজয়ের কৃষ্ণাবতারে শাপ-মোচন হয় । সুতরাং বামনাবতারে আবার তাঁহাদেরই পার্শদত্ব কিরূপ সম্ভব হইবে ? অর্থাৎ তাহা অসম্ভব । অতএব ত্রিপাদ-বিভূতিবর্তী যে-সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্শদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন এবং সাধনসিদ্ধ ।

(ঘ) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১।৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,— “কারুষ-দেশাধিপতি শিশুপাল, দন্তবক্র পূর্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল—‘জয়-বিজয়’ ছিলেন । (ভাঃ ৭।১।৩৪) শ্লোকে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রাকৃত দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে ঘটতে পারে,—শ্রীযুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট । সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের গ্রায তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই—একথা স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি হইতেই জানা যায় । শ্রীভগবান্ নিজামুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন,—“তোমরা মর্ত্যালোকে গমন কর । তোমরা ভীত হইও না । তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক । উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থান-কালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ত অশ্বখমার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাদের প্রতি ব্রহ্মশাপ খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না ।” শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, ‘জয়-বিজয়’ শ্রীসনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । পাদ্মোত্তরখণ্ডের গতানুসারে জানা যায়, শ্রীহরি নিজ ভক্তের চিত্র-বিনোদনের জন্ত এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘটন-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম জ্যোতির্ময় দেহ, পাখিব গুণময় দেহ তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন ।

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃস্বস্ত্রাজৌ তব ।

অধুনা শাপনিম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রেহতাংহসৌ ॥

(ভাঃ ৭।১।৪৬)

শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃস্বসার (কুন্তীদেবীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । কৃষ্ণচক্রে তাঁহাদের পাপ হত হওয়ায় তাঁহারা এখন শাপ-নিম্মুক্ত । উপরি উক্ত শ্লোকের দ্বীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণচক্রেণ হতমহো যমোঃ তৌ । তমোঃ

পাপমেব হতং, ন তু তাবিতার্থঃ ।” অর্থাৎ কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অর্থাৎ জয়-বিজয় হত হয় নাই — ইহাই তাৎপর্য ।”

শ্রীজয়-বিজয়কে অভিশাপ-প্রদানের পর শ্রীনারায়ণ সেইস্থানে আবিভূত হইয়া মুনিগণকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিলেন । মুনিগণ ভগবানের মধুরবাক্য ও শ্রীমূর্তি-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তদুপরি তচ্চরণে প্রণিপাত করিবার সময় তদীয় পাদপদ্ম-সৌরভমিশ্রিত তুলসীর আঘ্রাণ তাঁহাদিগের নাসাবিবরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনকে উন্টাইয়া দিয়াছিল । ইতঃপূর্বে তাঁহারা ‘ব্রহ্মানন্দময়’ ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ভগবানের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সৌরভের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের চিত্ত ও শরীর ভগবন্মাধুর্য্যানুভবানন্দে পরিপূরিত হইল—চিত্ত ক্ষুভিত হইল ও সেই ক্ষোভ কম্পাশ্রু-পুলকাদিরূপে শরীরে প্রকাশ পাইল ; তাঁহারা ‘ভক্ত’ হইলেন ।

দৈত্বেই ভক্তের ভূষণ । চিত্তে ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের প্রথম প্রকাশ—দৈত্বে । যে মুনিগণ কিছুক্ষণ আগে ক্রোধ শাপ-প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মুনিগণ এখন শ্রীভগবানকে বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমরা আপনার সেবানিরত নিরপরাধ ভূত্যদ্বয়কে অকারণে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি । তজ্জন্ত আপনি আমাদের উচিত শাস্তি বিধান করুন এবং ইহাদের প্রতি প্রদত্ত অভিশাপকে আপনার যেরূপ ইচ্ছা অন্তথা করুন, তাহাতে আমাদের পূর্ণ অনুমোদন আছে ।”

তদুত্তরে শ্রীভগবানের বাক্য (ভাঃ ৩।১৬।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—“(ভগবান্ কহিলেন,) হে বিপ্রগণ ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত । আমি এই পরম-ভক্তদ্বয়ের আশ্রয়-ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠ আনাইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনাদের দ্বারা শাপ-প্রদান করিয়াছি । এস্থলে আমার পার্শ্বদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোন অপরাধ নাই ।”

সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—“হে ভগবন্ ! আপনি ভক্তবৎসল । স্ততরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ-প্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল ?”

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—“হে বিপ্রগণ ! আপনারা সর্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন ; আমার বলা বাহুল্য মাত্র । জয়-বিজয়ের প্রেম-বিজুস্তিত কোন ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ । তাঁহারা আমার যুদ্ধকৌতুক অনুভবের ইচ্ছা দেখিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘হে প্রভুবর ! আপনি দেবতাগণেরও

অধিদেব—বৈকুণ্ঠনাথ । মর্ত্যজীবের সামর্থ্য অতি অল্প । আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধ-সুখ হইবে না । অতএব আমাদিগকে কোনপ্রকারে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধ-সুখ অনুভব করুন । আপনার স্বতঃপরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না । অতএব আপনি স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্য-গুণ খর্ব করিয়াও অস্বদৃশ কিস্করদ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন ।”

সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদনার্থই ভগবানেরও তৎকালে ঐপ্রকার বাসনার উদয় হইয়াছিল । তৎপরে জয় ও বিজয় ভূতলে প্রথমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । ভগবান্ নৃসিংহদেব-কর্তৃক হত হইয়া তাহার রাবণ-কুন্তকর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করে । সেই জন্মে তাহার শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক হত হয় । পরে শিশুপাল-দন্তবজ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া শাপ-মুক্ত হয় ।

পরমারাধ্যতম জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে শ্রীজয়-বিজয়ের তিনবার জন্ম ও শেষজন্মে শাপমুক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-ঋষি প্রশ্ন করিলেন— “হিরণ্যকশিপু ‘রাবণে’র দেহ ধারণপূর্বক দৈত্য অশুরগণেরও দুস্ত্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু মুক্তিলাভ করে নাই । সেই দৈত্য আবার ‘শিশুপাল’-দেহে কি-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ সাযুজ্য লাভ করিল ?” তদুত্তরে পরাশর বলিলেন— শ্রীনৃসিংহদেব আবিভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে ‘ইনি বিষ্ণু’—এবুদ্ভি না করিয়া কোন পুণ্যরাশি-সমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল । রজোগুণের উদ্রেক-হেতু মরণ-কালে শ্রীভগবানের রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধন-ফলে রাবণ-দেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল । এই কারণে ভগবানকে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়-বিগ্রহ-বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই । সে রাবণ-দেহে কাম-পরবশত্ব-হেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্য-বুদ্ধিই হইয়াছিল । শ্রীরাম-হস্তে পতন-ফলে পরজন্মে সে শিশুপালদেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজবংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্যলাভ করিয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ ‘বাসুদেব’ বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্ম পর্য্যন্ত বিবেচন-ফলে

তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায়, নিন্দন-তর্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বন্ধমূল বিদ্বেষভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্ভূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপস্থত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিম-কালে ঘেঁষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজ বিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় সে পরমব্রহ্ম ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণ-প্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রতিকূল অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণদেবীগণ যখন বৈরাগ্যবন্ধ-দ্বারাও সদৃগতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল-অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্বাপেক্ষা উত্তম গতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্বে ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয় ছিলেন, পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল—এইমাত্র বলিয়াছেন। অতএব এই ভগবৎ-পার্ষদদ্বয় যে, সকল কল্পেই অমুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে। তাহা না হইলে প্রতি-কল্পেই ভগবৎ-পার্ষদগণের পতন হয়—একথা বড়ই অসঙ্গত। অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাশক্তির ত্রায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাশক্তিও নিত্য বর্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়কগণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রচুর সন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূল-ভাবাপন্ন অনাদি-বহির্মুখ জীব, অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূল-ভাবযুক্ত করিয়া এবং তাহারাও প্রতিকূল-ভাবাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়া-বৃত্তি চরিতার্থ করেন। এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদগণের পতন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্বলিখিত প্রবন্ধ*

হরিভক্তনের অধিকারী ও বর্ণ-বিচার

বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অগ্রতম শ্রীচমস-মুনির উক্তি,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

অর্থাৎ চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। পরিপ্রশ্ন হইতে পারে যে, চারিবর্ণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর-ভজন না করিলে পতিত বা নিয়মগামী হইবে; কিন্তু চারিবর্ণ ব্যতীত অগ্ৰাণ্ড যে-সকল শঙ্কর-বর্ণাদি জাতি আছে, তাহাদের ত' ঈশ্বর-ভজন না করিলে পতিত বা নিয়মগামী হইতে হইবে না? সুতরাং ঈশ্বর-ভজন ঐ চারিবর্ণের জন্ত, অগ্র বর্ণের জন্ত নহে—এই পরিপ্রশ্নের সমাধানকল্প শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে শচীমাতার জিজ্ঞাসা-ছলে লিখিয়াছেন—

মা'য়ে বলে,—“আজি, বাপ, কি পুঁথি পড়িলা ?

কাহার সহিত কি বা কন্দল করিলা ?”—

প্রভু বলে,—“আজি পড়িলাও কৃষ্ণনাম।

সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥

সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্তন।

সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন ॥

... * প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। লেখক ইহা ১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৭ সালে বৃন্দাবনে বসিয়া লিখেন। এই প্রবন্ধের কোনও শিরোনাম লিখা ছিল না। দুইটি সংক্ষেপ শিরোনাম পরে বসান হইয়াছে।

সেই শাস্ত্র সত্য - কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য় ।

অতথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১২২-১২৫)

তথাহি জৈমিনি-ভারতে আশ্বমেধিকে পৰ্বণি—

“যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে ।

শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥”

“চণ্ডাল ‘চণ্ডাল’ নহে,—যদি ‘কৃষ্ণ’ বলে ।

বিপ্র ‘বিপ্র’ নহে,—যদি অসংপথে চলে ॥”

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১২৬-১২৭)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা, এবং ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন অসদ্বৃত্তিজীবী কৃষ্ণ-ভক্তিহীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ । জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজনকারীদিগকে দর্শন নিষিদ্ধ ।

রুচি, বৃত্তি-স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই মানুষের বর্ণ-নির্দেশ বিধেয়—ইহাই সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাস-পাণ্ডুরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত ।

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।” (গীঃ ৪।১৩)—গুণ-কর্ম্মানুসারে জীব চারিবর্ণ ও বর্ণ-শঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হয় । অতএব যাহারা ঈশ্বর-ভজন না করে, তাহারাই বহিষ্মুখ বা পতিত ।

কৃষ্ণ-বিস্মৃত বহিষ্মুখ জীবের ক্লেশ-বর্ণন

এ-যুগে উচ্চ-নীচ বর্ণবিচার না করিয়া, সেখর কপিলের মূল শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি-জন্ত গর্ভবাসাদি ক্লেশ সম্বন্ধে মাতার প্রতি দেবহুতি-কপিলের আশ্রয় যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

চিত্ত দিয়া শুন' মাতা ! জীবের যে গতি ।

কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥

মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস ।

সর্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব-পাপের প্রকাশ ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২-২০৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিলেন,—

মাতঃ ! এই যে কালের কথা কহিলাম, মানুষ ইহার প্রভাবেই চালিত হয় ; কিন্তু মেঘসকল বায়ু-কর্তৃক বিচলিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত

হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না। মনুষ্য স্রুথের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে-যে বস্তু উপার্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে-সমুদায় বস্তুই বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুর্গত জীব মোহবশতঃ পুত্র-কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গৃহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; স্রুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। পশুসকল এই সংসারে যে-যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতে সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে; তাহারা কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহাৰাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় দুরাশয় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দক্ষীভূত হইতে থাকে। তাহাতেও অপারক হইয়া সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্মবহুল স্রুথ-দুঃখপ্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের অধি আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্ঞন-বিরচিত সন্তোগাদিরূপা মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতে থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখ প্রতিকারের যত্ন করিতে গিয়া দুঃখই লাভ করে এবং উহাকেই স্রুথ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

মূঢ় ব্যক্তিগণ তথাকথিত স্বজন-পোষণে অধোগতি লাভ করে এবং সদস্য উপায় দ্বারা নানা স্থান হইতে অর্থোপার্জনপূর্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহাৰ করিয়া অতি কষ্টে জীবন-ধারণ করে। উপজীবিকা-রহিত হইলে তখন অত্র উপায় অবলম্বনে বারংবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হয় এবং তখন যুগিত লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। এইরূপে অত্যন্ত পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াও হতভাগ্য পুরুষগণ বারংবার যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন তাহারা হতশ্রী, দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের মধ্যে কাহারও বিরাগ উপস্থিত হয় না! জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবজ্ঞা করিয়া

তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুকুরের
 ঠায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে ; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন
 করিলে মায়া-মোহাচ্ছন্ন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ, মৃতপ্রায় ব্যক্তির প্রতি
 তাহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া আর্তনাদ
 করিতে থাকে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করে ।
 কিন্তু সে তখন কাল-পাশের বশবর্তী হইয়া মৃত্যু-বরণ-সময়ে বন্ধুগণের কোন
 কথারই উত্তর দিতে পারে না । কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপ্তচিত্ত অজিতেন্দ্রিয়
 ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোক্তমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয়
 দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয় এবং অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ
 করে ।

এইরূপ গৃহব্রত ব্যক্তির মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিয়া
 উপস্থিত হয় । ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রাস ও ভয় পাইয়া পুনঃ
 পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে । অনন্তর যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে
 স্কুলদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে পাশ
 বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া
 যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ-পথে প্রস্থান করে ।
 যমদূতগণের তিরস্কার বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং
 সর্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয় । পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে
 আসে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ
 করিতে করিতে চলিতে থাকে । যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়,
 তাহা প্রতপ্ত বালুকা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত বন্ধুর পথ ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা
 পানীয় জল নাই ; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত ; সূর্য্য-কিরণ এবং দাবানল
 দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও, যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে
 কশাঘাত করিতে থাকে ; সুতরাং সে অতিকষ্টে পথে চলিতে বাধ্য হয় ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

বৃন্দাবন

অনর্থ-নিবৃত্তি

‘অর্থ’ কাহাকে বলে, ইহা প্রথমতঃ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হওয়া কর্তব্য। ‘অর্থ’-শব্দে আমরা সাধারণতঃ ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও শব্দের বাচক প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি। ‘অর্থ’ শব্দে যদি আমরা ধনকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে স্বাবরাস্থার সম্পত্তিকেও বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি যে, ‘ধন’ শব্দে একমাত্র ভগবান্ ও তন্মামই উপলক্ষিত হইয়াছে।

জগতে যত প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে স্পর্শমণিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এহেন শ্রেষ্ঠ-বস্তু পাইয়াও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, নদী-তীরে বালুকা-ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং প্রকৃত ধন বা পরমধনের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ যে ধন লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিত্য, সত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ। সে ধন লাভ করিতে পারিলে জগতে কাহারও আর কিছু লাভ করিবার আশা হৃদয়ে উদ্ভিত হইতে পারে না। অর্থাৎ সর্বপ্রকারের অভাব-বোধ হৃদয় হইতে চিরতরে নির্বাসিত হয়। কারণ ধন, রত্ন, মণি-মাণিক্যাদি যতই লাভ করা যায়, ততই ঐগুলি আরও অধিকতর লাভ করিবার আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মাণিক্যাদি ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি আনন্দদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহাদ্বারা পূর্ণানন্দ-লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু পরম-ধন লাভ করিতে পারিলে—“প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্” অর্থাৎ প্রতি-পদ পূর্ণ অমৃত আস্বাদনের বিষয় হয়। আংশিক বা খণ্ডভাবে আশা প্রপূরিত হয় না।—ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন গোস্বামিপাদ তাঁহাকে স্পর্শমণির সন্ধান দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার ধন-পিপাসার শান্তি হইল না; ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গভীর চিন্তায় নিপতিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, “এই স্পর্শ-মাণিক্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন নিশ্চয়ই ইহার নিকট আছে; নচেৎ কেনই বা গোস্বামী ঠাকুর ইহাকে ত্যাগ করিলেন? সুতরাং আমাকেও সেই ধন লাভ করিতে হইবে।” এইরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—

“যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তাহার খানিক।

মাগি আমি নতশিরে, এত বলি’ নদী-নীরে, ফেলিলা মাণিক ॥”

অবশেষে গোস্বামিপাদ সেই ব্রাহ্মণকে সৰ্ববেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ ও সার শ্রীভগবন্ম-রূপ রত্ন দান করিয়া, তাঁহাকে জড়েন্দ্রিয়-প্রসূত ধন-পিপাসার কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি কৃষ্ণধনে ধনী হইলেন।

‘অর্থ’-শব্দে যদি ‘বস্তু’কে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়সমূহকে বুঝাইয়া থাকে। ঐ ‘বস্তু’-শব্দে ‘সংপাদ’, বা ‘সত্য’ প্রভৃতি অর্থও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বস্তু-শব্দে ‘বাস্তব বস্তু’কে স্বীকার করিয়াছেন—“বেদং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।”

আর ‘অর্থ’-শব্দে যদি ‘প্রয়োজন’ বুঝি, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রত্যেক জীবের জাগতিক চিন্তাশ্রোতবৃত্ত কৰ্ম্ম-ধারার অনুকূলে যে-সকল প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে, বিজ্ঞগণ তাহাকে প্রয়োজন বলেন না; কারণ এরূপ প্রয়োজনের দ্বারা মানবকুল কখনও পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর সেবালাভ করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর নিত্য সেবা-প্রাপ্তিই—জীবগণের পক্ষে পরম প্রয়োজন।

অতএব ধন, বস্তু ও প্রয়োজন প্রভৃতি প্রত্যেকটী শব্দকে কেবল ‘অর্থ’-শব্দের বাচক না বলিয়া, ‘পরমার্থ’ শব্দের বাচক বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিপরীতার্থ-দ্যোতক বিষয়কে ‘অনর্থ’ বলিয়া অভিহিত করা হয়—

মায়া মুগ্ধস্য জীবন্ত জ্ঞেয়োহনর্থশ্চতুর্বিধাঃ ।

হৃদৌর্দ্বল্যঞ্চাপরাধোহসতৃষ্ণা-তদ্বিভ্রমঃ ॥ (ভজনরহস্য)

মায়া মুগ্ধ জীবগণ মোহের কবলে পতিত হইয়া অনর্থ-চতুষ্টয়ের অধীন হইয়া পড়ে। হৃদয়দৌর্দ্বল্য, অপরাধ, অসতৃষ্ণা ও তদ্বিভ্রম প্রভৃতি অনর্থগুলি জীবগণকে সৰ্বদাই বিপদগ্রস্ত করিতেছে।

হৃদয়ের দুর্বলতা ভগবদ্ভক্তি-পথের একটী কণ্টক-স্বরূপ। কারণ হৃদয়দৌর্দ্বল্য থাকিলে জীবগণ কৃষ্ণোত্তর বিষয়ে অত্যাশঙ্ক হইয়া পড়ে। আবার অত্যাশঙ্ক-বশতঃ গ্রাম্য কুটীনাটী আলোচনায় লিপ্ত হইয়া যায়। এরূপ কুটীনাটী-বিষয়ে লিপ্ত হইলে অগ্রায়বশতঃ পরদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অতএব প্রথম অনর্থ—হৃদয়দৌর্দ্বল্য আমরা চারিপ্রকার বলিতে পারি।—

কৃষ্ণনাম-স্বরূপেষু তদীয় চিৎকণেষু চ ।

জ্ঞেয়ো বুদ্ধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ (ভজনরহস্য)

কৃষ্ণনামে, স্বরূপে, ভক্তে ও অন্ত নরে—অপরাধভেদে হৃদয়দৌর্ভল্য চতুর্বিধ ।
 দ্বিতীয় অনর্থ—ঐহিক ও পারত্রিক এষণা, ভূতিকাম ও মুক্তিকাম-ভেদে
 চতুর্বিধ । তৃতীয় অনর্থ—অসতৃষ্ণাও চতুর্বিধ । কৃষ্ণ ও কাঞ্চ'সেবা বাদ দিয়া
 কি-উপায়ে ইহলোকে সুখ ও পুণ্যাদি অর্জন করিয়া পরলোকে সুখভোগ করিতে
 পারা যায়, এতাদৃশ চেষ্টার নাম—ঐহিক ও পারত্রিক এষণা । কৃষ্ণভোলা জীব-
 গণের ঐরূপ চেষ্টাকে তত্ত্ববিদগণ 'অসতৃষ্ণা' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । সম্পত্তি
 বা ঐশ্বর্য্য-কামনা অথবা অগ্নিমাди অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি-কামনাকে ভূতি-কাম
 বলা হয় । ইহা দ্বারা মানবকুলের কোন সুবিধা হয় না ; পরন্তু সকলে তসুবিধার
 মধ্যেই পড়িয়া থাকে । কারণ জগতের লোকগণ যদি দৈবক্রমে কিছু ঐশ্বর্য্যবান্
 বা বিজ্ঞানালী হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা নাস্তিক হইয়া ভগবৎ ও তত্ত্বজ্ঞানের
 বিদেষ-আচরণে প্রবৃত্ত হন । তাই জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন—

“কনক-কামিনী,

প্রতিষ্ঠা-বাধিনী,

ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব ।”

অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি দ্বারা কখনই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না । ইহা দ্বারা
 আত্মার প্রসন্নতা লাভ হয় না ।—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদন্তথা ক্রায়া ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

সুতরাং যমাদি সাধনকে ভূতি-বাঞ্ছা নামক অসতৃষ্ণা বলিয়া আখ্যা
 দেওয়া যায় । মুক্তি-কামনাও একটা অসতৃষ্ণা । অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নামই
 মুক্তি । জ্ঞানী ও কৰ্ম্মিগণ সদাই মুক্তি ও ভুক্তি কামনা করিয়া থাকেন । কিন্তু
 ভগবদ্বক্তৃগণ কখনও অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত মুক্তি ও ভুক্তি কামনা করেন না ।
 জ্ঞানী ও কৰ্ম্মিগণ ঐহিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যাবতীয় কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ;
 কিন্তু ভগবদ্বক্তৃগণ ঐহিক দুঃখ-নিবৃত্তির কোনমাত্র চেষ্টাই করেন না । উপরন্তু
 অনেকস্থলে কেবলমাত্র দুঃখকেই বরণ করিয়া থাকেন । কারণ দুঃখ সকল সময়ে
 লাগিয়া থাকিলে দুঃখহারী ভগবান্ ভক্ত-হৃদয় হইতে এক পল-মাত্র সময়ের জন্যও
 ছাড়িয়া থাকিতে অবসর পান না । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে,—কুরু-পাণ্ডবের
 যুদ্ধান্তে বিজেতা পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরিয়া পাইয়া রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলে,
 পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর রাজমাতা কুন্তীদেবীর নিকট
 বিদায় গ্রহণমানসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, কুন্তীদেবী
 যাহাতে পুত্রদের সব সময়েই বিপদ ও দুঃখ লাগিয়া থাকে—এতাদৃশ বর প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। কারণ পুত্রদের দুঃখ লাগিয়া থাকিলেই কৃষ্ণ কখনও একমুহূর্তের জন্য তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, অর্থাৎ কৃষ্ণকে হৃদয় হইতে বিদায়ের পরিবর্তে প্রকারান্তরে কুন্তীদেবী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবায় বর প্রার্থনা করিলেন। তাই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তিগণ শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন,—

তোমার সেবায়,

দুঃখ হয় যত,

সেও ত পরম সুখ।

সেরা-সুখ-দুঃখ,

পরম সম্পদ,

নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ (শরণাগতি)

ভগবদ্ভক্তিগণের নিকট দুঃখই সুখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, দুর্দিনগুলিকে সুদিন বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ মুক্তিকে ‘কৈতব’ বা ‘কপটতা’ আখ্যা দিয়া থাকেন—

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ চৈঃ চঃ অঃ ১।৯২)

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি শ্রা-

দৈবেন ন ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেহস্থান্

ধর্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষা ॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭)

হে ভগবন্! তোমাতে যদি কাহারও নিশ্চলা ভক্তি উদ্ভিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য মুক্তি কুতাঞ্জলিপুটে সময় প্রতীক্ষা করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তিব্যাঞ্জা ও অসভৃষ্ণার অন্তর্গত।

স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বয়োঃ ।

বিরাধিবিষয়ে চৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্কিধাঃ ॥ (ভজনরহস্য)

আত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও বিরোধি-বিষয়-তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্কিধ তত্ত্ব-ভ্রম। ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরু শ্রীচরণাশ্রয়ে নিরপরাধে দ্বাদ্বিংশৎ বর্গ ও ষোড়শ-নামাত্মক কলিপাবন মহামন্ত্রের সম্যক সাধন করিতে হইবে। ইহাই বলিহত জীবকুলের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে করিতে সাধক-জীবসমূহের হৃদয়-গুহা হইতে অনর্থ-চতুষ্টয় দূরে অপসৃত হয়। তখন তাঁহারা অনর্থ-নিম্মুক্ত হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা শ্রীগনু মহাপ্রভুর

উপদিষ্ট নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীনাম-প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব রূপা ভগবন্মমাপি

দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শ্রীশিক্ষাষ্টক—২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার ।

রূপাতে কহিল অনেক-নামের প্রচার ॥

থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।

কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥

‘সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।

আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ২০: ১৭-১৯)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বর্তমান সভ্যতার মানদণ্ড

আজকাল সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ কেবলমাত্র চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ বা দু’এক গদ ইংরাজী জানা না জানার উপর দিয়াই পরিলক্ষিত হয়। ইহার উপর যদি কিছু টাকা বা কয়েক বিঘা জমি-জমা কাহারও থাকে, তবে তিনি যতই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম বা দুষ্কর্ম করুন না কেন, আধুনিক সভ্য-সমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য না হইয়াই পারিবেন না। পথে-ঘাটে চলিতে গেলে দেখিতে পাই— দু’এক গদ ইংরাজী না ঝাড়িতে পারিলে তাহাকে কেহ মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। কেহ যদি কোন বড়লোকের বাড়ীতে বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া যান, তবে বাবু আগে তাঁহার চাকরকে পাঠাইয়া জানিতে চাহেন—‘দর্শন-প্রার্থী মোটরে করিয়া আসিয়াছেন কিনা, দেখিতে ভদ্র কিনা’ অর্থাৎ তিনি রূপবান্ কিনা এবং তাঁহার ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আছে কিনা ইত্যাদি। যদি সেই ভৃত্য আসিয়া বাবুর উপরি উক্ত ধারণামুযায়ী সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে তবেই সেই দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকর ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন, মতুবা যদি বাবু তাঁহার ধারণার

বিপরীত কিছু শ্রবণ করেন তবে সেই আগন্তুককে বাড়ির বাহির হইতেই বিদায় লাভ করিতে হয়। যাহারা আধুনিক ‘এটিকেট’ মোটেই জানেন না, সেই সেকলে ধরণের চটি পা’য়, গায়ে একখানা চাদর, মাথায় শিখা, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কিন্তু ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ একবারে ‘দেশী সাহেব’ নহেন, তাঁহারা আজকাল নব্য-শিক্ষিত বাবুদের কাছে মানুষ বলিয়াই গণ্য নহেন। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে অত্যন্ত গর্কিত হইয়া যিনি দিবানিশি কলি-পঙ্ককের দাশ্যে রত, যিনি গভর্ণমেণ্ট বা পাবলিককে দুই দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়া খেতাব অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন, যিনি সর্বসময়ে অপরকে উদ্বিগ্ন প্রদানের জন্য ব্যস্ত, জীব-হিংসারত, নিজের অনিত্য সুখের জন্য পাপকর্ম করিতে যাহার বিন্দুমাত্র ভয় নাই, যাহার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও নাই, যিনি স্বার্থপর, পরসুখে-দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, ক্রোধী, দন্ত-পরায়ণ, বিষয়-মদে অতুষ্কণ মত্ত, হিংসা-গর্কই যাহার অলঙ্কার-স্বরূপ, যিনি নিদ্রালস্য-পরবশ হইয়া সর্বদা সর্ব সুকার্য্যে বিরত কিন্তু অকার্য্যে উত্তোগী, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বদা সাধুসঙ্গ-বিবর্জিত, যাহার চিত্ত সর্বদা অসন্তুষ্ট অতএব যিনি বাহিরে ধনবান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র, যিনি বাহিরে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও ভগবদ্বিষয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন নিতান্ত মূর্থ, যিনি সাধু-মহাজনের নির্দিষ্ট পন্থা উল্লঙ্ঘনের জন্য অশ্রীত-পন্থী, যিনি একবার ভুলিয়াও ভগবানের নাম মুখে আনেন না, যিনি চিং-জড়-সমন্বয়বাদী অথবা সত্যে মিথ্যা বা মিথ্যায় সত্য-দর্শনহেতু বিবর্তবাদী, যিনি ভগবৎসেবা-সম্বন্ধবিহীন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, ভগবৎসেবা ভিন্ন ইতর-তৃষ্ণায়ুক্ত, সরলতাকে বিসর্জন দিয়া যিনি কপটতাকেই একমাত্র সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহার আশ্রয় লইয়াছেন—তিনিই হইতেছেন বর্তমান যুগের সভ্য মানব; আর যিনি নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যে দিবানিশি ভগবানের নাম কীর্তন করিতেছেন এবং ভগবৎসেবায় নিমগ্ন আছেন, যিনি জগতের লোকের প্রদত্ত মান বা অপমানে বিন্দুমাত্র উল্লসিত বা অসন্তুষ্ট নহেন, যিনি জগতের লোকে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, ভ্রমাদি দোষশূন্য মহাজন-পদাশ্রয়-হেতু যিনি নিজেও তত্তদোষ-দুষ্ট নহেন, সুতরাং যাহার সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্য-ভ্রম জন্য বিবর্তবুদ্ধি হয় নাই, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না, যিনি তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর যে স্বর্ষীকেশ তাঁহার সেবায় সতত নিযুক্ত, যিনি মহাজনকথিত সর্বসদৃগুণপূর্ণ—তিনিই বর্তমানযুগের সভ্যতা-বাদীদের নিকট ‘অসভ্য’ বলিয়া

পরিচিত । ধন্য সভ্যতা ও অসভ্যতার আধুনিক ধারণা ! এই বিপরীত ধারণার
বশবর্তী হইয়াই বর্তমান জগৎ চায় তাহার উন্নতি ! কিন্তু ইহার দ্বারা প্রকৃত
উন্নতি সম্পূর্ণই অসম্ভব ।

—শ্রীহরিদাস রায়

পরিত্রমার শংখরব

ভবাটবী-দুঃখ-তলে কে আছ বসিয়া,
বৃথা সুখ-বারি আশে চাতকের সম ।

এস ত্বরা করি' সবে এস হে ছুটিয়া,
ব্রজধামে পাবে যদি শান্তি অনুপম ॥

'সাধু-সঙ্গ,' 'নাম-গান,' 'ভাগবত-শ্রবণ,'
'মথুরা-বাস,' 'শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি-সেবন' ।

সকল সাধন-সার এ-পঞ্চ সাধন—
মাধবের প্রীতি বলি' গায় সাধুজন ॥

তাল, মধু, কুমুদ, বহুলা, কাম্যবন,
খদির, বৃন্দাবন—যমুনার পূব পারে ।

ভদ্র, বিল্ব, লৌহ আর ভাণ্ডার মহাবন—
পশ্চিম যমুনা-পারে দেখহ সাদরে ॥

এই ত দ্বাদশবন—কৃষ্ণলীলা-ভূমি-
পরিত্রমা-সেবা-সুখ যদি চাও সবে ।

ধনী-মানী-ভেদে যত মাতা, সূত, স্বামী,
সকল যাতনা ছাড়ি' ছুটে এস তবে ॥

স্বরাটের সেবা ছাড়ি' ভুলি' স্বাধীনতা,
চির পরাধীন কেন কামাদির বশে ।

স্বরাট সুশীল কৃষ্ণ সেবায় ধীরতা,
লভিলে হ'বে স্বাধীন পর ধামাবাসে ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

আমরা বিগত ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার তারিখের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র কলিকাতা সংস্করণে উক্ত শিরোনামায় একটি সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সংবাদটি পাঠকবর্গের আনন্দবিধান করিবে জানিয়া নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল :—

“সোমবার লাটভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন কমিটির উদ্বোধন সভায় এ প্রদেশে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ‘প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদকে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হউক। সংস্কৃত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্ত সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

“প্রাচ্যবাণী মন্দিরের” উদ্যোগে সভার আয়োজন হয়।

ডাঃ রমা চৌধুরী বলেন, কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুধর্মের অনুশাসনের গোড়ামিই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ধর্মের অনুশাসন হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়াই অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। ঈশ্বরানুভূতি হইতে যখন আমরা বিচ্যুত হই, তখনই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষ যদি তাহার প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃ উদ্ধার করিতে পারে, তবেই সকল অনর্থের অবসান হইবে। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃ উদ্ধার করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের অমুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

সভাপতি ডাঃ কাটজু বলেন যে, সংস্কৃত অতি সমৃদ্ধ ভাষা। এক সময় এই ভাষা সারা ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেশ বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন প্রতি বৎসরই স্কুল কলেজে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছাত্রদের অমুরাগ হ্রাস পাইতেছে। এই ভাষাকে জনপ্রিয় করিয়া উহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা সরকার ও জনসাধারণের কর্তব্য।

অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ যতীন্দ্রবিমল রায় চৌধুরী কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।”

বাংলার চিন্তাধারার অনুসরণ

মাননীয় আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী ভারতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করিবার পর বাংলাদেশে আসিয়া বাংলার প্রশংসামুখে বলিয়াছিলেন—“What Bengal thinks to-day, all India thinks to-morrow.” অর্থাৎ বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে, ভারতের অবশিষ্ট প্রদেশ তাহা পরে অনুসরণ করে। এই কথাটি মাননীয় বাল গঙ্গাধর তিলক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাতের সময় বঙ্গগঙ্গীর স্বরে উক্তি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত বৎসর কাঙ্ক্ষিত-সময়ে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণদেশে তীর্থস্থানসমূহ ভ্রমণকালে ঐপ্রকার উক্তির প্রচুর সমর্থন পাইয়াছেন। বাংলা ভারতের শীর্ষস্থান, সুতরাং ভারতের ভাগ্যবিধানের সুব্যবস্থা বাংলাকেই করিতে হইবে। রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক অর্থনৈতিক, ও ধর্মনৈতিক যাবতীয় বিষয়সমূহের চিন্তা বাংলাই করিয়া থাকে। তাই আমরা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাংলা, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাধাত্য দিলে ভারত তাহার অনুগমন নিশ্চয়ই করিবে। ইহাই রাজনৈতিক ধারা—বহুকাল যাবৎ পরিলক্ষিত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষার সহিত ভারতের উন্নতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ভারত ইহা বর্তমানে ভুলিতে বসিয়াছে। তাহার এই ভ্রম অপনোদন করিয়া সংস্কৃত ভাষার দ্বারা তাহাকে সংস্কার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলার মহামাণ্ড প্রদেশপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু মহোদয়ের ও ডাঃ রমা চৌধুরীর উক্তি সর্বতোভাবে অনুমোদন করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সংগঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এসম্পর্কে বাংলা কেন, সমগ্র ভারত-বাসীর দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

‘ভাষা’ ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মুক ব্যক্তির নিকট ‘বৈখরী’ স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে-স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ, লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্যের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা ই ভাবের

অভিব্যক্তি হউন না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাঙ্ক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই ‘ভাষা’ নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতাদিরও ভাষা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদগণ, পশুতত্ত্ব-আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্বজনীন ও সার্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, শুষ্ক পর্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্তমান। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বাহ্যতঃ যেক্রপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচেতনের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতেতর যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম অবস্থিত হইলেও তাহার বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন, অত্র অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই ‘ভাষা’ বলিয়া কথিত হয়। কীটানুকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু এক জাতি অত্র জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ববাদি-সম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জীবাণু স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আস্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচেতন্য জীবাণু অণুত্রে ও ধর্ম এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচেতন্য জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মাস্তানুশক্তি-বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ধৃত ভাষারই পার্থক্য বর্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আচার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য

প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে ‘বৈশিষ্ট্য’ বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অগুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ ‘ব্যবহারিকতা’ ও ‘মিথ্যার’ প্রশয় দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। উজ্জ্বলই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অনুশীলনে যাহারা যত উন্নত, তাহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাশ্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনাগুন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন, উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাটভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে ‘ব্রহ্মসূত্রে’ আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং ক্রমশঃ বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। ‘বীজ’ অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সম্ভা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট মহীকূহের সম্ভা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী বলেন—
“বাগা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্বং ন হৃশ্চক্ষমিবেহাস্তি।” (নঃ তাঃ ৮।২)

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—“বাওঁমাত্র-আচ্ছোঙ্কারশ্রোতত্ত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাগা ইতি। সর্ব-বর্ণন-কবলনরূপত্বাদ্ বৈথর্যাদিকপত্বাচ্চ বাওঁমাত্রমবগন্তব্যম্।”

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাওঁমাত্রতাহেতু তাহার ওতত্ত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়। সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈথরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাওঁমাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ)

যাবতীয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং ‘ওঁ’ এই দিব্য শব্দটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিক রূপে সিদ্ধ।

‘সংস্কৃত’ ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ, কাল, পাত্র হইতে বহিভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার অভিস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই ‘সংস্কৃত ভাষা’।

ভাষার ‘সংস্কৃত’ আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

‘সংস্কৃত’ শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে ভাষা সর্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেইপ্রকার ‘সংস্কৃত ভাষা’টীও সর্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিষ সর্ববৈজ্ঞানিক দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেইপ্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—‘সংস্কৃত ভাষা’। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দেশকারিণী।

‘অক্ষর’-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা ‘কুপণ’ হইয়া পড়ি। তজ্জন্য বৃহদারণ্যক (৩৯।১০) বলিয়াছেন—“এতদ্ ‘অক্ষরং’ গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাং প্রৈতি স এব ‘কুপণঃ’।

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কুপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অগ্ন্যাদি দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয়

লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈবভাষাই অগুচৈতন্য জীব-
মাত্রের ভাবজ্ঞাপক ধানবাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয়
করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জগুই তাহাকে শিক্ষা-গুরুর আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া
গতানুগতিক ধারা অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন
করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর-বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের
ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।
অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি।
ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ
না থাকিলে তাহা সর্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল
হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। ফোন্টবাদী বৈয়াকরণিক-
গণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ
কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ‘স’
তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে
তালব্য স=‘শ,’ মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্ত স=‘ষ’ এবং দন্ত হইতে যে
স এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স=‘স’। এইপ্রকার উচ্চারণ ভেদে ‘ন’ও
দুইপ্রকার। যথা দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন এর নাম—দন্ত্য ‘ন’ এবং মূর্দ্ধা
হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম—মূর্দ্ধন্ত ‘ণ’। সুতরাং ‘বৈয়াকরণিকের
শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের গ্রায় প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে
আমরা ‘অক্ষর’ শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-
পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না
হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই।
সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন—বর্ণমালাকে সর্বতোভাবে ‘সংস্কৃত’ করিয়া অর্থাৎ
তাহার যাবতীয় মূল বিদূরিত করিয়া অথবা সদ্বৈষ্ণোর গ্রায় জারিত করিয়া
গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সন্ধান পাইব। ‘বর্ণ’ এবং ‘অক্ষর’
এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশবস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও,
উপমান-জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবরেণ্য জগদগুরু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত ‘শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে’র প্রথমে লিখিয়াছেন—“নারায়ণাং উদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ”—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ, এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক সমাবেশে বাক্য, এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই ‘সংস্কৃত ভাষা’ বলিয়া জানি। (ক্রমশঃ)

— — —

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল মহোদয়ের বিলাত যাত্রা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি, এম, এ, বি, এল মহোদয় ‘ব্যারিষ্টারী’ পড়িবার জন্ত গত ১৯শে আশ্বিন ১৩৫৮, ৬ই অক্টোবর ১৯৫১, শনিবার—বোম্বাই হইতে বাম্পীয়-জলযানে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্যামবাজার, কলিকাতার ১৪০এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ তাঁহাদের নিজ বাসভবন-প্রাঙ্গণে বেলা ৫ ঘটিকার সময় একটা মহতী সভা আহূত হয়। তাহাতে বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সহকারী সম্পাদক মহোদয়ের বিলাতে ভ্রমণের উপলক্ষে মৌখিক ও লিখিতভাবে অভিনন্দনাদি প্রদান করেন। বিদ্যানিধি মহোদয়ের পিতৃদেব মাননীয় পরমভাগবত শ্রীযুত সখীচরণ রায়, ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আগ্রহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিবিজয় প্রভুর যত্ন ও আগ্রহাতিশয্যে উপস্থিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অন্যান্য বৈষ্ণববর্গ ও সমাগত ভক্তমহোদয়গণ সকলেই অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হন এবং সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বক্তৃতামুখে বিদ্যানিধি মহোদয়ের সাফল্য-কামনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তৃতা পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের অসারতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং

বিজ্ঞানিধি মহোদয়ের নিজ আচরিত বৈষ্ণব-সদাচার পাশ্চাত্যে যাহাতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করেন। বিশেষতঃ ভারতীয় বিচার-বিভাগের প্রাচীন নিয়ম-পদ্ধতি যাহা যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু প্রভৃতি ঋষিবর্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুকূলে সর্বত্রই শাসন-পদ্ধতি যাহাতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পাশ্চাত্য শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহাও বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়।

তৎপরে মাননীয় বিজ্ঞানিধি মহোদয় বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতা ও অভিনন্দন-সমূহের (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা) সংক্ষেপে দৈন্যমুখে মধুর উত্তর প্রদান করেন।

অতঃপর মাননীয় ভক্তিবিজয় প্রভু অতি দৈন্য সহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দিত ও চমৎকৃত করেন এবং সমাগত সকলকেই চতুর্বিধ-রস-সমন্বিত ভগবৎপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজ্ঞান-পদাবলী কীর্তিত হইয়াছিল।

—শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
সহকারী সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ্ধ—৪৬৫ ; পৌষ—১৩৫৮

৪ নারায়ণ, ১ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-চতুর্থী রা ১০।২৩।
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সমুদয় মঠে পঞ্চদশ বার্ষিক
বিরহ-মহোৎসব।

১১ নারায়ণ, ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ১।৩০।
সফল একাদশীর উপরাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২২ নারায়ণ, ৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ২।২৪। দি
৯ ৫০ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর, বুধবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ১০।১৯।
শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৮ নারায়ণ, ১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, সোমবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১১।১৮।
শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের
তিরোভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষেজে ।	*
ধর্মঃ সমুৎপত্তিঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	বাসুদেব, ৩ নারায়ণ, ৪৬৫ গৌরাক্ষ রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮; ইং ১৬।১২।৫১	২০ম সংখ্যা
----------	--	------------

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

গোবিন্দাশ্রোতুংসিত-বংশী-কণিতোক্ত-
ল্লাশ্রোৎকণ্ঠা মত্ত-ময়ূরব্রজ-বীত ।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গ-তরঙ্গাস্কুরিতাঙ্গ
প্রত্যাশাং মে হং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥১॥

যশোৎকর্ষাদিস্থিত-ধীভিব্রজদেবী-

৭

বৃন্দৈর্বর্ষ্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্তম্ ।

চিত্রৈষুঞ্জন্ স দ্যুতিপুঞ্জৈরখিলাশাং

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥২॥

বিন্দন্তিযো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ

কন্দৈশ্চেন্দোবন্ধুভিরানন্দয়তীশম্ ।

বৈদূর্য্যাতৈর্নির্বরতোয়ৈরপি সোহয়ং

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৩॥

শশ্বদিশালঙ্করণালঙ্কৃতি-মেধৈঃ

প্রেম্না ধৌতৈর্ধাতুভিরুদীপিত-সানো ।

নিত্যাক্রন্দং কন্দর-বেণুধ্বনি-হর্ষাৎ

৭

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৪॥

প্রাজ্যা রাজির্যশ্চ বিরাজতু্যপলানাং

কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা ।

সোহয়ং বন্ধুবন্ধুর-ধর্ম্মা সুরভীণাং

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৫॥

নিধূনানঃ সংহতি-হেতুং ঘনবৃন্দং

জিহ্বা জস্তারাতিমসস্তাবিতবোধম্ ।

স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৬॥

বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজ-দণ্ডোপরি ভক্তু-

শ্চত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষ্যৎ ।

কৃষ্ণোপজ্ঞং যশ্চ মথস্তিষ্ঠতি সোহয়ং

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৭॥

গান্ধর্ববায়ঃ কেলিকলা-বান্ধব-কুণ্ডে

ক্ষুণ্ণৈস্তৃপ্তাঃ কঙ্কণ-হারৈঃ প্রযতাস্ত ।

ব্রাসক্রীড়া-মণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য

প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥৮॥

অদিশ্রেণী-শেখর পদ্মাস্টকমেতৎ

কৃষ্ণান্তোদপ্রেষ্ঠ পঠেদযন্তব দেহী ।

প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্ৰমমন্দং

তং হর্ষণে স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥৯॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অধর-শোভিত মুরলী-ধ্বনি শ্রবণে নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণ দ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালা দ্বারা তোমার অঙ্গে অভিনব হরিত-তৃণ-লতা অঙ্কুরিত হইয়াছে ; হে শৈলরাজ গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদিত উৎকর্ষ-প্রযুক্ত বিম্বয়াপন্ন গোপীগণ যাহাকে ‘হরিদাস-বর্য্য’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণের চঙ্ককাস্তাদি মণিগণের কাণ্ডিয়ারা যাহার তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥২॥

তুমি মন্দির-তুল্য কন্দরসমূহ, চঙ্কবন্ধু কুমুদ-মৃণালাদির গায় উজ্জল ও সুস্বাদু কন্দমূল এবং বৈদূর্য্যতুল্য স্বচ্ছ নিষাব-বারিধারা দ্বারা সপত্রিকর শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছ ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অতীষ্ট পূরণ কর ॥৩॥

জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের ভূষণ-ব্যাপারে বিগুহ প্রেম-প্রকালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা তোমার সান্নিধ্য-দেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দবশতঃ তোমার কন্দরসকল সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাসনা সফল কর ॥৪॥

তোমার গণ্ডশৈলশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর উপবেশনবশতঃ সাতিশর শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো-গণের পালন-জন্ত তাহাদের বন্ধু হইয়াছ ; স্মৃতরাং তোমার পালন-ধর্ম্ম বিশেষভাবে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; হে শৈলপতে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥৫॥

সংহার-নিমিত্ত জগদ্বিপ্লবকারী জলদ-সমূহের প্রেরক ও সর্বত্র বিজয়ী জন্তারাতি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্বক তুমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ পর্বতসমূহের শত্রু বিনাশ করিয়াছ ; হে ইন্দ্রবিজয়িন্ গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর ॥৬॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভূজদণ্ডোপরি ছত্ররূপে অবস্থান করিয়া স্বকীয় 'গিরিরাজ'— এই নামের সার্থকতা করিয়াছ এবং তোমার যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর ॥৭॥

তুমি গান্ধারী শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী, তোমার অঙ্গ নিকুঞ্জ-নিপতিত শ্রীরাধিকার কঙ্কণ ও মালাদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, এবং তোমার উপত্যকা-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় মণ্ডিত ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ কর ॥৮॥

হে গিরিরাজ ! হে গোবর্দ্ধন ! যিনি তোমার এই পদ্মাষ্টক পাঠ করেন, তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্ত্বর তাঁহার নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্বক সানন্দে তাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন ॥৯॥

শ্রী প্রবোধানন্দ

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণ ও শ্রীরঙ্গমে চাতুর্মাস্য-ত্রত-পালন

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্যটন-চ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল-প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী-সঙ্গমে, পরে বর্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের অনেক তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 'চাতুর্মাস্য' আগত দেখিয়া দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্রে চারিমাস কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রী-সম্প্রদায়-বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের সদাচার-নিষ্ঠা—প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত্ত-বিপ্রগণ কোনমতে বাস করিতে স্মবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবলমাত্র 'শ্রী'-বৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্মই শ্রীমন্নহাপ্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস-কাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও কৃষ্ণ-কথা-প্রচার দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যেক্ট-পরিবার-গৃহে চারিমাস অবস্থিতি

সেই সময়ে তিরুমলয়, ব্যেক্ট ও প্রবোধানন্দ* নামক তিনটি ভাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্র-বংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারিমাস-কাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভাতা ব্যেক্টের পোগণ্ড বয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড়্গোশ্বামীর অগ্রতম শ্রীগোপাল-ভট্ট। ‘শ্রী’-সম্প্রদায়-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা-প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক দয়া-গুণে এই ভট্ট-পরিবার শ্রীকৃষ্ণরস-লাভ নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতিরুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্য-গত-প্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীব্যেক্টের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্য লীলা—নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে।

গোপাল-ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ—শ্রীকৃষ্ণলীলায় ‘ভুজবিজ্ঞা’

শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যমুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সংশিক্ষা-প্রভাবে শ্রীব্যেক্টের পুত্র শ্রীগোপাল-ভট্ট শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্য লাভ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য-দাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান—অত্যন্ত উচ্চ। শ্রীকবি-কর্ণপুর তৎকৃত ‘শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা’য় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় ‘ভুজবিজ্ঞা’ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল-ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ-দাসকে সন্তোষ সাধনপূর্বক ‘হরিভক্তি-বিলাস’ রচনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

কেহ কহে,—প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।

সর্বত্র হইল যার খ্যাতি ‘সরস্বতী’ ॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ।

তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

পরম-বৈরাগ্য-স্নেহ-মূর্তি মনোরম ।

মহাকবি, গীত-বাণ-নৃত্যে অনূপম ॥

*প্রবোধানন্দের পূর্ব নাম “গোপালগুরু”। পাঠান্তরে প্রবোধানন্দ-নামের পরিবর্তে গোপালগুরু এই নামও দৃষ্ট হয়।

যাঁর কাব্য* শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার ।

প্রবোধানন্দের মহা-মহিমা অপার ॥ (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীমোর-চরণাশ্রয় ও গোপালের ভদ্রগমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয়গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অতীষ্ট ভজন সঙ্কল্প-পূর্বক শ্রীগৌর-চরণাশ্রয়ে কাল-বিলম্ব না করিয়া মাথুর-মণ্ডলে 'কাম্যবনে' বাস করিলেন। শ্রীগোপাল-ভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজধাম-বাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীগৌর-প্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গর এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীগৌর-ভক্ত-পাঠকের প্রীতির জন্য তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার শ্রীঘনশ্যাম শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বলেন—

‘শ্রীগোপাল’-‘ভট্টের’ এসব বিবরণ।

কেহ কিছু বলে, কেহ না করে বর্ণন ॥

না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।

অপরাধ-বীজ তা’র হৃদয়ে সঞ্চারে ॥

পরম-রসিক পূর্ব পূর্ব কবিগণ।

বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন ॥

রাখিলেন মধ্যে মধ্য বর্ণন করিতে।

বর্ণিবে যে কবিগণ তাহাব নিমিত্তে ॥

শ্রীগোপাল ভট্টে হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।

গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা ॥

কেনে নিষেধিলা,—ইহা কে বুঝিতে পারে?

নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে ॥

কবিরাজ তাঁ’র আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে ॥ (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

* এই প্রবন্ধের পাঠান্তরে ‘কাব্য’ স্থলে ‘বাক্য’ দৃষ্ট হয়। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকর’ মূলগ্রন্থে ‘কাব্য’-পাঠই রহিয়াছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ পারকীয় মাধুর্যের উপাসক

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত কাব্যাবলী হইতে স্বকীয় বাদের পুষ্টি দেখা যায় ; এজন্য শ্রীরূপানুগ গৌর-ভক্তগণ পারকীয়-ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুর অধিক অলোচনা করেন না। যাহা হউক, শ্রীনরহরি-দাসের গ্রাম নিরপেক্ষ শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্ত-মাত্রই ভাগ্যবান ; সুতরাং তাঁহার গ্রাম সকলে কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরানুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয়-দাস্ত-মাধুরী নিরন্তর আশ্বাদন করুন।

প্রবোধানন্দের অতুলনীয় গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ—পরম পরিশুট ; ভাষার গাভীর্য ও মাধুর্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই শ্রীপ্রবোধানন্দের ‘শ্রীবৃন্দাবন-শতক’ নিত্য পাঠ করিয়া অমুপম প্রীতি-লাভ করেন। তদ্রচিত ‘শ্রীনবদ্বীপ-শতক’-গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবন-শতকের গ্রাম। শ্রীপ্রবোধানন্দের ‘শ্রীরাধা-সুধানিধি’* কাব্য-গ্রন্থখানি—জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ-পাঠে সাধারণ-কাব্যপ্রিয় পাঠকের তাদৃশ সুখানুভূতি না হইলেও উহা—শ্রীহরি-রস-স্নিগ্ধ নিকপট ভক্তজনের পরম প্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি ; এজন্য পাঠকের স্কৃতির উপর ঐ লোকাভিত ব্রজ-রসমূলক ভাবগুলি কার্য্য করিবে। ‘বিবেক-শতক’ বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অধ্যাপক অফ্রেতের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায় এবং বহরমপুর-বাসী পরলোকগত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন। ‘শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত’-গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-বিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে স্ব-স্ব চিত্তের নির্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরানুগগণও ইহা পাঠ করিলে, পরমানন্দে অনির্বচনীয় সুখ-মাগরে নিমগ্ন হইবেন। ‘সঙ্গীত-মাধব’-নামক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর একখানি গীতি-গ্রন্থও আছে। শ্রীগোলোকপতি চারিমাস কাল ধরিয়া যাহাদের সেব্য-বিষয় হইয়া ছলভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী তাঁহাদের অক্ষয় অমূল্য দ্রব্য-ভাণ্ডারের কিছু অংশ লাভ করিবার অবশ্যই প্রত্যাশা রাখে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ কখনও প্রকাশানন্দ নহেন

কেহ কেহ মায়াবাদী কাশী-বাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য

* এই গ্রন্থের অন্য নাম—“শ্রীরাধা-রস-সুধানিধি।”

প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পান ; আমরা কিন্তু তাহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না ।

‘প্রকাশানন্দ’-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে,—

“এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ।
ভক্তিপুখে ভাসে লই’ সৰ্ব্ব অমুচর ॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি’ ।
গর্জিয়া মুরারি-ঘরে, চলিলা আপনি ॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই’ বরাহ-ঈশ্বর ।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি’ বলয়ে উত্তর ॥
হস্ত, পাদ, মুখ মোর নাহিক লোচন ।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা ‘প্রকাশানন্দ’ ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে,—বেদ মোর বিগ্রহ না মানেন ।
সৰ্ব্বাঙ্গ হইল-কুষ্ঠ তবু নাহি জানেন ॥
সৰ্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র ।
অঙ্গ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে ।
তাহা ‘মিথ্যা’ বলে বেটা কেমন সাহসে !”

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয় । শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদকে দেখিতে পান । তাঁহারা—তৎকালে ‘শ্রী’-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ; স্মতরাং বিশিষ্টাধৈতবাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী । এই দুই ব্যক্তিকে ‘এক’ করিবার চেষ্টা বা সাম্য-প্রয়াস—বাতুলতা-মাত্র ।

প্রকাশানন্দের প্রকৃত পরিচয়

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ; যথা—

“বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ ।
 দন্ত কড়মড়ি করি’ বলয়ে বিশেষ ॥
 সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে ।
 মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥
 পড়ায় বেদান্ত, মোর ‘বিগ্রহ’ না মানেন ।
 কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানেন ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে ।
 তাহা ‘মিথ্যা’ বলে বেটা কেমন সাহসে ?
 সত্য কহোঁ, মুরারি, আমার তুমি ‘দাস’ ।
 যে না মানেন মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥
 সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান ।
 ইহা ‘মিথ্যা’ বলি’ মোরে করে ধান খান ॥
 যে-যশঃ-শ্রবণে আজি অবিচ্ছা-বিনাশ ।
 পাপী অধ্যাপকে বলে, ‘মিথ্যা’ সে বিলাস ॥
 হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার ।
 সে কছু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥”

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি-শাক্ত-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা,
 আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত বদ্ধকেন্দ্র-প্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী
 জীয়ারস্বামী । প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ—
 কাম্যবন-প্রবাসী বৈষ্ণব । একজন—আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপরজন দাক্ষিণাত্যের
 বৈষ্ণব ; একজন—নির্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাদ্বেত সর্বিশেষবাদী,
 পরে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বেত-মতাপ্রিত । একজন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া
 উদ্ধার-লাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য
 শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর গুরুদেব । শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর পরমারাধ্য
 পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুল-চূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিদ্বেষী
 মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়-জনক বৈষ্ণব-
 অপরাধ হয় ।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতাপাদের দৈন্য নির্দেশহেতু তাঁহার সম্বন্ধে

বর্ণনায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ঔদাসীণ্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে ও আদি লীলায়

সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি—মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি-প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় ‘শ্রী’-বৈষ্ণব হইতে পারেন? আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ, ঐতিহ্যসমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন-প্রবৃত্তি অল্পদূঃখের বিষয় নহে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্ত ও বিনয়ের বশবর্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায়, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান-কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে, তাঁহাকে তদীয় প্রকট-দশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত ভাবি-কালে এই বিষম-ভ্রমময়ী চেষ্টা উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্টগোস্বামী-দ্বারা শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে সেরূপভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রবোধানন্দের মহিমা

শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে,—

তিরুমলয়, বোঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ ।
 তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র ॥
 লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসক এ তিন পূর্ব্বতে ।
 রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥
 তিরুমলয়, বোঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে ।
 বিচারয়ে,—‘প্রভু বিনে রহিব কেমনে ?
 মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে ?
 কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে ?’
 চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায় ।
 তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥
 প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন ।
 কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন ॥
 কেহ কহে—প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।
 সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি ‘সরস্বতী’ ॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ।

তাঁর প্রিয় তাঁ-বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

শ্রীল প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীত-মাধব'

অধ্যাপকবর অফ্রেতের তালিকায় 'শ্রীসঙ্গীত-মাধব'-নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি । স্থানান্তরে* উহা প্রকাশ করিলাম ।

ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও ক্রমে 'একদণ্ড'-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না । তাঁহারা 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়ার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন । শ্রীল প্রবোধানন্দের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত'-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বিশিষ্ট-প্রমাণাভাবে উহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয় ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৫) জন-সঙ্গ

ভক্ত মিস্রাপ, সর্বজ্ঞ ও কন্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামী শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন । ভক্তি-সাধকগণ স্বভাবতঃ কন্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ । শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যেষাং তন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য-কর্মণাম্ ।

তে বন্দ-মোহ-নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ (গীঃ ৭।২৮)

ভক্তগণ * কৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপ-পুণ্যরূপ বন্দ সঙ্কে যে মোহ— তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন । সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্র-কন্ম । তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না । কন্মী ও জ্ঞানীদিগের চায় তাঁহারা অলঙ্ক ন'ন, কেননা, তাঁহারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন ।

* 'শ্রীসঙ্গনতোষণী'-পত্রিকা ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীসঙ্গীত-মাধব' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রদ্ধা-ফলে সাধুসঙ্গ ; এবং সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য

বহু জন্মের শ্রুতি-ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় ; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কৰ্ম্মা—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে । সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয় । সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মদুক্তানাঞ্চ যে ভক্তাশ্চ মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ (আদিপুরাণ)

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্ত-সকলই ভক্ততম ।

সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

ভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উক্ত হইয়াছে—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ কণাৎ ।

ভক্তাঃ পুনস্তি কৃষ্ণশ্চ সাক্ষাদপি চ পুরুষম্ ॥

কৃষ্ণ-ভক্তের কণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস—সাক্ষাৎ পুরুষকেও পশ্চিৎ করে । শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

নৈবাং মতিস্তাবদ্রুক্রমাজ্জিৎ স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদ-রজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫.৩২)

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্রুক্র মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই ।

ভগবদ্রুক্র-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না—ইহা শাস্ত্রে অনেকস্থলে কথিত হইয়াছে । সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন । অতএব ‘জনসঙ্গ’-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে ।

অসাধু-সঙ্গ ত্যাগের আবশ্যিকতা

এইজগত্বে শ্রীকৃষ্ণপাদ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহিষ্মুখ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

যথা—

সঙ্গ-ত্যাগো বিদুরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ । (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩)

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্ত যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহিষ্মুখ-সঙ্গ ত্যাগ

করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের* লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়াসকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য-ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাকে ‘সঙ্গ’ বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য্য যাহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল—বলিতে হইবে।

বহিষ্মুখ বা অসাধু-সঙ্গ সাত (৭) প্রকার

ভগবদ্বহিষ্মুখ জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেইসকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহিষ্মুখ জন সপ্ত প্রকার, যথা—

(১) মায়াবাদী বা নাস্তিক, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি, (৪) যোষিৎ, (৫) যোষিৎ-সঙ্গী, (৬) ধর্ম্মধ্বজী এবং (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও শক্তি স্বীকার করেন না। জীব-সত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তি-তত্ত্বকে তাহারা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটি অনিত্য উপায় মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব মায়াবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর উপদেশ—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।

মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥

বৈষ্ণব হঞা যেবা ‘শারীরক-ভাষ্য’ শুনে।

সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি’ আপনারে ‘ঈশ্বর’ মানে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।২৪-২৫)

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর-তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

(২) বিষয়ী

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ। যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্বদা ব্যস্ত, তাহারা

* দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্কতে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

[অর্থাৎ দান, প্রতিগ্রহ, গৃহকথা বলা ও শুনা, ভোজন করা ও করান।]

পরিনিদ্রা ও ঘেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয়-পিপাসা বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে অবসর পায় না। পুণ্যকর্মই করুক বা পাপকর্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হৈলে, নাহি কৃষ্ণের স্মরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮)

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয়-স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্বদা আত্মতত্ত্বে এবং কৃষ্ণ-বিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত নন।

(৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি

বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহ্নিস্থ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী ; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী নন, অথচ বিষয়িদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গও সর্বদা পরিহার্য্য। কেন-না, তাঁহারা শীঘ্র বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গ দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত বিষয়ী ও ভগবদ্বহ্নিস্থ বিষয়ী। নিতান্ত বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ্য। ভগবদ্বহ্নিস্থ বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানকে স্বীয় বিষয়াদি করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদ্বার্থে সমস্ত বিষয়কার্য্য করেন। প্রথম-প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ-প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাঁহারা পাপ-যুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও, যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের সঙ্গযোগ্য নন। বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয় ; কেন-না, অনেকস্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়িপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তি-সাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

(৪-৫) যোষিৎ ও যোষিৎ-সঙ্গী

যোষিৎগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোক যখন সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনিও পুরুষ-সঙ্গ করিবেন না। যোষিৎ-সঙ্গ বা পক্ষান্তরে

পুরুষ-সঙ্গ সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অহিতকর। যোষিং বা পুরুষ—দুই প্রকার। যে-পুরুষের সহিত যে স্ত্রীলোকের ধর্ম-সম্বন্ধদ্বারা বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের পরস্পর সংস্পর্শ ও সম্ভাষণে পাপ নাই, বরং শাস্ত্রানুমোদনে সংস্পর্শ-সম্ভাষণে পুণ্য আছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি কর্তব্য-সাধন ব্যতীত অন্য কোন-প্রকার মোহ-কার্যের ব্যবস্থা নাই। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিং-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ বলা যায়। যাহারা হরিভক্তনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রভূত অনিষ্টের উদয় করে। যদি এক-পক্ষের সঙ্গ-দোষ ঘটে, তবে অপর-পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের সহায় হন, তবে যোষিং-সঙ্গ বলিয়া একটা দোষের জন্ম হয় না। পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের বিরুদ্ধা হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিং-সঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী। এই সমস্ত বিচারপূর্বক ভক্তি-সাধক ব্যক্তি যোষিং-সঙ্গ ও যোষিং-সঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যথা, শ্রীভাগবতে—

ন তথাস্ত্য ভবেন্নোহো বন্ধুচাত্ত্বপ্রসঙ্গতঃ।

যোষিং-সঙ্গাদ্-যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ ॥ (ভাঃ ৩।৩।৩৫)

পূর্বোক্ত অবস্থাবিশেষে গৃহী সাধকের স্ত্রী-সংস্পর্শ ও স্ত্রী-সম্ভাষণ ভক্তি-বিরোধী হয় না ; কিন্তু গৃহত্যাগী পুরুষের কোনও প্রকারে স্ত্রী-সংস্পর্শ বা স্ত্রী-সম্ভাষণ হইতে পারে না, হইলেই ভক্তি-সাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেইরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

(৬ক) ধর্মধ্বজী

ধর্ম-ধ্বজিগণের সঙ্গ বিশেষ অবধানের সহিত পরিত্যাগ করিবে। যাহারা ধর্মের বাহ-চিহ্নসকল ধারণ করে অথচ ধর্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম-ধ্বজী। ধর্ম-ধ্বজী দুইপ্রকার অর্থাৎ কপট ও মূঢ় ; বঞ্চক ও বঞ্চিত। কপট ও জ্ঞানাধিকারেও এই ধর্মধ্বজিত্ব অতিশয় নিন্দনীয়। ভক্ত্যধিকারে এই ধর্মধ্বজিত্ব জীবের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার ধর্মীয় দুঃপ্রতিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করতঃ সেই কার্যে

প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ গুরু হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এইসকল কপট-কুটিল-সঙ্গ পবিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন। সরল-ভজনই কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরশু দুরন্তবীৰ্য্যশ্চ রথাস্থপাণেঃ ।

যোহমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ-সরোজ-গন্ধম্ ॥

(ভাঃ ১।৩।৩৮)

দুরন্তবীৰ্য্য চক্রপাণি পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের পদবী, তিনিই জানিতে পারেন যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করেন। আবার শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সৰ্ব্বানুনাশ্রিত-পদো যদি নির্ঝালীকম্ ।

তে দুরন্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালিভক্ষ্য ॥ (ভাঃ ২।৭।৪২)

যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন, সৰ্ব্বানু-স্বরূপে আশ্রিতপদ, ভগবান্ অনন্ত তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁহারা দুরন্তা ভগবন্মায়া পার হইয়া যান। যাঁহাদের কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে ‘আমি’ ও ‘আমার’-বুদ্ধি, তাঁহাদের একরূপ লাভ হয় না।

(৬খ) ধর্মধবজী (অন্যপ্রকার)

অন্তরে মায়াবাদ অথচ বাহ্যে বৈষ্ণব-স্বভাব-প্রদর্শন, একরূপ কাণ্ড্য ও কপট-বৈষ্ণবতা। শ্রীচরিতামৃত রামদাস বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বাহ্যে তিনি ‘পরম-বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক’—

অষ্টপ্রহর রাম-নাম জপে রাত্রি-দিনে ।

সর্ব ত্যজি’ চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা ।

মহাপ্রভু অধিক তাঁ’রে কৃপা না করিলা ॥

অন্তরে মুমুকু তেঁহো, বিত্তা গর্ভবান্ ।

সর্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্বজ্ঞ ভগবান্ ॥

(চৈ চঃ অঃ ১৩।২৩.১০২-১১০)

শ্রী রোহম ঠাকুর স্বীয় দৈন্তর্য্যে বুলিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ ছয় জনে,

লঞা ফিরে মানা-স্থানে,

বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥

হইয়া মায়া'র দাস,

করি নানা অভিলাষ,

তোমা'র স্মরণ গেল দূরে ।

অর্থ-লাভ—এই আশে,

কপট বৈষ্ণব-বেশে,

ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥

এই প্রকার ধর্ম্ম-ধ্বজিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শুদ্ধ হরিভজন হয় না । জগতে এই সকল লোকই অনেক ; সুতরাং যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত নির্জন-জীবন-যাপন ও ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ ।

(৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ

কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজদিগের সঙ্গে ভজন-প্রবৃত্তি প্রকল্প হয় না । তাহারা স্বভাবতঃ জীব-মাংস ভোজন ও আসব-পানে অহুরক্ত এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-মতে সংস্থাপিত নয় । তাহাদের চরিত্র সর্বদা অনিয়মিত । দুরাচার সঙ্গে চিত্ত মলিন হয় । তবে যদি সেই সেই কুলজাত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দর্শনে ভক্তিতে প্রদ্বাবান্ হন এবং ক্রমশঃ অনন্তভাবে কৃষ্ণ-ভজনে রুচিলাভ করেন, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ অশুভকর হয় না । তাহাদের পূর্ব স্বভাববশতঃ কিছুদিন কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও তাহারা সাধু । শ্রীগীতায় বুলিয়াছেন—

অপি চেৎ সূ-দুরাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শম্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ (গী: ৯।৩০-৩১)

তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত্যজ-স্বভাব পুরুষগণ যদি কোন স্বকৃতিবলে অনন্ত-ভক্তিতে প্রদ্বা লাভ করেন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত পথ লাভ করিলেন—বলিতে হইবে । অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা শ্রীহরিনাম ঠাকুরের অহুসরণে বিশুদ্ধ-চরিত্র, শান্ত-স্বভাব ভক্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই । স্বভাব-জনিত দুরাচার অগত্যা কিছুদিন থাকে । তাহাতেও তাঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলা যাইবে না । শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে, বিংশ-অধ্যায়ে তাঁহাদের লক্ষণ বুলিয়াছেন । যথা—

জাতপ্রদ্বা মৎকথাসু নির্কিঞ্চঃ সর্বকর্ম্মহ ।

বেদ দুঃখাত্মকানু কামানু পরিত্যাগেৎপ্যনীশ্বরঃ ॥ (ভা: ১১।২০।২১)

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদকোংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

প্রোক্তেন ভক্তি-যোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ ।

কামা হৃদয়া নশন্তি সর্বৈ ময়ি হৃদি স্থিতে ॥

(ভাঃ ১১।২০।২৮-২৯)

মূলকথা—কৃষ্ণবিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ই দুঃসঙ্গ এবং ত্যাজ্য

মূল-কথা এই—ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ই দুঃসঙ্গ । ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত (আপাত) পাপী ব্যক্তির সঙ্গও স্বসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে ।

মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

বরং হতবহ-জ্বালা-পঙ্করান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।

ন শৌরি-চিন্তা-বিমুখজন-সংবাস-বৈশসম্ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫১ ধৃত কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য)

অগ্নি-জ্বালা বা পঙ্করমধ্যে বন্ধনও ভাল, তবুও যেন কৃষ্ণ-স্মৃতি-বিমুখ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ-জ্ঞাত কেশ না হয় ।

ভক্তি-সাধনকালে এই বিষয়টী বিশেষ যত্ন-সহকারে বুঝিয়া লইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে কার্য করা আবশ্যক ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

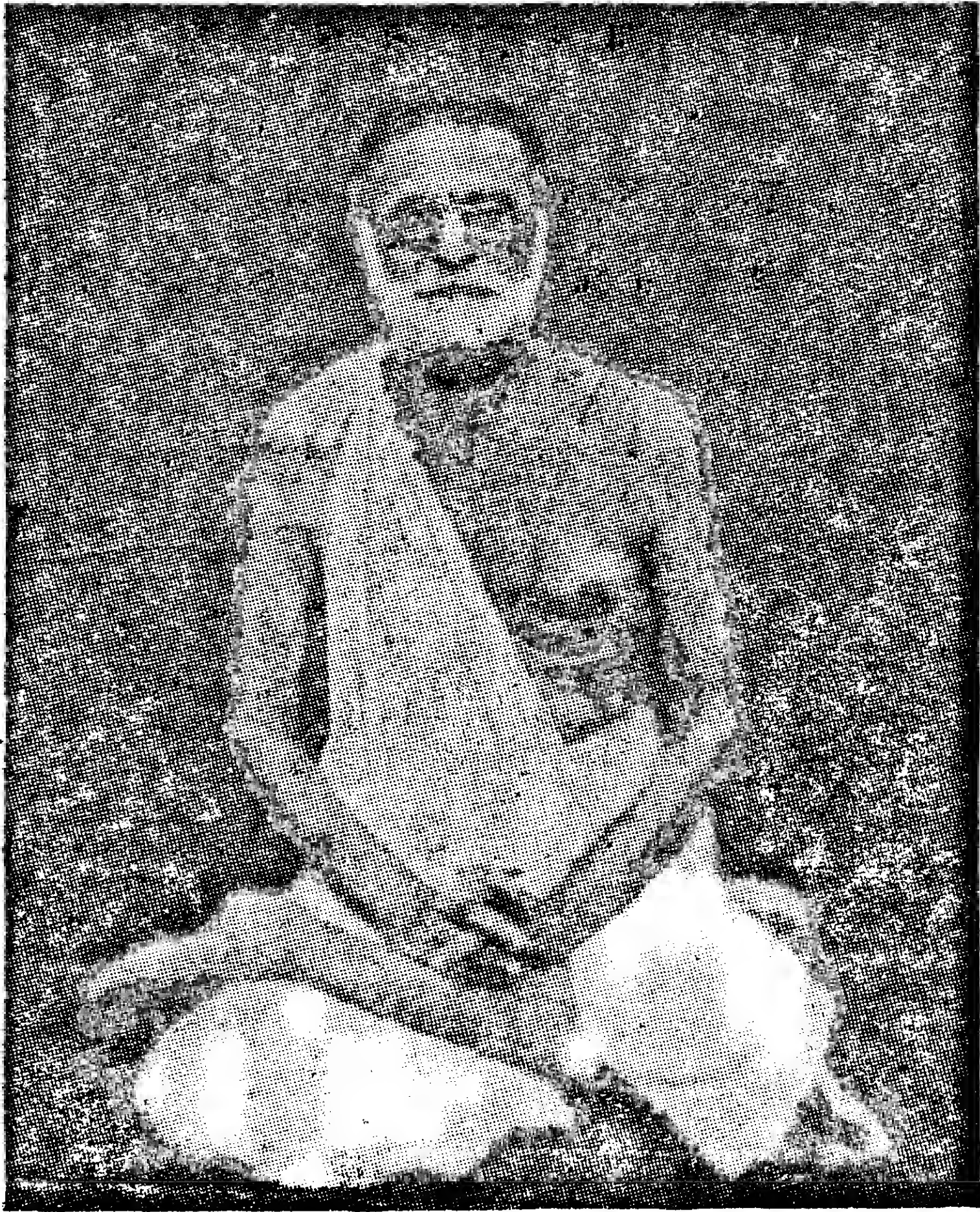
শ্রদ্ধাই ভক্তিলতাবীজ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় “শ্রদ্ধা”-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলেন । আমরা তাঁহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধার করিলাম—

সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে । তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন । তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব স্পষ্ট । তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ট হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন । শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নিগূর্ণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা । ইহাই ‘ভক্তিলতাবীজ’ ।

—প্রকাশক

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্ষ্য অষ্টোত্তর-শতাব্দী
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
মহারাজের শ্রীচরণ-কমলৈ
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি



আয়রে আয় প্রভুপাদের

চরণ-ধূলায় লুটবি আয়—

ধূলা গায়ে মাখবি আয় ;

অভিন্ন নিতাই আপনি এসে জীব তরাতে নাম বিলায় ।

জীবের মলিন বদন হেরে নয়ন-জলে ভেসে যায় ॥ ১ ॥

কাজ কি'রে তোর ছার কামনা,

তাঁর চরণে প্রাণ সঁপ না,

প্রভুপাদের অপার করুণা,

(তিনি) পতিত-পাবন, অধম-তারণ, তাঁর করুণায়—

অন্ধ যে-জন চক্ষু পায়, কতই পতিত ত'রে যায় ॥ ২ ॥

ও' ভাই ! হরি ব'লে বাহু তুলে,

আয়রে পতিত দলে দলে

প্রভুপাদের চরণ-তলে,

প্রেমে মাখা ভক্তি-ফুলের পুষ্পাঞ্জলি দিবি আয় ।

নিত্যধন পাবিয়ে ভাই, প্রভুপাদের করুণায় ॥ ৩ ॥

প্রভুপাদ জগদগুরু,

নাম ধ'রেছেন কল্লতরু,

অপূর্ণ বাসনা নাই কা'রু—

(সেই) তরুর তলায় বসলে পরে, শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়ায় ।

ও' ভাই, তাপিত হৃদয় শীতল হয়, পরা শান্তি পায় হিয়ায় ॥ ৪ ॥

দীন গোপাল বলে আবুল প্রাণে,

শরণ লয় যে' তাঁ'র চরণে,

ছোঁয় না ভাই তাঁ'রে শমনে,

(ও' তার) সকল দুঃখ ছুটে, আর মায়ার বাঁধন টুটে যায় ।

প্রভুপাদের চরণ-গুণে অস্তে কৃষ্ণ-চরণ পায় ॥ ৫ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-সংরাজ-সেবাভিলাষী—

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০০ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণতঃ জ্ঞানী-সম্প্রদায় অদ্বৈতপন্থী হইয়া থাকেন । চেতনের সন্ধান পাইয়াছেন—মনে করেন এবং জড়ের তিক্ততা বোধ হইয়াছে ও কর্মের ব্যর্থতা অনুভব করিয়াছেন—ইহাই জ্ঞানিগণের অদ্বৈতবাদ অবস্থা । কিন্তু চিদমুসন্ধান পরিপূর্ণ হইলে, চেতন-রাজ্যে যে চিদ-বিলাসরূপ সর্বিশেষত্ব বর্তমান আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় । ক্রমশঃ সেই চিদবিলাস-তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বে আকৃষ্ট হন । যথা—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্তুত্ব ভঃ ॥ (গীঃ ৭।১২)

কৃষ্ণতত্ত্ব যাহার অনুভব হয়, ত্রিজগতের মধ্যে তাঁহার 'তিক্ত' বলিয়া কোন বস্তু থাকে না । সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিপুষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই সমস্ত জগৎই,

মুমুক্শুদিগের জ্ঞান প্রাপ্তিকল্প বুদ্ধি না হইয়া, ‘কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ’ বা ‘বাসুদেবময়’—তাঁহার এই ভাবের উদয় হয়। তখন বাসুদেবময় জগৎ কৃষ্ণ হইতে আর স্বতন্ত্র বস্তু থাকে না। জগতের সমস্ত বস্তুই বাসুদেবের সেবা পর—এইরূপ দর্শন করিয়া তিনি সেই সকল বস্তুর চরম উপাদেয়ত্ব অনুভব করেন। বাসুদেবপর-জগতে মায়া-কোন অধিকার না থাকায় তাহা তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়। সেইপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানী ভক্ত যে কেবলমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মে নিজেই প্রপত্তি করেন তাহা নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকলকেই সেই শ্রীপাদপদ্মে অকুণ্ঠে করিবার চেষ্টা করিয়া ‘মহাত্মা’-নামে অভিহিত হন। এইপ্রকার ‘মহাত্মা’গণই যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা খুবই স্মরণীয়।

সাধারণতঃ, তথাকথিত মহাত্ম্যগণ জগৎকে বাসুদেবময় না জানিয়া নিজেই ‘বাসুদেব’ সাজিয়া সেবা গ্রহণ করিবার ছলনা করিয়া মায়া-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা বহু কামনা দ্বারা প্রলোভিত হইয়া, বাসুদেব ব্যতীত অন্যান্য ইতর দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন।

কামৈশ্চৈশ্চৈতজ্জানাঃ প্রপদন্তেহনুদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাশ্রয় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ (গীঃ ৭।২০)

কামনা-প্রলোভিত ব্যক্তিগণ রোগ-শোকাদির দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হইয়া ‘হতজ্ঞান’-শব্দে শব্দিত হন। সেইপ্রকার হতজ্ঞান ব্যক্তি অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। হতজ্ঞানই—বহুবীধবাদী। বহুবীধবাদিগণ বুঝেন না যে—‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব-কর্ম কৃত হয়।’ তাহাদের ধারণা—সূর্য্যাদি দেবগণ বিষ্ণুর সমান। সেইপ্রকার মায়িক বিচারে পতিত হইয়া হতজ্ঞান ব্যক্তিগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু যাহারা উদার-দী-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহারা জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর; তাঁহাদের কোনপ্রকার কামনা থাকিলেও তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারদীঃ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজেত পুরুষং পরম্ (ভাঃ ২।৩।১০)

যাহার যে-কামনাই থাকুক না কেন, তাহার সিদ্ধির জন্ত (ইতঃপূর্বে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন) তীব্র ভক্তিয়োগের দ্বারা সেই পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করা কর্তব্য। স্বভাবতঃই যাহারা কৃষ্ণ হইতে বহিষ্কৃত, তাঁহারা যদি কামনা লইয়াও পরম-

পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করেন, তাহা হইলে স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের কামনা-করায় দূর হইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপ অমৃত আশ্বাদনের সুযোগ লাভ হয়। সুতরাং, নষ্টবুদ্ধি না হইয়া সর্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, পরতত্ত্ব-বস্তু হইয়া জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। “একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্য।”—সূর্য্যাদি দেবগণ সকলেই ভগবানের আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমাধান করেন। এবং সেইজন্য তাঁহারা দেবতা বলিয়া খ্যাত। কারণ ভগবদ্বক্তৃত্বমাত্রই দেবতা-পর্য্যায়ে পরিগণিত; আর তদ্বিষয় যাহারা, তাহারা অস্বর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সুতরাং দেবতাগণের নিজের কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই। এমন কি, তত্ত্বং দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উদয় করাইবারও ক্ষমতা সেই দেবতাগণের নাই; তাহাও শ্রীভগবান্-কর্তৃক সাধিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একাংশে পরমাত্মা রূপে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তত্ত্বং দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। ইহাই অন্তর্ধামীর কার্য্য। কারণ সূর্য্যাদি দেবগণের যে বিভূতি, তাহা ভগবানেরই শক্তি। শক্তির দিকে আকৃষ্ট হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ক্রমশঃ শক্তিমানের দিকে আকর্ষণ হয়। ব্যতিরেকভাবে সেই সেই দেবতাগণের পূজা দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে। কামনামুক্ত জনগণ শক্তিমান্ অপেক্ষা শক্তির প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। যথা—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধাচ্চিত্তুমিচ্ছতি ।

তশ্চ তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব দিধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধা যুক্তস্ত গুরাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্ ॥

(গীঃ ৭।২১-২২)

রাজার তুলনায় রাজকীয় কর্মচারীগণের যেকোন ক্ষমতা, ইতর দেবতা-গণেরও সেইরূপ ক্ষমতা। তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই জীবতত্ত্ব। যে-জীবের প্রতি ভগবানের যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাহা লইয়াই সে বাহাদুরী করিতে পারে। জীবের নিজের কোন স্বতন্ত্র-ক্ষমতা নাই। সুতরাং, রাজপ্রদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্তি-হেতুই যেমন রাজকীয় কর্মচারীর নিকট হইতে কিছু উপকারাদি পাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ দেবতা-গণকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তদনুযায়ী দেবতাগণ সেই সেই যাজকগণের

উপকার করিতে সমর্থ। কামনাবৃত্ত দেবতা-যাজিগণের যদি কোন বুদ্ধি হয় যে, দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়ই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিমান হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথক পৃথক দেবতাগণের পৃথক পৃথক ক্ষমতা থাকে। যেমন—সূর্য্যের ক্ষমতা—রোগ প্রশমিত করা, চন্দ্ৰের ক্ষমতা—ওষধি-বৃক্ষসমূহকে বীৰ্যবান্ করা, দুর্গার ক্ষমতা—বল-বীৰ্য্য দান করা, সরস্বতীর ক্ষমতা—বিদ্যাবান্ করা, লক্ষ্মীর ক্ষমতা—ধনাদি দান করা, চণ্ডীর ক্ষমতা—মদ্য-মাংস খাইবার অবিধা দেওয়া, গণেশের ক্ষমতা—কার্য্য-সিদ্ধি করা—ইত্যাকার বহু দেবতার বহুপ্রকার পৃথক পৃথক ক্ষমতা থাকি লও তাহা সমস্তই ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি জানিতে হইবে। এক দেবতার নিকট এক অবিধা পাওয়া যায়, অন্য দেবতার নিকট অন্তরূপ অবিধা মিলে। কিন্তু পূর্ণ ভগবানের নিকট সকল অবিধাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কূপ-মণ্ডকের জলাশয় আর প্রবাহমান নদীর জলাশয়, উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান।

আমরা পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি যে, জগতে সমস্ত ব্যাপারই ক্ষেত্র-শক্তি ও ক্ষেত্রজ-শক্তি—এই উভয়েরই সংঘর্ষে উৎপাদিত। সেই দুই শক্তিই পূর্বে ‘পরা’ ও ‘অপরা’ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং দুই-ই ভগবানের প্রকৃতি—ইহা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং জগতের সমস্ত ব্যাপারই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-পরিণাম মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান-তত্ত্ব সর্বদাই অপৃথক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি একত্রই সম্পর্কিত। কিন্তু মায়াবাদিগণ শক্তির পরিণাম না বুঝিয়া জগতে বিপর্য্যয় উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দেবতাগণ বা জীবগণ সকলেই শক্তিতত্ত্ব, কেহই শক্তিমান-তত্ত্ব নহেন। জগৎও শক্তি-তত্ত্ব। এই সূক্ষ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে পরিশেষে মায়াবাদী হইয়া যাইতে হয়; ফলে, ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্যবদ্ধ হইতে হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—শক্তিমান্ তত্ত্ব; তাঁহাকে ‘নির্কিংশেষ’ ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মের পূর্ণতা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জানিতে হইবে। তিনি অসমোদ্ধ পরাংপর তত্ত্ব, তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই। তাই তিনি—“একমেবাদ্বিতীয়ম্”। তাঁহার শক্তি বহুভাবে প্রকাশিত দেখিয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণই বহুৈশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। সুতরাং, আমাদের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক যে—জগতে যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহা সমস্তই ভগবানেরই শক্তির পরিচয়। মায়াবাদিগণ এই ‘শক্তি-পরিণাম’ বাদ দিয়া ‘বিবর্ত্ত’-আশ্রয়ে ব্রহ্মকে ‘নির্কিংশেষ’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

ভগবানের নির্কিশেষ পরিচয় যেখানে কথিত হইয়াছে, সেখানে ভগবান্ স্বয়ং ‘পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ,’ ‘জীবনং চক্ৰভূতেষু,’ ‘বলং বলবতাং চ,’ ‘বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং,’ ‘তেজস্তেজস্বিনাম্’ ইত্যাদি কথায় বহুপ্রকারে নিজের নির্কিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এইসমস্ত নির্কিশেষ ও সবিশেষ পরিচয় দ্বারা অচিন্ত্য-শক্তিমান্ পুরুষ একই কালে ‘সম’ এবং ‘পৃথক্’ পরিচয়ে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই প্রতি-স্থাপিত করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে এইভাবে নিঃসৃত হইয়াছে ; যথা—

“মত্ত এবতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥” (গীঃ ৭:১২)

অর্থাৎ সমস্ত চরাচর বস্তুই তাঁহা হইতে প্রভাবিত ও বিভাবিত হইলেও তিনি তাহাতে নাই, কিন্তু সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে আছে। শক্তিমান্ হইতে সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হইলেও, শক্তির কার্য্য হইতে তিনি স্বয়ং পৃথক্। শক্তি তাঁহাতে নিহিত থাকিলেও, তিনি শক্তি-কার্য্যে নিহিত নহেন। এই সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, দেব-দেবীগণের শক্তি--শক্তিমান্ ভগবানেই নিহিত, কিন্তু সেই সেই দেবতাগণ কখনও ভগবান্ নহেন। সুতরাং দেবগণের প্রদত্ত ফল কখনই নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে পারে না।

অস্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবত্যগ্নমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদুক্রা যাস্তি মামপি ॥ গীঃ ৭:২৩)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সকাম ভক্তগণ যদি কামনার বশবর্তী হইয়াও অগ্ৰাণু দেবতাগণের আরাধনা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবানেরই আরাধনা করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। সকাম-কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ-পন্থা হইতে নিষ্কাম জ্ঞানযোগ-পদে অধিরূঢ় হইবেন। তাহা হইলে সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় নশ্বর স্বর্গাদি লাভ না করিয়া বৈকুণ্ঠে সালোক্য-মুক্তি লাভ করিবেন। দেবযাজিগণ দেবলোকে গমন করেন। সেই দেবলোক বা স্বর্গলোক—সমস্তই অনিত্য বস্তু। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গাদি লোক হইতে এই ভুলোকে আসিতে হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ—ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে আর এই মরলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীগুরুতত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীগুরু-স্বরূপ

“যস্তু দেবে পরাভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” (শ্বেতাস্বঃ ৬।২৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যিনি এক-জগদ্গুরুবাদ পরিহার করিয়া, আশ্রয়-পারম্পর্যগত মহান্ত-জগদ্গুরুবাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাবতীয় কু-রূপ অপসারিত করিয়া সু-রূপের রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে অপ্রাকৃত সেবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরদুঃখদুঃখী জগদ্বন্দ্য সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের শরণের বিষয় হউন । তিনি স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে রূপা-পরবশ হইয়া আমাদের নয়ন-পথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন । প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্যবস্ত । সুতরাং তিনি নিত্যকালই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন । নন্দীশ্বর-পতি-সুতের অত্যন্ত প্রাণ-প্রের্ত্ত নিজজন শ্রীগুরুদেব আমার গায় মুক বাক্তিতে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন—তিনি আমার গায় পতিত পাগরকে অনিত্য বিষয়-রতি হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য নব-নবায়মানা সর্ব্বোত্তমা রতির বিষয় শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবের পরমমধুর-রসে সংলিষ্ট-দশায় নিত্য-লীলার নিজ চিন্ময় পরিকর-স্বরূপ প্রদান করান্ । স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনী গান্ধারী দেবীও নবনীতাপেক্ষা সুকোমল ও করুণা-বিগলিত স্নেহাদ্র-হৃদয়ে স্বীয় আকৃষ্ট আপন-জনকে সম্যকরূপে স্ব-চরণকমলে গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

শ্রোত বিচার ও সদ্গুরু-নিষ্ঠা

আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় ‘শ্রুতি’ বা ‘শ্রোত’ শব্দের যে ক্রটি-বৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় ‘শ্রুতি’ বা ‘শ্রোত’-শব্দের সেইরূপ সাধারণ-ক্রটি মাত্র গ্রহণ করেন না । শ্রোত-শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত বাণীর অবিমিশ্রভাবে সেবা-শ্রদ্ধা-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সম্প্রীত-ধারা কর্ণাঙ্গুলি দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহাই ‘শ্রুতি’ । যে গুরুপাদপদ্ম হইতে সেবোন্মুখ শ্রদ্ধা-শিষ্য সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন, সেই গুরু যদি নিত্য ও শ্রোত না হন, তবে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরস্পরার অভিনয়ের মধ্য শ্রুতি কখনই আপনাকে প্রকাশ করেন না । “যস্তু দেবে পরাভক্তিঃ”—‘পরাভক্তি’-শব্দে—অত্যাভিলাষ-রহিতা

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণ-নিষ্কৃতা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধাভক্তি ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি

উপায় ও উপায়-ভেদবাদী—জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে-সকল গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের নিত্যত্ব নাই । ত্রিপুটী বিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য থাকে না ; যোগ-সিদ্ধিতে কৈবল্য-লাভের পর গুরুসেবার প্রয়োজন বোধ হয় না ; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকার-বাদে শ্রেয়ঃ বা পরাভক্তি নাই । দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরু তেমনিই নিত্য । দেবতা-শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীগুরুদেব—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ । “সাক্ষাৎকরিষ্মেন সমস্ত-শাস্ত্রৈককৃত্ত্বস্তথা ভাব্যত এব সত্ত্বিঃ । কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্ম বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥” নিখিল শাস্ত্র ষাঁহাকে সাক্ষাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণ’-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সাধুগণও ষাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করেন, তথাপি যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ।

গৌড়ীয়-সাহিত্যে গুরু-তত্ত্বের বিচার এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি-যুক্ত । এই পরাভক্তি-বৃত্তি ষাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁহারই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রীতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট । হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-রহিত কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্বাদির আবরণ-আবর্জ্জনা করণপূট অবরুদ্ধ থাকিলে শ্রুতি সঞ্চারিত হইতে পারে না । সেবানুযায় কর্ণে প্রবিষ্ট পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে ‘শ্রুতি’ বলা যায় ।

অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ

পাশ্চাত্য দেশে জড়দেহের ক্রম-বিকাশ-বাদ জড়-বিজ্ঞানকে সম্বন্ধিত করিয়াছে ; কিন্তু, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জড়াতীত তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ-স্বরূপ, আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রম-বিকাশের সহিত পরতত্ত্বের সেবা-যোগ্য নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলারূপ অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে । আত্মার সেবা-বৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, থর্কাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরতত্ত্বের নিত্য নাম-রূপাদির প্রকাশ—মৎস্য, কুম্ভ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার তত্ত্ব-বর্ণনায় মানব-হৃদয়ে ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে ।

‘বামন’ ক্ষুদ্র মানুষ - পূর্ণ পুরুষের আকার নহে। বামনের পূর্বে অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ-পশুরাজ-মিলিত-তত্ত্ব। ক্ষুদ্র নরাবস্থার পর অসভ্য নরাবস্থা। তৎপরে সভা-নরাবস্থা বা নীতিপুষ্ট নরমূর্তি। তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা।

ভগবৎ-তত্ত্ব ও অবতারী কৃষ্ণ

ভগবৎ-তত্ত্বের মধ্যে ছয়টি চিন্ময় গুণ নিহিত। যথা—

“ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ প্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যশ্নাং ভগ ইতীন্দ্রনা ॥” (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরহে অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টির নামই গুণ। যাহাতে এই ছয় গুণ পূর্ণভাবে লক্ষিত হয়, তিনিই ভগবান্। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে,—ভগবান্ সকল গুণ বা গুণ-সমষ্টি মাত্র নহেন ; কিন্তু, তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়-স্বরূপবিশেষ তাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে গুস্ত আছে। উক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে ‘ঐশ্বর্য্য’ ও ‘শ্রী’ ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। ঐশ্বর্য্যাত্মক-স্বরূপে আশ্বাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকায়, উহা হইতে সৌন্দর্য্যাত্মক-স্বরূপটী অধিকতর আশ্বাদক-প্রিয়। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্য্যাতি অপার পাঁচটি গুণ মাধুর্য্য-স্বরূপে ক্রোড়ীভূত-রূপে অবস্থিত। মাধুর্য্য-রস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়। শিশুপাল, পুতনা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে ঘেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক প্রিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণে নিকৃপাধিক প্রীতির অনুশীলন করেন, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি ? অর্থাৎ কোন সংশয়ই নাই। শ্রীগদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যম্—

“উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈত্ব্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।

দ্বিষন্নপি হৃষীকেশঃ কিমুতাদোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥” (ভাঃ ১০।২৯।১৩)

এইখানে ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য্যাধিক্য-হেতু প্রিয়ত্ব-ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য।

নারায়ণে গৌরব-রস

জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবজ্-জ্ঞানের উদয়কালে ‘শান্ত’-নামে একটি রসের উদয় হয়। ঐ রস নারায়ণপর, কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন-ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন প্রেমের স্বরূপ মমতার উদয় হয়, তখন ‘প্রভু-দাস’-স্বয়ং-বোধ হইতে ‘দাস্য’ নামক আর একটি রসের কাণ্ড হইতে

থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের আশ্রয় কখনই হইতে পারে না। কাহার এইরূপ সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্বক কহিবে—“সখে! আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনয়ন করিয়াছি।” কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুষ্প-স্নেহ-স্নেহে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সাহস করিবে? আর কেই বা কহিতে পারিবে, “হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার প্রিয়া।”

নারায়ণাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির উৎকর্ষ

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমেশ্বর্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর, আর দীন-হীন জীব কতদূর ক্ষুদ্র ও অক্ষম! কিন্তু উপাশ্র-বস্ত্র পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখনই জীবের উদ্ধগতি লক্ষ্য করেন, তখনই পরম অনুগ্রহপূর্বক ঐসকল উচ্চ-রস-বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবৃত্ত হন। অতএব চৌষটি-কলাবিশিষ্ট, ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ীভূত, পরম-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণতম বিষয় হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকল জীবের যে নিম্নল প্রেম, তাহাই শুদ্ধাত্মার নিরুপাধিক চরম প্রাপ্তি।

পরম-প্রামাণিক বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই জড় পদার্থে প্রেম নাই; উহা ‘কাম’ শব্দবাচ্য। শুদ্ধ-জীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ জীবের বিমুগ্ধ।

ভক্তের ক্রমোদ্ধ সোপান ও রসের ক্রমোৎকর্ষ

চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে চিন্ময় কারণ-বারি বিরজা নদী অবস্থিত। উহাতে স্নানের পর গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা শান্ত-রতির প্রকাশ হয়। শান্ত-রতিতে মমতারূপে প্রেম যুক্ত হইলে দাস্ত-রতি হয়। সেই মমতা—সমতা ও বিশ্রুস্তে মথিত হইলে সখ্য-রতির উদয় হয়। সখ্য-রতিতে পাল্য-বিচার সংযুক্ত হইলে বাৎসল্য-রতির প্রকাশ হয়। বাৎসল্য-রতিতে বাৎসল্য রতির আশ্রয়ের নিকট যাহা গুপ্ত থাকে, তাহাও সর্বাঙ্গীন উন্মুক্ত হইলে অর্থাৎ সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গে সেবার উৎকর্ষ প্রকাশিত হইলে মধুর-রতির বা শৃঙ্গার-রসের প্রকাশ হয়।

সর্বোত্তম প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের অসমোদ্ধা প্রিয়তমা শ্রীরাধা

সমগ্র চিন্ময়-রসের বিষয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম পুরুষ ও পরাৎপর।

বস্তু । সকল প্রকার রতিতে পরমেশ্বরই পুরুষ বা ভোক্তা । পরম-পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ নিরপেক্ষ ভোক্তৃত্ব হইতে পারে না । শান্তরসে গোধন, বেত্র, বিষাগ, বেণু প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন । ‘রক্তক’, ‘চিত্রক’, ‘পত্রক’ প্রভৃতি দাস-রসে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন । সুদাম, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাগণও সখ্য-রসে সেই একই পরমপুরুষের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহারই সুখ-সেবা বিধান করেন । নন্দ-যশোদাও গোপাল কৃষ্ণকে তাঁহাদের পাল্য-জ্ঞানে সদা সেবা করিয়া থাকেন । ব্রজ-গোপীগণ সর্বাঙ্গের দ্বারা কামদেব কৃষ্ণের সর্বোত্তমা সেবা বিধান করিয়া থাকেন । সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা সমগ্র রসের আশ্রয় ও প্রেমোৎকর্ষের সার মহাভাব-স্বরূপা । তিনি সর্বাঙ্গীন সর্বতোভাবে সর্দাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাহু পূতি করিয়া থাকেন । “কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ ষাঁর ভিতরে বাহরে ।” তাঁহার সমান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোপরি প্রিয়তা সাধন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হন না । তিনি শতকোটি কায়বুহ বিস্তারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোমুখী উজ্জল-রসের বিস্তার করিয়া অসমোদ্ধ-রতি-বর্দ্ধন ও সেবা-সুখ বিধান করেন । তিনি উজ্জল-রসের নায়িকা-শিরোমণি । শ্রীকৃষ্ণও উজ্জল রসের নায়ক-শিরোমণি । এই অপ্রাকৃত চিলীলা-মিথুন ব্রজের নবীন-যুগল-কিশোরই ‘আশ্রয়’ ও ‘বিষয়’-স্বরূপে মহাভাব ও রসরাজ-স্বরূপ । অন্য যাবতীয় আশ্রয় ও বিষয়তত্ত্ব এই দুইয়েরই অধীন । মধুর-রতিতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি অষ্ট মহানিধি চরম ও পারাকাষ্ঠাবস্থায় একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাতেই উজ্জলরূপে সর্বোৎকৃষ্টতার সহিত দেদীপ্যমান । ললিতাদি অষ্ট-নায়িকা শ্রীরাধার কায়-বুহরূপা, তাঁহারা মান, প্রণয় প্রভৃতি প্রধান অষ্টভাবের মূর্ত্যবিগ্রহ-স্বরূপে স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রভৃতি শ্রীরাধার নায়িকোচিত অষ্ট কায়বুহ । শৃঙ্গার-রসে চিন্ময় সামগ্রীর মিলনে প্রেম, মান, স্নেহ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি চরমাবস্থার প্রাপ্তিতেও প্রেমের গতির ইয়ত্তা নাই । ইহাই শ্রীরাধার মহিমার অসমোদ্ধত্ব ।

গৌড়ীয়-দর্শনে ‘অপ্রাকৃত’-শব্দের বৈশিষ্ট্য

‘অপ্রাকৃত’ শব্দটী গৌড়ীয়-দর্শনে বিশেষ আদৃত পরিভাষা । ইহার সর্বোত্তম বিকাশ একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যায় । দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডল আধ্যাত্মিক-গণ ইহার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । যাহারা ‘প্রাকৃত’-গবাক্ষের মধ্য দিয়া ভগবদ্বহিষ্মুখ দৃষ্টিতে ‘অপ্রাকৃত’ তত্ত্বের পরিমাপ করিতে যান, তাহারা উহার বিকৃত ছবি দর্শন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিয়া থাকেন ।

কংসমাতা পদ্মার নীতি

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেই বিকৃত ছবির একটি দৃষ্টান্ত দিয়া “পদ্মা-নীতির” বিচারটী দেখাইয়াছেন। পদ্মা ছিলেন—কৃষ্ণদেবী কংসের মাতা। তাঁহার বিচার কৰ্ম্ম-জড়-সাংসারিক বুদ্ধিতে পূর্ণ। তাঁহার বিচার ছিল,—বৃন্দাবনে নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণকে লইয়া এত নাচানাচি করে কেন? তিনি জানিতেন না যে, ব্রজবাসীগণের একমাত্র জীবন-সর্বস্বই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার ধারণা—ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছু ধার পাইবে। তাই পদ্মা একটি পরামর্শ দিলেন; বলিলেন—“একটা হিসাব-নিকাশ হউক। কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে কতটা খাটিয়া দিয়াছে, আর গোপ-গোপীগণই বা কৃষ্ণকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন, খাওয়া-পরাব বাবদ কত টাকা খরচ করিয়াছে। যদি ব্রজবাসীদের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তাহ’লে সেই পাওনার কয়েকটা টাকা তাহাদিগকে দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের সম্বন্ধটুকু চিরতরে চুকিয়ে দেওয়া যাক।” ইহার উত্তরে শ্রীবলরাম-জননী শ্রীরোহিণী দেবী যে জবাব দিয়াছেন, তাহা যেন শ্রীরোহিণী দেবী নিজ পুত্র বলদেবাপেক্ষা কোটা প্রাণ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-স্নেহ-বৃত্তিকা দ্বারা অধিকতর স্নিগ্ধ-দীপিত প্রাণ-প্রদীপে সর্বদা নিরাজন করিয়াছেন। যাহাদের প্রাণ-সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ সেই নন্দ-যশোদা-রোহিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের নিত্য পরিকর ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে মৰ্ম্মান্তিক আঘাত দিয়া সেই অপস্বার্থ-পরতায় বিমুঢ়া জরতী কংসমাতা পদ্মা অধিকতর অপরাধের আবাহন করিয়াছিল। কৰ্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-গৃহমেধি-ধৰ্ম্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের মায়িক জড়-বিচারের চশমার দ্বারা কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে দেখিতে গিয়া ঐপ্রকারই দর্শন করিয়া থাকে। কৃষ্ণ ও ব্রজবাসীগণের মধ্যে যে নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

ঐশ্বর্য-গন্ধগুণ মাধুর্যের মহাদানই ঔদার্য্য প্রকাশিত। প্রণয়াদির চরমাবস্থায় বিশ্রুত-ভাবের প্রগাঢ়তায় বিষয়াশ্রয়ের পরস্পর এক-প্রাণ এক-আত্মা ইত্যাদি ভাবের স্ফুর্তি হয়।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-স্বরূপের রহস্য

শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য-কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্তা হন, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-প্রভাব হইতে ভগবত্ত্বের অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরম-পুরুষ সর্বরাজ-রাজেশ্বরভাবে (নারায়ণস্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন।

এই ভাবটী নিত্য ও সনাতন। সর্লৈশ্বৰ্য্য-পরিপূৰ্ণ শ্ৰীভগবানকে ঐশ্বৰ্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। ঐশ্বৰ্য্যাপেক্ষা মাধুৰ্য্য-স্বরূপে অধিকতর চমৎকারিতা স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুৰ্য্যপৰ ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসত্তায় মাধুৰ্য্যের প্রকাশ হয়, উহাই সৰ্ব্বচিত্তাকৰ্ষক পরমানন্দধাম শ্ৰীকৃষ্ণ-স্বরূপ। নারায়ণ হইতে শ্ৰীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে এরূপ নয়, কিন্তু উভয় সত্ত্বাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য।

“সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্ৰীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৩২)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমন্তুক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

সখ্য

কৃষ্ণপ্ৰেম-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ নবধা-ভক্তির অগ্রতম সখ্য-ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আপনাদের সেবা করিবার চেষ্টা পাইব। সহ+খ্যা+কর্ম+ইন্ প্রত্যয় করিয়া সখা বা সখি শব্দ নিম্পন্ন। মিত্র, সহচর, সহায় প্রভৃতি শব্দ সখি বা সখা-শব্দের পর্যায়-বাচক। সখি+ক্য প্রত্যয়ে ‘সখ্য’-শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে।

অতি-বিশ্বস্ত-চিত্তস্ত বাসুদেবে সখ্যামুধৌ।

সৌহার্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ (হঃ ভঃ কঃ লঃ ১।১।১)

অর্থাৎ একান্ত দৃঢ়-বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তির সর্বস্বত্বের অমুখি-স্বরূপ বাসুদেবে সৌহার্দের সহিত যে পরা প্রীতি, তাহাই ‘সখ্য’ বলিয়া কথিত হয়।

এই মহাবাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ‘সখ্য’ শব্দটী যথেষ্টা যত্র-তত্র ব্যবহার করা চলে না। ব্যবহারিক জগতে নিকটস্থ অথবা দূরদেশস্থ গোত্রান্বয়ের বহিভূত, পরিচিত অথবা অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত ঐহিক প্রীতির সম্বন্ধ-স্থাপনের নামই ‘সখ্য’; কিন্তু পারমাণ্বিক জগতে এতাদৃশ সম্বন্ধ-স্থাপনকে ‘সখ্য’ বলা হয় না। যদ্বারা সৌহার্দের সহিত একান্ত আসক্তচিত্ত হইয়া সর্বস্বত্বের আকরস্বরূপ পরমপুরুষ পরমাত্মা বাসুদেবের নিত্য-সেবায় নিত্য-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই প্রকৃত ‘সখ্য’। যে-প্রীতির সম্বন্ধ চির অক্ষুণ্ণ, নিত্য, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ—এমন কি, শত-সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও হৃদয় হইতে যাহা দূর করিতে পারা যায় না এবং যে-সম্বন্ধ স্থাপনের পর জীবে ও ঈশ্বরে

নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্মৃতরাং যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয় আর থাকে না—উত্তরোত্তর পরাশাস্তির আকরস্বরূপ চিরশান্তিময় ধামে বিচরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়—তাহাই ‘সখ্য’। এতাদৃশ সখ্য, একমাত্র শান্তি-রাজ্যের অধীশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের শ্রীচরণ-যুগল-সেবাদ্বারাই সম্ভব, নচেৎ স্মদূর-পরাহত।

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি-ভেদে ‘সখ্য’ দ্বিবিধ—

“বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিঃ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্।” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৪)

কৃষ্ণ আযায় পালেন, রাখেন—এইরূপ চিত্রবৃত্তির ভাবই ‘বিশ্বাস-সখ্য’। “রক্ষিত্বীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা”—এই যে বিশ্বাস, ইহাও বিশ্বাস-সখ্য; কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জুন যখন বলিয়াছিলেন—“সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত!”, তখন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কোরব ও পাণ্ডব-সৈন্যসাগর-মধ্যে যুদ্ধ-রথ স্থাপনপূর্বক অর্জুনকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মহারথী অর্জুন কোরব-সৈন্য-সাগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণকে দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হন। তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ, জগতে ‘সখ্য’র বৈশিষ্ট্য স্থাপন-মানসে ও তিনিই যে সর্বৈশ্বরেশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা পরিপূরণ দ্বারা যে জগতের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইতে পারে না, অথবা “মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্যাতে”—এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত অর্জুন-কর্তৃক যুদ্ধে কোরব-বিনাশরূপ দুষ্কার্য্য-সাধন দ্বারা জগতে কীর্ত্তিধ্বজা স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি বিশ্বাস-মিশ্রিত সখ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইস্থলে অর্জুন “সৌহার্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যম্” বাক্য যথাযথ প্রতিপালন করিয়াছেন। এই বাণীর সত্যতা সংরক্ষণ-কল্পে তিনি স্বীয় পরমাত্মীয়-বধেও বিন্দুমাত্র কুঠাবোধ না করিয়া, অগ্নানবদনে শ্রীকৃষ্ণদেশ পালন করিয়া সখ্য-ভক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এতাদৃশ ভাব পরিদর্শন, একাধারে বিশ্বাস-সখ্য ও মিত্র-সখ্য—এই দুই সখ্যেরই পরিচায়ক হইতেছে। শ্রীদাম, স্মদাম প্রভৃতির বিশ্রান্ত-সখ্যের কথা আরও অনেক উন্নত ও বিশ্বাসযুক্ত। এস্থলে তাহা আলোচিত হইল না।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর) .

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

যাত্রাপথে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-দর্শন
তীর্থ-দর্শন, পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত-পালনের নিয়ম

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥

“প্রদক্ষিণঞ্চ বৈ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসন্ধানি ।

বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্ ॥

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎশেষেণ তু কার্ত্তিকম্ ।

তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্বযত্নেন ভাবিনী ॥”

[কার্ত্তিকমাসে (উর্জ্জব্রতকালে) বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ (পরিক্রমা) করিবে ।
বিষ্ণুর পূজা বিধান, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণব দর্শন করিবে । কার্ত্তিক
মাসে বিশেষ করিয়া “কার্ত্তিক-ব্রত” গৃহে করিবে না ; সর্বপ্রকার যত্ন-
সহকারে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিবে ।]

উপরিউক্ত মহাজন-বাণী ও সাঙ্ঘত-বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত
শাস্ত্র-বচন শিরে ধারণ করত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতি বৎসরই কার্ত্তিক-
মাসে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনোপলক্ষে ভগবৎ ও ভাগবত-ধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা
করিয়া দেশবাসিগণের পারমার্থিক কল্যাণ লাভে সহায়তা করিয়া থাকেন ।
এবংসরও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমন্তুষ্টিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত গয়া, কাশী,
প্রয়াগ-তীর্থ, শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন ও পরিক্রমার আয়োজন
করিয়া অকালু জনসাধারণকে ভক্ত্যুগী স্মৃতি অর্জনের সুবর্ণ-সুযোগ প্রদান
করিয়াছেন ।

সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভক্তি-লাভের অপূর্ব সুযোগ

অনেকে বলিয়া থাকেন গৃহে থাকিয়া কি ধর্ম-কর্ম হয় না ? তজ্জন্ম
তীর্থস্থানাদিতে যাইবার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—ধর্ম-কর্ম
যাহাই পালিত হউক না কেন, সর্বত্রই সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন । নিজচেষ্টা
বা বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ—কোনমতে সম্ভবপর নহে ।
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-দ্বারা শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমেই ভক্তি-বৃত্তি উদ্ভিত
হয় । শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্ধ্যবতী ভগবৎ-ভাগবত-গাথা শ্রবণ-

কীর্তনামূলকভাবে জীবের অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। সাংসারিক জীবের এইরূপ সৌভাগ্য অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্ত শ্রীবেদান্তসমিতি অন্যান্য বহু উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও, প্রতিবৎসর দেশবাসী জনসাধারণকে উজ্জ্বলত বা নিয়মসেবা-সময়ে মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তনমুখে বিভিন্ন তীর্থস্থানাঙ্গ দর্শন ও পত্রিমার অযোগ্য দিয়া থাকেন।

পরিক্রমা কাহাকে বলে ও শ্রীমণ্ডলাদি পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমন্তুর্জিহ্বাসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, “চতুষ্টয়প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে পরিক্রমা অত্যন্ত। ‘পরিক্রমা’ ‘পাদসেবন’-ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে নবধা ভক্তি লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— ‘অশ্রু (পাদসেবায়াঃ) শ্রীমূর্তির্দর্শন-স্পর্শন পরিক্রমা-অমুত্রজন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয় - তীর্থস্থান - গমনাদয়োহপ্যন্তর্ভাব্যাঃ ।’ অর্থাৎ শ্রীমূর্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অমুগমন এবং ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীধামের ও শ্রীমণ্ডলের পরিক্রমা—উত্তরোত্তর ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে। শ্রীঃগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীঃগোবিন্দ-মন্দির, শ্রীঃগোবিন্দ-ধাম, “মাথুরা গোষ্ঠবাটী”—শ্রীমণ্ডল-পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। এজ্জন্ত ভগবদ্ভক্তিগণ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-জ্ঞানে মণ্ডলাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।”

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজ-মণ্ডলের ইতিবৃত্ত ও পরিক্রমা ইত্যাদির বিবরণ জানিবার জন্ত শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ ও অন্যান্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্ত ইহা জনসাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বিশেষ উপকারে আসিবে জানিয়া যথাসম্ভব বর্ণিত হইল।

বিগত ৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮, ইং ১৭ই অক্টোবর ১৯৫১, বুধবার—উক্ত সমিতি ২০০ শত শ্রদ্ধালু ভক্ত-যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৮-১০ মিনিটের সময় (৯নং আপ) ডুন্ এন্ড্রুয়েসে রিজার্ভড্ বগীতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পশ্চিমমধ্যে গয়া, কাশী, প্রয়াগ-তীর্থও দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তজ্জন্ত পূর্বে হইতেই ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর মাননীয় কর্তৃপক্ষগণ যাত্রীগণের সুবিধার্থ একখানি বগী রিজার্ভ করিয়া দেন। যে-যে স্থলে দর্শনের নিমিত্ত আমরা

অবতরণ করিয়াছিলাম, সেই সেই স্থানে ঐ রিজার্ভড্ বগীখানি কাটিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পূর্বনির্দিষ্ট সময়ানুসারে যাত্রীগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে উহা পুনরায় অত্র গাড়ীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাত্রীগণের সুবিধার জন্য গাড়ীতে বৈদ্যাতিক আলো, পাখা এবং প্রয়োজনীয় জল ইত্যাদিরও বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। এসম্পর্ক কলিকাতা হেড্ অফিস হইতে আমাদের সকল হণ্টিং ষ্টেশনসমূহে পূর্বেই নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ই, আই, আর, রিজার্ভেশন বিভাগের মহাত্ম্য ভব দায়িত্বশীল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দের অনুগ্রহ-নির্দেশ ও সুব্যবস্থায় যাত্রীগণ বিশেষ আনন্দিত হন।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮-১০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর উহা খুব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্যাংকল ষ্টেশনে পৌঁছিতেই শ্রীশ্রীগুরু-পৌরাক্ষের সন্ধ্যারাত্রিকর পর ভোগ সমাপ্ত হইল। শ্রীবিগ্রহ-শয়নের পর সকল যাত্রীগণকে পুরী, আলুর তরকারী ও মিষ্ট-প্রসাদ ‘খা-চাই’ করিয়া বিতরণ করা হয় এবং উদ্ভূত প্রসাদ ষ্টেশনে দীন-দুঃখিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। যাত্রীগণ মনের আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। সকলেরই মুখে হাসি, মনে উৎসাহ,—আনন্দে সকলেই উৎফুল্ল। এই সময়ে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে কেহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছিলেন, আবার কেহ কেহ গুন্ গুন্ স্বরে কীর্তন করিতেছিলেন। গাড়ীখান যেন আমাদের নিজস্ব শ্রীমঠ-মন্দির ও গৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। একটা সংবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে একজন অগ্রান্ত্র কামরায় গিয়া কাহারও কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সকলেই একবাক্যে তাহাকে বলিলেন—“এইরূপ সুব্যবস্থায়ও যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তবে তাহার তীর্থযাত্রা না করাই ভাল।” বর্ধমানে আমাদের গাড়ী পৌঁছিলে তথা হইতেও কয়েকজন যাত্রী আমাদের রিজার্ভড্ গাড়ীতে উঠিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এইরূপে বহু নদ-নদী, প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, পল্লী-নগরী আতক্রম করিয়া পরদিবস ১৮ই অক্টোবর ভোর ৫-৫৪ মিনিটে আমরা শ্রীবিষ্ণুশাদপদ্মক্ষেত্র শ্রীগয়াধামে উপস্থিত হইলাম। ডুন্ এক্সপ্রেস আমাদের রিজার্ভড্ বগী এখানে কাটিয়া রাখিয়া যাত্রা করিল।

শ্রীবিগ্রহের নিমিত্ত শিবিকা সজ্জিত হইতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণের পতাকা, শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল প্রভৃতি হস্তে যাত্রীগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের গাড়ীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রেলওয়ে কর্মচারিগণ আসিয়া শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া নিজেদের জীবন ধন জ্ঞান

করিলেন। যথাসময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চালৈখ্য-মূর্তি ও শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ বহু মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত শিবিকায় অধিরূঢ় হইয়া জনসাধারণকে কৃপাপূর্বক দর্শন দান করিতে থাকিলে, পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের নির্দেশমত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আনুগত্যে যাত্রীগণ নার-সঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রা-যোগে যুদ্ধ-করতালাদি হস্তে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্্তন করিতে করিতে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত “নয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ” দর্শন ও পরিক্রমা করেন। এস্থলে ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’র সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীনারসিংহ মহারাজ গুরুর প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর গয়া-আগমনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তথা হইতে যাত্রীগণ ১১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীগদাধর মন্দিরে শ্রীপত্রিকার সহঃ সম্পাদক শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয়ের স্বভাবসুলভ স্মধুর কীর্্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতুষ্ট হন। পণ্ডিত শ্রীগৌরানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও এস্থলে গোহামী-শাস্ত্র হইতে গয়া-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্্তন করেন।

হাওড়া হইতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে ২৮৫ মাইল গয়া ষ্টেশন। পঞ্চকোশ ব্যাপিয়া এই গয়াক্ষেত্র। গয়া ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণে শ্রীগদাধর-মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে নিম্নেই ফল্গুন নদী প্রবাহিত। ফল্গুর পরপারে ‘আদি অক্ষয়বট’। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে ‘ব্রহ্মযোনি পর্বত’ ও উত্তর দিকে ‘রামশিলা পর্বত’ এবং ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে ‘প্রেতশিলা পর্বত’। শ্রীমন্দির হইতে ৫৬ মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকে ফল্গুনদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া সকলেই ষ্টেশন অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যাত্রীগণের থাকিবার জন্য ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী “শেঠ শিউপ্রসাদ বুনুঝনবালা ধর্ম্মশালা” নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ভক্তগণ ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া “নগর ভ্রমণ ক’রে গৌর এল ঘরে” কীর্্তনটী উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ ও আরাত্রিকের পর প্রসাদ সেবান্তে সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা

সন্ধ্যা-আরতি ও কীর্্তনান্তে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে “সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ” পাঠ করেন। পাঠের পূর্বে তিনি যাত্রীগণকে পরিক্রমায় যোগদানের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ

করেন। তিনি বলেন—পরিক্রমা ও তীর্থস্থানাди দর্শনের তাৎপর্য না বুঝিয়া বৈষ্ণব-আনুগত্য বাদ দিয়া নিজ ইচ্ছামত কেবল ‘আকু-পাকু’ করিয়া বেড়াইলেই আমাদের কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তীর্থ-দর্শন, তাহা হইলে, কেবল ভ্রমণেই পর্য্যবসিত হইবে। আপনারা যখন আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, তখন আমাদের কর্তব্য হিসাবে আপনাদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছি। শ্রবণমুখেই আমাদের দর্শন হওয়া প্রয়োজন। ‘শ্রবণ’ না হইলে আমাদের সম্যক ‘দর্শন’ হইবে না। তাই আমাদের গুরুবর্গ কর্তৃক দ্বারা দর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পরে স্বামিজী আরও বলেন,—গয়া—‘কর্মক্ষেত্র’, বাশী—‘জ্ঞানক্ষেত্র’ এবং প্রয়াগ—‘ভক্তিক্ষেত্র’। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম ও জ্ঞানের আদর করেন না। শ্রীচরিতামৃত-কথিত বিদ্যানগরের দুই মহাভাগবত, যাহাদের জন্ম শ্রীভগবানের শ্রীমুর্তি শত দিবসের পথ হাটিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া “মথুরাতে আইলা দু’হে আনন্দিত হৈঞা ॥” ‘মহাজনো যেন গতঃ সঃ পশ্চাঃ।’ সূতরাং মহাজনবর্গের সর্বতোভাবে অনুসরণই আমাদের কর্তব্য। আমরা গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই পরিক্রমা-পথে অগ্রসর হইব।

তিনি আরও বলেন—বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রই কর্মমार्গের হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য্য ও কর্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন “কৃতাত্যয়ে অনুয়শবান্ দৃষ্টশ্চুতিভ্যাম্” সূত্রেও কর্ম ও কর্মফলের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া কর্মজড় স্মার্তগণের বিশেষ রুচিপ্রদ হইলেও, স্বয়ং ভগবান্ শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির গয়ায় আগমনের সেক্ষেপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীভগবান্ যাহাকে পিতৃত্ব বরণ করিয়াছেন, তাঁহার অধঃলোক বা প্রেতলোক-প্রাপ্তি কিরূপ বিশ্বাস করা যায়? সূতরাং প্রভুর গয়ায় আগমনের অন্তরূপ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তিনি স্বয়ংই শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণাভিনয় করিয়া বলিয়াছেন—“কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস পান। আমায়ে করাও তুমি এই চাহি দান ॥”

অনেকে শ্রীমন্নুহাপ্রভুর গয়াযাত্রার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ‘তিনি স্মার্তগণদের প্রশ্রয় দিয়াছেন’—এইরূপ বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন। শ্রীগৌরহরিনিখিল জগতের লোক-শিক্ষক প্রভু। তিনি এস্থলে কেবলমাত্র

একটা 'লৌকিক-আচার' প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। পক্ষান্তরে, কৰ্ম্মজড় স্মার্তগণ "এতে প্রেত-তর্পণকালে ভবন্তীহ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি সময়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে পিণ্ডাদি দান করেন, তাহা সৰ্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, যিনি দেহান্তে উদ্ধগতি বা উন্নত লোক লাভ করিয়াছেন, বা মুক্ত-ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাকে যদি ভগবন্নৈবেদ্য ব্যতীত অত্কিছু নিবেদন করা হয়, তাহা কি তিনি গ্রহণ করিবেন? শাস্ত্রকারগণ বলেন—বদ্ধজীবেরই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। 'অপুনর্ভব' মুক্তি সৰ্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। অক্ষয় স্বর্গের কথাটী কেবল বাক্যবিজ্ঞাসমাত্র। উহার প্রকৃত তাৎপৰ্য সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। তবে, 'স্বর্গ'-শব্দের অর্থে বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামসমূহকে লক্ষ্য করিলে, অক্ষয় স্বর্গের সার্থকতা আছে। জীবমাত্রের মৃত্যুর পরের অবস্থা লইয়া কিছু মতভেদ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে, বদ্ধজীব অত্ৰ জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোথাও বা, মৃত্যুর পর বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিয়া পরে কৰ্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, সৰ্ব্বত্রই কৰ্ম্মানুসারে পরজন্ম নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং কৰ্ম্মের তারতম্য অনুসারে, কেহ বা প্রেতলোক, ভূতলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবর লোকাদিতে জন্মগ্রহণ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিচার বাদ দিয়া, সাধারণ উদাহরণ গ্রহণ করিলেও আমরা বিষয়টী অর্থাৎ স্মার্ত-শ্রাদ্ধাদির পরিণতি ভালরূপ বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীর স্মৃতি বা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' অনুসারে শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি নির্দোষ ও সৰ্ব্বতোভাবে পবিত্র। স্মার্তগণের বিচার অনুসারে সাধু-অসাধু যে-কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার শ্রাদ্ধে যেরূপ পিণ্ড-দানাদির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়, তাহা সৰ্ব্বত্রই একপ্রকার। সাধু ব্যক্তি যদি চিরজীবন সংকৰ্ম্মের দ্বারা নিষ্পল পবিত্র জীবন-যাপন করিয়া থাকেন, এমন কি, যিনি মোক্ষ-পদবী লাভ করিয়াছেন, তিনিও স্মার্তগণের শ্রাদ্ধকালে "এতে প্রেত-তর্পণকালে ভবন্তীহ" মন্ত্রের দ্বারা উদ্দিষ্ট হইতে বাধ্য হন। সেই সাধু ব্যক্তির সৎপুত্র কি করিয়া তাহার ধার্মিক পিতাকে প্রেতলোক-গত বদ্ধ হয়ে বা ঘৃণিত মনে করিয়া স্মার্তের অধীন পিণ্ডদান করিতে পারেন? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এইরূপ ক্ষেত্রে বাসুদেবে নিবেদিত মহাপ্রসাদ, যাহা ব্রহ্মতুল্য নির্বিকার বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহার দ্বারাই পিণ্ডদানাদি করিয়া, মৃত-ব্যক্তি বদ্ধ বা মুক্ত যে-কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তদ্বারা তাঁহার তৃপ্তি-বিধান করিয়া থাকেন। এস্থলে গীতার (৯।২৫) শ্লোকটী বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ নিজ-নিজ কস্মানুসারে বদ্ধজীব ভূত-লোক, পিতৃ-লোক, দেব-লোক এবং ভগবদ্ভক্ত নিত্য বৈকুণ্ঠাদি ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মৃত ব্যক্তি কোন্ লোকে গমন করিয়াছেন—ইহা শ্রদ্ধাকর্তা স্থির করিতে না পারিলে একরূপ একটি পথই অবলম্বন করা আবশ্যিক, যাহার দ্বারা সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে পারা যায় । যে-দ্রব্য ভূত প্রেত-লোক ব্যতীত দেব-মনুষ্য-লোকাদিতে প্রবেশ করে না, তাহার দ্বারা সকলের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না ; বৈকুণ্ঠাদি মোক্ষলোকের বিষয় ত' দূরের কথা । বিষ্ণু-নৈবেদ্য সকলেরই মঙ্গলদায়ক ও সর্বত্র তাহার অবাধ গতি ।

রাত্রে প্রসাদাদি পাইয়া যাত্রিগণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন । আগামীকল্য সকালে কাশী যাত্রা করা হইবে । (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; পৌষ—১৩৫৮

জানুয়ারী—১৯৫২

২৫ নারায়ণ, ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ৩২০ ।
পুত্রদা একাদশীর উপবাস ।

২৬ নারায়ণ, ২৩ পৌষ ৮ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী ৪২৬ ।
দি ৯।৩৭ গতে ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ । শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের
তিরোভাব ।

৩০ নারায়ণ, ২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, শনিবার—পূর্ণিমা দি ৯।৫৮ ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা ।

মাঘ—১৩৫৮

৩ মাঘ, ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ৪।০ । শ্রীল
গোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের
তিরোভাব ।

৫ মাধব, ৩ মাঘ, ১৭ জাম্বুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬।২০।
শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির
শাখামঠ সমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৯ মাধব, ৭ মাঘ, ২১ জাম্বুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-নবমী সন্ধ্যা ৫।০। শ্রীল
লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মাধব, ৯ মাঘ, ২৩ জাম্বুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১।৪৫।
ষট্টিলা একাদশীর উপবাস।

১২ মাধব, ১০ মাঘ, ২৪ জাম্বুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১।৪৩।
পূর্বাহ্ন ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৯ মাধব, ১৭ মাঘ, ৩১ জাম্বুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌর-পঞ্চমী রা ৭।২৭।
শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। শ্রীল রঘুনাথ
দাস গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব।

২১ মাধব, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—গৌর-সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।২।
মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে
উপবাস।

২২ মাধব, ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌরাষ্টমী সন্ধ্যা ৬।১৫। পূর্বাহ্ন
১০।০ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর পারণ। শ্রীভীষ্মপঞ্চক।

২৩ মাধব, ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—গৌর-নবমী রা ৬।৫২। শ্রীপাদ
মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব, ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-দশমী রা ৭।৫৮। শ্রীল
রাগানুজ আচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব, ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—গৌরৈকাদশী রা ৯।৩২। তৈমী
একাদশী ও বরাহদ্বাদশীর উপবাস।

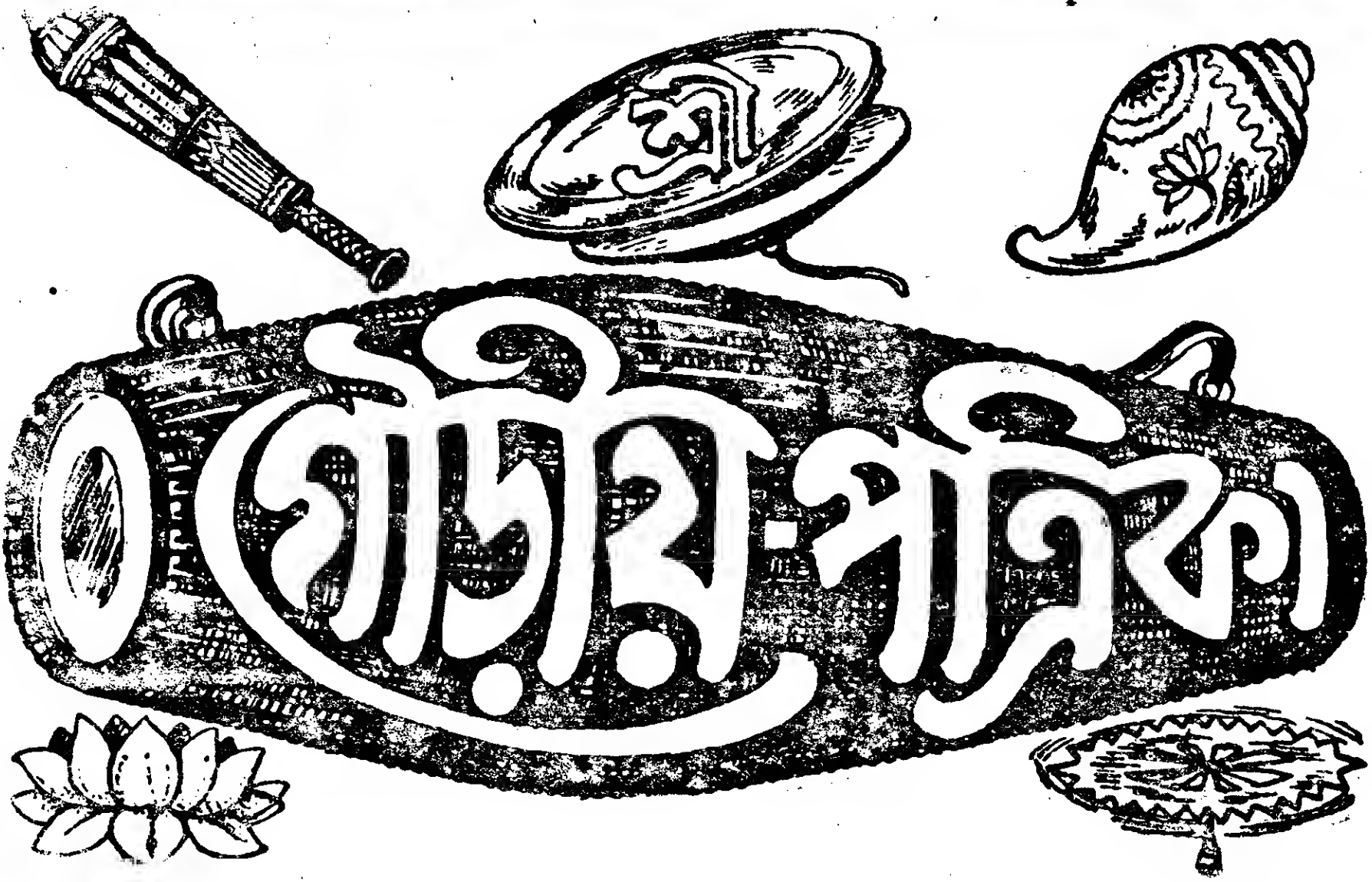
২৬ মাধব, ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১১।২৪।
বরাহদেবের অর্চনান্তে পূর্বাহ্ন : ০।২৪ মধ্যে পারণ।

২৭ মাধব, ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১।৩১।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।

২৮ মাধব, ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—গৌর-চতুর্দশী রা ৩।৪০।
পূর্বাহ্ন ১০।২৩ মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর পারণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ২ মাঘ, ৪৬৫ গৌরাদ
সোমবার, ২৯ পৌষ, ১৩৫৮; ইং ১৪।১।৫২ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডলিকম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীমদীশ্বরী-কুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশানন্ম-ধর্মোত্তি-রঙ্গৈ-

নিখিল-নিজসখীভির্ষৎ সহস্তুন পূর্ণম্ ।

প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ-

স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

ব্রজভূবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
 রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্লদ্রুমং তম্ ।
 জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
 ত্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
 প্রসর-কৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্ ।
 অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈ-
 স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমিনিকামং
 ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব ।
 পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্তা-
 স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
 প্রণয়-সুরলতা স্নাতস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সূনোঃ ।
 সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্তা
 তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ রুপ্ত-নামান উচ্চৈ-
 নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ ।
 মধুকর-রত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
 স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

তট-ভূবি বরবেণ্ডাং যস্য নস্ম্যতি-হৃদ্যাং
 মধুর-মধুরবার্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা ।
 প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
 তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমতালি-সঙ্গৈঃ
বরসরসিজ-গন্ধৈহারি-বারি-প্রপূর্ণে ।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু-কুণ্ডলকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি-দাম্ভ্যাপিতাত্মা ।
অচিরমিহ-শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপূরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডলকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী দৈত্যকে বিনাশ করিলে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাগীর পরিহাসগর্ভ বাক্যে [অর্থাৎ—তুমি ব্রজরাজনন্দন হইয়া বৃষাসুর বধ করায় তোমার গো-হত্যা-জনিত পাপ হইয়াছে ; রাজকৃত পাপ প্রজাসকলকেও স্পর্শ করে, অতএব আমাদের যে পাপ হইয়াছে তজ্জন্তু আমরাগিকেও সর্বতীর্থের জলে অভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে ।] নিজের সমস্ত সখীগণের সহস্থানীত জলে পরিপূর্ণ হইয়া যে রাধাকুণ্ড শ্রীনন্দনন্দন-কর্তৃক আমোদপূর্বক এই পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই অতি রমণীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

যে রাধাকুণ্ড, স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়-ক্ষেত্রে চন্দ্রা-রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের বাঙাতিশয় দ্বারাও দুঃপ্রাপ্য অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রেম-কল্পতরু উৎপাদন করেন, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

অতের কথা কি বলিব, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণও মানিনী শ্রীরাধার বিস্তৃত প্রসাদ-জনিত কটাক্ষ-লাভের আশায় স্নান-সেবানুবন্ধন-হেতু সযত্নে যে রাধাকুণ্ডের অনুসরণ করেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

ব্রজের মধুর-রসাম্রিত কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ছায় যাহা ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেমভাজন, এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-

কর্তৃকই শ্রীরাধার নামদ্বারা প্রচারিত অর্থাৎ ‘শ্রীরাধাকুণ্ড’ এই নামে প্রকাশিত, সেই অতি কমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

এজগতে বিবেকাদিশূন্য ব্যক্তিও যে রাধাকুণ্ডের সেবানুগ্রহে তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াস্পদরূপ প্রেম-কল্পলতিকা হইয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্তুরূপ পুষ্প-সমৃদ্ধি-লাভে প্রশংসনীয় হন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার নিজ-পরিজনবর্গ অর্থাৎ শ্রীললিতাদি সখীগণ-কর্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নাম-বিশিষ্ট, [অর্থাৎ—পূর্বতটে চিত্রা-সুখদ-কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদ-কুঞ্জ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত] এবং সখীগণের বিভাগক্রমে পরিজনবর্গ-কর্তৃক আশ্রিত, ভ্রমর-গুঞ্জনরম্য, সকলের বাঞ্ছনীয়, মধুররসের উদ্দীপক বাহার তটস্থিত নিকুঞ্জ-সমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

যাঁহার তট-প্রদেশস্থ উত্তম বেদিকার উপরিভাগে ঈশ্বরী শ্রীরাধিকাদেবী প্রাণসখীগণের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্বন্ধীয় অতি মধুর বার্তাসমূহ পরস্পর বাক্-চাতুর্য্য-সহকারে প্রকাশ করিতেছেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

উত্তম কমল-সৌরভযুক্ত মনোহর সলিল-পূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল প্রমত্ত হইয়া প্রেমমত্ত সখীগণের সহিত অতিরঞ্জে প্রত্যহ বিহার করিতেছেন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীরাধার নিয়ত-উল্লাসদায়ী দাস্ত্রে . আত্মসমর্পণপূর্বক শ্রীরাধিকার এই মনোহর কুণ্ডাষ্টক নিম্নলিখিত সর্বতোভাবে পাঠ করেন, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া পরম-হর্ষযুক্তা প্রেমসী শ্রীরাধাকে সেই সাধকের এই শরীরে অবস্থিতি-কালেই দর্শন লাভ করাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

উপকুর্বাণ

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—(১) উপকুর্বাণ ও (২) নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ,—‘উপকুর্বাণ’ ও ‘নৈষ্ঠিক’। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে, ১৭ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক-টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—‘উপকুর্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ’।

উপকুর্বাণের পালনীয় ধর্ম

‘উপকুর্বাণের’ ধর্ম শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে—শৌক-জন্ম-লাভের পর, দ্বিতীয় সাবিত্র-জন্ম । পরে তৃতীয়—দৈক্ষ্য-জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন । গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর বেদাধ্যয়ন-জন্তু আচার্য্য-কর্তৃক আহুত হইয়া তৎকূলে বাস করিবেন । মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অতৈল নিবন্ধন জটা-ধারণ, অধৌত দস্ত ও অধৌত পরিধেয় ও ‘কুশ’ ধারণ করিবেন । রক্তাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ । স্নান, ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ-কালে বাগ্‌যত হইবেন । কক্ষোপস্থিত লোম ও নখ-ছেদন নিষিদ্ধ । স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না । অনিচ্ছায় সেইরূপ হইলে জলে অবগাহনপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন ; অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক্ হইয়া জপ করিবেন ।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি উপকুর্বাণের একান্ত করণীয়

আচার্য্যকে অতীষ্টদেব জ্ঞান করিবেন, কখনই অপমান এবং মরণশীল-জ্ঞানে অশ্রয়া করিবেন না । গুরু সর্বদেবময় । প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্ত্রদ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন । তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন । আপনাকে নীচের গ্ৰায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্বদা সেবা-শুশ্রূষা করিবেন । তাঁহার যান, শয্যা, আসন ও স্থানের নাতিদূরে কুতাঞ্জলি হইয়া থাকিবেন । এইপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ‘উপকুর্বাণ’ ব্রহ্মচারী ভোগ-বিবর্জিত হইয়া অথও ব্রত-ধারণপূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন কালাবদি গুরুকূলে বাস করিবেন । পরে আশ্রমাস্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদান করত গুরুভিমতিক্রমে স্নান করিবেন অর্থাৎ সমাবর্তন করিবেন ।

‘নৈষ্ঠিক’ ব্রহ্মচারীর লক্ষণ

যাঁহারা ‘নৈষ্ঠিক’ ব্রহ্মচারী, তাঁহারা ‘উপকুর্বাণ’ ব্রহ্মচারীর গ্ৰায় সমাবর্তন করিবেন না । আজীবন ভক্তিযোগ দ্বারা নিকাম শুদ্ধাস্তঃকরণে ‘বৃহদব্রত’ ধারণ করিবেন । বৃহদব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্মলতা লাভ করিবে । ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্বাণ-শ্রেণীস্থ হইবেন । তাঁহাদের সমাবর্তন-বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্মাশ্রয় করিবেন । নিকাম হইলে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচার্য্য-ক্রমে গুরু-পাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৬) লৌল্য

লৌল্য অর্থাৎ চাঞ্চল্যের প্রকার-ভেদ

‘লৌল্য’-শব্দের অর্থ—চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি-চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্ত-চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য। শ্রীগীতায়—

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্ননোহনুবিধীয়তে ।

তদশ্রু হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবিমবাস্তসি ॥ (গীঃ ২।৬৭)

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-দিগের মধ্যে যে-ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

রাগ-দ্বেষাত্মক চিত্ত-চাঞ্চল্য ভক্তির দ্বারা জিত

আবার বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্বার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োন্ বশমাগচ্ছেত্তৌ হস্ত পরিপন্থিনৌ ॥ (গীঃ ৩।৩৪)

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। সেই রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু রাগ-দ্বেষই শত্রু হয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ভক্তিদ্বারা নিয়মন কর্তব্য

ভক্তির আজ্ঞা এই যে, বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যই যখন ভক্তি-সাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্ভাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে-সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে যে অংশে ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে,

তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্তব্য । কিন্তু যত দিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, তত দিন কি করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে ? অতএব বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষ্টকে নিয়মিত করিতে পারিবে ।

বুদ্ধি দ্বিবিধ—(১) ব্যবসায়াত্মিকা, (২) বহুশাখা

মনের সদসদ্বিষয়িণী বৃত্তিকে ‘বুদ্ধি’ বলে । সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ ‘ব্যবসায়াত্মিকা’ ও ‘বহুশাখা-সমন্বিতা’ বুদ্ধি । ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার ; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার । যথা, গীতায়—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন !

বহুশাখা হনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ (গীঃ ২।৪১)

অব্যবসায়ীদিগের বহুশাখা-বুদ্ধি হইতে কাম, স্বর্গ-গমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য এবং চিজ্জগতের অনঙ্গীকার—এই সকল উৎপাতের উদয় হয় । সূত্রাং—

ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ (গীঃ ২।৪৪)

ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে । কাজে-কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না । সমাধিতে যাহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী ।

স্থিত-প্রজ্ঞ ও স্থিত-ধীর লক্ষণ

তাহাদের লক্ষণ এই—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মগ্ৰেবাঅনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষুঅদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ (গীঃ ২।৫৫-৫৬)

হে পার্থ ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ । যখন দুঃখে অন্বিগ্নমন ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বর্জিত হ’ন, তখন তিনি স্থিতধী মুনি হইতে পারেন । এই ‘উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত ।

প্রাকৃত-বুদ্ধি মনের, অপ্রাকৃত বুদ্ধি আত্মার

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে-বৃত্তি সদসদ্ বিচার করে তাহা একপ্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত-বুদ্ধি এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে, সে-বুদ্ধি অপ্রাকৃত-প্রকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এইজন্ত গীতায়—

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যানুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈর্ধ্বং পরতন্ত সঃ ॥ (গীঃ ৩।৪২)

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকল শ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; কেন-না মনের চিত্তবৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়সকল কৰ্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি আত্মগত-বৃত্তি, অতএব মনের নিয়ন্তা—প্রভু; কোন জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃতভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। অতএব ক্ষেত্রজ-পুরুষকে ‘বোদ্ধা’ বলিয়া বেদে নির্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চিন্ময় অহঙ্কার, ও চিত্তে বলবতী বুদ্ধির পরাক্রম

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ-চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্তাভিমান-রূপ চিন্ময়-অহঙ্কার উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিত্তস্তর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্তা-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং তিনি প্রাকৃত-কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করেন। এই অবস্থায় ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ ও ‘স্থিতধী’—এই দুইটা নামে জীব পরিচিত হন। চিত্তে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চল হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আত্মাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে; ‘ইন্দ্রিয়গণের অর্থে’ অর্থাৎ বিষয়-সমূহে কৃষ্ণদাস্তানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই ‘ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ’ বলে।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপায়

শুদ্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায়—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারশ্চ দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যশ্চ পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ (গীঃ ২।৫২)

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্ত-রসরূপ চিত্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়-বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সম্মূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাক্ষুশ্য, ও চিত্ত-চাক্ষুশ্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়।

কর্ম-যোগ-বৈরাগ্য-জ্ঞান-দানাদি বুদ্ধি-চাক্ষুশ্য বিনাশ করিয়া ভক্তি-লাভই কর্তব্য

বুদ্ধির চাক্ষুশ্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুদ্ধ-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন বা শুদ্ধ-জ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীভাগবতে একাদশে কথিত হইয়াছে—

যং কর্মভিষত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যং ।

যোগেন দান-ধর্ম্যেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মদ্বক্ত্রিযোগেন মদ্বক্ত্রো লভতেহঙ্গসা ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ।

ন কিঞ্চিং সাধবো ধীরা ভক্তা হে কান্তিনো মম ।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৪)

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা যাহা লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টাদ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম-জ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে-ফল নির্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম ও অন্ত যতকিছু শুভকর্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়—সে-সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম-দ্বারা যে স্বর্গাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ-প্রাপ্তি এবং কর্ম-মার্গীয় শুষ্কার্চন-ব্রতদ্বারা যে উচ্চ-লোকাদিতে গমন হয়, সে-সমুদায় তত্তৎ উপায়দ্বারা অতি কষ্টে ঘটিয়া থাকে ; মদ্বক্ত্রগণ ইচ্ছা করিলে সেইসকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বপ্নায়ামে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা মদ্বক্ত্র কৈবল্য অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবা-সুখই তাঁহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এইসমস্ত বিচার করত ভক্তিসাধক পুরুষ চাক্ষুশরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন ।

**লৌল্য অর্থাৎ অশুদ্ধ-বিষয়-লোভ—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত
যম-নিয়ম-আসনাদি দ্বারা নষ্ট হয় না।**

‘লৌল্য’-শব্দের অন্য অর্থ—লোভ । লে ভ যদি অন্য বিষয়ে করা যায় তবে, তাহা কৃষ্ণ-বিষয়ে আর কিরূপে কার্য্য করিবে ? কৃষ্ণ-দাশ্ত্রে লোভকে বহুযত্নে নিবৃত্ত করা কর্তব্য । বিষয়-ভোগ-লোভকে পূর্বোক্ত উপায়দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে । এইজন্য বলিয়াছেন যে, কাম-লোভহত ব্যক্তিগণ যমাদি যোগ-প্রক্রিয়ায় তত শুদ্ধ হইতে পারেন না, যেরূপ কৃষ্ণসেবা দ্বারা হইতে পারেন । যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদন্তথা দ্বাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি— এই অষ্টাঙ্গদ্বারা সূক্ষ্মরূপে যোগ সাধিত হইলেও সাধকের চিত্ত কাম-লোভ দ্বারা সর্বদা হত হওয়ায় শমতা-গুণ লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু কৃষ্ণসেবা-পদ্ধতি আদরপূর্বক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে সম-ধর্ম্মকে অবলম্বন করেন ; কেন-না “শমো মন্বিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ” (ভাঃ ১।১।১২ ৩৬) ।

লৌল্য অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবা-লোভই মঙ্গলের হেতু

কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর-লোভ থাকিতে পারে না । ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগ-ভক্তিতে অধিকার লাভ করেন । যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-লোভ খর্ব্ব হয় । ভাগ্যরূপ ভোজন, পান, শয়ন, ধূম্র ও আসবাদি-সেবায় লোভ থাকিলে তাহা দ্বারা জীবের ভক্তি দক্ষুচিত হয় । আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী । ষাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐসকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন । পাপ-বস্তুতেই হউক বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর-লোভ অত্যন্ত হেয় । কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্বমঙ্গলের হেতু । মহাজনের যেরূপ কৃষ্ণকথায় লোভ হয়, তাহা শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বরন্তু ন বিতুপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে ।

যচ্ছ্রুতাং রসজ্ঞানাং স্বাহ স্বাহ পদে পদে ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

হে স্মৃত ! উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন-শ্রবণে আমরা তৃপ্তি লাভ করি না ; কেন-না তাহাতে রস লাভ করত আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমরা তাহা যত শুনি, ততই পদে-পদে আমাদের স্বাদ-বৃদ্ধি হইতেছে । এই কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভের অন্যতম নাম—‘আদর’ । এবিষয়ে পরে আমরা বিশেষরূপে বিচার করিব ।

লৌল্য অর্থাৎ ‘বাসনা,’ ইহা (১) ভোগ ও (২) মোক্ষ-ভেদে দ্বিবিধ
লৌল্যের অন্য অর্থ—‘বাসনা’ । বাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ ভোগ-বাসনা ও মোক্ষ-বাসনা । এই দুইপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তি-সাধন হয় না । শ্রীকৃষ্ণগোপীনাথ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যদয়ো ভবেৎ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা—ইহারা দুইটী পিশাচী । ইহারা যে-পর্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে-পর্যন্ত ভক্তি-সুখের উদয় হয় না ।

(১) ভোগ-বাসনা দ্বিবিধ—ঐহিক ও পারত্রিক

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক । ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য, রাজ্য, জয়, সুখাদ্ভ্য ভোজন, সুখশয্যা শয়ন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্তু কামিনী-সন্তোগ, বর্ণাদির সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস—সমস্তই ঐহিক ভোগ । স্বর্গ-গমন ও তথায় অমৃতাদি সেবন এবং অজর অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি—সমস্তই পারত্রিক ভোগ । হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারে না । স্মরণ্য ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তি-সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত হয় ।

**ভক্তি-অনুকূল বিষয়-ভোগের নাম—“সাধক-জীবনোপায়”
ও “যুক্তবৈরাগ্য”**

ইহাতে একটি কথা এই যে—ঐ সমস্ত বিষয়-ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ-ভাবে স্বীকার করিতে পারেন । সে-স্থলে ঐসকল ভোগকে ‘ভোগ’ বলা যায় না, কিন্তু ‘সাধক-জীবনোপায়’ বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায় । শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

ধর্ম্যস্ত হ্যাপবর্গ্যস্ত নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নর্থস্ত ধর্ম্মেকান্তস্ত কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

কামস্য নেদ্রিয়প্রীতির্নাভো জীবতে যাবতা ।

জীবন্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কস্মভিঃ ॥ (ভাঃ ১।২।২-১০)

ভোগ-সাধক ধর্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল—ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হয় । কিন্তু আপবর্গ্যরূপ একান্ত ধর্ম্মে যে অর্থ-লাভ হয় এবং অর্থে যে কাম-প্রাপ্তি হয়, সে-সমস্তই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অনুকূল হইয়া থাকে ; যেহেতু কৃষ্ণ-কাম—ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামই—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা । এই ধর্ম্মের অন্ততম নাম—‘যুক্ত-বৈরাগ্য’ ।

(২) মোক্ষ-বাসনা পঞ্চ প্রকার

মোক্ষ-বাসনাও নিতান্ত পরিত্যাজ্য । মোক্ষ পঞ্চ প্রকার—সালোকা, সাষ্টি, সামীপ্য, সাক্ষ্য ও সাযুজ্য । ভক্তি-সাধকের পক্ষে সাযুজ্য মুক্তি বড়ই ঘণিত । সালোকা, সাষ্টি, সামীপ্য ও সাক্ষ্য—ইহারা ভোগবাঞ্ছাশূন্য হইলেও স্পৃহণীয় নয় । জীবাত্মা ভক্তি-বলে উড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন । কিন্তু সে-মুক্তি ভক্তির অবাস্তুর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফল নয় । মুক্ত-পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধন-ভক্তির মুখ্য ফল । এস্থলে শ্রীসার্কভৌমের উক্তি বড়ই মধুর । যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

‘সালোক্যাদি’ চারি যদি হয় সেবা-দ্বার ।

তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥

‘সাযুজ্য’ শুনিতে ভক্তের হয় ঘণা-ভয় ।

‘নরক’ বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥

ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত’ প্রকার ।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য বিকার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৭-২৬৯)

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের যে অচিৎ-সম্বন্ধ-ছেদনরূপ মুক্তি হয়, তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন । তজ্জন্ম স্পৃহা করিয়া ভক্তি-চেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয় ।

বহির্মুখ-লোল্য বিণেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তি-সাধকের একান্ত কর্তব্য ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সঙ্জনতোষণী—১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)



শ্রীল ঠাকুর নরহরি

নমঃ সেবাবিগ্রহায় 'শ্রীনরহরি'-নামিনে ।

সর্বজীব-সুহৃদায় সর্বসদৃশ-ধারিণে ॥

কায়-মনো-বাক্যে বন্দি' ও-রাঙ্গা চরণ ।

অহৈতুকী কৃপাশিস্ কর বরিষণ ॥

সুপ্রসন্ন হও প্রভো ! তব নিজগুণে ।

সার্থক করহ 'অদোষ-দরশী'-নামে ॥

আমি ত' পতীতা অতি, তুমি ত' পাবন ।

প্রভু-ভূত্যে এ-সম্বন্ধ নিত্য সনাতন ॥

কুকুর-জনম শ্রেয়ঃ তোমার চরণে ।

ভুষ্ট-পুষ্ট হই সदा উচ্ছিস্ট সেবনে ॥

শ্রবণ নিয়োগ রহ বাক্য-সুধা-পানে ।
 নয়ন সার্থক হ'ক সেবা দরশনে ॥
 বদন নিযুক্ত থা'ক যশের কীর্তনে ।
 মস্তক নমিত হউক চরণ-বন্দনে ॥
 মানস নিযুক্ত রহ গুণের চিন্তনে ।
 চিত্ত রত হউ 'সেবা-বিগ্রহে'র ধ্যানে ॥
 মহাভাগবত তুমি, ভকত-প্রধান ।
 তোমার স্মরণে হয় বিঘ্ন অন্তর্কান ॥
 ক্ষম ক্ষম ক্ষম দেব ! সর্বব অপরাধ ।
 ছুটুক আমার যত ভকতির বাধ ॥
 মো-হেন পাপাত্মা নাহি পাবে ত্রিভুবনে ।
 হেন অপরাধ নাহি না ক'রেছি মনে ॥
 শ্রদ্ধাও তারিতে পারে ভাগবতগণে ।
 এই ত' ভরসা মোর একমাত্র প্রাণে ॥
 চরণ-সরোজ-সেবা মাত্র করি' দান ।
 এঅধমে নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
 সাং বানারিপাড়া (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্কপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

অল্প-মেধাবী ব্যক্তিগণই অনিত্য ফল-লাভের আশায় অল্প দেবতার আরাধনা করে । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একমাত্র ভগবানের আরাধনা করিলেই যদি সমস্ত কার্যই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল ব্যক্তিই সেই পথ অবলম্বন করে না কেন ? দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন—“মহারাজ ! যাহাদের অল্প পুণ্য সঞ্চয় আছে, তাহাদের নাম-ব্রহ্মে, বৈষ্ণবে, গোবিন্দে এবং মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না ।” শ্রীভগবদগীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই স্বয়ং সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

যেষাং স্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনিম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ (গীঃ ৭।২৮)

পাপাবিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি জন্মায় না । যাহারা স্ব-স্ব ধর্ম-সম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্মদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাঁরাই আদৌ কর্ম-যোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান-যোগ ও পরিশেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা সমাধিক্রমে ভগবানের চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন । সেইপ্রকার পুণ্যবান্ ব্যক্তিই ভগবানের নিত্য-স্বরূপ শ্রামশূন্য দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ বিদ্বৎ-প্রতীতিতে দেখিতে পান ।—

বেগুং কণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং

বর্হাবতংসমসিতামুদসুন্দরাজম্ ।

কন্দর্পকোটি-কমনীয়বিশেষশোভং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩০)

পাপের দ্বারা অবিচাররূপ ঘোর অন্ধকার বিস্তার-লাভ করে, আর পুণ্যদ্বারা জ্ঞানরূপ আলোকের সন্ধান পাওয়া যায় । সেই পুণ্যদ্বারা যে-জ্ঞান সঞ্চয় হয়, তাহাঁই বিদ্বৎ-প্রতীতি । নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসাদি ব্যাপার সাধন করিয়া যাহারা কেবলই পাপকর্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি-লাভ করা একান্ত দুর্লভ ব্যাপার । পুণ্যকর্ম দ্বারা বা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বিদ্বৎ-প্রতীতি উদ্ভূত হইলেই, দ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব-মোহ হইতে নিম্মুক্ত ব্যক্তি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া তাহাকেই ভজন করেন । কেবলমাত্র পুণ্যকর্ম দ্বারা ভগবদর্শন হয় না । পুণ্যকর্ম সম্যক সাধিত হইলেই সদ্ভগুণ উৎখিত হয় এবং তদ্বারা তমো গুণাদি মোহ ধ্বংস হইয়া যায় । রজস্তমো গুণ ধ্বংস হইলেই বিদ্বৎ-প্রতীতি প্রকাশ পায় ।

এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, কলিকালে পুণ্যকর্ম করিবার যজ্ঞ, দান, তপশ্চা প্রভৃতি যে পদ্ধতি, তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য সাধারণ ব্যক্তির আছে কি না ? ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, সেই সকল ব্যয়-বাহুল্য কার্য্য কলিহত জীবের আদৌ সম্ভবপর নহে । তজ্জন্তই কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন—

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥”

কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামেরই শ্রবণ কীর্তন-স্মরণ দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রে বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কলিকালে

একমাত্র নামযজ্ঞ-সাধনেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়। ‘হরেনাম’ বা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় নামেরই শ্রবণ-কীৰ্ত্তন দ্বারা সমস্ত অভদ্ররাশি নষ্ট হইয়া যায়।—

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ

ক্ষীগোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।” (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

অতরাং আমাদের দ্বন্দ্ব-মোহরূপ অভদ্রাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সেই শ্রামশূন্য মুরলীধর ভগবদ্বিগ্রহকে বা তদভিন্ন নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত শ্রীভগবন্নামকে সর্বদাই স্মরণ-পথে রাখিতে হইবে। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃতভাবে গীতায় ব্যক্ত করিলেন। যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজতাস্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধিস্মামেবৈষ্যন্তসংশয়ঃ ॥ (গীঃ ৮।৬-৭)

মৃত্যু-সময়ে যিনি যেভাবে পোষণ করিয়া উপস্থিত শরীর ত্যাগ করেন, পরজন্মে তিনি সেই সেই ভাবগত শরীর প্রাপ্ত হন। উপস্থিত পঞ্চভূতাত্মক জড়-শরীর নষ্ট হইলে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত যে সূপ্তাবস্থার সূক্ষ্ম-শরীর আছে, তাহা মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। যেরূপ বায়ু-প্রবাহ হইতে স্থল-বিশেষের ভাব প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার মৃত্যুকালের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-সম্মিলিত ভাব পরজন্মে জড়-শরীরে প্রকটিত হয়। কোন উত্তম স্তম্ভ ফুল-ফল-শোভিত উদ্যান-বাটীকা হইতে প্রবাহিত বায়ু যেমন স্তম্ভকেই বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোয় দুর্গন্ধময় স্থান হইতে প্রবাহিত বায়ু যেরূপ দুর্গন্ধময় হইয়াই প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার জীবিত-কালের মন-প্রবাহ আচার-ব্যবহারে আবিষ্টচিত্ত হইয়া মৃত্যুকালে ভাবরূপে উদ্ভূত হয় এবং সেই ভাব সূক্ষ্মশরীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়াই পরজন্মে স্থল-শরীরে প্রকাশিত হয়। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—“Face is the index of the mind.” মনের ভাব শরীরে প্রকাশ পায় এবং মনেই পূর্বজন্মের সংস্কার গঠিত হয়। অতএব মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারই পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সামঞ্জস্য বিধান করে। দিবাভাগে আমরা যে-যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, সেই সেই কার্য্য মনের উপর প্রভাবিত হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় বহুপ্রকার ভাব প্রকাশ করে। এই প্রকারে আমৃত্যু আমরা যে-যে ভাবে জীবনযাপন করি, তাহাই মৃত্যুকালে ভাবরূপে মনে উদ্ভূত হয় এবং তাহাই পরজন্ম গঠন করে। অতরাং বর্ত্তমান শরীরের স্থিতিকালেই আমরা

ভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি-রূপ চিৎ-তত্ত্বের আলোচনা করিলে, মৃত্যুকালে তদ্রূপ ভাবেরই প্রকাশ স্বাভাবিক। এইরূপ চিদালোচনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রকটিত হইলে পরজন্মেই আমরা ভগবদ্ধাম লাভ করিতে পারি। অতএব, সেইপ্রকার ভাবের উদয় করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্ত সাধারণ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘তুমি যুদ্ধও কর’ এবং ‘আমাকে স্মরণও কর’। ইহারই নাম—কর্মযোগ। তজ্জন্ত ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের শরীরযাত্রা নিকাহাদি সমস্ত কর্মে, এমন কি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মধ্যেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ-পথে রাখিয়া চলেন। তাঁহাদের দেহ-রথের সারথি স্বয়ং ভগবান্—পার্থ-সারথি। এইপ্রকার ভগবদর্পিত দেহ, গেহ, মন সমস্তই ভগবদিচ্ছায় চালিত হইয়া পরিশেষে সেই ভক্তগণ এই জড়শরীর ও সূক্ষ্মশরীর পরিত্যাগ করত ভগবদ্ধামেই উপনীত হন।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত ভগবন্নামের নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিই বিশুদ্ধ ভক্তি-যোগের লক্ষণ। পূর্বে যে কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও ধ্যানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই কার্যে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বহু প্রকার অসুবিধার কথা আছে। বিশেষতঃ, শুদ্ধভক্তি-পর্য্যয়ে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের সম্যক্ দর্শন লাভ ঘটে না। যে-শুদ্ধভক্তি লাভ হইলে “ভক্ত্যা মামভিজানাতি” ইত্যাদি বিচারের সার্থকতা হয়, তাহার প্রথম অবস্থা এইরূপ—

অনন্তচেতঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং স্নলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তশ্চ যোগিনঃ ॥ (গীঃ ৮।১৫)

শুদ্ধভক্তির প্রথম লক্ষণ—অনন্তচিত্ত। ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ বা ব্যাপারই যাহার চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহাকেই অনন্তচেতা শুদ্ধভক্ত বুঝিতে হইবে। এই শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে অগ্রাণ্ড মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও কিছু দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। গোবিন্দ-আচার্য্যসম্রাট্ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য এইভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন—

অন্যভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাণ্যনাবৃতম্ ।

অস্মুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকৃতম্ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১২)

আমাদের অন্যভিলাষ থাকার জন্তই আমরা অগ্রাণ্ড দেবদেবীর আরাধনা করি। রোগ-শোকাতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত আর্তাদি মিশ্রভক্তগণ যে সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ । ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ সূর্য্যাদি দেবগণ আমাদের রোগাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, আর শ্রীকৃষ্ণ পারেন না—এই-প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিই ‘অত্যাভিলাষ’ । এইপ্রকার সন্দেহ-বাদ অপসারিত হইলেই শুদ্ধভক্তির গৃহে প্রবেশ-লাভ হয় । কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও ভুক্তি ও মুক্তির অভিলাষ থাকে । সুতরাং সেইসমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় যে অমুকুলভাবে কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব হয়, তাহাই ‘উত্তমা-ভক্তি’ । দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্ ।

হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিকৃত্যতে ॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

শরীর ও মন-সম্বন্ধে আমাদের যে বিবিধ পরিচয় আছে, তাহা সমস্তই উপাধি । ‘স্বরূপে’র সেইসমস্ত উপাধি নাই । স্বরূপের একমাত্র পরিচয়—ভগবানের দাস ও অংশবিশেষ । অতএব উপাধিশূন্য হইলেই ‘তৎ’পরত্ব লাভ হয় । এবং ‘তৎ’পরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মায়ামুক্তি নিৰ্ম্মলতা লাভ করে । সেইপ্রকার নিৰ্ম্মল ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবার নামই—শুদ্ধভক্তি । ইহাই শুদ্ধভক্তির পরিচয় ।

‘অনন্তচেতা’ ও ‘নিত্যযুক্ত’—এই শব্দ দুইটা এক-তাৎপর্য্যপর । ভগবদ্বিষয়ে অনন্তচেতা না হইলে নিত্যযুক্ত হওয়া যায় না । ভগবানেই নিত্যযুক্ত থাকিলে কৰ্ম্ম-জ্ঞান, অত্যাগ্ৰ দেবারাধনা, স্বর্গাপবর্গাদি ফলপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা সমস্তই তিরোহিত হইয়া অনন্তচেতা হওয়া যায় । ‘সতত’ শব্দে বুঝিতে হইবে—দেশ, কাল, পাত্র, শুদ্ধ, অশুদ্ধাদি অবস্থার অপেক্ষা না করিয়া । সর্বদেশের, সর্বকালের সকল ব্যক্তিই—স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, এমন কি চণ্ডালদিগের সকলেই অত্যাগ্ৰ জ্ঞান-কৰ্ম্ম-যোগ-চেষ্টা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অনন্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারেন । ‘নিত্য’ শব্দে প্রতিদিনই । সর্বক্ষণই যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবান্ সুলভ । ব্রহ্মসংহিতায় একরূপ বলা হইয়াছে, যথা—

অষ্টৈতমচ্যুতমনাদিমনস্তরূপ-

মাত্মং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।

বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫।৩৩)

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তিনি সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা অতুলিত হইলেও নিজভক্তগণের নিকট সর্বদাই স্তূল্য।

সকল প্রকার ধর্ম-যাজন করিতে বা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন করিতে গিয়া আত্মাদিগকে যে পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং পুণ্য-পাপাদি সংঘ করিতে হয়, একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই সেই সমস্ত ক্লেশল কার্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বিশ্ববাসী সকলের পক্ষে স্তূল্যে প্রাপ্তি ঘটায়। তিনি আনন্দময় লীলাপুরুষোত্তম এবং তাঁহার ভজনে একমাত্র ‘অনন্ত-ভক্তিই’ প্রয়োজন; অন্য কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কোনপ্রকার হিংসাবৃত্তি নাই। কেবলমাত্র জঘন্ত-বৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে হিংসা করিয়া থাকে। কৃষ্ণভজনে সুখ, কৃষ্ণ-লাভে সুখ এবং কৃষ্ণভক্তিই সুখী।

কর্মী-জ্ঞানী-যোগী বা সাধারণ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অপরাপর সকলেই যাহারা এই দুঃখময় জগৎকে সুখময় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের ভালভাবেই বুঝা আবশ্যক যে, এই জগৎ অত্যন্ত দুঃখময় এবং অনিত্য। এই জগতে থাকিবার জন্য আমরা যতই পাকা বন্দোবস্ত করি না কেন, শেষ পর্যন্ত এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য। যতদিন এখানে থাকা যায়, ততদিনই কেবল ‘দুঃখে’র সহিত বুঝাপড়া করিতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এইভাবে আমাদের ‘যাওয়া-আসা’ চলিতেছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে যে কেবল সুখে বাস করেন তাহা নহে পরন্তু যে-জগতে তাঁহারা গমন করেন তাহাও নিত্য আনন্দময়। ভগবদ্-ভজনশীল ব্যক্তিগণ ভগবদ্ধামেই গমন করেন। “যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণাবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীধাম-মায়াপুর-বন্দনা

অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুর—দেশ বা সীমার অতীত

শ্রীধাম মায়াপুর নিত্য-ধাম। নিতাধাম বলিলে অনিত্যতার প্রতিযোগী বুঝায়; শুধু তাহাই নহে, দেশ, কাল ও পাত্রগত কুণা-ধর্মের অতীত বুঝিতে

হইবে। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরকে ষোল-কোশের অন্তর্কর্তী দেশ বলিলে আমরা যে প্রাকৃত ধারণা করি, তাহা নিত্যধামের সেবা-চিন্তার অনুকূল নহে। সকল মহাজনগণই অনর্থযুক্ত জীবগণের হিত-কামনায় নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ষোলকোশ ব্যবধান স্থির করিয়া শ্রীধামের ভৌগোলিক পরিস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীধামের দেশ নির্দিষ্ট হয় নাই, বুঝিতে হইবে। বৈকুণ্ঠ-বস্তু নির্বিশেষ ধারণার অতীত। তাহাতে যাবতীয় কুণ্ঠা-রহিত ব্যবধান ও দেশ-কাল পরিলক্ষিত হয়। স্বল্পবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিন্তাশ্রোতে ব্রহ্মের যে বৈকুণ্ঠ-ধর্ম দেখা যায়, তাহার পারমা দৃষ্টিতে আমরা দ্বিভুজ-মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রহ্মের পরম তত্ত্ব বা 'পরব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাই বৈকুণ্ঠগত সবিশেষ তত্ত্ব। ষোলকোশ কোন দেশ নহে বা কোন দেশের পরিমাণ নহে— ইহা বৈকুণ্ঠ-দেশ। স্বল্পজ্ঞানী নির্বিশেষবাদীর নিকট ইহার পরিচয় নাই। জ্ঞান প্রসারিত হইলে বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান-প্রভাবে ভক্তি-বিলোচনে ষোল-কোশান্তর্গত বৈকুণ্ঠ শ্রীমায়াপুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীধাম মায়াপুরের চিন্ময় মুদাধারের প্রত্যেক ধূলিকণাই বৈকুণ্ঠ এবং তাহা যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সমষ্টি হইতেও অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ। সুতরাং, আমরা সেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

বৈকুণ্ঠ শ্রীমায়াপুর—কালাতীত

কালক্ষোভ্য দৃষ্টিতে ৪৬৫ বৎসর পূর্বে শ্রীধামের আবিষ্কার বলিয়া স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তির মিথ্যা ধারণা। যে স্থলে কোন কালের ব্যবধান নাই, সে-স্থলে কোন বর্ষের উল্লেখ ভ্রান্তিমূলক। কাল বলিলে প্রধানতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই তিনটিকেই লক্ষ্য করা হয়। বৈয়াকরণিকগণ এই কালত্রয়কেই কেন্দ্র করিয়া আরও বহু কালের সৃষ্টি করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এই কালগুলির কোনটাই শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থিতি-কাল নিরূপণে সমর্থ নহে। কলি আমাদের মস্তিষ্ক একরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, আমরা অপ্রাকৃত ধামের চিন্তা করিতে গিয়াও কালান্তর্গত বিচার গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাই মায়াবৈভব, যাহার দ্বারা মায়া-পার বা 'মায়াপুর' মাপিয়া লইতে পারা যায় না। মায়াপুরের অপর গুণগত নাম—'ব্রহ্মপুর'। উপনিষদে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপৌরুষেয় বেদ যাহা কীর্তন করেন, তাহাতে দেশ-কালের বিচার সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সুতরাং, আমরা সেই কালাতীত ব্রহ্মপুর শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।

অপ্রাকৃত ধামে কেবল 'বর্তমান'-কালের অবস্থিতি

বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেকেই শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্যত্ব অপ্রাকৃতত্ব, ধাম-শ্রেষ্ঠত্ব বাচনিক অঙ্গীকার করিয়াও মানসিক অঙ্গীকার করিতে কুঠা বোধ করেন। তাঁহাদের এই কুঠার মূল—দেশ ও কালগত বৈষম্য। তাঁহারা বিবেচনা করেন, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের অবতার। ইহা বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব-বিচারে বড়ই অশোভন। ভজন-রাজ্যের স্মৃষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এইরূপ বিচারে উপনীত হইতেছি যে, কৃষ্ণই গৌরাবতার অথবা গৌরই কৃষ্ণাবতার—এইরূপ স্থির-নির্দেশ বৈকুণ্ঠ-বিচার নহে। কালগত জগতে অবস্থিত হইয়া ঐরূপ নির্দেশ করিতে গেলে কালাতীত তত্ত্বের স্মৃষ্ট প্রকাশ সম্ভবপর নহে। বৈকুণ্ঠ-জগতে নিত্য 'বর্তমান'-কাল পরিলক্ষিত হয়। 'বর্তমান' হইতেই ভূত ও ভবিষ্যতের উৎপত্তি—ইহা বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং, 'বর্তমান' তাঁহাদের চক্ষে 'মিথ্যা' বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর দুর্দৈবের বিষয় কি হইতে পারে? তজ্জগুই তাঁহাদিগকে নাস্তিক-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যে-স্থলে নিত্য 'বর্তমান,' তাহার আদি-অন্ত কোথায়? অগ্র-পশ্চাৎ কি করিয়া ধরা হইবে? তাহাতে কালের ময়লা প্রবেশের সুযোগ কোথায়? সুতরাং শ্রীধাম-বন্দাবন, শ্রীধাম-মায়াপুর নিত্যকাল বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে বৈকুণ্ঠ-সাম্যে অবস্থিত। ইহাতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কালধর্ম্ম আনয়ন করিলে ধামাপরাধ হইবে। সুতরাং, আমরা বিশেষ অবধানের সহিত সেই নিত্য 'বর্তমান' অভিন্ন-ভ্রজমণ্ডল শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

তর্কই তর্কের বিনাশক

আমাদের গ্রাম অনর্থযুক্ত বদ্ধ-ধারণা লইয়া যাঁহারা পারমার্থিক চিন্তাশ্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুই একটি কথা নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর। কালগত-বিচারে তিনি ৪৬৫ বৎসর পূর্বে ঐ ক্ষুদ্র পল্লীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে ঐ স্থানটিকে কি-প্রকারে গৌর-ধাম বলিয়া মানিতে পারা যায়? এইরূপ তর্কক্ষেত্রে আমরা তार्কিকগণের সন্তোষ-বিধানার্থ তর্কের খাতিরে যুক্তি অবলম্বন করিলে দোষ কি? যদিও শাস্ত্রকারগণ বলেন, “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং”—তর্কের কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা নাই। তর্ক ও যুক্তি এক নহে, তথাপি তর্কই তর্ককে হীন-প্রতিষ্ঠ, হীনবীৰ্য্য করিয়া থাকে। অতএব

উহার দ্বারাই তাকিকের তর্ক-স্পৃহা প্রবল হইবে। সুতরাং, আমরা সেই তর্কাতীত শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।

শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্য সন্মুখে পূর্বপক্ষ

কালগত-বিচারে কৃষ্ণলীলার কাল—আনুমানিক সাদ্ধ পঞ্চ-সহস্র (৫৫০০) অতীতাক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারি। কিন্তু শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলার কাল—মাত্র ৪৬৫ বৎসর। এস্থলে বিচার্য্য এই, কৃষ্ণলীলার সময়ে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীমন্নহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীমায়াপুরের কিরূপ প্রকাশ ছিল? শ্রীধাম-মায়াপুরের অপর নাম ‘অন্তর্দ্বীপ’—ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্বত্রই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, নবদ্বীপের ২টি দ্বীপের মধ্যবর্তী অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপস্থানে অবস্থিত বলিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে ‘অন্তর্দ্বীপ’ নাম হইয়াছে। ইহা একপক্ষে সত্য হইলেও, প্রকৃত-প্রস্তাবে এই শ্রীধাম-মায়াপুরকে শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও ‘অন্তর্দ্বীপ’ বলা হইত। কেন যে শ্রীধাম-মায়াপুরের পূর্বনাম অন্তর্দ্বীপ ছিল এবং এই ‘অন্তর্দ্বীপ’ নাম কৃষ্ণলীলার সময়েও প্রকাশিত ছিল, তাহার ইতিহাস আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,—

প্রথমতঃ—অন্তর্দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস

আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন মথুরামণ্ডলে ভোম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন তিনি যমুনা-পুলিনে সখাগণ-পরিবৃত হইয়া সখা-রসের লীলা-বিলাসে প্রমত্ত ছিলেন। সেই সময়ে অহংগ্রহোপাসক কংসানুচর অঘাসুর লীলা-বিলাসের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ সেই পাপাসুর অঘাসুরের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তৎপরবর্তী-কালে ক্রীড়া-কৌতুকরত গোপ-বালকগণ বনভোজনে মত্ত হইলে জগদগুরু ব্রহ্মা লোক-শিক্ষার জন্ত তথা হইতে গো-বৎসসকল হরণ করিয়া কোন পর্বত-গুহায় লুক্কায়িত রাখেন। গোপ-বালকগণ তজ্জন্ত ব্যস্ত হইলে অন্তর্ধামী কৃষ্ণ তাহাদের সন্তোষার্থে গো-বৎসসকলের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। ইতোমধ্যে আদিগুরু ব্রহ্মা অলক্ষিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রকাশ-উদ্দেশ্যে গোপ-বালকগণকেও তথা হইতে হরণ করিয়া লন। কৃষ্ণ অদ্বৈতবাদিগণের মোহ নিরসনার্থ অর্থাৎ তিনিই যে স্বয়ং উপনিষদ্-বেদ পুরুষ, তাহা জানাইবার জন্ত তিনি স্বয়ং গো-বৎস ও গোপ-বালকরূপে ব্যক্ত হইলেন। “একোহং বহুঃ শ্রাম্” এই উপনিষদ্ বা বেদান্তের ভাষ্যরূপে তিনি এইরূপ লীলা গ্রহণ করিলেন। চারি বেদের আবিষ্কারক চতুর্মুখ ব্রহ্মা কিয়ংকাল পরে যমুনা-পুলিনে অনুসন্ধিৎসু হইয়া

সমাগত হইলে পূর্বের গায় গো-বৎস ও গোপ-বালকগণকে সেই সেই মূর্তিতে দর্শন করিয়া মুগ্ধ, চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিত হন। তখন তিনি অস্তঃস্থ হইয়া বেদ-বেদ্য ও উপনিষদ্-প্রকাশিত পরতত্ত্বের লীলা-বিলাসের কথা অবগত হইয়া স্বকৃত অগ্নায় উপলব্ধি করিলেন। কৃষ্ণলীলার অথবা পরতত্ত্বের বা পরব্রহ্মের লীলার ব্যাঘাত-কারক যে-কোন ক্রিয়া, স্তব-স্ততি বা সিকান্ত অপরাধজনক। বৈদিকগুরু ব্রহ্মা ইহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য অমুমান সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে আর্তি-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তজ্জন্মই এই মায়াপুরের পূর্ব-নাম—‘আর্তিপুর’ বা ‘আতোপুর’। আজও প্রাচীনগণের মুখে আতোপুরের নাম ও ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। তৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ব্রহ্মার আর্তি পরিচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার অন্তরের ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করেন। তিনি জানানু—আমি কৃষ্ণলীলার ব্যাঘাত উৎপন্ন করায় নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছি। এই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত ঘৃণিত অরবকুলে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। শ্রীগৌরসুন্দর ‘তথাস্তু’ বলিয়া ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা এইরূপ অন্তরের অস্তঃপুর হইতে এই ইচ্ছা শ্রীগৌরপাদপদ্মে নিবেদন করায়, এই আতোপুর বা শ্রীমায়াপুরের অন্য নাম—‘অস্তঃপুর’ বা ‘অন্তর্দ্বীপ’। তদবধি আজও শ্রীমায়াপুরে ‘দ্বীপের মাঠ’ অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের মাঠ ও বাহির-দ্বীপের মাঠ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতেই এই পল্লীর নাম—‘অন্তর্দ্বীপ’ বা ‘আতোপুর’। সুতরাং, আমরা সেই ব্রহ্মার অন্তর-গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।

দ্বিতীয়তঃ—আতোপুরের ভৌগোলিক অবস্থিতি

আতোপুর একটি বিরাট পল্লী। ইহার অন্তর্গত বহু পল্লী ছিল। তন্মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুর, মায়ামারী ও সুবর্ণবিহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে সুবর্ণবিহার অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। তখন সরস্বতী, যাহার বর্তমান নাম জলাঙ্গী নদী সুবর্ণবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। জলাঙ্গীর অবৈধ প্রবাহে বর্তমানে সুবর্ণবিহার আতোপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জলাঙ্গীর খাদ আজও গৌরজন্মভিটার পাদদেশে বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বর্তমানে ‘আবড় বিল’ নামে কথিত। উক্ত জলাঙ্গী নদী ক্রমশঃ আরও

দক্ষিণে প্রবাহিতা হইতেছিল। উহার চিহ্ন আজও বর্তমান। তাহাকে 'মল্লার জোন' বলা হয়। ইহা হইতে আরও দক্ষিণে অপসারিত হইয়া বর্তমান জলাঙ্গীর স্রোত প্রবাহমান রহিয়াছে। ইহাই স্রবর্ণবিহারকে জলাঙ্গীর দক্ষিণ-তটে নিক্ষেপ করিয়া 'মায়ামারী'কে উত্তর-তটে অবস্থিত রাখিয়াছে। সীমন্ত-দ্বীপের অন্তর্গত শরডাঙ্গা হইতে, এমন কি, শ্রীমায়াপুর হইতেও আতোপুরের অন্তর্গত স্রবর্ণবিহার ও মায়ামারী দক্ষিণ-পূর্বকোণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং, আমরা সেই আতোপুর শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

তৃতীয়তঃ—মায়ামারী-গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস

মায়ামারী গ্রামও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রাচীনতা জ্ঞাপন করে। মায়ামারী গ্রাম শ্রীধাম-মায়াপুর ও স্রবর্ণবিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন ঐতিহ্য এই যে, দ্বাপর-যুগান্তে কৃষ্ণাবতার শ্রীবলদেব এইস্থানে মায়াসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তদবধি এই গ্রামের নাম—'মায়ামারী'।

সন্দিনী শক্তিমৎ-তত্ত্ব শ্রীবলদেবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ-প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ-শক্তি এবং যাবতীয় ভীষ-হৃদয়ের মায়া বিনাশ করিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। শ্রীবলদেব-কর্তৃক এই মায়াসুর নিহিত হওয়ায় মায়াপার অর্থাৎ মহামায়াতীত যোগ-মায়াপুর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'শ্রী'-শক্তিই যোগমায়া-শক্তি বা যোগ-শক্তি। তাই অন্তর্দ্বীপের অন্য নাম—'শ্রী'-মায়াপুর বা 'যোগ-মায়াপুর'। সুতরাং, আমরা সেই মায়াতীত যোগ-মায়াপুর শ্রীমায়াপুরের বন্দনা করি।

চতুর্থতঃ—শাস্ত্রের 'মায়া'-তীর্থই শ্রীমায়াপুর

বহু পুরাণে বহু তীর্থের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সপ্ততীর্থই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহারা মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ। তদ্ব্যতীত নির্বিশেষ নির্বাণ-মোক্ষ বন্ধনেরই নামান্তর। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত মোক্ষ বলা হয় না। সেই প্রধান তীর্থসমূহই বিষ্ণুতীর্থ। বিষ্ণুতীর্থে নির্বিশেষ মোক্ষের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় নাই। তন্মধ্যে 'মায়া' একটি প্রধান তীর্থ। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কানী কাকী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ ॥”

কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত মায়া-তীর্থকে হরিদ্বার মনে করিয়া থাকেন। বর্তমানে হরিদ্বারের দক্ষিণ-পূর্বকোণে গঙ্গার অপর পারে মায়াপুর নামে একটি

স্থান কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই মায়াপুরে তীর্থ-সংঘটক কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। হরিদ্বারকে শৈবগণ হরদ্বার মনে করিয়া এই স্থানকে শৈব-তীর্থে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বদরি-ক্ষেত্রে নারায়ণই উপাশ্রু দেবতা। তাহারই পাদদেশে অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশে হরদ্বার বা হরিদ্বার অবস্থিত। শৈবগণ হরদ্বারের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তৎস্থানের অদূরে মায়াপুর কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমিই—মায়া-তীর্থ। বহু-কালাবধি এই স্থানের নাম—মায়াপুর। উক্ত শ্লোকে যে মায়াতীর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, উহা যে সাক্ষাৎ যোগমায়াপুর শ্রীধাম-নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর, তাহা অন্যান্য যামল-তন্ত্র-পুরাণ-বচন * হইতেও জানিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের উল্লেখ-প্রসঙ্গে “মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি” “মায়াপুরে দ্বিজালয়ে” “মায়াপুরে নবদ্বীপে” প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যে শ্রীধাম-মায়াপুরকেই সপ্ততীর্থের অন্ততম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, আমরা সেই সপ্ততীর্থের অন্ততম গৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

“শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ”-পুরুষই শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীগৌর-ভগবান্ শ্রুতির “শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ” বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষ। অন্যান্য শ্রুতিও “মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ”* বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুব করিয়াছেন। শক্তি-শক্তিমান্-অভেদ-পুরুষই মহাপ্রভু। যে-বিগ্রহে পরতত্ত্ব শক্তিমৎতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, সেই বিগ্রহেই যাবতীয় শক্তিস্বরূপা শ্রীমতী বাধারাগী। সুতরাং একই বিগ্রহে শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে শ্রীগৌর-বিগ্রহ। পরতত্ত্ব গৌরসুন্দর আধেয়রূপে

* অথবাঃ ধরাধামে ভূত্বা মদুত্তরূপধৃক্।

মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ণনাগমে ॥ (ব্রহ্মযামল)

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।

জনিয়া পার্শদৈঃ সার্কং কীর্তনং প্রকটিষ্যতি ॥ (কপিল-তন্ত্র)

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসকৌ বিশেষতঃ।

মায়াপুরে নবদ্বীপে পরমকং শচীসুতঃ ॥ (গরুডপুরাণ)

*মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ সত্ত্বৈশ্রব্যঃ প্রবর্তকঃ।

সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ (ছান্দোগ্য ৩২)

[সেই পুরুষই মহাপ্রভু; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক। তাঁহার কৃপায়ই সুনির্মলা শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তিনিই নিয়ন্তা ও অব্যয়।]

অধিষ্ঠিত হইলেও আধারভূত নিত্যধামে অবস্থিত। আধার ও আধেয়-মধ্যে দেশ-কালগত জড়ীয় ভেদ না থাকায় তত্ত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে তৎকালের আবির্ভাব অবশ্যস্তাবী। সুতরাং, আমরা সেই অপ্রাকৃত আধেয়-স্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

পঞ্চমতঃ—নিত্য-ধামের আবির্ভাব

বৈকুণ্ঠ-ধাম বৈকুণ্ঠাধিপতির ইচ্ছানুসারে যে-কোন মুহূর্ত্তে, যে-কোন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারেন। বেদ-উপনিষদ্ যে বস্তুকে “অণোর-ণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” বলিয়া কীর্তন করেন, তাঁহার অণুত্ব ও মহত্ব উভয়ই সম-পাধ্যায়ে অবস্থিত। অর্থাৎ তাঁহার অণুত্ব বিভূত্বের পূর্ণতাজ্ঞাপক এবং বিভূত্বও অণুত্বের সাক্ষ্য-প্রকাশক। সুতরাং বৈকুণ্ঠগত দেশ-কাল অথবা ১৬ ক্রোশ বা ৮৪ ক্রোশ ব্যবধান অথবা ৪৬৫ বৎসরের অবস্থিতি বা তদধিক সহস্র সহস্র বর্ষের অতীত ব্যাপারসমূহ একই ধারণায় চিত্তিত। ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধাম ও পরিকরবর্গ সকলেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা কালান্তর্গত দৃষ্ট হইলেও কালক্ষোভ্য ব্যাপার নহে। নিত্য সনাতন বস্তুরই এইপ্রকার আবির্ভাব সম্ভব। সুতরাং, আমরা সেই নিত্যবিভূত শ্রীধাম-মায়াপুরের বন্দনা করি।

আত্মনিবেদন

শ্রীপত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় নববিধা ভক্তির অন্ততম আত্ম-নিবেদনাখ্য ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইব। আত্ম-শব্দে সাধারণতঃ কেহ কেহ দেহ, প্রাণ, মন, জীবাত্মা ও স্ব প্রভৃতিকে বুঝিয়া থাকেন। আত্ম-শব্দে আমরা যাহা কিছু বুঝিয়া থাকি, তৎসমুদায় শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করাকেই আত্ম-নিবেদন বলা হয়।

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্ত নিঃস্বপ্নানহকৃতৈঃ ।

মনসস্তংস্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥ (হরিভক্তি-কল্পলতিকা ১২।১)

শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অথবা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায় যিনি নিজ দেহ উৎসর্গ করিতে পারেন এবং যিনি কৃষ্ণত্ব বিষয়ে সমতা ও অহঙ্কার-শূন্য, সেই তদগত-চিত্ত-জনের মনে যে ভগবৎস্বত্ব-তাৎপর্য্যে আত্ম-স্বত্ব-চেষ্টা-রাহিত্য, তাহাই ‘আত্মনিবেদন’ বলিয়া কথিত হয়। নববিধা ভক্তির প্রত্যেকটাই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হইলেও

কীর্তন ও আত্মনিবেদন ব্যতীত অন্য কোনটী দ্বারা ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছেন—“নাম-সকীর্তন কলৌ পরম উপায়”, তথাপি বিশেষরূপে বিচার করিলে বুঝা যায়, দীক্ষাকালে শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি করিলে তদ্বারা বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। যেহেতু, সর্ববিধা ভক্তি-মধ্যে আত্মনিবেদনরূপা ভক্তি অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।—

“দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে গুরু তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥”

পতিতপাবন পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান লাভের অধিকার দেন, তখন শিষ্য ‘আমার’ বলিতে কিছু না রাখিয়া সমস্তই শ্রীগুরু-চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবও সমর্পিতাত্মা শিষ্যকে আত্মসম করিয়া লন অর্থাৎ স্বয়ং যেরূপ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরমাত্ম বস্তুকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ, শিষ্যকেও তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পরমাত্ম বস্তুকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করিবার অধিকারী করিয়া থাকেন; তখন শ্রীগুরুচরণ হইতে লব্ধদীক্ষা শিষ্য বলিতে থাকেন—

সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া,

প’ড়েছি তোমার শরে।

ভূমি ত’ ঠাকুর, তোমার কুকুর,

বলিয়া জানহ মোরে ॥ (শরণাগতি)

শরণাগত-পালক অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শরণ না লইলে প্রেমভক্তি-লাভ করা সুদূর-পরাহত। এই শরণাগতি ছয় প্রকার, ইহার মধ্যে আত্মনিবেদন একটী। আত্মনিবেদনাত্মক শরণাগতি লাভ করিতে পারিলে, প্রেম-ভক্তি-স্নাতকের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন—যাঁহার ভগবানে একনিষ্ঠা ভক্তি নাই তিনি যতই চারিবেদ ষড়্‌দর্শনাদি অধ্যয়ন করুন না কেন, তাহা অন্ধের নিকট দর্পণবৎ বৃথা হইয়া যায়। তদ্রূপ গুরুগণ শ্রীগুরু-চরণে আত্মনিবেদন না করিয়া শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যতই যাজন করুন না কেন, তাহা ‘মূলতুষাবঘাতীর’ ন্যায় পণ্ড্রমাত্র হইয়া যায়। সর্ববেদান্ত-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৩।২৭—২৮) আলোচনা করিলে জানা যায়—

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্রুত-কর্মণঃ ।

জন্ম-কর্ম-গুণানাক্ষ তদর্থেহখিল-চেষ্টিতম্ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।

দারান্ সূতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যং পরশ্মৈ নিবেদনম্ ॥

অলৌকিক লীলাপরায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কর্ম, গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টি, ইষ্ট, দান, তপ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু সদাচার, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ—এইসকল আপন প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেই প্রেমভক্তি-লাভের অনুকূল হয়, নতুবা ভক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বলি মহারাজ সর্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া, নিত্য কালের জন্য কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব কলিকালে যদি অনন্যা-ভক্তি আচরণ করিতে হয়, তাহা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সহযোগেই করিতে হইবে। স্মতরাং শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ আত্ম-নিবেদনপর হইয়া কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সহযোগে কৃত হইলে সর্বার্থ-সিদ্ধি অবশ্যস্তাবী, নচেৎ প্রেমভক্তি-লাভ সূদূর-পরাহত।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

সাং কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

বিগত ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর, সোমবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, “বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর,” “জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,” “গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া,” “গুরুদেবে ভজবনে,” “এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাক্ষি,” “ষে আনিল প্রেমধন”—প্রভৃতি স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনামূলক বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্তন করা হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অসমোর্দ্ব করুণার কথা আলোচনামুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দর্শক ও ভক্তমণ্ডলীকে চতুর্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বিরহাৎসব উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ চন্দনলিপ্ত পুষ্পমাল্য-ভূষিত স্তব্ধ অর্চ্য-মূর্তিতে সভাস্থলে সুসজ্জিত সুউচ্চ আসনোপরি বিরাজিত হইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দকে কৃপাপূর্বক দর্শন দান করিতে থাকেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া “সুজনাক্ষুদরাধিত-পাদযুগম্” স্তোত্র, “দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব” “শ্রীকৃপমঞ্জরী-পদ,” “যে আনিল প্রেমধন” প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় ও মনোহরী গীতিসকল কীর্তিত হইবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নির্দেশানুসারে সুগায়ক শ্রীপাদ আনন্দগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিরহ-তিথি উপলক্ষে লিখিত তাঁহার স্বরচিত “বিরহীর অশ্রু-বন্দনা” নামক কবিতাটী (৪৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) সভাস্থলে পাঠ করেন। পরে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিতাবলী বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী এবং কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় কর্তৃক পর পর বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

সর্বশেষে পূজ্যপাদ সভাপতি স্বামিজী-মহারাজ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের জগদগুরুত্ব ও তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য বর্ণনামুখে জীবমঙ্গলকর বহু উপদেশ-সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান করেন। উহা— “সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম” শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধাকারে ৪২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে পূজনীয় স্বামিজী-মহারাজের রচিত “শ্রীল প্রভুপাদের আরতি”-গীতি কীর্তনমুখে তাঁহার অর্চ্য-মূর্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর মূল-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে, ছায়াচিত্রযোগে ধ্রুব-চরিত্র প্রদর্শিত হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরান্দ্রপদ ব্রহ্মচারীজী গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যামুখে ধ্রুব-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অষ্টকার অনুষ্ঠান-সভায় চুঁচুড়া-সহরস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী ও ধর্মপ্রাণ সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, সমিতির নবদীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য শাখামঠ-সমূহেও উক্ত বিরহ-তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত ও পালিত হইয়াছে। স্থানাভাব-বশতঃ উহার বিবরণ এস্থলে প্রকাশিত হইল না।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
পঞ্চদশ-বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে
“বিরহীর অশ্রু-বন্দনা”

প্রভুপাদ ! আমার উপাস্ত-দেব তুমি ।

তোমার বিরহে যাঁ'রা, বর্ষে চির অশ্রু-ধারা,
সেই ‘অশ্রু’ বন্দি আজ আমি ॥

প্রভুপাদ ! কে শুনিবে এ কাহিনী-লোর ।

দিনগুলি ধূলি-সম, যায় উড়ি' সদা মম,
মরণ ডাকিছে ঘন ঘোর ॥

প্রভুপাদ ! তুমি নিত্য ভাগবত-ভানু ।

তুমি কৃষ্ণলীলা-কাম, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধাম
অভিন্ন সে নিত্যানন্দ-তনু ॥

প্রভুপাদ ! কবে মুক্ত হ'ব এ সংসারে ।

ধন-জন-কবিতার দূর করি' দুঃখ-ভার,
একান্তে ভজিব ভাব-ভরে ॥

প্রভুপাদ ! এই মাত্র সদা মনে আশা ।

তব পদে রহি রতি, যা'তে মিলে ব্রজপতি,
যে-প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥

প্রভুপাদ ! কবে তব সেবকে সেবিব ।

সব দুঃখ পরিহরি', ভক্তিমঠে বাস করি',
অবশেষ প্রসাদ পাইব ॥

প্রভুপাদ ! সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ।

বিতরিল খেই প্রেম, লভি যেন সেই প্রেম,
সিদ্ধদেহ ধরি' নিরন্তর ॥

প্রভুপাদ ! বন্দি পুনঃ চরণ তোমার ।

নন্দনন্দন-নন্দী, তাই তোমায় সদা বন্দি,
বন্দী জনের নাহি কিছু আর ॥

—শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী

আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
৩রা মাঘ, ১৩৫৮ সাল।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকেব নরোত্তমম্।

দেবীঃ সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৮, ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, শনিবার—ব্যাসাভিন্ন
জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে
উপরিউক্ত মঠে আগামী ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্যন্ত দিবসত্রয়
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক,
শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা
ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্তন,
ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি
এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুকভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে
সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান
করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে
সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—বৃহস্পতিবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, শুক্রবার
অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। শনিবার পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের
পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে
আলোচনা।

সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসের সভাপতি স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন—
 অণু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি। বিরহ-তিথিতে তাঁহার স্মরণই আমাদের
 একমাত্র কর্তব্য। গুরুবর্গ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—“কীর্তন-প্রভাবে
 স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব।” সুতরাং, কীর্তন ব্যতীত যে স্মরণ,
 তাহা কখনই ফলপ্রসূ হয় না। আবার স্মরণ ব্যতীতও কীর্তন হয় না। বৃন্দাবন,
 শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে কৃত্রিম স্মরণ-পন্থীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু
 শাস্ত্রে কীর্তন-সহযোগে স্মরণের ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। কীর্তন ব্যতীত কোন
 ভক্ত্যঙ্গ-যাজনই সুষ্ঠু হয় না—“যতপ্যত্না ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য্যা, তদা কীর্তনাখ্যা
 ভক্তি সংযোগেনৈব।” শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণ-প্রভাবে ভগবান্কে লাভ
 করিয়াছেন। “শ্রবণং কীর্তনম্” (ভাঃ ৭।৫২৩) শ্লোকে দেখা যায়, তিনি কীর্তন-
 প্রভাবে স্মরণেরই প্রাধাণ্য দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার আজীবন আচার-
 প্রচার দ্বারা ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি কখনও নির্জন-ভজনের প্রশংসা
 দেন নাই। ‘নির্জন ভজন’ অর্থে—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন। হরিকথা
 প্রচারই—প্রকৃত নির্জন ভজন। হরিকথার বক্তা, শ্রোতা সকলেই সাধু। ভগবৎ-
 কথার শ্রোতা, অনুপঠনকারী, ধ্যানকারী, আদরকারী, অনুমোদক—সকলেই উহার
 অনুশীলন দ্বারা সত-সত পবিত্রতা লাভ করেন। সুতরাং হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনেই
 প্রকৃত ভগবদ্ভজন সম্ভব।

তিনি আরও বলেন—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বর্ণিত “বৃন্দাবনীয়াং
 রসকেলি-বার্তাম্” (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১), ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজশক্তি সঞ্চার দ্বারা
 শ্রীল রূপ-গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা-মাধুরী—
 বাণীরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে বর্ণিত হইয়াছে—“কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ
 নারীণাম্” (গীঃ ১০।৩৪)। ব্রাহ্মাণ্ড-পুরাণ বলিয়াছেন—কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত ইত্যাদি
 দ্বারা যে শব্দ-সামান্য উচ্চারিত হয়, শ্রীনাম ও ভগবদ্বাণী তাহার অতীত বস্তু।
 উহারা প্রাকৃত দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন। শ্রীনাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন,
 শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বাণীও তদ্রূপ অভিন্ন। উহারা পূর্ণ-চেতনময় শব্দব্রহ্ম।
 তাই “হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অক্ষুণ্ণ।” স্বয়ং
 ভগবান্ শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষরূপে জগতে প্রকটিত থাকেন। তাঁহার বাণীই আমাদের
 একমাত্র সম্বল। কর্মমার্গে লিপ্ত থাকিলে সেই বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয়

হয় না। তাই নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলেন—“তাৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিজ্ঞেত যাযতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।” যতদিন কর্ম্মমার্গে আমরা বিচরণ করিব, ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের কথায় আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ভক্ত কখনও কর্ম্মাচরণ করেন না বা তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল খাওয়া-পরার জন্তই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই। মুখ্য ব্যক্তিগণই হরিভক্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এইজন্যই আমাদের বাস্তব শান্তি-লাভে এত বিঘ্ন।

স্বামিজী-মহারাজ বক্তৃতামুখে আরও জানান—পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়গণ যে মহাপুরুষের অতিমর্ত্য পুত চরিতাবলী কীর্তন করিয়াছেন, তিনিই জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি “সত্ত্ব এবাস্য হিন্দুস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ” (ভাঃ ১১।২৬।২৬) বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ স্বয়ং বাণীরূপা ‘সরস্বতী’। তিনি জগতের লোকের প্রাকৃত ক্রটির অনুকূল ‘সায়’ না দিয়া—রোগীকে মিষ্টকথা বলিয়া তাহার দূষিত ক্ষত হাত না বুলাইয়া direct Operation করিয়াছেন। এই তেজস্বী আচার্য্য-কেশরী সত্যের নির্ভীক প্রচারক ছিলেন। অসত্যের প্রতি তিনি চিরদিনই Non-Co-operation করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্র-রূপে আবিভূত হইয়া শ্রীল ঠাকুরেরই প্রকৃত স্বরূপ জগতের নিকট স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধমালায় শ্রীল ঠাকুরের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের লিখন-প্রণালীর আপাত তারতম্য লক্ষ্য করা গেলেও উহা একই-তাৎপর্য্যপর। তিনি উহা দ্বারাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহরীষ্ট প্রচার করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন—শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটকালীন আশীর্ষচনে জানাইয়াছেন, “Love and Rupture”—(ভালবাসা ও বিরোধ) উভয়ই এক-তাৎপর্য্যপর।” জগতের লোক হরিভক্তন করিতেছে না দেখিয়া উহা কখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ভগবৎ-সেবা সর্ব্বকালে সর্ব্বসময়েই করিতে হইবে। মায়ায় হাত হইতে আমাদিগকে নিস্তার পাইতেই হইবে। বর্তমানকালে ভগবৎ-সেবা বা হরিভক্তনের নাম শুনিলে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ি। কোনও পুত্র যদি স্তমতিক্রমে স্মৃতিপ্রভাবে ভগবদ্ভজনে ক্রটিবিশিষ্ট হয়, অগ্নি পিতা-মাতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান।—তাহাকে নানারূপ হৃদয়-বিদারক ও প্রলোভন-বাক্য শুনাইয়া গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্ত

বন্ধপরিষ্কার হন। ধর্মালোচনার অভাবেই নিতান্ত কর্তব্যাকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা এইরূপ দুর্দশায় উপনীত হইয়াছি। প্রাচীনকালে ঋষিযুগে হুকুমার-মতি বালকগণের সংযত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান করত ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করার ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সমাপ্ত হইবার পর কেহ সকাম হইলে গুরু-দক্ষিণা প্রদানান্তে সম্যাবর্ত্তন করিতেন, আবার কেহ ভগবদ্ভজনে রুচিবিশিষ্ট হইয়া আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বনপূর্বক গুরুগৃহেই বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে ভারতের কোন কোন স্থানে ঐরূপ আশ্রম বা গুরুকুল থাকিলেও বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনের অভাবে আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি না। ইহা আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচয় ও অধঃপতনেরই লক্ষণ। নিজেরা সেধর-নৈতিক ও ধার্মিক হইয়া পুত্রগণকে ধর্মজীবন যাপনে উৎসাহ-প্রদান করাই পিতামাতার কর্তব্য। ইহা দ্বারাই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইবে ও ভারত লুপ্তগৌরব অর্জনে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় বাণীই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। বলি মহারাজ ভগবদ্বাণী নির্বিচারে পালন করিয়া নিত্যকাল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ভগবদ্বাণীর আচার-প্রচার করিলে আমরাও শ্রীবলি মহারাজের আনুগত্যে শ্রীভগবানে প্রপত্তি লাভ করিতে পারিব। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষ ও আচার-পরায়ণ হইয়া আমাদের জগতে অকৈতব কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব-প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকানীধাম-দর্শন ও পরিক্রমা

১৯শে অক্টোবর, ১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার—যাত্রীগণ অতি প্রত্যুষেই প্রাতঃ-ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া কানী-যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ৯নং আপ ডুন্ এক্সপ্রেস গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের পূর্ব ব বস্থানুসারে আমাদের রিজার্ভড্ বগী উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। গয়া হইতে সকাল ৬-২ মিনিটে যাত্রা করিয়া বেলা ১০-৪৩ মিনিটের সময় আমরা কানী

ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। কাশীতে শাণ্টিং লাইন (Shunting line) না থাকায় ডুন্ এক্সপ্রেস আমাদের রিজার্ভড্ বগী বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে লইয়া গিয়া কাটিয়া রাখে। সমিতির কয়েকজন সেবকের উপর ঐ গাড়ী তত্ত্বাবধানের ভার চাপ্ত হইয়াছিল। এদিকে যাত্রিগণের বিশ্রাম ও প্রসাদাদির বন্দোবস্তের জন্য অগ্রদূতগণ কর্তৃক কাশী ষ্টেশনের সংলগ্ন একটি অপূর্ব উদ্যান নির্দিষ্ট হয়। গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ সেবাতে যাত্রিগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন।

বৈকাল ৩টার সময় নগর-সঙ্কীর্্তন শোভাযাত্রা-যোগে আমরা শ্রীবেগী-মাধব, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীঅন্নপূর্ণা, জ্ঞানবাপী, দশাশ্বমেধ ঘাট, মণি-কর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক-মহারাজ অচ্য স্বয়ং পরিক্রমায় উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। তাঁহার আনুগত্যে যাত্রিগণ স্থানমাহাত্ম্য-শ্রবণমুখে অচ্য সকল স্থানই স্মৃষ্টভাবে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাত্রে প্রসাদ সেবাতে আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে ও সংরক্ষিত গাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

শ্রীসনাতন-শিক্ষামূলী শ্রীবারাণসী

সপ্ততীর্থের অগ্রতম কাশী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দাক্ষিণাত্যে যেরূপ বিষ্ণুকাশী ও শিবকাশী, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুকাশী ও শ্রীশিবকাশী—এই উভয় কাশী লইয়াই শ্রীকাশীধাম। ইহা ‘বরনা’ ও ‘অসি’-নদীর মধ্যবর্তী স্থান বলিয়া ইহার অপর নাম—শ্রীবারাণসী। ‘বরনা’ নদীর দক্ষিণে বিষ্ণুকাশী ও ‘অসি’ নদীর উত্তরে শিবকাশী অবস্থিত। এই সম্মিলিত তীর্থদ্বয়ের পূর্বে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রবাহিত। শ্রীমন্নহাপ্রভু গৌরমুন্দর ভক্ত-ভগবানের যুগ্মক্ষেত্র কাশী-তীর্থকে তীর্থীভূত করিয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। কাশীধামে শ্রীমন্নহাপ্রভু যে বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন, উহা তাঁহার নামানুসারে ‘শ্রীচৈতন্যবট’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুস্থানী লোকেরা ইহাকে কেহ কেহ ‘যতন বট’ বলিয়া থাকেন। বিগত ১৯৪৬ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কাশীধামে মাসাধিক-কালব্যাপী উর্জ্জ্বত পালনের ব্যবস্থা করিয়া ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে এই বারের জায় এসকল স্থানসমূহ দর্শনের সুযোগ-দান করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থ দর্শন ও পরিক্রমা

২০শে অক্টোবর, ২রা কার্তিক, শনিবার—অতি প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া আমরা বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন হইতে সকাল ৬-১৫ মিনিটে '১৫৫ নং আপ' যোগলসরাই-লক্ষৌ-প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করিয়া জজ্জাই জংসনে পৌছি। তথায় ২AJ DNএর সহিত আমাদের রিজার্ভড্ বগী সংযুক্ত করিয়া দিলে বেলা ১০-৫০ মিনিটে আমরা প্রয়াগ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। পূর্বব্যবস্থানুযায়ী আমাদের রিজার্ভড্ বগী এলাহাবাদ ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সমিতির পক্ষ হইতে এলাহাবাদ-নিবাসী সপুত্র ভক্তপ্রবর শ্রীবৃদ্ধ রাখাল চন্দ্র বসাক মহোদয় প্রয়াগ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া পুষ্প ও পুষ্পমালাদিসহ পরিক্রমা-সঙ্ঘকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। তাঁহার চেষ্টায় ষাট্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি ধর্মশালার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি মাননীয় শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি-বেদান্ত মহোদয়ও পরে ধর্মশালার উপস্থিত হইয়া, নিয়ামক মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট-প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও মিশন পরিচালন-ব্যাপারে অত্যদ্বুত ক্ষমতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরিক্রমা-সঙ্ঘের প্রাথমিক-চিকিৎসার জন্ত তাঁহার নিজ কারখানায় প্রস্তুত কতকগুলি মূল্যবান ঔষধাদিও তিনি প্রদান করেন।

অপরায় ৪ ঘটিকার সময় নগরসঙ্কীর্্তন-শোভাযাত্রা-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অমুগমনে ষাট্রিগণ প্রথমে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃপ গৌড়ীয় মঠ দর্শন করেন। পরে তাঁহারা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান—ত্রিবেণী-সঙ্ঘমের চিন্ময় বারি স্পর্শ করিয়া শ্রীবিন্দুমাধব, শ্রীকৃপ-শিক্ষাস্থলী দশাশ্বমেধঘাট প্রভৃতি দর্শন করত ধর্মশালার প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীকৃপ-শিক্ষাস্থলী শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থ ও তাঁহার মাহাত্ম্য

কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু দশ দিবস এই প্রয়াগতীর্থে অবস্থানপূর্বক শ্রীকৃপ-গোস্বামীকে শক্তিসংস্কার দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বাদি ভাগবত-সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সর্বরসতত্ত্ব স্মৃতি করান। কালে বৃন্দাবন-কেলি-বার্তা লুপ্ত হওয়ায় সেই লীলা বিশেষরূপে বিস্তার করিবার জন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপামৃতে দ্বারা পরমপ্রিয় শ্রীকৃপ ও শ্রীসনাতনকে অভিধেয় ও সঙ্গক-তত্ত্বাচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রয়াগতীর্থ ব্রহ্মার যজ্ঞবদী; এইস্থানে তেত্রিশ কোটি দেবতা অতি সুস্বাদু সোমরসের ধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অতিশয় প্রমুদিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে যে ‘অক্ষয়বট’ আছেন, অমরগণ ইহার আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহার জটাসকল পাতালদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অবিমুক্ত অর্থাৎ বারাগসীতে তারকব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই লোকে মুক্ত হয়, কিন্তু সকল প্রাণীই বিনা জ্ঞানেই এখানে মুক্ত হইয়া ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পরিক্রমা-সভ্যের শ্রীমথুরায় উপস্থিতি

২১শে অক্টোবর, ৩রা কার্তিক, রবিবার—দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ-আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে যাত্রীগণ প্রসাদ পাইয়া প্রয়াগ ষ্টেশন হইতে বেলা ১০-৫০ মিনিটে 2AJ DN গাড়ীতে এলাহাবাদ জংসনে পৌঁছেন। সকলে রিজার্ভড্ বগীতে স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে, বৈকাল ৩-২৯ মিনিটে ১১নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া আমরা টুওলা জংসনে রাত্র ১টার সময় উপস্থিত হইলাম। তথায় ITA UP Passenger এর সহিত আমাদের বগী সংযুক্ত হইলে গাড়ী নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া ভোর ৪টার সময় আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে পৌঁছিল। GIP Ryর ব্যবস্থা অনুসারে এখানে আমরা বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। অবশ্য ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে (পুম্পোড়ানে) যাত্রীগণের যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইবার ও বিশ্রামের কোনরূপ ক্রটি হয় নাই। বৈকাল ৫-২০ মিনিটে এখান হইতে 53 NE Passengerএ যাত্রা করিয়া রাত্র ৬-৫০ মিনিটের সময় আমরা দেবতাবন্দিত বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাস্থলী শ্রীমথুরা-পুরীতে (মথুরা জংসনে) পৌঁছিলাম। এখানে আমরা আমাদের রিজার্ভড্ বগী পরিত্যাগ করিলাম।

বলা বাহুল্য, উর্জ্জ্বত শেষ করিয়া পুনরায় বাংলায় ফেরত যাইবার জন্তও বেদান্ত সমিতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হাতরাস্ জংসন হইতে রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুত রঘুনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগে.বর্দনদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ পরিক্রমা-সভ্যকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্ত পূর্ব হইতেই মথুরা জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যাত্রীগণের বিছানা ও মাল-পত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্তও যান-বাহনাদির সকল প্রকার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। সভ্যের ও যাত্রীগণের অবস্থানের নিমিত্ত মথুরা সহরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত “হেমনগঞ্জ নয়া ধর্মশালা”টা নির্দিষ্ট হয়।

পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীমথুরা-নগরী ও শ্রীযমুনাদেবীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শ্রীগুরু-গোরাঙ্গের আনুগত্যে সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে পরিক্রমা-মুখে যথাসময়ে উক্ত ধর্মশালায় উপনীত হন এবং প্রসাদ সেবাস্তে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শ্রীব্রজ-পরিক্রমার অপূর্ব সুষোগ গ্রহণের নিমিত্ত দিল্লী, দেৱাডুন প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তগণ কয়েকদিন পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হন।

(ক্রমশঃ)

স্মার্ত্ত শ্রমণের মতি পরিবর্তন

মতি পরিবর্তন ভালর জন্ত, কি মন্দের জন্ত—ইহাই বিচার্য। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই—“Change for the better or worse.” রথযাত্রার তিথি-নির্দ্ধাচনে মাননীয় শ্রমণ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিচার অনুসারে মতি পরিবর্তন করিয়া রথযাত্রা “নব-দিনাত্মিকা” বিচারে একাদশীতেও পুনর্যাত্রা নির্দ্ধারণ করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই মতি পরিবর্তন ভালর জন্তই বুঝিতে হইবে। তবে হেরা-পঞ্চমীর বিচার করিতে গিয়া এখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু একাদশীর পারণ নির্দেশ করেন নাই। পূর্বপূর্ব বৎসরের তাঁহার ‘নবদ্বীপ পঞ্জিকা’য় ইহা স্পষ্ট থাকিত। এই বৎসর এইরূপ মতি পরিবর্তনের কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ছাপার ভুল বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলে চলিবে কি?—অথবা তিনি হয়ত বিচার করিয়াছেন উক্ত একাদশীর পর সময়মত পারণ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

উক্ত পঞ্জিকাতে তিনি পূর্বে প্রতিবৎসরই শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে উপবাস ও পারণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরের পঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ না করিবার কারণ জানিতে পারি কি? শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব। স্তবরাং তাঁহাদের আবির্ভাবে উপবাস করা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। বরাহ-দ্বাদশীর উপবাসের উল্লেখ সম্বন্ধেও তিনি এবৎসর উদাসীন হইয়াছেন। এইরূপ মতি পরিবর্তনের কারণ, ভালর জন্ত কি মন্দের জন্ত—ইহা পাঠকবর্গ ভালরূপ বিচার করিয়া অনুসরণ করিবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার “সংক্ষিপ্ত অর্চন-পদ্ধতি” গ্রন্থে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উপবাস করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে ইহার পরিবর্তন করিলে

ভক্তিবিনোদ-ধারা রক্ষিত হইবে কি ? মাননীয় শ্রমণ মহারাজ হয়ত বলিবেন—
শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিনায়ে উক্ত উপবাসের কোনরূপ ব্যবস্থা
যখন লিপিবদ্ধ করেন নাই, তখন আমরা ঐরূপ উপবাসের ব্যবস্থা দিব কেন ?
সেস্থলে আমার বক্তব্য—ইহাতে কি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রকৃত আনুগত্য
করা হইবে ? অধিকন্তু, বলিতে চাই—শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমায় উপবাসের ব্যবস্থাও
হরিভক্তিবিনায়ে দৃষ্ট হয় না। তথাপি তাহার ব্যবস্থা তিনি লিপিবদ্ধ করিলেন
কেন ? উন্টাপান্টা বিচার না করিয়া একধারা অবলম্বন করাই আমরা ভাল
মনে করি।

এবিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত “বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা”র ব্যবস্থা-
মুসারে উপবাস ও পারণাদি করেন। তাহাতে (৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৪০০ পৃষ্ঠা)
লিখিত হইয়াছে—

(ক) ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার—মহাবিশ্বুর অবতার
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস ও তৎপরদিবস
পূর্বাহ্ন ১০।০ মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর পারণ।

(খ) ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার—ভৈরবী একাদশী ও বরাহ
দ্বাদশীর উপবাস ও তৎপরদিবস বরাহদেবের অর্চনাস্ত্রে পূর্বাহ্ন ১০।২৪
মধ্যে পারণ।

(গ) ২৫শে মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস ও তৎপরদিবস পূর্বাহ্ন ১০।২৩ মধ্যে
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর পারণ।

দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত (ক), (খ) ও (গ) চিত্রিত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত উপবাস
ও পারণাদি সম্বন্ধে স্মার্ত-পাঞ্জিকাকারগণ তাঁহাদের দিন-পঞ্জিকায় কোন নির্দেশ
দেন না। নবদ্বীপ-পঞ্জিকার বর্তমান পরিচালক মহোদয়ও বোধ হয় তাঁহাদের
আনুগত্য করিয়াই উক্ত উপবাস ও পারণ-বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। ইহাই
স্মার্তের লক্ষণ।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাদ—৪৬৫ ; ফাল্গুন—১৩৫৮

৪ গোবিন্দ, ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ৯।৩৮।
চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অতঃ হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ।

৬ গোবিন্দ, ৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৯।৪৯।
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সমাপ্ত।

১১ গোবিন্দ, ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-একাদশী
রা ১২।২৪। বিজয়া একাদশীর উপবাস।

১২ গোবিন্দ, ৯ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১০।৩।
পূর্বাহ্ন ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১৪ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—কৃষ্ণ-চতুর্দশী সন্ধ্যা
৫।২০। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রত।

১৫ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—অমাবস্যা দি ৩।১০।
পূর্বাহ্ন ৯।৫৫ মধ্যে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রতের পারণ।

১৬ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-প্রতিপদ
দি ১।১৩। শ্রীল রসিকানন্দ-দেব গোস্বামীর ও বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল
জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২৪ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ, বুধবার—গৌর-নবমী দি ১২।২০।
শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার সঙ্কল্প-গ্রহণ।

২৫ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার—গৌর-দশমী ২।১৩।
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ।

২৬ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ, শুক্রবার—গৌর-একাদশী দি ৪।১৭।
আমলকী একাদশীর উপবাস।

২৭ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ, শনিবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৬ ২৪। পূর্বাহ্ন
৯।৫০ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব,
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, সোমবার—গৌর-চতুর্দশী রা ১০।৩।
শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্তন।

৩০ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ১১।২০।
শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস। পূর্ণিমাতে ৪৬৬ গৌরাদ আরম্ভ এবং
পরদিবস পূর্বাহ্ন ৯।৪৮ মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ, শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈবো পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩য় বর্ষ	অনিরুদ্ধ, ৩ গোবিন্দ, ৪৬৫ গোরাঙ্গ বুধবার, ৩০ মাঘ, ১৩৫৮; ইং ১৩১২।৫২	১২শ সংখ্যা
----------	--	------------

শ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ

ভ্রাতুরন্তকস্ত পতনেহভিপত্তি-হারিণী
 প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোহপি পাপসিন্ধু-তারিণী ।
 নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষ-চিত্ত-বন্দিণী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিণী ॥ ১ ॥

হারি-বারি-ধারয়াহতিমণ্ডিতোরু-থাণ্ডবা
 পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্দণ্ডজালি-তাণ্ডবা ।
 স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপসম্পদক্ষিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥

শীকরাভিমূষ্টি-জম্বু-দুর্বিপাক-মর্দ্দিনী
 নন্দ-নন্দনাস্তুরঙ্গ-ভক্তিপূর-বন্ধিনী ।
 তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপচক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
 শ্রীমুকুন্দ-নির্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী ।
 কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দ-নিন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুনাভিমণ্ডিতা
 প্রেমনক-বৈষ্ণবাবধ-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা ।
 উন্মি-দোর্বীলাস-পদ্ননাত-পাদ-বন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীর-রন্তমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
 দিব্যগন্ধভাকদম্ব-পুষ্পরাজ-রুষিতা ।
 নন্দসূনু-ভক্তসংঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥

ফুল্পপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
 ভক্তিরিক-দেব-সিক-কিন্নরালি-পূজিতা ।
 তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥

চিদ্ৰিলাস-বারিপূর-ভূভূবঃ-স্বর্যাপিণী
কীৰ্ত্তিতাপি দুৰ্ম্মদোরু-পাপমৰ্ম্ম-তাপিনী ।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গরাগ-ভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

ভূষুবুদ্ধিরষ্টকেন নিৰ্ম্মলোন্মি-চেষ্টিতাং
হামনেন ভানুপুত্রি সৰ্বদেব-বেষ্টিতম্ ।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সৰ্বপাপ-মোচনে
ভক্তিপূৰ্ণমস্ম্য দেবি পুণ্ডরীক-লোচনে ॥ ৯ ॥

শ্রীযমুনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি স্বীয় পবিত্র দর্শন-দানেই অতিপাতকী জনগণকেও পাপসিদ্ধ হইতে পরিব্রাণ করিয়া স্বাগ্রজ যমরাজের নগরাভিমুখে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, যিনি স্বকীয় নীর-মধুরিমায় অশেষ দেব ও নরগণের চিত্ত বশীভূত করিয়া থাকেন, সেই পদ্মবন্ধু ভানু-নন্দিনী শ্রীযমুনা দেবী সৰ্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

চিত্তহারিণী বারি-প্রবাহে যিনি ইন্দ্রের অরহৎ খাণ্ডব-বন বিশেষরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, ষাঁহার শুভ্র পঙ্কজসমূহে খঞ্জনাদি পক্ষীশ্রেণী পরম-অথে নৃত্য করিতেছে, স্নানকারী ব্যক্তিগণের কি কথা, স্নানেচ্ছু জনগণেরও অতি তীব্র পাপরাশিকে যিনি ক্ষীণ করিয়া থাকেন, সেই কমল-বন্ধু সূর্য্যকণ্ঠা যমুনা দেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

যিনি অমুকণ-সংস্পৃষ্ট প্রাণীগণের দুষ্কৰ্ম্ম-ফল বিনাশ করিয়া ব্রজেজ্ঞনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন করেন এবং যিনি নিজ তট-নিবাসেচ্ছু জনগণের পরম কল্যাণকারিণী, সেই রবিশ্রুতা শ্রীযমুনা দেবী সৰ্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপ-সেবিত সপ্ত-সমুদ্রের বেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা, যিনি শ্রীমুকুন্দের প্রকটিত সর্বোত্তম দিব্য কেলিসমূহের পরিজ্ঞাতা, স্বকীয় দিব্যোজ্জল কান্তি-প্রভাবে ইন্দ্রনীল-মণিরও কান্তি-সমূহকে যিনি পরাভব

করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী সদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

যিনি মনোহর মথুরামণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত হইয়া পরম শোভিতা হইয়াছেন, প্রেমৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের যিনি বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির পরিবর্দ্ধনকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গরূপ বাহুবুগল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনে তৎপরা, সেই ভাস্কর-দুহিতা শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

অতি রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হৃদ্য'-ধ্বনিকারী গোবৎসগণ-কর্তৃক যাঁহার শোভা বন্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব-পুষ্পশ্রেণীর দিব্যগন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকর-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্বকাল আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

আনন্দে পক্ষ-বিস্তারকারী মলিন-চঞ্চু-চরণ রাজহংস-বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিতা হইতেছেন, ভক্তিতে আকৃষ্টচেতা দেব-সিদ্ধ-কিন্নর-অধিপতিগণও স্ব-স্ব যুথ-পরিবৃত হইয়া যাঁহার পূজায় রত থাকেন, এবং যিনি উভয় তীরস্থ গন্ধবাহী পরিমল দ্বারা প্রাণীসমূহের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্কর-দুহিতা যমুনাদেবী সর্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

চিহ্নিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদাত্মক বারিপ্রেবাহ দ্বারা যিনি 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বর' এই লোকত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন,—সে-কারণ যিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা' এই নামে পরিচিতা, যিনি উচ্চারিতা হইয়াও অত্যন্ত দুর্দমনীয় পাপরাশির মর্ম্মাস্তঃ-বিনাশকারিণী, ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া-হেতু তদীয় অঙ্গরাগ-গলিত কুঙ্কুমাঙ্গি অলুপন গন্ধদ্বারা যিনি সুরভিতা, সেই সবিতৃ-তনয়া শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

হে সর্বপাপমোচনকারিণী ! হে ভাস্কুপুত্রি ! পবিত্র তরঙ্গ-বিস্তারই তোমার চেষ্টা এবং তুমি সর্বদেবগণের আশ্রয়স্বরূপা । যিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টক পাঠ করিয়া তোমার স্তব করেন, তুমি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহার ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন কর ॥ ৯ ॥

প্রকট-পূর্ণিমা

যাবতীয় উৎসবের মধ্যে গৌর-জন্মোৎসবই শ্রেষ্ঠ

প্রেমময়-বিগ্রহ গৌরহৃদয়ের আবির্ভাব-তিথি আগতপ্রায় । গৌরভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির ন্যায় গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু ।

এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে বদ্ধজীব কতই না ‘আপাত-মধুর পরিণাম-বিষময়’-ফলাকাজ্জ্বায় উদ্গীব। শ্রীগৌর-ভগবান্ যখন অনিত্য-ফল-পিপাসু মর্ত্য জীব-কুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া অভিনব অপ্রাকৃত চমৎকারিতার পথ দেখাইয়া দিলেন, তখন কলিহত জীবের সৌভাগ্য আত্মারামবৃন্দেও লোভনীয় পদবী হইল। জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে, কিন্তু প্রকট-পূর্ণিমাৎসব সর্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ সর্বোত্তম-জনারাধ্য, তাঁহার প্রকট-তিথির উৎসবও সর্বোৎসাহকর।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতেই বিশ্বে শ্রীপ্রকট-পূর্ণিমার আদর প্রচারিত

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্ত-ঋতুর ফাল্গুন-পূর্ণিমায়া প্রকট হইয়া সংসার-দুঃখরূপ শীত-জাড়ের অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করত নিত্য কৃষ্ণ-সংসারের পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র পদানুসরণে জীবের সর্বোত্তম লাভ, শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরান্দের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপ্রকট-পূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুল্লাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চ-নীচ অনেকের গৃহে প্রকট-পূর্ণিমার মহিমা ন্যূনাধিক জাতীয়-পর্বে রূপে লক্ষিত হইতেছে। ইতঃপূর্বে শ্রীগৌরান্দ ও তাঁহার মহিমা, তাঁহার পার্শ্বদ-বংশে ও তদাশ্রিত কুলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃই বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। আজ বঙ্গের অনেক কৃতিসন্তান গৌরান্দের প্রাণাকর্ষিণী বাণীর অনুগমনে হরিকীর্তন ‘ভগবৎ সান্নিধ্যের হেতু’ ও ‘হরিসেবার একমাত্র উপায়’ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির স্থান হৃদয়ের অত্যাচ্ছ-প্রদেশে রক্ষা করিবার বল লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌর-জন্মস্থানে শ্রীমূর্তি-প্রকাশ ও প্রকট-মহোৎসবের প্রবর্তন

শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কথা, তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার অনিয়-লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্ত যিনি তাঁহা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধানপূর্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-স্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগৌর-জন্মতিথিতে মহোৎসবের প্রবর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ ভাগবতগণকে সর্বদা আহ্বান করিয়া যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরাও গৌরভক্ত সাধারণকে শ্রীগায়াপুরে যোগপীঠে আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিতে অনির্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি।

গৌর-জন্মোৎসবে যোগদানে চতুর্কর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ

বৎসরের সকল দিনে আমরা জড়য়ে উন্নত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছি এবং এই রসের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতি-মূহুর্তে উপলব্ধি করিতেছি। তাই বলি— প্রাকৃত জগৎ হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া একদিন অপ্রাকৃতির উদ্দেশে ব্যয়িত করি। ইহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের যে ব্যাঘাতটুকু হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উদ্দেশে প্রদত্ত হইল বলিয়া জানিব এবং তাহাতে অজ্ঞাত স্মৃতিপুঞ্জ উদয় হইয়া কালে প্রেম-ভক্তির অবতারণা করাইবে। পাঠক অবশ্যই জানেন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষময় চতুর্কর্গ প্রেমের তুলনায় কত ক্ষুদ্র! এমন অসীম লাভ ছাড়িয়া ভব-সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া কখনই ভাল নহে।

শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠিত যে-কোনও স্থানে গৌর-জন্মোৎসবে যোগদানের নির্দেশ

মাদ্রাজ-নগরীতেও শ্রীগৌর-জন্মদিনে একটি সম্মেলন হইবে জানিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। মাদ্রাজবাসীগণ সেই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীগৌরহরির জন্মোৎসব করিতে সমর্থ হইবেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ

‘বসুমতী’ পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক অভিমত

বসুমতী-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টি অবগত হওয়া যায়,—

“ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদবধি নানাশাস্ত্রে গঙ্গা-মহিমা পরিকীর্তিত হইতেছে। যাহারা গঙ্গা মানেন না, মহিমায় তাহারা উপবাস করেন। সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত আমাদের ভাগীরথীকে উচ্চ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। প্রকৃতরূপে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গাজল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কল, তাহাতে কোনপ্রকার অপবিত্রতা অথবা দূষিত কীটানুসত্তা কিছুমাত্র নাই। পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে অপবিত্র পদার্থ বিস্তৃত আছে, ভারতের গঙ্গা সর্বাংশে সে দোষবর্জিত এবং

সর্বতোভাবে পবিত্র। * * * একপাত্ৰ গঙ্গাজল তিনি স্বল্পরূপে রূপভাগ (Analysis) করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত গঙ্গা-মাহাত্ম্য সমস্তই সত্য। স্বদেশে পৌছিয়া তিনি এই মহৎ আবিষ্কারের বিষয় তথাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,— গঙ্গা কেবল একাকিনীই পবিত্র নহেন, গঙ্গার সহিত যে-সকল নদ-নদীর যোগ থাকে, সে-সকল স্রোতের জলও পবিত্র হয়। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উক্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বসুমতী-সম্পাদকের অশোভন মন্তব্য

শাস্ত্রে গঙ্গার মহিমা যে-প্রকারে লিপিবদ্ধ, তাহা যদি সেরূপ না হইয়া ঐরূপ কৈজ্ঞানিক মতামুসারে লিখিত থাকিত, অজ্ঞলোকে তাহা হইলে গঙ্গাকে এতদূর আদর করিত না। ধর্মের গৌরব করিয়া আমাদের শাস্ত্রকার মহাশয়েরা সকল বিষয়েই যে-প্রকার পবিত্র ধর্মভাব আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, নীরস বিজ্ঞানের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহারা যদি সেই প্রমাণের উপর সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের ধর্মভাব কখনই এতদূর বিশ্বজনীন হইতে পারিত না।”

শ্রীল ঠাকুরের প্রতিবাদ :—

অপ্রাকৃত জীব সাংখ্যের ২৪ তত্ত্বের অতীত ; পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর
পাদপদ্ম হইতেই শ্রীগঙ্গার উৎপত্তি

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে গঙ্গার এরূপ মহিমা যথেষ্ট নয়। প্রাকৃত জগতে চব্বিশটি তত্ত্ব আছে। জীব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। জীবের স্থলদেহে চব্বিশটি প্রাকৃত তত্ত্ব আছে। জীবের আত্মা ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত। তাহা প্রকৃতির অতীত বলিয়া ‘অপ্রাকৃত’ শব্দে অভিহিত। পরব্রহ্মও সম্পূর্ণ ‘অপ্রাকৃত-তত্ত্ব’। পরব্রহ্মের নামান্তর বিষ্ণু। ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্’—এই কথাগুলি বেদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। সেই বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাদেবী উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গার জল-সত্তায় যে-কিছু প্রাকৃত মহিমা থাকুক, তাঁহার চিৎসত্তায় অনন্ত প্রাকৃত মহিমা আছে—ইহা সর্বশাস্ত্র-সম্মত।

শ্রীগঙ্গার প্রাকৃত মহিমা অপেক্ষা অপ্রাকৃত মহিমা প্রচুর,

এবং গঙ্গাস্নানে ভক্তি লাভ

মার্কিন পণ্ডিত মহাশয় এবং বসুমতী-পত্রিকার লেখক মহোদয় গঙ্গার প্রাকৃত মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে মহিমা অপেক্ষা অনন্ত মহিমা গঙ্গাদেবীতে

বিরাজমান । শুদ্ধ-ভক্তমণ্ডলী একথা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, গঙ্গার নিকট বাস করিলে এবং গঙ্গাজল পান করিলে হরিভক্তির উদয় হয় । যে জল পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের চিন্ময় পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত, সে জলে যে হরি-পাদপদ্মে ভক্তি উদয় করাইবার শক্তি আছে, তাহা শ্রীব্যাসাদি মহর্ষিগণ সর্বত্র গান করিয়াছেন । জীবাত্মা কলুষিত হইয়া জড়জগতে হরি-বিস্মৃতি-দুঃখে মগ্ন আছেন । গঙ্গাজলে অবগাহন করত যখন তিনি হরিগুণ গান করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে । গঙ্গার এই পরম গুণ কেবল ভাগ্যবান্ লোকেই অনুভব করিতে পারেন । যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা কেবল প্রাকৃত গুণেই আবদ্ধ থাকেন ।

অপরাধী ব্যক্তির গঙ্গাস্নানেও ভক্তিফলের বাধা

যদি বল, অনেকেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করেন, কিন্তু কখনই হরিভজন করেন না, তাহাতে কথা এই, যে বস্তুতে যে গুণ আছে, তাহা প্রতিবন্ধকশূন্য বস্তুতেই ব্যাপ্ত হয় । Electricity (তড়িৎ) নামক বস্তুগুণ, Good conductor (উত্তম চালক) বস্তুতে ব্যাপ্ত হয় । যে বস্তু bad conductor (মন্দ চালক), তাহাতে সে গুণ ব্যাপ্ত হয় না । তদ্রূপ জীবগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন, তাহারা ভক্তিরূপ Electricity (তড়িৎ) সম্বন্ধে bad conductor (হীন চালক) । হরিনাম-বলে যাহারা পাপ করেন, তাহারা নামাপরাধী । গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যের ভরসায় যাহারা পাপ করেন, তাহারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী । অতীত সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয়, কিন্তু উক্ত অপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না । যাহাদের এই অপরাধ আছে, তাহারা এরূপ bad conductor (মন্দ চালক) যে, গঙ্গার অনন্ত মহিমা অনুভবে সমর্থ হন না । এই কারণেই আজকাল গঙ্গার চিন্ময়ী শক্তি অনেকের উপলব্ধিতে আসে না, কেবল প্রাকৃত জল-ধর্ম-সকলই তাঁহাদের বুদ্ধি-গোচর হয় ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত গুৰ্ব্বষ্টকের পত্নানুবাদ

ভীষণ সংসার-দাবানলে সন্তাপিত

জীবগণে পরিত্রাণ লাগিয়া যে-জন,
করুণা-বারিদ-রূপ ধরি' অযাচিত—

কৃপাবারি অবিরত করেন বর্ষণ,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ১ ॥

সংকীৰ্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাণে চিত্ত যাঁর
সতত উন্মত্ত রহে, গৌর-প্রেমরসে—
রোমাঞ্চ-পুলক-কম্প দেহে অনিবার—

অশ্রুর তরঙ্গ সদা উঠে ভাবাবেশে,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ২ ॥

বিগ্রহের নিত্য-সেবা মন্দির-মার্জ্জন,
আচরস-উদ্দীপক বেশাদি-রচনা—
প্রভৃতি সেবার কার্ষ্যে আপনি যে-জন
নিযুক্ত রহিয়া ভক্তে দেন প্ররোচনা,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৩ ॥

চতুর্বিধ ভগ্নবৎ-প্রসাদান্ন দিয়া
ভক্তগণে পরিতৃপ্ত করিয়া যে-জন,
প্রপঞ্চ নাশিয়া প্রেমানন্দ উপজিয়া,
আপনিও পরিশেষে পরিতৃপ্ত হ'ন,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকা-মাধবের যিনি প্রাতিক্ষণ

অনন্ত মাধুর্যময় রূপ-গুণ-নাম—

লীলা আদি আশ্বাদিতে লুক্ক চিত্ত হ'ন,

সর্ববজীব-হিতে রত সতত নিষ্কাম,

অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জ-বিহারী ব্রজ-যুগলের রতি-

ক্রীড়া সাধনের লাগি' প্রিয় সখীগণ—

আশ্রয় করেন যে-যে যুক্তি, তা'তে অতি-

নিপুণতা যুক্ত, যিনি সখী-প্রিয় হ'ন ।

অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৬ ॥

বেদাদি নিখিল শাস্ত্র যাঁ'রে শ্রীহরির

স্বরূপ বলিয়া সদা করেন কীর্তন,

সে রূপ চিন্তেন যাঁ'রে সাধু-ভক্ত-ধীর,

(কিন্তু) হরির পরমপ্রেষ্ঠ হ'ন যেই জন,

অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৭ ॥

যাঁর কৃপা-বলে হরি-কৃপা লাভ হয়,

ভক্তির সিদ্ধান্তে যিনি অতীব নিপুণ,

ছেদনে সমর্থ যিনি শিষ্যের সংশয়,

জীবে স্তব-ধ্যান করে যাঁ'র কীর্তি-গুণ,

অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হ'ন ।

বন্দ তাঁর পাদপদ্ম করিয়া যতন ॥ ৮ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন

নারমা (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ এস্থলে পুনরায় নিম্নোক্তরূপ বলিয়া তাঁহার পূর্ববাক্যের পরি-
সমাপ্তি করিতেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (গীঃ ৮।১৫)

নিত্যযুক্ত মহাত্মগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিয়া গেলে তাঁহাদিগকে আর এই দুঃখালয়ে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি-‘সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ’ লাভ করায় ভগবানের নিত্যলীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হন। যোগীগণের ‘অষ্টসিদ্ধি’ আর এই ‘পরম সিদ্ধি’ একবস্তু নহে। যোগীদিগের অষ্টসিদ্ধি—প্রাকৃত বা ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু ভগবদ্-সেবায় যে সম্যক সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই অপ্রাকৃত সিদ্ধি বা নিত্যসিদ্ধি। ভগবানের সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিত্যকালই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা নিত্য প্রকটিত আছে। সূর্য যেমন একই স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কোটি কোটি বস্তুধাতিতে লোকচক্ষে ‘উদয় হন’ এবং ‘অস্ত যান’ এবং সেইভাবে চিরদিনই প্রতীয়মান হন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিত্যকাল তাঁহার নিত্যধাম গোলোকে অবস্থান করিয়াও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই নিজলীলা প্রকটিত করেন। ‘প্রাতঃকালে সূর্য উদিত হইল, আর সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত গেল’—এই প্রকার ধারণা যেমন আমাদের ভুল এবং লৌকিক (কেন-না, সূর্য কোন-দিনই উঠেন না বা কোনদিনই ডুবিয়া যান না), সেইপ্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমুক সময়ে অমুক স্থানে উদিত হইলেন বা অমুক সময়ে অমুক স্থানে অস্ত গেলেন বা অমুক স্থানে অমুকের দ্বারা হত হইলেন (?)—এই প্রকার সমস্ত ধারণাই ভুল বা লৌকিক। তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম সমস্তই দিব্য বা অলৌকিক। সুতরাং সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব যাঁহাদের বোধগম্য হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাভ্রুদেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥ (গীঃ ৪।২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখনই যেখানে তাঁহার ভৌমলীলা বিস্তার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিত্য পিতামাতা শ্রীব্রহ্মদেব-দেবকীর মারফত শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে নিজে

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীযশোদা-নন্দনরূপে প্রকটিত করেন, সেই সেই স্থানেই যে-সমস্ত মহাত্মগণ পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহার পার্শ্বদরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যলীলার প্রবিষ্ট স্বরূপসিক বা পরম-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তগণ পরমসুখে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য পার্শ্বদ অর্জুনকে লইয়া যে অগ্ন্যাগ্ন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের এই নিত্য-লীলা প্রকটিত করেন, তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটিতে জানিতে পারি—

বহুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তাং হং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ (গীঃ ৪।৫-৬)

যে-সকল ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিয়া ঐশাধিক ধন্যে আবৃষ্ট হইয়া প্রাকৃত কাম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধনে যত্নবান্ হন এবং স্বর্গাপবর্গাদি সামান্য সুখ-সুবিধা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যস্তাবী। তাঁহারা প্রাকৃত উচ্চাচ স্থানে অবস্থিত হইয়া নাগর-দোলায় চড়িয়া বৃথা ঘুরিয়া মরেন। যথা—

আব্রহ্মভুবনান্নোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কোন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতি ॥ (গীঃ ৮।১৬)

আমরা ভুঃ-ভুবঃ-স্বর-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এবং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত একটীর পর আর একটী—এই প্রকার যত উচ্চ লোকেই আরোহণ করি না কেন, সেস্থান হইতে আবার আমাদের ফিরিয়া আসিতে হয়। ঐপ্রকার পরলোকাতির কথা বাদ দিলেও, ইহলোকেই আমরা দেখিতে পাই—রাজা, মহারাজা, দেশপাল, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, নেতা প্রভৃতি বহু লোকই বহু কষ্টসাধন করিয়া ঐসকল উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ‘পুনর্মুখিকো ভব’ হইয়া নিম্নস্তরে চলিয়া যান। উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইলে যে কিরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়, তাহা আমাদের ‘লীডার’ (চালক)-গণ ‘হাড়ে-হাড়ে’ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ‘দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ’-ব্যক্তিগণ যদি কোনদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐপ্রকার প্রকৃতির নাগর-দোলায় চড়িয়া ‘যন্ত্রাক্রান্তানি মায়য়া’র গায় কড়ু স্বর্গে কড়ু মর্ত্যে, কড়ু দাস কড়ু প্রভু, কড়ু ব্রাহ্মণ কড়ু চণ্ডাল প্রভৃতি ‘রং-বেরং’এর, অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইলেই আমাদের নিত্য-স্বরূপের বিলাস আরম্ভ হয়।

শরীর ও মনস্তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই যেমন কর্মবশে জন্মজন্মান্তর শরীর-ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শরীর ও মনস্তত্ত্বের যে অনিত্য প্রাকৃত বিলাস-ভূমি চতুর্দিশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতেও ‘কভু স্বর্গে কভু মর্ত্যে’ এইভাবে ভ্রমণ করিতে হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্বোপাধি-বিনিমুক্ত আত্মার যে চিন্ময় বিলাস-ভূমি, সেইস্থানে অবস্থিত হওয়া যায়। সেই চেতন-ভূমি—জড় ব্রহ্মাণ্ড ও অব্যক্তেরও অতীত। তেজ-বারি-মৃৎ বিনিময়ে প্রস্তুত এই শরীর যেরূপ নশ্বর, তদ্রূপ ক্ষিতি-অপ-তেজ নিশ্চিত মরীচিকারং এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও নশ্বর। আবার অপ্রাকৃত আত্মা, যাহা তেজ-বারি-মৃৎ বিনিময়ে কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বহু গবেষণাময়ী ‘ল্যাবরেটরী’তে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, সেই আত্মা এবং তাঁহার নিত্য বিলাস-ভূমিও অবিনশ্বর। দুই বস্তুই সনাতন। সনাতন বস্তুকে সনাতন ধামে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে উপায়, তাহাই ‘সনাতন ধর্ম’।

নিরীশ্বর সাঙ্খ্যিকার কপিলাদি দার্শনিকগণ প্রাকৃত জগতের বিশ্লেষণ-কার্যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির পরও যে সনাতনী প্রকৃতি আছে তাহা তাঁহাদের সামান্য বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে নাই। এবং তাঁহারা অকূল-পাথারে ‘হাবু-ডুবু’ থাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ‘অব্যক্ত’ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব যত বড়ই মননশীল হউক না কেন, তাহার সমস্ত কার্য্যই একটি প্রাকৃত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। এইপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট কখনই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। অতরাং যে-বস্তু প্রাকৃত বুদ্ধি-সীমার অতীত হইয়া বর্তমান, তাহাকে ‘অব্যক্ত’ না বলিয়া আর উপায় কি? ইহারই নাম—‘কূপ-মণ্ডুক-শ্রায়’। কূপ-মধ্যস্থিত মণ্ডুক তাহার সীমার বাহিরে যে মহাসমুদ্র বর্তমান আছে তাহা নিজ-বুদ্ধিতে কোনদিনই উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার ধারণা—নিজ কূপের জল ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরাও সেই ‘কূপ-মণ্ডুকে’র শ্রায় শরীর ও মনের ‘কসরৎ’-স্বরূপ যোগ-জ্ঞান ইত্যাদি লইয়া যতই আলোড়ন করি না কেন—যতই চিন্তাশীল দার্শনিক হই না কেন, আমাদের ঐ কূপ-সীমা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। অতরাং সঙ্কীর্ণচেতা আগাদিগকে কে সেই মহাসিন্ধুর সন্ধান দিতে পারেন? আমরা ব্রহ্মাণ্ড-রূপ কূপের মধ্যে পড়িয়া ‘আব্রহ্মভুবনালোকাঃ’ পরিভ্রমণ করিয়া কত জন্ম-জন্মান্তর হাবু-ডুবু খাইতেছি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন—একমাত্র ভগবান্ বা তাঁহারই ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিজজন

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরূপা মরস্বতী । তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে মহাসমুদ্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারই নাম অবরোহ-পন্থা এবং তাহাই অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় । অবরোহ-পন্থায় সেই সনাতন-ভূমিকার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায় --

সহস্রযুগপর্য্যন্ত হর্ষদ্রব্ধগো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

পরন্তুস্মাতু ভাবোহিত্যোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্কেষু ভূতেষু সশ্রুৎসু ন বিনশতি ॥ (গীঃ ৮।১৭-২০)

ব্রহ্মলোকে লক্ষ-লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায় বলিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোকের বহুমানন করিয়া থাকেন । সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্ত বহু কষ্ট-সাধন ও তপশ্চা করিতে হয় । কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই ব্রহ্মলোকের যিনি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা, তিনিও চিরদিন বাঁচিয়া থাকেন না । যাহারা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—মনুষ্য মানের যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়, সেই প্রকার প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ বৎসরে একটি চতুষ্টয় সম্পূর্ণ হয় । ঐরূপ এক হাজার চতুষ্টয় সমাপ্ত হইলে তবে ব্রহ্মার একদিন সম্পূর্ণ হয় । সেই প্রকার দিন, পক্ষ, মাসাদি বৎসর পরিমাণ করিয়া একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ । অতএব তিনিও নশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও নশ্বর । এবং তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্য যে নশ্বর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের তুলনায় মনুষ্য যেরূপ অমর (?), আমাদের ক্ষুদ্র পরমায়ুর তুলনায় ব্রহ্মাদি দেবগণও সেইপ্রকার অমর (?) । প্রকৃতপক্ষে শরীরধারী মনুষ্য কেহই শরীর সম্বন্ধে ‘অমর’ নহে ।

ব্রহ্মার দিবাভাগের শেষে যখন রাত্রিভাগ উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গলোক পর্য্যন্ত প্রলয়ীভূত হইয়া যায় । জগতের সমস্ত প্রাণিগণ ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্ট হইয়া রাত্রিভাগে প্রলয়ীভূত হয়—“ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে” । (ক্রমশঃ)

— শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত

সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-জয়

গৃহ-ধর্ম

গৃহ-কর্তৃ—ক প্রত্যয় করিয়া ‘গৃহ’ শব্দ নিষ্পন্ন। গৃহ-অর্থে ঘর ও গৃহস্থ-আশ্রমকে বুঝাইয়া থাকে এবং ধর্ম-অর্থে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য, স্বভাব ও রীতি ইত্যাদিকে বুঝায়। গৃহ ও ধর্ম অর্থে বহু-কিছু অর্থান্তর স্বীকৃত হইলেও এস্থলে কিন্তু সে-সকল অর্থ না লইয়া কেবল মাত্র গৃহ-শব্দে গৃহস্থাশ্রম ও ধর্ম-অর্থে স্বভাবকে উপলক্ষ করিয়া, গৃহ-ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিব। এক কথায় গৃহস্থাশ্রমীর নিত্য বা বাস্তব স্বভাবই যে গৃহ-ধর্ম, তদ্বিষয়েই আলোচনা করিবার ইচ্ছা। প্রথমতঃ, ধর্ম কি?—আমরা এতদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে গৃহ ও ধর্ম একত্রে গৃহ-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব।

ধৃ—মন্ প্রত্যয়ে ধর্ম-শব্দ নিষ্পাদিত। ‘ধৃ—ধারণ-পোষণয়োঃ।’ ধর্ম-শব্দে আমরা সাধারণতঃ স্বভাব ও নিসর্গকে বুঝিয়া থাকি। তবে স্বভাব ও নিসর্গ এই দুইটি শব্দ একই ধর্ম-শব্দের পর্যায়বাচক হইলেও অর্থের তারতম্যে নিত্যানিত্য-ভেদে, আলো ও অন্ধকার-সদৃশ পৃথক-রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেখানে ধর্ম-অর্থে স্বভাবকে লক্ষ্য করে, সেখানে বস্তুর নিত্য-স্বভাবকেই নিত্য-ধর্ম বুঝিতে হইবে এবং যে-স্থানে ধর্ম-অর্থে নিসর্গকে বুঝায়, সে-স্থানে বস্তুর অনিত্যতা বা নৈমিত্তিক-ধর্মকে বুঝিতে হইবে। উদাহরণ-স্থলে বলা যায় যে, জলের নিত্য-ধর্ম তরলতা, কিন্তু এই তরল্য-ধর্মবিশিষ্ট জলকে নৈসর্গিক প্রক্রিয়াতে যখন কাঠিন্যে (বরফে) পরিণত করা হয়, তখন এই কঠিনত্ব জলের নিসর্গ বা অনিত্য অবস্থান্তর মাত্র। যদি জলের এই জমাট অবস্থাটী নিত্য হইত, তাহা হইলে পরস্পরে উচ্চ তাপস্পর্শে কখনও দ্রব হইতে পারিত না। যাহা যাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম তাহা যে-কোনও প্রকারে রূপান্তরিত হইলেও তদ্ভাবে অর্থাৎ সেই রূপান্তর অবস্থায় নিত্যকাল থাকিতে অসমর্থ। তৎকারণ-স্বরূপ আর একটী উদাহরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতে পারি। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস কিন্তু মায়ার দাস নহে; তথাপি স্বতন্ত্রতা-বশে জীব এই কৃষ্ণদাস ভুলিয়া অনিত্য সংসারে বিমুখমোহিনী মায়ার প্রহেলিকায় মুগ্ধ হইয়া, মায়িক জীবরূপে প্রতিভা হইতে থাকে। নৈসর্গিক-মতি দ্বারা কখন কখন আচ্ছন্ন হইলেও, ‘জীব নিত্য কৃষ্ণদাস’ বলিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণ-ভোলা হইয়া থাকিতে পারে না; যেহেতু ইহা জীবের নৈমিত্তিক বা নৈসর্গিক অবস্থান্তররূপে প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র। তা শাস্ত্র বলেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।

শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায় ।

'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন' !

'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ (৫ঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫৪)

উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—বস্তুর অনিত্য বা নৈসর্গিক ধর্মের স্থায়িত্ব জগতে বেশীদিন হইতে পারে না । সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২য় শ্লোকে 'ধর্ম' শব্দে বলিয়াছেন—যাহা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাত্মক কৈতব-রহিত, ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ, তাহাই ধর্ম । যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে, তাহাই ধর্ম । সর্বদেবময় শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্মের মূল বা প্রমাণ,—

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিরোগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

ভগবন্মাম-গ্রহণাদি দ্বারা বাসুদেব-ভগবানে যে ভক্তিরোগ, তাহাই মানবগণের 'পরম-ধর্ম' বলিয়া কথিত হয় । এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।২৬)

উক্ত শ্লোক দুইটি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—'পুংসাং'-ধর্ম বলিতে মানবগণের ধর্মকে বুঝায় । এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; অন্ত্যজ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষ-নির্কিশেষে মানব-মাত্রেরই ধর্মের কথা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ; ধর্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া বলিয়া উল্লেখ করেন নাই । শাস্ত্রাদিতে যেখানে 'পরম-ধর্মের' কথা স্বীকৃত হইতেছে সেখানে পরম-ধর্ম ব্যতীত আরও অল্প ধর্মসমূহ আছে, ইহাও স্মৃতঃই স্বীকৃত হইয়া থাকে । সেই ধর্মসমূহকে অনাত্ম-ধর্ম, ছল-ধর্ম, কপট-ধর্ম বা কৈতব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আধ্যাত্মিক জগতে অনাত্ম-ধর্মের বহুমানন থাকিলেও পারমার্থিক জগতে ইহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না । কারণ, ইহার মধ্যে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি এবং

ধর্মার্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্কর্গানুসন্ধান-পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত রহিয়াছে। নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ধর্ম-সমূহকে এককথায় আশ্রম-বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলা হয়। সে-কারণ ইহাকে গৃহস্থের গৃহ-ধর্ম বলা হইবে না। শাস্ত্রাদিতে কেবল গৃহকে ‘গৃহ’ বা গৃহস্থিত ব্যক্তিকে ‘গৃহস্থ’ বলা হয় নাই। একরূপ বলিলে ভুল বলা হইবে ; কারণ, “ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।” এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তে শিষ্যকে আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্বক গুরু-শুশ্রূষা ও তদুপদেশ-ক্রমে শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার পালন ও নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য-সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রথম আশ্রম-ধর্ম আচরণ করিতে হয়। গুরুগৃহে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিতে ষাহারা অসমর্থ হন, তাহারা গুরুর আদেশক্রমে দ্বাদশবর্ষান্তে সমাবর্তন করিয়া বেদোক্ত বিধানে ধর্মপত্নী গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই অবস্থার নামই—গৃহস্থাশ্রম। প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাইবার জন্তই শাস্ত্র বিবাহাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

লোকে ব্যায়ামিষ-মতঃসবা নিত্যাস্ত জন্তোন’ হি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতঃস্তষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আগ্নিষ-ভক্ষণ ও সুরা-পান প্রভৃতিতে প্রায় সকল প্রাণীরই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ইহার অকরণে কোন প্রত্যাবায় নাই। তবে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আগ্নিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরা পান প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্তই নির্দ্ধারিত।

শাস্ত্রাদিতে গৃহিণের কর্তব্য বহুপ্রকার নির্ণীত হইলেও, তাহাদের ধর্মপত্নীগণ-সহ কাষ্মনোবাকো শ্রেয়ঃ আচরণকেই ‘গৃহধর্ম’ বলা হয়। ধর্ম্যাচরণে সহায়তা করিবার নিমিত্ত দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ত পত্নীর আর এক নাম—সহধর্ম্মিণী। ‘সহ-ধর্ম্মাচরেদিতি সহধর্ম্মিণী’। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বা ধর্মহীন পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিবার জন্ত দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ষাহারা ক্ষণিক সুখ-সন্তোগের জন্ত দার-পরিগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদিতে মত্ত থাকেন, শাস্ত্র তাহাদিগকে প্রকৃত গৃহস্থ না বলিয়া ‘গৃহমেধী’ বা ‘গৃহব্রতী’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। গৃহমেধীর ধর্ম ও গৃহস্থের ধর্ম কখনও এক নহে। কারণ, কাম-কামিগণ—গৃহমেধী, আর কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিণিষ্ট সনোষ্ঠী গৃহস্থগণই—গৃহধর্ম্মী। ইহলোকে দুই প্রকার মনুষ্য বাস করেন। তন্মধ্যে কৈতবরহিত বিষ্ণুভক্তগণ—দৈব, আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অর্থাৎ কন্মী, জ্ঞানী, যোগী ও রাজসিক-তামসিক

প্রকৃতির যাবতীয় মনুষ্যগণ—আম্বর-বর্ণাশ্রমী বলিয়া কথিত । শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে বহিস্মুখ গৃহাশ্রম-গৃহমেধিগণের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্য-কশিপুকে বলিয়াছেন—হে পিতঃ ! গৃহব্রতিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে কোনপ্রকারে ক্রোধে নিযুক্ত হয় না । তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, স্তবরাং, বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্কিত বিষয়ই চর্ষণ করিয়া থাকে ।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিভৈষণাতুরঃ ।

স্বৈৰঃ কৃপণধীমুটো সমাহমিতি বধ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৬)

গৃহব্রতিগণ গৃহে আসক্তচিত্ত হইয়া ‘আমি-আমার’ এইরূপ জ্ঞানে পুত্র ও বিভৈষণায় আতুর এবং স্বৈৰ ও অলসমতি হইয়া উত্তরোত্তর মায়াজালে আবদ্ধ হয় ও দুঃখভরে বলিতে থাকে—‘হায় ! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভাৰ্যা ; সন্তানগুলি আমা-বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন-ধারণ করিবে ?’ এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হইয়া সর্বদা পুত্র ও কন্যাাদিগকে ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যুর পর অন্ধ তামসী ঘোনিতে প্রবেশ করে । তজ্জন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্কিংশেষে কাহারও গৃহমেধী বা গৃহব্রতী হওয়া উচিত নয় ।

কুটুম্বেষু ন সজ্জত ন প্রমাণ্যত কুটুম্ব্যপি ।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্চাদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫২)

বিদ্বান্ গৃহিগণ কুটুম্বী হইয়া কুটুম্বতে আসক্ত-চিত্ত হইবে না । দৃষ্টবস্ত যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুরও নশ্বর জ্ঞান করিবে । এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেই প্রকৃত ‘গৃহস্থ’ বলিয়া অবিহিত হওয়া যায় । শ্রীপৃথু-মহারাজ সনৎকুমারাди ভগবদ্বক্তৃ ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—“যাহাদের গৃহে আপনাদের স্রায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি বর্তমান থাকে, তাহারাই প্রকৃত গৃহস্থ । এতদ্ব্যতীত যাহাদের গৃহ, তীর্থ-পবিত্রকারী মহাভাগবতগণের সমাগম ও পাদোদক-বর্জিত, তাহা সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থল বলিয়া গণ্য ।”

অতএব শাস্ত্রে এতাদৃশ সদাচারী গৃহস্থগণের কায়মনোবাক্যে শ্রেয়ঃ আচরণই—
‘গৃহ-ধর্ম’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভুর স্থলিখিত প্রবন্ধ*

বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্তব্য

এ বৎসরটা আমার শেষ বছর—ক'দিন পরে নতুন বছর পড়বে—সন ১৩৫৭ সাল দেখা দেবে। তাই মনে নতুন ভাব নিয়ে—নানারূপ চিন্তাতে এত নিরাশা ও হতাশার মধ্যেও মনটা আমার নতুন আশায় ছলে উঠছে। কেবল মনে হ'চ্ছে, এই 'পুরাণো বছর' বিদায় নেওয়ার সময় সে যেন তা'র সঙ্গে নিয়ে যায়—হিংসা, প্রতিহিংসা, অসৎ-উত্তেজনা, অবিশ্বাস ও ভোগের অভাবহেতু অশ্রদ্ধা। এই প্রার্থনাই ক'দিন থেকে আমার মনে-প্রাণে বাজছে। এ বছরের শেষের ক'টা দিনে মানুষের সমাজে মানুষের যে-ভাব দেখলাম, তা'তে মনে হ'লো—মানুষ নিজেই নিজকে সবচেয়ে বেশী অপদস্ত ও লাঞ্চিত ক'রেছে। তাই এসমস্ত ছরবস্থা দেখে, মহাজনগণের আনুগত্যে আমি ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি—

নাশ্বা ধর্ম্মে ন বস্তুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে

যদ্যদ ভবাং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্ম্মানুরূপম্ ।

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহমতং জন্মজন্মান্তরেহপি

স্বপ্নাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥ (মুকুন্দমালা-স্তোত্র)

[বেদ-কথিত সবিতৃ-উপাসনা ইত্যাদি আমার অভীক্ষিত নহে, অষ্টগণদেবতা বা ধন-রত্নাদিতেও আমার আস্থা নাই, এক কথায় ধর্ম্ম-অর্থ-কামোপভোগও আমি কামনা করি না। পূর্বপূর্ব-কর্ম্মফলানুসারে আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক। কিন্তু, হে ভগবন্! জন্মজন্মান্তরেও যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী অচলা ভক্তি থাকে—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।]

বর্তমান পারিপার্শ্বিক ঘটনা, নানাপ্রকার আলোচনা ও সবকিছু নিয়ে তোমরা (দেশের ভাবী উন্নতিকামী উৎসাহী যুবক-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া) যদি একটু ভেবে দেখা, দেখবে—'মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, প্রীতিতে বাঁধবে'

* এই প্রবন্ধটি তাঁহার তিরোধানের স্মৃতিতে। তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা দর্শনে তিত্ত অভিজ্ঞতা-হেতু ইহার হিত-কামনার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার নিষ্কৃতির নির্দেশ দিয়াছেন।

—এ'কথা বড় কেউ জানে না। 'মানুষ শ্রদ্ধেকে শ্রদ্ধা করবে এবং তাঁ'দের নির্দেশ ও পরামর্শমত চলবে'—একথা বললে কেউ তোমাদের কথায় কাণ দেবে না। 'সজ্জনকে গালি দিয়ে, নিন্দা ক'রে, অপমান ক'রে' বক্তৃতা দাও রচনা লেখো—অমনি বাহবা পাবে। কারণ এখন সবাই আমরা বড় সজ্জন এবং সবাই আমরা সমান ও সমবুদার! মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা ও সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনতে হ'লে 'ভালকথা শুন্তে হ'বে, কিছু না কিছু তাঁ'র আচরণ ক'রতে হ'বে'—একথা বলা আজকাল যেন অপরাধ ব'লে গণ্য হ'য়েছে। কারণ বেশীর ভাগ মানুষই চায় না, ভালকথা শুনে ভালভালে চলতে। তাঁ'রা চায়—পরের ঘাড়ে চেপে, পরের উপর জুলুম ক'রে, কেড়ে-কুড়ে লুটে-পুটে খেতে।

শাস্ত্রে মানুষের মনের অবস্থা দুই প্রকার ব'লছেন—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেহ্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্ষ্যঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।]

দেবতা ও অসুর-শ্রেণী চিরদিনই জগতে থাকলেও দৈব-ভাবেরই সব সময় আদর। কিন্তু আজ আমরা শতকরা শত জনই দৈবভাব পরিত্যাগ ক'রে, অসুর-স্বভাববিশিষ্ট হ'য়ে নিতান্ত নৈনৈতিক নাস্তিক ব'লে নিজদিগকে জগতের কাছে হীন প্রতিপন্ন ক'রছি। এই হ'লো আজ আমাদের দেশের মানুষের পরিচয়, যে-দেশে জন্মেছিলেন স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, রামচন্দ্র, বামনদেব প্রভৃতি এবং তাঁ'দের অংশাংশরূপে জন্মেছিলেন ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি মুনি-ঋষিগণ, এবং কিছুদিন পূর্বে শ্রীল রূপ, সনাতন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ঠাকুর সরস্বতী প্রভৃতি। যে-দেশের যুবক-যুবতীরা দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য দলে দলে প্রাণ দিয়ে গেল, আজ দেখি সেই দেশের ছেলে-মেয়েরাই নিজের দেশের শান্তি-সম্মান ও সুনামকে উত্তেজনার বশে ধূলার লুটিয়ে দিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ ক'রছে না। বর্বরতা, অমানুষিকতা দমন ক'রতে ছুটে না গিয়ে এরা অনেকেই অপর পক্ষের বর্বরতা ও অমানুষিকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেষ্টা ক'রে, পথে-ঘাটে তাঁ'রই গৌরব ক'রে বেড়াচ্ছে।

আমাদের চারিপাশের এই অবস্থায়, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে এদেশের সাধু-সজ্জনেরা না জানি কি-কষ্টে, কতখানি মনোবেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

তোমাদের দেশেরই পৌরাণিক-যুগে এইসব মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্র অনেক

কথাই ব'লে গিয়েছেন। তা'র মধ্যে দু'একটা কথা আমি এখানে আলোচনা করছি—

“ব্রহ্মস্থানি বিনশন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।

কল্যাণ-ভক্তিবৃদ্ধশ্চ মদন্তো ন প্রণশ্ণতি ॥”

[অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সমস্তই নশ্বর। কিন্তু আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিব্যোগে অবস্থান করিয়া অনন্তকাল অপার আনন্দ-স্রোতে ভাসমান থাকেন। কোনকালেই তাঁহাদের বিনাশ বা ক্ষয় নাই।]

“ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তা লব্ধ্বা জন্ম সুদুল্ভম্।

তেহপি যান্তি মহীং পৃথ্বা নরাস্তীর্থং মমালয়ম্ ॥”

[অর্থাৎ আমার ভক্তগণ দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করত ভারতে পরিভ্রমণপূর্বক ভূলোক পবিত্র করিয়া পরিশেষে আমার আলয়ে আগমন করেন।]

এপ্রকার পৌরাণিক কথার নির্দেশ অনুযায়ী ভগবদ্ভক্তের আদর্শে তোমাদের প্রত্যেকের জীবনকে যদি গ'ড়ে তুলতে পার, তা' হ'লে আবার এই দেশের হতভাগ্য মনুষ্য-জগৎ সমগ্র বিশ্বের উন্নত সভায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে। তাই বলি, তোমরা ছোট হ'লেও যে-টা অমানুষের কাজ ব'লে তোমাদের মনে হ'বে—পাপ ব'লে মনে বুঝতে পারবে, তা'কে কোনদিনই তোমরা স্বীকার ক'রে নিয়ো না।

পুরাণো বছর চ'লে যাচ্ছে; তা'র সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় ক'রে দাও—তোমাদের যত কিছু অসৎ চিন্তা, অত্যাচার ও পাপগুলো। নতুন বছর আসার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম প্রভাত মনে-প্রাণে আপন ধর্ম ও প্রাণকে মহান ও গৌরবান্বিত করার নূতন সঙ্কল্প গ্রহণ কর। তোমাদের চারিপাশে কেউ কাউকে না মানলেও, কেউ কাউকে না বিশ্বাস করলেও, তোমরা পরস্পর সবাই সবাইকে মেনে চলার অভ্যাস কর এবং পরস্পরকে বিশ্বাস কর ও ভালবাসো। অযথা সময় নষ্ট না ক'রে যা'তে নিজ আত্মার স্বরূপ জাগে তা'রই রকমারি কাজে লেগে থাকার অভ্যাস কর। প্রত্যেক কাজের মধ্যেই একটা ভগবদ্ভাব রাখার চেষ্টা করবে। দেখবে, তা' হ'লে সকলেরই এই নূতন জীবনের চঞ্চল স্পন্দনে ঘরে ঘরে আবার মানুষ তৈরী হ'বে, তা'দের হারাণো চেতনা ফিরে পাবে, আর পাবে শান্তি—সুখ—স্বাস্থ্য।

ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তোমরা শুনাও শান্তির বাণী, প'ড়ে শুনাও এদেশের মহাপুরুষ-চরিত, শাস্ত্রীয় বাণী ও উপদেশগুলি। যথা—

ধর্মঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহিত পরমনির্মলসরাগাং সতাং

বেদ্যং বাস্তুবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিরুতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ

সদ্যো হৃদ্যবরুদ্বতে কৃতিঃ শুশ্রুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ (ভাঃ ১।১।২)

[ভাগবত-ধর্ম আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কর্তৃক চতুঃশ্লোকী রূপে উপদিষ্ট ।

ইহা নির্মলসর অর্থাৎ সর্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আশ্রয়ণীয় ধর্ম । ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্কর্ণের অতীত বলিয়া ইহার অপর নাম পরম-ধর্ম । এই সনাতন-ধর্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, মঙ্গলপ্রদ ও বাস্তুব-বস্তু ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-প্রদানকারী । ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ।]

আরও শুনাও—

লক্ষ্য। সূত্বলভমিদং বহুসন্তবাস্তে

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদমৃত্যু যাবৎ

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ শ্রুৎ ॥ (ভাঃ ১।১।২২)

[চৌরাশী লক্ষ জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, অতএব ইহা বিশেষ চুল্লভ । এই মানব-জীবন অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ । সুতরাং বিবেকী পুরুষগণ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যু পর্য্যন্ত চরম কল্যাণ লাভের জন্ত চেষ্টা করিবেন । ইহাই মানুষ-জীবনের সফলতা ।]

নিজেরা শাস্ত্রের উপদেশ-নির্দেশগুলি পালন ক'রে, হাতে-কলমে কাজ শিখে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঐগুলি সবাইকে দেখিয়ে দাও । “অলস হ'য়ে ব'সে থাকা কতখানি অন্যায়া । দেশ ও জাতির প্রতি কতখানি শত্রুতা !!—একবার চিন্তা কর । ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে ভারতে নাস্তিকতার যে সর্বনাশা ধ্বংসের স্রোত নেমেছে, তা' থেকে যাঁরা মুক্তি পেতে চান তাঁদের পথই একমাত্র অমুসরণ কর—নচেৎ কল্যাণ নাই । এই ধ্বংসের স্রোতে ভারতের ভাবী উত্তরাধিকারী তোমরা ভেসে যেয়ো না । তোমরা ভেসে গেলে আমরা আমাদের শেষ সম্বল হারিয়ে সবাই সর্বহার হ'ব ; তা' কখনই হ'তে দিও না—এই আমার বর্ষান্তে শেষ প্রার্থনা ।

উপসংহারে “নববর্ষ উৎসবে” তোমরা সবাই মিলিত হ'য়ে মনীষিবৃন্দের

বাণী থেকে নব নব প্রেরণা লাভ কর। পরিশেষে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে আমার এই “উদ্দেশ্যহীন প্রবন্ধ” শেষ ক’রুনাম।

বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী

(মথুরা)

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য-তত্ত্ব কেন ?

শান্তি-পিপাসা-কাতর মানব-সমাজ সর্বাধিক উচ্চতম নীতির আদর্শকে বাদ দিয়া, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনের পরস্পর আনন্দ-গোষ্ঠী রচনার আকাজক্ষায় মানবেতর ভূচর, জলচর ও খেচর প্রাণী-সমূহের মধ্য হইতেও অনেক নীতি আহরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাই রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যবহার, গঠন, পোষণ, উৎপাদন, রক্ষণ, ধ্বংস, স্বভাব ও শান্তি প্রভৃতি যত প্রকারের নীতি আছে, তৎসম্বন্ধীয় নীতিগুলি মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও আছে জানা যায়। এইজন্ত উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ববিদগণ উদ্ভিজ্জ-জাতির মধ্যে, পশু-তত্ত্ববিদগণ পশু-জাতির মধ্যে, পক্ষী-তত্ত্ববিদগণ পক্ষী-জাতির মধ্যে এবং সরীসৃপ ও কীট-তত্ত্ববিদগণ সরীসৃপ ও কীট-জাতির মধ্যে বহু বহু নীতির ব্যবহার দেখিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পিপীলিকার রাষ্ট্র ও সমাজ-নীতি অগ্ৰতম। বর্তমান সোভিয়েট রুশজাতি যে নীতি পরিবহন করিতেছেন, তাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। পরস্পর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লালিত-পালিত হইয়া নিজ নিজ সুখ অশুভবই ইহাদের জীবনের মূল-ব্রত। যদিও ইহারা ষড়্‌রসের মধ্যে মধুর-রসের অধিক প্রিয়, তথাপি মোমাছির সহিত ইহাদের তুলনা হয় না। মোমাছির সমাজ সঞ্চয়ের প্রথম হইতেই ধ্বংসের দিকে না গিয়া চরমে কোথাও কোথাও হটাৎ ধ্বংসমুখে পতিত হয় মাত্র। ইহারা শূন্য-বিহারী ; কিন্তু পিপীলিকা শূন্য-বিহারী হইতে গেলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্ত শাস্ত্র সাধারণ কন্মি-সমাজকে পিপীলিকার সহিত, ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়কে বানরের সহিত, পুণ্যকামী কন্মি-সমাজকে মোমাছির সহিত, এবং ভক্তগণকে বৃক্ষ ও ভ্রমরের সহিত স্থানে স্থানে তুলনা করিয়াছেন।

এই জগতে আকর্ষণ-ধর্মী অনেকেই বহু-ভোক্তা ও একক-ভোক্তা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কারণ মরণশীল ঐ-সকল ব্যক্তি ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যাদি দোষযুক্ত। আবার কেহ কেহ সাধুমুখে হরিকথা শুনিয়া এবং গীতা-ভাগবতাদি পড়িয়াও সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে একমাত্র ভোক্তারূপে বরণ করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের উক্তি,—ভগবান্ যদি সর্ব-অন্তর্যামী, বিশ্ববন্ধু, ভক্তবৎসল, দীনার্তিহর ও অদোষদর্শী, সত্যব্রত গুণবিশিষ্ট হন, তবে জগজ্জীবের এত দুঃখ ও কষ্ট কেন? স্মরণ্য আসলে তাঁহার যথেষ্ট অযোগ্যতা আছে; এই নিমিত্ত তিনি একমাত্র ভোক্তা বা আরাধ্য হইতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন,—অবাধ্য পুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার, নয়নমুদ্রিত জনের প্রতি সূর্যের ব্যবহার, আহারে অনিচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি খাদ্যদাতার ব্যবহার, অন্ধকারে বস্তু-বিচারের ব্যবহার প্রভৃতির তুলনাগুলি ভগবান্ ও তদ্বশ্ত জনের প্রতি প্রযুক্ত না হওয়াই উচিত। এখানকার তুলনাগুলি যখন নশ্বর, তখন ঐসকল তুলনা দিয়া ভগবৎ সম্বন্ধীয় গুণ বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এখন আসুন, আমরা ঐসকল প্রশ্নের বিচার শ্রবণ করি। এজগৎ গোলোকের সহিত সম্পূর্ণ বিযুক্ত নহে বলিয়াই অথবা বন্ধ-মুক্ত জীবপুঞ্জের বিচরণ-ক্ষেত্র বলিয়াই এখানকার তুলনাগুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। এইজন্ত এখানকার বিভিন্ন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের উপমা ও উদাহরণের তুলনাগুলি আংশিকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে যত প্রকার আদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ইতিহাস এবং তুলনাকেই কেন্দ্র করিয়া আছে। তবে তুলনামূলক নীতিগুলি গ্রহণ করিতে গিয়া মানব-জাতির ইতর-প্রাণীর নীতি-ধর্মের আজীবন দীক্ষিত থাকা উচিত নহে। সনাতন জীবাত্মার বাস্তব জীবনের সহিত ঐসকল নীতির কোন সামঞ্জস্য নাই। অতএব মানব-জাতির বাস্তব-জীবনের সর্বতোভাবে উন্নতি বিধানকল্পে একমাত্র সর্বাধিক উচ্চতম আদর্শই গ্রহণযোগ্য। সর্বাধিক উচ্চতম নীতির আদর্শ কোথায়?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারি—

তর্কাহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,

নাসাবৃষির্যশ্চ মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্যশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

মহাজনো যেন গতঃ সঃ পস্থাঃ ॥ (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ৩১৩.১।১৭)

অর্থাৎ তর্ক স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাহার মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষিই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্যতত্ত্ব গুঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে

অর্থাৎ যে-কোন শাস্ত্র-পাঠ করিয়া তাহা পাওয়া কঠিন । সুতরাং যাহাকে ‘মহাজন’ বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে শাস্ত্র-পথ বলিয়াছেন, অপর সকল ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শের জন্য সেই পথেই গমন করা উচিত ।

যে বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম । অতএব জীবসকলের নিত্য-স্বভাবের নামই—নিত্যধর্ম । সেই ধর্মের তত্ত্ব গুহায় লুক্কায়িত কেন ?—এই প্রশ্নের উত্তরে একটি তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে,—

কোন সময় কোন রাষ্ট্রনায়ক যদি রাষ্ট্রের কোন খণ্ডদেশ আগবিক বা উদ্যান বোমা দ্বারা ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা আছে জানিতে পারিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উন্নতিমূলক মূল্যবান্ ধন-রত্নাদি ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দলিলাদি-সমূহ কেবলমাত্র আত্মরক্ষা দলকে জানাইয়া গোপনে রক্ষা করেন, তাহা হইলে ধ্বংসের পরবর্ত্তী কালে সেই দেশের শিশুগণ আত্মরক্ষা-দলের সাহায্যে যেরূপ উহা লাভ করিয়া নিজেদের বাস্তব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তদ্রূপ বদ্ধজীব-গণ যুগ-যুগান্তর ও কল্পের ধ্বংসশীল এই জগতে থাকিয়াও অবিনশ্বর নিত্য-ভূমিকার পরিচয় জানিতে চাহিলে, ত্রিকালদর্শী মহাজনগণের আচরিত যে-শিক্ষা জগতে প্রচারিত আছে, তাহাই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ও পরম আদর্শরূপে তাহাদের গ্রহণ করা কর্তব্য ।

এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে অজামিল-উদ্ধার-প্রসঙ্গে—“ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতম্” ও “স্বয়ন্তুনীরদঃ শত্ৰুঃ” শ্লোকদ্বয়ে শ্রীযমরাজ নিজ-দূতগণকে বলিয়াছেন—হে দূতগণ ! ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত । ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, এমন কি, দেবতাগণ অথবা সিদ্ধদেব, অশুরগণ, মানবগণ কেহই উহা জানেন না ; বিদ্যাধর, চারণগণ কি-প্রকারে জানিতে পারিবে ? হে ভূতগণ ! কেবল ব্রহ্ম, নারদ, শঙ্কর, সনৎকুমার, দেবহুত-পুত্র কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম)—এই দ্বাদশজন ভাগবত-ধর্ম অবগত আছি । ঐ ধর্ম অতিশয় পবিত্র, গোপনীয় ও দুর্লভ ; কিন্তু উহা জানিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় । সুতরাং তখনই শ্রীগীতার,—“যঃ শাস্ত্রবিদীমুৎসৃজ্য” শ্লোক ও দেবগুরু বৃহস্পতির “কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কৰ্ত্তব্য বিনির্গমঃ” শ্লোক অনুভবের বিষয় হইবে । দ্বাদশ মহাজন সাত্ত্বিক পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণত-জন-পালক, ভক্ত-বৎসল, শরণাগত-বন্ধু, দীনাগ্রিহর ও দুঃস্থ-নিবহর প্রভৃতি বলিয়াছেন । (ক্রমশঃ)

“আমিও যা’ব”

আজ রবিবার, সূতরাং সময়মত খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। চক্ষু দু’টা চারিদিকে ছুটছে, আর আমি কিন্তু অস্থির হ’য়ে প’ড়েছি। এমন সময় দেখ লাম—দুইটা বাবু অত্র রাস্তা ছেড়ে আমারই পথের পথিক হ’লেন। আমি তাঁ’দের না চিনলেও কথাবার্তায় নাম জানতে দেবী হ’ল না।

গোরা,—কানু, তোমাকে অনেকদিন থেকে ব’লেছি যে, ফাল্গুন মাসের শেষে এক জায়গায় যেতে হ’বে।

কানু,—কোথায় যাবে? বন্ধু-বাড়ী নাকি?

গোরা,—হাঁ, ঠিক ব’লেছ। বন্ধু-বাড়ীই বটে, প্রকৃত বন্ধু-বাড়ী। ‘হুনিয়ায় যত বন্ধু-বান্ধব দেখ,’ সবই ভাই পয়সার সময়। যেমন গৃহস্থের বাড়ীতে ধান, চাল থাকলে দলে দলে পায়রা এসে জুটে, না থাকলে সে-উঠানও মাড়ায় না; সেইরূপ সময় ভাল থাকলে কতজন না কতভাবে ভালবাসা পাতায়; আর অসময়ে পড়লে ছাতা আড়াল দিয়ে স’রে যায়।

কানু,—খুব তত্ত্বকথা আরম্ভ করলে যে! কেরাণীর আবার ধর্মচিন্তা! মাস ভরে খাট’, মাস গেলে টাকাটা নিয়ে দোকান-দেনা শোধ কর। এর মধ্যে পরমার্থ-চিন্তা কখন হয় ভাই?

গোরা,—ঠিক ব’লেছ ভাই। তবে কিনা যা’না করলে চলবে না, তা’ ছেড়েই বা কি ক’রে থাকি? শরীর-রক্ষা করতে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই শরীরের দ্বারা যদি পরমার্থ না পাওয়া গেল, তবে সে শরীরের প্রয়োজন কি? শাস্ত্র বলেন—“অ’হার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভিন’রাণাম্”। পশু-পক্ষীরাও ত’ খেয়ে-দেয়ে দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরা ত’ তা’দের চেয়ে বুদ্ধিমান বটে।

কানু,—ভাই, তোমার কথা ঙলি লাগছে ভাল, বেশ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—তুমি এ-সব কথা চিন্তা কর কখন?

গোরা,—একথাটাও আবার বুঝাতে হ’বে ভাই? যখন জন্ম হ’য়েছে, তখন মৃত্যু হ’বেই, সূতরাং মরণ-পথের পথিক আমি, মরণের পরপারের চিন্তা করব না?

কানু,—ঠিক ব’লেছ ভাই। আমারও মাঝে-মাঝে সেই কথা মনে হয়। তবে কিনা বাড়ীর কাউকে এসব চিন্তা করতে দেখি না। বন্ধু-বান্ধবের কথা ত’ তুমি সবই জান। একে আমাদের বয়সের সময়, তারপর আবার সঙ্গ চমৎকার! সবই ভোগের দিকে ছুটছে। একটু আধটু ধর্ম-চিন্তা করবার স্থানই নাই।

গোরা,—কেন ? এই জগতে খুঁজলে সবই পাওয়া যায় ।

কান্ন,—সত্যি নাকি ? বলত’ কোথায় ?

গোরা,—কেন কান্ন, তুমি কি নবদ্বীপের শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের নাম শুন নাই ?

কান্ন,—নাম শুনেছি । সেদিন অনেকের নিকট “শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির” অনেক ছাপা নিগন্তন পত্র দেখলাম, এবং মহোৎসবের বিজ্ঞাপনও পড়লাম । তবে সেখানে যাওয়া ভাগ্য হ’য়ে উঠেনি ।

গোরা,—এই কলি-ক্ষেত্রে সেই স্থানটী কলির বিপরীত । মঠবাসী সকলেই ত্যাগী ও সদাচারী । যাঁর সঙ্গে আলাপ করবে, দেখবে সবাই বেশ পণ্ডিত । মঠের মহারাজজীর কথা ভাষায় বলা যায় না । তাঁর সেই সৌম্য, প্রশান্ত মুক্তিখানি দেখলেই যে-কোনও জীব ভগবন্তজনে প্রবৃত্ত হ’তে বাধ্য হ’বে ; মঠে এমন গৌরান্দেব ও রাধাকৃষ্ণের মুঠি আছেন, যা’ দেখলেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায় ।

কান্ন,—আমাকে নিয়ে যা’বে ?

গোরা,—তুমি গেলে নিয়ে যা’ব । সেখানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, ধর্ম লোচনা ইত্যাদি হয় ।

কান্ন,—তবে ভাই এই সপ্তাহেই যা’ব ।

গোরা,—না, এসপ্তাহে নয়, কেন-না, ২২শে ফাল্গুন থেকে এবৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হ’বে । এবং তা’র পরই দোল-পূর্ণিমা ও মহোৎসব—একুনে এই সাত দিন ।

কান্ন,—ভাই, নবদ্বীপের ব্যাপার ছেড়ে দাও । একটা যোগ জুটলেই ঠাকুরবাড়ীর মালিকদের স্বেযোগ । ভেট ইত্যাদি নিয়ে বড়ই গুণগোল বাধায় ।

গোরা,—তুমি সংসার-নবদ্বীপের অগ্ন্যন্ত স্থানের কথা বলছ । সেখানে ব্যাপার ঐরকমই । এস্থান কিন্তু অগ্নরকম ।

কান্ন,—‘নবদ্বীপ’ আবার কয়টা ?

গোরা,—একটু আগেই না বললাম যে, নয়টি দ্বীপ নিয়ে ‘নবদ্বীপ’ । এ ছাড়া ‘নবদ্বীপ’-নামের আরও অনেক ঐতিহ্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে আছে । এ’কথা এতদিন লোকের অজানা ছিল । এখন সে-সব স্থানের প্রচার হ’য়েছে ।

কান্ন,—তাই নাকি ? আচ্ছা, যাঁরা পরিক্রমায় যাবে, তাঁরা কোথায় থাকবে ? কি থাকবে ?

গোরা,—ভাই, সেই কথাই ত’ বলব । এমন স্বেযোগটী আর পাবে না । এখানে যত লোক যা’বে বিনাবায়ে থাকবার স্থান ত’ পাবেই, তত্পরি হ’বে না ।

পেট পূরে প্রসাদও পেতে পারবে। এখানে ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার।

কানু,—তাই নাকি? এ ত' খুব আশ্চর্য্য! এই কণ্ট্রোলার বাজারে কি সম্ভব? যাহা হউক, তুমি কি নবদ্বীপ যাওয়ার কথাই বলছিলে?

গোরা,—হাঁ, আমি আজ ১৫ দিনের ছুটির দরখাস্ত করব। ছুটি পাওনা আছে, হ'য় যাবে।

কানু,—তবে ভাই তোমার সঙ্গে আমিও যা'ব।

এই কথা শেষ হ'বার পর বন্ধু দুইজন অগ্র রাস্তায় চ'লে গেলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম—হায়! আমি ত' কিছুই জানি না। যাই হোক জীবনটা ত' কলুর বলদের মত খেটে খেটে চ'লে গেল। এবার একবার নিশ্চয়ই মোড়টা ফিরিয়ে দেবো। সংসারের জন্ত এত খাটছি, কিন্তু আমার পরকালের কি করলাম? ঐ ভদ্রলোক আফিসে চাকরী ক'রেও বেশ সাধুসঙ্গ, তীর্থ করছে। যাক, ভগবানের বড় দয়া, তাই এতকথা শুন্বার সুবিধা হ'ল। তিনি যখন তাঁ'র ধামের কথা আমাকে জানানেন, তখন আমার কর্তব্য অবশ্যই করতে হ'বে। পরিক্রমায় শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আমিও যা'ব।

সাধুসঙ্গাভিলাষী—

—শ্রীহরিদাস রায়

সভাপতি, নারায়ণ বিদ্যাসাগর-তরুণ-সঙ্ঘ

(মেদিনীপুর)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, ৮ পঙক্তিতে “প্রভুপাদের তিরোভাব” স্থলে “প্রভুপাদের আবির্ভাব” হইবে। উক্ত সংখ্যার ৪৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত “শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান”-শীর্ষক নিমন্ত্রণ পত্রে উহা ঠিক লিখিত হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার ১০ম ও ১১শ সংখ্যার যথাক্রমে ৪০০ ও ৪৩৯ পৃষ্ঠায়, ২৬,৩০ ও ১৭,২০ পঙক্তিতে পারণের ব্যবস্থা কলিকাতা সময়ানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ষান্তে নিবেদন

জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পায় আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার তৃতীয়-বার্ষিকী সেবা সমাপন করিতে সমর্থ হইলাম। আমরা তাঁহারই আদর্শে সিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা সঞ্চল করিয়া শ্রীপত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্তমান বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিনি “পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি”-নামক প্রবন্ধে আমাদেরকে যে আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব তাৎপাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিনি উক্ত প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—“সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমার্থিক পত্রিকার বৃত্তি।” “নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরমানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষ্টের বশবর্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ ‘নামাপরাধ’ সঞ্চয় করেন।”

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-মণ্ডলী, মুদ্রাকর-মণ্ডলী, লেখক-মণ্ডলী ও পরিচালক-মণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যথাযোগ্য সেবা করায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আনন্দের বিষয়—আমাদের এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; এমন কি, এখন হইতেই আগামী ৪র্থ বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য বহু সজ্জন ব্যক্তির আবেদন পত্র পাইতেছি। তজ্জন্ম আমরা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর অধিক সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিব। বড়ই দুঃখিত হইতেছি, পত্রিকার শেষভাগেও বহু সাধুব্যক্তি এই পত্রিকার প্রথম হইতে গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, আমাদের মুদ্রিত সংখ্যা অতিক্রম করিয়া যাওয়ায়, আমরা তাঁহাদিগের সন্তোষ-বিধান করিতে পারি নাই। আজকাল কাগজ ও মুদ্রন-ব্যয় অত্যধিক বলিয়া আমাদের বর্তমান ও ভাবী গ্রাহক বন্ধুবর্গকে নিবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত থাকিবার বা হইবার জন্য পূর্ব হইতেই আমাদেরকে অবহিত করেন।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে শুনিতে পাই, “পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ চলে।” ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে “ধর্মঃ প্রোজ্জ্বলিত-
কৈতবোহত্র পরমোনির্মলসরাণাং সতাম্” ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।
স্মৃতরাং ধর্মের গ্রায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ তাহা পারমার্থিক তত্ত্ব নহে—এরূপ
কোন মায়ামিশ্রিত ক্রিয়াকলাপে আমাদের প্রবেশ করা বর্তব্য নহে। যে-কোন
কর্মবীর, ধর্মবীর, জ্ঞানবীর বা যোগবীর হউন না কেন, আমরা ভাগবতের

বিচার অবলম্বন করিয়াই সকলকে পারমার্থিক জীবন-যাপনের অনুরোধ করি। সর্বাপেক্ষা উন্নততম প্রয়োজন-লাভের সুযোগ অনুসন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য। আমরা তাহাই শ্রীপত্রিকায় আলোচনা করিয়া থাকি। এতৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তারতম্যমূলক বিচার স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। তজ্জন্তু আমরা নিরপেক্ষ পাঠক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—
তঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমাদের আনন্দবিধান করেন। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া শ্রীপত্রিকার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। “প্রাণীমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে”—ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা। অনুদ্বিগ্নচিত্তে নিছক সত্যকথা আলোচনা করিলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে। গুরুবর্গ, পিতামাতা, শিক্ষকশ্রেণী ও অভিভাবকগণ সর্বদাই প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা লইয়াই আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া মধুর কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহা প্রকৃত কটু নহে, বস্তুতঃ মধুর। সকলেই তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন—“সন্তু এবান্তু ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।”

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দৃঢ়তার সহিত পূর্ব মহাজনগণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যপ্রচারে পরাজুগ হইতেছেন না। বিশেষ দুঃখের বিষয়, কতকগুলি হবিগুরুবৈষ্ণব-বিদেষ্টা ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আচার-প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীগুরুপাদপদের কৃপা-উৎসাহে আমরা তাহা সমস্তই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছি ও হইতেছি। অধিকন্তু, আমরা তাহাদিগকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; যেহেতু তাহারাও ব্যতিরেকভাবে শ্রীপত্রিকার সেবা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি ‘বেনামী-পত্র’ পরপর লাভ করিয়াছি। আমরা সেই পত্রগুলির উত্তর ও সমালোচনা আগামী ৪র্থ বর্ষের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিব। ঈর্ষা, ঘেঁষা, হিংসা—ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত বিরুদ্ধ। “পর-চর্চকের গতি নাহি কোন কালে”—ইহাই মহাজনগণের শিক্ষা।

পারমার্থিক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রথম হইতেই যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি—“ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না।” সুতরাং সেই ভক্তিবিনোদ-ধারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় একমাত্র বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫১

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগপাবনারতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ, বৃহস্পতিবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ, বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টি দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্তনমুখে ষোলকোশ পরিক্রমা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-দ্বারা বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাঙ্কর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদিগ্ভাসী শ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতবা বা প্রেরিতব্য।

পারিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

- ১। ২২শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(১) শ্রীগৌড়মদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—
গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ
প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-
বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)
(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা,
হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।
- ২। ২৩শে ফাল্গুন, শুক্রবার— (৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—
গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ,
কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, টাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) এবং
(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাভতপুর
বা রাঁতুপুর।
- ৩। ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার— (৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর
(জহ্নুমুনি-স্থান), বিছানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।
(৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্তাখ্য)—মামগাছি
(শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, য়াতাপুর
বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।
- ৪। ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামাতলা
ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া,
শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।
- ৫। ২৬শে ফাল্গুন, সোমবার—(৮) শ্রীসৌমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া,
শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং
(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—
শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মাভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন,
শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের
সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)
শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট।
- ৬। ২৭শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—শ্রী শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।
- ৭। ২৮শে ফাল্গুন, বুধবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্বসাধারণে
মহা-প্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্যামৌ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ ।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপরমধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী ।
- ৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২ বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ।
- ৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব ।
- ৫। শ্রীপিছল্দা পাদপীঠ—পিছল্দা, ঈশ্বরপুর পোঃ, (মেদিনীপুর) ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্কলিত ও প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। প্রেম-প্রদীপ

অভিনব সংস্করণ । যোগ, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার-সম্বলিত অপূর্ব পারমাণ্বিক উপন্যাস । গ্রন্থখানি একাধারে রসশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রের অপূর্ব সঙ্কলন । ইহা স্মরসিক ভগবদ্ভক্তগণের অবশ্য পাঠ্য । মূল্য ১৥০ টাকা মাত্র । শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ সিকা মাত্র ।

২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী

অভিনব সংস্করণ । অতি সুন্দর কাগজে অতি উত্তম ছাপা । মূল্য ১৥০ টাকা মাত্র । শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ সিকা মাত্র । এই গ্রন্থখানি সকলের বিশেষতঃ বৈষ্ণবমাত্রেরই সংগ্রহ করা কর্তব্য ।

৩। শরणाগতি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব গীতি-সাহিত্য । ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্তনীয় । মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।

৪। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

এই গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলার প্রকাশক । গ্রন্থকর্তা ইহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীধাম নবদ্বীপের ৯টি তীর্থস্থানের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনামূলক অপূর্ব গ্রন্থ । ইহার পদ-লালিত্য ও কাব্য অতীব মধুর । মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।

৫। SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

HIS LIFE AND PRECEPTS

BY THAKUR BHAKTIVINODE. Price Re. 1/- only.